সৌরীন্দ্রমোহন গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

বিগত দিনের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের কথা বলতে গেলেই লেখক অথবা কথকেরা মুখবন্ধরূপে অনুযোগ তোলেন যে লেখককে আমরা ভুলে গেছি। আমার মনে ও কানে এই ধুয়া খারাপ ঠেকে। মনে হয় যেন অমুকের বই আমরা অবজ্ঞাবশত পড়ি না এবং তা না পড়া যেন আমাদের অপরাধ। লেখক-কথকরা ভুলে যান যে সূর্যের মতো দীপ্তিমান্ সাহিত্যিকেরও উদয়াস্ত আছে। আমাদের দেশের কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন সাহিত্যিকের রচনা একটানা পাঠকের গোচরে থাকে না এবং তা থাকবার কথাও নয়। তবে এখন ভালো হোক মন্দ হোক, এক শ্রেণীর সাহিত্যরচনা আবশ্যিকভাবে আমাদের চোখের সামনে পাতা খুলে থাকে। সে হল পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক, রাজনীতির গলাবাজি অথবা ধর্মনীতির বিজ্ঞাপন। এ রচনাগুলির কথা ধরছি না।

নারীর অলঙ্কারের মতো সাহিত্য হল মোটামুটি রুচির ব্যাপার (সেই সঙ্গে মনের কারবারও বেশ থাকে)। মেয়েদের অলঙ্কার যেমন ঘুরে ফিরে আবার আসে ফ্যাশন হয়ে, সাহিত্যও তেমনি আবার ফিরে আসে পাঠকের ভোজে। সুতরাং কালকের লেখকের বই আজকের পাঠক যদি না পড়ে, তবে ভাবনার কিছু নেই। রচনায় গুণ থাকলে ছাপা বই সহজে মারা পড়ে না। সত্য বটে, ফ্যাশনের প্যাঁচে ভালো লেখকের রচনা বিকৃতদৃষ্টি পাঠকের কাছে গ্রহণদুষ্ট হতে পারে। যেমন হয়েছিল ডিকেন্সের রচনা ইংরেজ পাঠকের কাছে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে। কিন্তু এ গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পেরতে না পেরতেই আবার ডিকেন্সের বই পাঠকের নজর আকর্ষণ করলে, আগেকার চেয়ে বেশি প্রবলতায়।

সৌরীন্দ্রমোহনের প্রসঙ্গ তোলবার আগে এত কথা যে বললুম, আশা করি পাঠকবর্গের কাছে তা বাজে বকুনি বলে গণ্য হবে না।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম তোড় কমে আসবার পরেই আমাদের সাল তারিখের এই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দু'একটি তরুণ লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল গল্প লেখকরূপে। এঁদের নেতা ছিলেন, পরোক্ষভাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং এঁদের ক্ষেত্র ছিল 'ভারতী' ও 'কুন্তলীন' পুরস্কার।

'ভারতী'র দ্বার খুলত কিছু পাকা হাতের লেখকদের জন্যে। 'কুন্তলীন' পুরস্কার কাঁচা-পাকা দু'রকম হাতের লেখকই লাভ করতেন। সৌরীন্দ্রবাবু তরুণ হলেও গোড়া থেকেই লেখায় শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই ভারতীর আসরে তিনি ঠাঁই পেয়েছিলেন এবং 'কুন্তলীন' পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত হন নি।

রবীন্দ্রনাথের পর ছোট গল্পে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন প্রভাতকুমার। ইনি সৌরীন্দ্রমোহনের চেয়ে বয়সে দশ-এগার বছর বড় ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন গল্প রচনায় অনেকটা প্রভাতকুমারের অনুসরণ করেছিলেন। সমসাময়িক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের রোমান্স তাঁর বিশিষ্ট গল্পের বিষয়। তিনি তাঁর আশেপাশের জীবন থেকে সরল মধুর কিছু সকরুণ ছবি এঁকেছিলেন তাঁর গল্পে। ওঁর গল্পের মর্ম গভীর নয়, তা ভাবায় না, তা মনকে হালকা করে। সৌরীন্দ্রবাবুর সাহিত্য রচনার ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল,—তাঁর নিজস্ব। হয়ত তাঁর হালকা ভাষার জন্যেই সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পের যতটা সমাদর হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নি। আমার মনে হয়, এখনকার পাঠক খোলা মনে সৌরীন্দ্রমোহনের গল্প পড়লে বেশ আনন্দ পাবেন। আরও একটা কথা আছে। সৌরীন্দ্রমোহন. প্রভৃতি তখনকার গল্পলেখকেরা যা লিখতেন, তার মধ্যে গল্পত্ব অর্থাৎ পাঠকের মন কাড়বার উপাদান বেশ থাকত। এখনকার গল্প লেখকেরা তো গল্প লেখেন না, লেখেন রুগ্ন মনের প্রব্লেম, বিকৃত রুচির ব্যাখ্যা, সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা কিংবা রাজনৈতিক জটিলতা। এখনকার দিনে গল্পখোর পাঠক আছে বলে মনে হয় না। (আছেন নিশ্চয়ই, তবে অন্তঃপুরের অন্তরালে কিংবা ঘরের কোণে।) উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, এখনকার দিনের পাঠকেরা টাটকা ডাবের জল খেতে পছন্দ করেন না, পছন্দ করেন অত্যন্ত ঝুনো নারকোলের ছোবড়া ছাড়িয়ে শুকনো শাঁসে কামড় দিতে। আমি ঝুনো নারকোলের কিছুমাত্র নিন্দা করছি না, ডাবের প্রতিও আমার কোন অন্ধ আসক্তি নেই। আমার কাছে তৃষ্ণায় যেমন নারকোল নয়, ডাব আদরণীয়, তেমনি গল্প পড়বার

সময়ে তত্ত্বকথার থিসিস অথবা কুৎসিতের বিজ্ঞাপন নয়, মন হাঁলকা করা সরস গল্প ভালো লাগে। স্বীকার করতে কিছু লজ্জা হচ্ছে না যে আমি গল্পের জন্যেই গল্পের বই পড়তে চাই। আমার মতো আরও অনেকে চান। তবে তাঁরা বলতে সাহস করেন না পাছে আশেপাশের বিদগ্ধ বন্ধুবান্ধবেরা উপহাস করেন।

সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে গল্পরস আছে। তাই সেগুলির স্বাদ এখনকার পাঠকেও উপভোগ করবেন। ভাবুক মানুষের মৌলিক ভালো লাগার পরিবর্তন ঘটে না।

সৌরীন্দ্রমোহনের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল অনুবাদের কাজে। ঠিক অনুবাদের কাজে নয়, অপরের লেখা কাহিনীর নিজস্ব রূপান্তরে। দেশী-বিদেশী বস্তু নিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন অনেক গল্প লিখেছেন। সে সব গল্প মৌলিক রচনার মতোই পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত। আমার মনে হয়, সৌরীন্দ্রমোহনের এই কৌশলের আশঙ্কা করেই অনেক সমসাময়িক সমালোচক তাঁর মৌলিক রচনারও খোলাখুলি প্রশংসা করতে সাহস পেতেন না।

সৌরীন্দ্রমোহন প্রথম দিকে অনেকগুলি নাটিকা—প্রহসন লিখেছিলেন। তার কোনটির বস্তুই নিজস্ব নয়। কিন্তু সেগুলি খুব সুরচিত বই এবং সেকালের রঙ্গমঞ্চে সে সব বই সপ্রশংস অভিনীত হয়েছিল।

যে চারজন নবীন লেখককে আমরা সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেকার দিনের "আধুনিক সাহিত্যিক" বলতে পারি, সৌরীন্দ্রমোহন তাঁদের একজন ছিলেন। ঠিক মনে করতে পারছি না, হয়ত তাঁদের প্রথমতম। আর তিন জন হচ্ছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সৌরীন্দ্রবাবুর চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়ো), আর মণিলাল এবং হেমেন্দ্রকুমার (এঁর আসল নাম ছিল প্রসাদদাস এবং এ নাম তাঁর কোন কোন রচনায় স্বাক্ষর রূপে পাওয়া যায় ১৩২০ সাল পর্যন্ত) ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহনের চেয়ে চার বছরের ছোট। বয়সের হিসেবে চতুরঙ্গের মধ্যবর্তী সৌরীন্দ্রমোহন আধুনিকতায় —বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের রচনায়—কিছু অনগ্রসর ছিলেন। মণিলালের সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন বেশ কিছুকাল ভারতীর জোয়াল টেনেছিলেন। মণিলালকে এবং হেমেন্দ্রকুমারকে

সৌরীন্দ্রমোহনের ভাবশিষ্য বলতে পারি। তিনজনের মধ্যে একটি ত্রিভুজবন্ধনও লক্ষ্য করা যায়। সে হল বঙ্গ মঞ্চপ্রীতি।

চারজনের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহনই বহুপ্রসূ ছিলেন। তাঁর পরে নাম করতে পারি চারুচন্দ্রের। মণিলাল অল্প বয়সে পরলোক গমন করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ লেখাই ছোট ও হালকা ধরনের। তবে আধুনিকতায় তিনি ছিলেন চতুরঙ্গের সবচেয়ে অগ্রসর। তাঁদের জ্যেষ্ঠ চারুচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মণিলালের কাছে পিছিয়ে পড়েছিলেন।

সাহিত্যজীবনকে প্রথম থেকেই সৌরীন্দ্রমোহন মুরুব্বির পার্ট প্লে করতে পেরেছিলেন। একাধিক বয়সে বড়ো ও ছোট নবীন সাহিত্যপথিককে সেথো হয়ে পথ দেখিয়ে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তাঁরই সহায়তায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে নিরুপমা দেবী প্রভৃতি লেখক-লেখিকা প্রথমে 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রাপ্তি ও পরে 'ভারতী'তে প্রকাশ-সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় দেড় শ' বছরের ইতিহাসে এমন সাহিত্য তীর্থের সেথোগিরি করেছিলেন এমন আর একজন ব্যক্তির নাম মনে পড়ছে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের বেশ তফাৎ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র প্রবীণ, গুরুস্থানীয় এবং লেখা ছাপতেন তাঁর নিজস্ব পত্রিকায়। সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন নিতান্ত নবীন, সুহৃৎস্থানীয়। তাঁর নিজের কাগজ ছিল না, ছাপিয়ে দিতে সাহায্য করতেন প্রতিষ্ঠিত সাময়িকে। সুতরাং সাহিত্য-সার্থবাহ হিসেবে সৌরীন্দ্রমোহনই বেশি প্রশংসার্হ।

সৌরীন্দ্রমোহনের গ্রন্থাবলী এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তাঁর অনেক বই ছাপা হয়েছিল গ্রন্থাবলীতে। সে গ্রন্থাবলীর কাগজ ভালো নয় বলে তা বেশিদিন টেকে নি। এখন বোধ হয় সৌরীন্দ্রমোহনের বই একটি একটি করে অথবা সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থাবলী করে ভালোভাবে ছাপিয়ে বার করার সময় হয়েছে।

সূচীপত্র

ওগো বর ওগো বধূ

শীতের বেলা। পাঁচটা বাজিবামাত্র সূর্যকে আড়াল করিয়া ছায়ার পর ছায়া নামিয়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

চাতরা···ডালিমতলা। দোতলা বাড়ি। বাড়ির পিছনে পাঁচিল-ঘেরা বাগান আর পুকুর। সেই পুকুরে কাবেরী চলিয়াছে কাপড় কাচিতে। অন্য দিন আরও আগে যায়, আজ দেরি হইয়াছে। খিড়কির বাহিরে আসিবামাত্র কাবেরী দেখে,—হাবু···

হাবু, দিদির বড় ছেলে। বয়স ছ'বছর।

কাবেরী কহিল "কি খাচ্ছিস রে হাবু এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে?"

হাবুর দু'চোখ কপালে উঠিল। জড়সড় মূর্তিতে ভীত স্বরে হাবু বলিল "পিঠে।"

কাবেরী কহিল "আধঘণ্টা আগে আমি তোকে পিঠে খাওয়ালুম না? রাঙা-আলুর পিঠে, সিদ্ধ পুলি, সরুচাকলি, আর গোকুল পিঠে? আবার এখুনি খাওয়া! এর পর যখন অসুখ করবে?"

হাবু জবাব দিল না। জবাব দিবার মত তার মনের অবস্থা নয়।

কাবেরী কহিল "নিশ্চয় ঢাকা খুলে পিঠে চুরি করেছো!"

হাবু কহিল, "না মাসীমা, চুরি করিনি। ঠাকুমা দেছে।"

—"ঠাকুমা!"

ঠাকুমা শঙ্করী দেবী ছিলেন অদূরে···নারিকেল-পাতা জড়ো করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিলেন। কাবেরীর কথায় আগাইয়া আসিয়া ঠাকুমা বলিলেন "হ্যাঁ, আমি দিয়েছি। বছরকার দিনে দুটো পিঠে না হয় খেলো। খেতে চাইল···কোন্ মুখে না দিয়ে থাকি!"

কাবেরীর সারা গায়ে কে যেন বাটা লঙ্কা ছিটাইয়া দিল! কাবেরী কহিল "দেওয়ার কথা হচ্ছে না। একরত্তি ছেলে···এইমাত্র আট দশখানা পিঠে খেয়েছে—এখনো আধঘণ্টা কাটেনি···তার উপর আবার! খেতে দিলেই তো হয় না···হজম হবে কেন?"

ঠাকুমা বলিলেন "আমাকে আর ও-সব কথা শেখাতে হবে না বাছা। খাইয়ে-দাইয়েই আমরা ছেলে মানুষ করেছি, না খাইয়ে তাদের এত বড়টা করিনি।"

কাবেরী বলিল "সে কথা আমি বলিনি। তাছাড়া আপনাকেও কিছু বলিনি! আমি বলছি হাবুকে।"

এই পর্যন্ত বলিয়া কাবেরী চাহিল হাবুর পানে, বলিল "যা খেয়েছো খেয়েছো···আর খাওয়া হবে না, বাকীগুলো আমায় দাও—রেখে আসি। দেখি, ক'খানা আছে?"

চোরের মত কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে মাসীমার পানে চাহিয়া বাকী পিঠাগুলা হাবু কাবেরীর হাতে দিল। কাবেরী গনিল, আটখানা। বলিল "ক'খানা খেয়েছো শুনি ?"

—"দু'খানা।"

—কাবেরী শিহরিয়া উঠিল! কহিল "ভাগ্যে দেখতে পেলুম, না হলে তুমি আজ কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছিলে! গিয়ে বলছি তোমার মাকে, দেখবে'খন···ঐ পিঠের শখ তোমার পিঠ দিয়ে তুলবে তোমার মা।"

পিঠা লইয়া কাবেরী আর দাঁড়াইল না, বাড়ি ফিরিয়া একেবারে আসিল রান্নাঘরে। হাবু বাগানে রহিল।

শঙ্করী দেবী এ-তাচ্ছল্য সহিতে পারিলেন না, আপন মনে বকিতে বকিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, "আমার ওপর টেক্কা দেওয়া,—আমি যেন কিছু বুঝি না!···তবু পড়ে আছেন এখানে ভগ্নীপোতের ভাতে! সে ভগ্নীপোত আমার পেটেই জন্মেছে··· আমারি ছেলে! লেখাপড়া শেখা মেয়ে, বর জোটে না···সিঙ্গি হয়ে ধিঙ্গিপনা করে বেড়াতে লজ্জা করে না!"

কথাটা গেল কাবেরীর দিদি নর্মদার কানে। কাবেরীর পানে চাহিয়া নর্মদা বলিল "মার সঙ্গে আবার তুই ঝগড়া করেছিস, কাবি!"

কাবেরী বলিল "সত্যি দিদি, বিশ্বাস করো, ওঁকে আমি কোন কথা বলিনি। খিড়কির ঘাটে যাচ্ছি···দেখি, হাবু একরাশ পিঠে নিয়ে চোরের মতো লুকিয়ে খাচ্ছে···এই ছাখো, এই এতগুলি। এ খেলে বাঁচতো? এগুলি উনি দিয়েছেন হাবুকে। আমি কেড়ে এনেছি বলে আমাকে যা-নয় তাই বলছেন।"

শঙ্করী দেবী এতক্ষণে রান্নাঘরের উঠানে আসিয়াছে, বলিলেন—"দিদির কাছে গিয়ে লাগানো হচ্ছে! চাল কেটে দিদি আমাকে তুলে দেবে যেন!"

কাবেরী কহিল "শুনলে! সত্যি দিদি, এক এক সময় আমার মনে হয়··"

কথা শেষ হইল না। কাবেরীর দু'চোখ বাষ্পে সজল এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

পিঠা রাখিয়া কাবেরী বাহিরে আসিতেছিল, নর্মদা বলিল—"খবরদার, তুই একটি কথা ক'বিনে!"

কাবেরী কহিল, "ভয় নেই দিদি। কোন কথা বলব না আমি। কথা আমি বলি না···নেহাত যখন না বললে চলে না, তখনই বলি। না হলে ওঁর দুর্বাক্য আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মনে করি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো···আমি ঘাটে যাচ্ছি গা ধুতে।"

কাবেরী চলিয়া গেল। শঙ্করী দেবী তখনও আপন মনে বকিতে লাগিলেন।

রান্নাঘরে পিঠা গুছাইতে গুছাইতে নর্মদা নিশ্বাস ফেলিল।

এই অবসরে এ-বাড়ির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। নহিলে পরের ঘটনা বুঝিতে অসুবিধা ঘটিবে।

বাড়ির মালিক যোগীন্দ্র ঘোষাল শ্রীরামপুরের কলেজে ফিলসফির প্রোফেসর। এ বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বাস করেন বিধবা মা শঙ্করী দেবী; স্ত্রী নর্মদা; ছেলে হাবু; মেয়ে মণি; এবং অনূঢ়া তরুণী শ্যালিকা কাবেরী।

কাবেরী আই-এ পড়া মেয়ে···কোন রকম অত্যাচার অবিচার সহিতে পারে না। অত্যাচার অবিচার দেখিলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া একেবারে ঝড়ের মত গর্জন তোলে।

নর্মদার বাবা গুণদা চাটুয্যে পশ্চিমের কোন বড় শহরে ওকালতি করিতেন। পসার ছিল বড়—সেই সঙ্গে চাল ছিল আরও বড়। গুণদাবাবুর তিন কন্যা। তিন নদীর নামে কন্যাদের নাম রাখিয়া ছিলেন···নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী।

এম-এ পাস করিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল পশ্চিমের কলেজে যখন প্রোফেসরি করিতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে গুণদা চাটুয্যের হয় আলাপ পরিচয়; এবং সেই পরিচয়-সূত্রেই নর্মদার সঙ্গে হয় যোগীন্দ্র ঘোষালের বিবাহ। তারপর গুণদা চাটুয্যের পত্নীর কঠিন পীড়া···সে পীড়ার চিকিৎসা করাইতে পত্নীকে লইয়া তিনি আসেন কলিকাতায়। কলিকাতায় স্ত্রীর অসুখ সারিল না বটে, কিন্তু মেজো মেয়ে সিন্ধুর পাত্র জুটিয়া গেল। পাত্র অ্যাটর্নি ধরণী মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র—ধনপতি। সিন্ধুর বিবাহ দিয়া পত্নীকে লইয়া দেশ-দেশান্তরে তিনি হাওয়া বদলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কাবেরীকে সিন্ধু নিজের কাছে রাখিয়া দিল। সিন্ধুর বাড়িতে থাকিয়া কাবেরী বেথুন স্কুলে ভরতি হইল।

তারপর ভাগ্যচক্রের তুর্লঙ্ঘ্য আবর্তনে পড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন গুণদা চাটুয্যে এবং তার পত্নী। গুণদা চাটুয্যের মৃত্যুর পর দেখা গেল, দেনায় সর্বস্ব বিজড়িত। সে দেনা মিটাইয়া আর এক কপর্দকও সম্বল রহিল না। কাজেই নিরুপায় কাবেরী সিন্ধুর কাছেই কায়েমী ভাবে রহিয়া গেল।

ম্যাট্রিক পাস করিয়া কাবেরী আই-এ পড়িতেছিল। সেকেণ্ড-ইয়ার সবে শুরু হইয়াছে, এমন সময় একটি মৃত শিশু প্রসব করিয়া সিন্ধু ইহজগতের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া চলিয়া গেল। সিন্ধুর কোন কুলে কেহ নাই বলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল কাবেরীকে আনিয়া সযত্নে নিজের গৃহে আশ্রয় দিলেন। সে-আজ তু'বৎসর আগেকার কথা। এ তু'বৎসর কাবেরী নর্মদার সঙ্গে বাস করিতেছে।

এখন লেখা-পড়া বন্ধ। উপায় নাই।···

হয়ত এখানে কাবেরীর কোন তুঃখ থাকিত না—কিন্তু অশুভক্ষণে শঙ্করী দেবীর সঙ্গে তার দেখা। কাবেরীকে দেখিয়া শঙ্করী দেবীর বিস্ময়ের অন্ত নাই। ভগ্নীপতির ঘরে এতবড় আইবুড়ো মেয়ে যখন আশ্রয় লইয়াছিস, কুণ্ঠায় সংকোচে চুপচাপ পড়িয়া থাক! তা নয়—মেয়ে যেন অগ্নিশিখা! একটু বাতাস পাইলেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে! নর্মদাও লেখাপড়া জানে, কিন্তু কী শান্ত—যেন মাটিতে লুটাইয়া আছে! আর তার বোন কাবেরী···বাপ রে! চক্র তুলিয়াই আছে!

কাবেরীকে দেখিয়া লেখাপড়া জানা একালের মেয়েদের উপর শঙ্করী দেবীর ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে। তাঁর এখন মস্ত তুর্ভাবনা, পরের দায় আসিয়া যখন ছেলের ঘাড়ে চাপিয়াছে, তখন বেচারার এ দায় উদ্ধার হইবে কি করিয়া!

তু'চারটি পাত্রের কথা মনে হইলে নর্মদার কাছে তিনি প্রস্তাব তোলেন, বলেন "কেন বৌমা, ছেলেটি তো বেশ···"

নর্মদা জবাব দেয় "ওঁকে বলুন মা। আমি মেয়েমানুষ, কী বা জানি। তা ছাড়া আমি তো বিয়ে দেবার মালিক নই।"

মা গিয়া ছেলের কাছে কথা তোলেন। বলেন "ভটচায্যি মশায়ের ভাগনে রে···ঐ যে কোন্ স্কুলে পণ্ডিতি করে, বয়স বত্রিশ বছর, বাড়ি আছে, বাগান আছে, ক'বিঘে জমিও আছে···বলিস যদি তো দেখি।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল হাসেন, হাসিয়া বলেন "ও পাত্র চলবে না মা! কাবেরীর জন্যে ভালো পাত্র চাই।"

মা বলেন "ভটচায্যি মশায়ের ভাগনে মন্দ পাত্র হল কোন্ খানটায় বাপু, বুঝি না! সৎ-ব্রাহ্মণ, ভালো ঘর······"

কথার উপর কথা বাড়াইতে যোগীন্দ্র ঘোষাল ভালোবাসেন না···চুপ করিয়া থাকেন।

শুধু ভট্টাচার্য মশায়ের ভাগনে নয়, আরও দু'তিনটি পাত্রের সন্ধান দিয়াছিলেন মা। রিষড়ের কলে কাজ করে কুঞ্জ বাড়ুয্যে···তার ছেলে একটা পাস করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছে। ত্রিশ টাকা মাহিনা পায়, সাহেব কুঞ্জ বাঁড়ুয্যেকে ভালোবাসে। বেশ, ওটি না হয়···রাঘব মুখুয্যের ভাই শ্রীপতি···পুলিসে দারোগাগিরি চাকরি পাইয়াছে···পুলিসের চাকরিতে অনেক পয়সা!···গোরুটির শ্যামানন্দ গাঙ্গুলির ভাইপো রামানন্দ, রেলে চাকরি করিতেছে···দ্বিতীয়-পক্ষ···তা হোক, প্রথম পক্ষের একটা মেয়ে আছে বই তো নয়! রামানন্দ মানুষ ভালো। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল সংসারে সর্বেসর্বা, কাবেরীর কোন দুঃখ থাকিবে না। মেয়ের যেমন তেজ, রামানন্দও তাকে তেমনি মানিয়া চলিবে।

এ সকল পাত্রকেই যোগীন্দ্র ঘোষাল মৃদু হাস্যে খারিজ করিয়া দিলেন।

মা রাগ করিলেন। কী এমন পদ্মিনী শ্যালী যে রাজপুত্র নহিলে তার বিবাহ দেওয়া চলিবে না।

কিন্তু এইখানেই তিনি থামিলেন না। এখনও মাঝে মাঝে পাত্রের কথা তোলেন।

যে কথা বলিতেছিলাম···

হাবুকে লইয়া বাদানুবাদ ঐখানেই থামিল। তার কারণ, কাবেরী মসলা যোগাইল না। কাপড় কাচিয়া গা ধুইয়া দোতলায় নিজের ঘরে আসিয়া কাবেরী পুরানো একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাইতে লাগিল।

বাড়িতে বামনী আছে···আশুর মা। দু'বেলা রান্নাবান্না করে। কাবেরী দু'বেলা আনাজ-তরকারি কুটিয়া দেয়···তার সাধ। যোগীন্দ্র ঘোষাল পরিহাস-ছলে নর্মদাকে বলেন "ছোট বোনটিকে দু'বেলা দুটি খেতে দাও বলে ওর ঘাড় ধরে দু'বেলা কাজ উস্থল করে নিতে চাও?"

তারপর হইতে নূতন ব্যবস্থা! এখন সকালের দিকে কাবেরী আনাজ-তরকারি কোটে, এবেলায় কোটে নর্মদা। যোগীন্দ্র ঘোষাল রুটিন বাঁধিয়া দিয়াছেন। কাবেরীর

গানের চর্চা ছাড়া চলিবে না। সন্ধ্যায় গান-বাজনা করা চাই। তারপর শ্যালী-ভগ্নীপতিতে বসিয়া নানা গল্প আলোচনা চলে।

কাবেরীর মনটা ভালো নাই। না থাকিবার কারণ আছে। পাঁচটা কাজে মন দিয়া সে-কারণ সে ভুলিয়া থাকিতে চায়। ভুলিয়া আছেও। কিন্তু যেদিন শঙ্করী দেবীর মুখে বাক্য-বাণ ছোটে, সেদিন সে বাণগুলা মনের সে বেদনার জায়গায় বড় বেশী বেঁধে। আজও বিঁধিয়াছিল···কেবলি মনে হইতেছিল, কথাটা সত্য। সে এখানকার কে? ভগ্নীপতি দিবে শ্যালীকে আশ্রয়···শ্যালীর ভার মাথায় বহিবে, এমন বিধান কোন দেশে নাই।

কিন্তু ভাবিলেও কূল-কিনারা মেলে না। অনেকবার এ-কথা ভাবিয়াছে, ভাবিয়া প্রতিকারের কোন উপায় নিরূপণ করিতে পারে নাই!

আজও মনে তেমনি বেদনা! সে তাহা ভুলিবার জন্য ঘরের এককোণে আসিয়া মাসিকপত্র খুলিয়া বসিল।

একটা গল্প। আগে এ-গল্প সে পড়িয়াছে। লেখা ভালো···পড়া হইলেও গল্পে মন আঁটিয়া বসিল।

মুক্তি মিলিল যোগীন্দ্র ঘোষালের কথায়।

দ্বারের সামনে আসিয়া কলেজের পোশাক-পরা বেশে যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ব্যাপার কি? কাবেরী দেবী আজ সুরেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু নয় যে?"

যোগীন্দ্র ঘোষালের কথায় মাসিকপত্র ফেলিয়া কাবেরী উঠিয়া আসিল, বলিল "দিদি বুঝি এখনো ওপরে আসেনি?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও···"

কাবেরী কহিল, "এমনি! রোজ রোজ সুরকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করলে সুর সুস্থ থাকবে কেন? মাঝে মাঝে তাকে ছুটি দেওয়া দরকার।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "তোমার কণ্ঠে সুর টানা-হ্যাঁচড়া ভোগ করে না···তোমার গলা বয়ে একেবারে সুরধুনীর মতো স্বচ্ছন্দ-ধারে তরঙ্গ ঝরে!"

হাসিয়া কাবেরী বলিল "সুরের অর্থ আপনি কি বোঝেন বলুন তো?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "না বুঝলে আমার এ নিরেট গন্ত মনকে টলানো কি বেসুর-অসুরের কাজ!"

কাবেরী কহিল "থাক, ও তর্ক কোনদিন মিটবে না। আপনার আজ এত দেরি হল কেন শুনি?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ছুটির পর একটা মিটিং ছিল।"

—"কিসের মিটিং?"

—"ভীষণ নীরস···ওয়ার্কিং-কমিটির!"

—"কি হলো?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল জবাব দিতেছিলেন···দেওয়া হইল না। নর্মদা আসিল। যোগীন্দ্র কহিলেন "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি···"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নর্মদা বলিল "এখনও পোশাক ছাড়োনি! দুজনে রঙ্গ-তামাশা হচ্ছে!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন, "রঙ্গ-তামাশার রঙই মিললো না, তা তামাশা করবো কি! রোজ তো তোমার ভগ্নীর সুর-তরঙ্গে চাকরির ময়লা কেটে মনে রঙের ছোপ লাগাই। আজ সে সৌভাগ্য ঘটলো না!"

বাধা দিয়া নর্মদা বলিল "যাও কোন কথা নয়, পোশাক ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। দু'বোনে বসে রকমারি পিঠে তৈরি করেছি…এখুনি খেতে হবে। কাবি তুই যা, বামুনদি বসে আছে…সরু-চাকলিগুলো করে নিয়ে আয়।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "পৃষ্ঠাবরণ মোচনের জন্য তাই এত আগ্রহ?"

হাসিয়া কাবেরী বলিল "পিঠ পেতে খাওয়াটুকু দিদির হাতেই হবে। সে খাদ্য পরিবেশন করে আমার হাতদুটোকে নাই বা কলুষিত করলুম!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "শুনলে গো তোমার বোনের কথা। আমার গায়ে হাত লাগলে ওঁর হাত কলুষিত হবে…যেন আমি সেই বিশ্বনিন্দিত দুর্গন্ধ অধম ছুছুন্দর!"

হাসিয়া কাবেরী বলিল "ছুছুন্দর হবেন কেন! আপনি শুধু ছুন্দর!" বলিয়া নিমিষে অন্তর্ধান হইয়া গেল।

আহারাদির পর যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "কাবেরীর আজ কি হলো? মোটে গান গাইলো না।"

নর্মদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, বলিল "ওদের মাস্টার মশাই দু'দিন আসেননি, ছেলে-মেয়েদুটো কিছু করছে না, তাদের পড়াচ্ছিল। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার সঙ্গে কথা আছে…খুব দরকারী কথা।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ভয় করে,…তুমি যখন গম্ভীর হয়ে কথার আগে আরও গম্ভীর ভূমিকা ফাঁদো…"

সহজ স্বরে নর্মদা বলিল "তোমার মত রসিক আমি নই…গম্ভীর মানুষ। যখন গম্ভীর কথা বলছি, তোমাকেও গম্ভীর হয়ে শুনতে হবে।"

"বেশ। গম্ভীর আমি হয়েছি, এখন বলো তোমার গম্ভীর কথা।"

নর্মদা কহিল "কি ভেবেছো তুমি বলতে পারো? কাবেরীর বিয়ে দেবে না? ডাগর সোমত্ত মেয়ে, তোমার এখানে নিরুপায়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে চিরকাল আইবুড়ো ধিঙি হয়ে? তোমার তাতে লজ্জা না হতে পারে, আমার হয়। কেন না, ও আমার ছোট বোন।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "কেন, কাবেরী কি কিছু বলেছে?"

নর্মদা বলিল "কাবেরী আবার বলবে কি? ও তো পাগল হয়নি। বলছে পাঁচজনে। আর কেনই বা বলবে না, ডাগর মেয়ে…বয়স আঠারো পার হতে চললো!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বয়স যদি আঠারো হয়ে থাকে, তা হলে আঠারো পার হবে বই কি। বয়স কারো স্থির হয়ে থাকে না।"

নর্মদা রাগ করিল, বলিল "তোমার তামাশা ভালো লাগে না, সত্যি। নেহাৎ নিরুপায়ে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে···এ শুধু ভাত-কাপড়ের আশ্রয় নয়, বাঙালী ঘরের মেয়ে···ওর বিয়ে দিতে হবে। সে-সম্বন্ধে তোমার উদাসীন থাকলে চলবে কেন? জানি, মস্ত দায়! অনেক টাকার ব্যাপার! তা এমন কথা আমিও কিছু বলছি না যে বিলেতফেরত আই-সি-এস পাত্র এনে শ্যালীর বিয়ে দাও আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে! তা নয়···তবে দায় তো! আর এ-দায় আজ তোমারই···"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "কিন্তু কাবেরীকে আমার দায় বলে মনে হয় না।"

এ কথায় নর্মদার রাগ হইল। নর্মদা বলিল "তোমার মনে হয় না, আমার হয়। ভেবো না, ভগ্নীপতির অন্নে ও চরিতার্থ হয়ে বাস করছে!"

নর্মদার পানে যোগীন্দ্র ঘোষাল ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর চিন্তিতভাবে কহিলেন "এমন কোন কথা কাবেরী বলেছে?···কিন্তু তুমি তো জানো, কাবেরীকে আমি শ্যালী বলে মনে করি না। ও আমার মায়ের পেটের বোন···আমার নিজের বোন থাকলে যেমন দেখতুম, কাবেরীকে আমি ঠিক সেই রকম দেখি।"

নর্মদা তা জানে। জানে বলিয়া স্বামীর উপর তার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। কিন্তু বোনের স্নেহে তাকে ঘিরিয়া রাখিলেই তো চলিবে না। এ বাঙলা দেশ··· বিলাত নয়!

নর্মদা কহিল "তা আমি জানি। কিন্তু এ বয়সে বিয়ে না দিলে লোকে নিন্দে করে।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল একটু স্বস্তি বোধ করিলেন···এ অনুযোগ তবে লোকের কথায়! কাবেরী এখানকার আশ্রয়-সম্বন্ধে অনুযোগ তোলে নাই!

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "লোকের কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিতে হয়। সে-কথা মনের কোণে থিতুতে দিতে নেই। আমি কখনো দিই না।"

নর্মদা বলিল "শুধু লোকের কথা নয়। শোনো লক্ষীটি, আমি যা বলি। যে-বয়সে যা। এ-বয়সে মেয়েদের মন চায় স্বামী, স্বামীর ঘর। মা-বাপের আদর-ভালোবাসাতেও এ-বয়সে তাদের মন ভরে না!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "তোমার তাই হতো বুঝি?"

নর্মদা বলিল "হতো বই কি! বাবার তখন অবস্থা ছিল ভালো···ভাই ছিল না··· আমরা তিন বোন ছিলুম সব। তবু মনে হতো, বাপের বাড়ি···বিয়ে হলে নিজের বাড়ি হবে। নিজের মন দিয়ে বুঝি তো, এ-বয়সে মেয়েদের মন কি চায়! কাবেরীর বয়সে হাবু জন্মেছে···সে-কথা তুমি ভুলে যেয়ো না।"

এ-কথার উত্তরে যোগীন্দ্র ঘোষাল কোন কথা বলিলেন না···চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন।

নর্মদারও ভাবনার অন্ত ছিল না। সে ভাবিতেছিল কাবেরীর কথা! কাবেরীর ভবিষ্যৎ!···ছিল সিন্ধুর কাছে, মনে দুশ্চিন্তা ছিল না। সিন্ধু আছে, নর্মদা আছে,—

দুই বোনে মিলিয়া কাবেরীর ব্যবস্থা করিবে। ধনপতি কলিকাতায় থাকে—কলিকাতার বনিয়াদী ঘরের ছেলে—তার চেষ্টায় ভালো পাত্র পাওয়া সহজ! কিন্তু সহসা বুকের অনেকখানি খালি করিয়া কোথায় গেল সিন্ধু! সেই সঙ্গে কাবেরীর ভবিষ্যৎ কি-আঁধারে ভরিয়া উঠিল! তারপর কাবেরীর এখানে আশ্রয় লাভ! শাশুড়ী যখন-তখন কাবেরীকে যে-সব কথা বলেন—নর্মদার বুক সে-কথায় ফাটিয়া দু'খান হইয়া যায়। নেহাত উপায় নাই···নিরাশ্রয় নিরুপায় বোন···

ভাবিতে ভাবিতে আবেগে বুক ছাপিয়া উঠিল।

নর্মদা বলিল, "মা নিত্য অনুযোগ করেন। সত্যি, মেয়ে ডাগর হয়েছে···বিয়ের চেষ্টা নেই। তাছাড়া কাবেরী ওঁর কথা সব সময় চুপ করে সইতে পারে না, তর্ক করে। আমার ভারি লজ্জা করে। তুমি আর গাফিলি করো না। দেখে-শুনে একটি পাত্র এনে ওর বিয়ে দাও। তাহলে ও নিশ্চিন্ত হবে, আমি নিশ্চিন্ত হবো আর তুমিও নিশ্চিন্ত হবে। বুঝলে!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "বুঝি সব, কিন্তু পাত্র পাচ্ছি কই? কাবেরীর মতো মেয়ে···যার-তার হাতে কাবেরীকে দেওয়া চলে না।"

নর্মদা রাগ করিল, কহিল "তোমার ঐ এক কথা। চেষ্টা করলে আর পাত্র মেলে না! এত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে! তুমি বলতে চাও তোমার শ্যালী বলে কাবেরী এত ভালো, এত বড়···"

বাধা দিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "সত্যিই বড়···সত্যিই ভালো কাবেরী। কাবেরীর সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের তুলনা হয় না···যেদিক দিয়েই ছাখো! অমন চেহারা, অমন মন, অমন বুদ্ধি।···আমি কি রকম পাত্র চাই জানো? কাবেরীর লেখাপড়া-জানা আর অন্য মেয়েদের লেখাপড়া-জানা···দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাত! তার উপর ওর মন চলে অনেক উঁচু পথ দিয়ে। ও-মেয়েকে শুধু রান্নাবান্না আর ঘরকরনার মধ্যে চেপে রাখলে ওর অপমান করা হবে। ওর জন্যে চাই cultured পাত্র। তার পয়সা থাকবে, বাড়ি গাড়ি থাকবে, লোকজন থাকবে। কাবেরীর যা মন, she is destined to rule."

বোনের সুখ্যাতি শুনিয়া নর্মদার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু শুধু আনন্দ করিলেই সংসার চলে না।

নর্মদা কহিল "শ্যালীর নামে তুমি একেবারে কবি-কালিদাস হয়ে ওঠো, আমি জানি! তা হও··তা নিয়ে আমি কিছু বলছি না! তবে সে-ছেলেটিকে ধরছো না কেন? তোমাদের কলেজে ঐ যে নতুন প্রোফেসর এসেছে···"

—"পারুল চক্রবর্তীর কথা বলছো! গরিবের ছেলে পাস করে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছে সত্যি—কিন্তু ও ঠিক কাবেরীর যোগ্য নয়···তাছাড়া আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ।"

নর্মদা কহিল "তুমি কি ভেবেছো বলো তো? কাবেরীর জন্যে কোথা থেকে তুমি এম-এ পাস রাজপুত্র ধরে আনবে? ছেলেমানুষি কোরো না। ঐ পারুল চক্রবর্তীকে

ধরো···এর বেশী দেখে-শুনে মানুষ মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না। বাড়ি-গাড়ি করা··· সে হয় মানুষের ভাগ্যে! তুমি···"

কথার খেই ছিঁড়িয়া গেল এক ঝলক দমকা বাতাসের মত কাবেরীর আকস্মিক আবির্ভাবে। কাবেরীকে দেখিয়া নর্মদা চুপ করিল।

কাবেরী আসিয়া কহিল "দু'জনে বসে গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে···আমার বনবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে! শুনেছি মশাই, কে আছে পারুল চক্রবর্তী ··তা পারুল···পুরুষ-মানুষ তো? নাম শুনে মনে হয় মেয়ে!"

নর্মদা কহিল "তোর লজ্জা করে না লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের কথা নিয়ে তামাসা করতে? ইংলিশে এম-এ···জানিস? ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!"

কাবেরী কহিল "বেচারা প্রোফেসর ছাড়া কি আমাদের দুই বোনের মুক্তির কোন উপায় নেই ভাই দিদি? তোমার ভাগ্যে প্রোফেসর জুটেছে বলে আমার ভাগ্যেও তাই?"

নর্মদা কহিল "তোর দাদাকে বেচারা বলছিস! তোর দাদাও তো প্রোফেসর।"

কাবেরী বলিল "দাদার মত প্রোফেসর তুমি সার্ভিস-লিস্টে ক'জন পাবে? এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে দাড়ি পোড়ায়···কলেজের কেতাব ছাড়া দুনিয়ার কোন খবর রাখে না···এগজামিনের কাগজ দেখতে আধ নম্বর বেশী দেবে কি কম দেবে এই ভেবে দু'রাত্তির ঘুম হয় না···unsocial···pedantic···এই তো তোমার সব প্রোফেসর! দাদা শুধু profession-এই প্রোফেসর···কলেজে কি করেন জানি না, তবে কলেজের বাইরে কি-রকম তাজা জীবন্ত মানুষ···বলো তো!"

নর্মদা কহিল "শ্যালী-ভগ্নীপতি দুজনে দুজনকে চিনে মশগুল হয়েই থাকো! পৃথিবীতে তোমাদের দুজনের জোড়া আর জন্মায়নি! দাদার গলাতেই মালা দাও তবে!"

কাবেরী কহিল "দাদার গলায় মালা দেবার রীতি নেই দিদি। দাদা দাদা। বর-মাল্যের চেয়ে বড় মাল্য যদি কোন দিন দিতে পারি তো তা দেবো আমার এই দাদার পায়ে, বুঝলে!" কথাটা বলিয়া কাবেরী হাসিতে লাগিল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল মুগ্ধ নয়নে কাবেরীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ঝংকার দিয়া নর্মদা বলিল "এত যদি রীতি-জ্ঞান, তাহলে দেশের রীতি মেনে চলো না কেন? ঘরে ডাগর মেয়ে পুষতে নেই···তার বিয়ে দিতে হয়···সে-রীতির কথা দুজনে ভুলে আছো কি বলে?"

কাবেরীর হাসি-ভরা মুখে নিমেষে মলিন ছায়া পড়িল। কাবেরী কহিল "আমার জন্যে এত ভাবো কেন দিদি? আমি খাসা রয়েছি···আমার জন্যে তোমার এত কেন অশান্তি বলো তো? এই তো মেজদির বিয়ে হোল···তারপর কোথায় চলে গেল। আমার বিয়ে হলে মেজদির মত যদি চলে যেতে হয় আমাকে?"

নর্মদা কহিল "তাতেও আমার দুঃখ হবে কম। তুই হাসিসনে কাবি···ও-হাসি আমার ভালো লাগে না।"

এ-কথায় দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া কাবেরী কহিল "হঠাৎ আমি আজ এত ভার হয়েছি দিদি···কেন?"

কাবেরীর বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নর্মদা বলিল "হ্যাঁ, ভার তুই হয়েছিস। কেন আমি তোকে পুষবো, বল দিকিনি? তোকে পুষবে তোর বর···"

এই অবধি বলিয়া নর্মদা স্বামীর পানে চাহিল। বলিল "সত্যি কথা বলছি তোমাকে, রূপসী শ্যালীর মুখের পানে চেয়ে অমন দারুময় জগন্নাথ হয়ে তোমাকে আমি থাকতে দেবো না আর। ওর বিয়ের ব্যবস্থা করো, নাহলে তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। ওর জন্যে আমার অনেক জ্বালা। কেন ও তোমার বাড়ি পড়ে থেকে দাসীবৃত্তি করবে? কেন ওর বিয়ে দেবে না? আমি ওকে পুষতে পারবো না আর।"

কথার শেষদিকে অভিমানে বেদনায় নর্মদার স্বর ভাঙিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। কাবেরীর দু'চোখে জলের আভাস···যোগীন্দ্র ঘোষালের পানে চাহিয়া মলিন মৃদু হাস্যে আর্দ্রস্বরে কাবেরী বলিল "দিদি আমাকে পুষছে? না, আপনি পুষছেন দাদা? বোনের ওপর দিদির এমনি স্নেহ বটে! একগাদা পাখি পুষেছে···তাদের বেলা কথা ওঠে না···তাদের পরিচর্যা দিদি নিজের হাতে তবু করে। আমাকে পুষতে দিদির কোন্‌খানটায় মেহনত হয়, বলুন তো?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীর চোখ পড়িল যোগীন্দ্র ঘোষালের হাতের দিকে। হাতে একখানা বই। বইখানা লইয়া মলাটে ছাপা নামটুকু পড়িয়া কাবেরী বলিল—"Mrs Jameson-এর Characteristics of Women. বারে, আজই আমি এ বই পড়বো দাদা···নিয়ে চললুম।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আর কোন পাতা না পড়ো, Introductionটুকু পড়ো দিদি···চমৎকার!"

—"পড়বো।" বলিয়া কাবেরী দমকা হাওয়ার মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাবেরী চলিয়া গেলে যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "শুধু বুদ্ধি···বুদ্ধির জীবন্ত শিখা যেন! চমৎকার মেয়ে এই কাবেরী!"

গাঢ় স্বরে নর্মদা বলিল "ওর ঐ বুদ্ধির জন্যেই আমার ভাবনা আরও বেশী।···না, আর দেরি নয় সত্যি, ওর বিয়ের ব্যবস্থা করো তুমি।"

রাতারপাড়ার চাটুয্যেবাড়িতে দোলে খুব ঘটা হয়। চাটুয্যেরা এখানকার বনিয়াদী বড় মানুষ। মস্ত বাড়ি, বাগান,—তার পাশে ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়িতে বিগ্রহ শ্যামসুন্দর। কর্তাদের আমলে বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা ছিল। এখনও ব্যবস্থা আছে, তবে সে ব্যবস্থায় অনেকখানি ভাঙচুর ঘটিয়াছে।

চাটুয্যেদের বাড়ির সামনে বড় মাঠ। এ-মাঠে চিরকাল এই দোলের সময় মেলা বসে। দরমার ঘর তৈরী হয়; এবং সে-ঘরে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা লইয়া বড় বড় মাটির মূর্তি গড়িয়া এগজিবিশন হয়। সাত-আট দিন ধরিয়া পুতুল-নাচ, নাগরদোলা, বাউল ও কীর্তন-গান হয়। দেশে রীতিমত সোরগোল পড়িয়া যায়।

চাটুয্যেবাড়ির মালিক এখন অবনী চাটুয্যে। তরুণ বয়স। অবনীর বাবা বিনয় চাটুয্যের ছিল ঘোড়ার সখ। এ-সখের জন্য তিনি একবার হুম্ করিয়া বিলাত চলিয়া যান এবং ঘোড়দৌড়ের বিলাতী নেশা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন দু'জুটো রেসের ঘোড়া সমেত। সেই সময় হইতে তিনি রাতারপাড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় বসবাস শুরু করিয়া দেন। ঘোড়া লইয়াই তাঁহার দিন কাটিত এবং এই ঘোড়ায় চড়িয়া দৌড়বাজি রপ্ত করিতে গিয়া একদিন বেটক্করে ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অবনী তাঁহার একমাত্র পুত্র। স্বামীর এই ঘোড়া-রোগের দরুন অবনীর মা মহালক্ষ্মী দেবী ইদানীং স্বামীর বড় একটা নাগাল পাইতেন না। কাজেই দেশের বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার পূজা লইয়া তিনি মগ্ন থাকিতেন। স্বামীর মৃত্যু তাঁহাকে সংসার হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেবতার কাজে একেবারে নিবদ্ধ করিয়া দিল।

অবনী মানুষ হইতেছিল সাহেবী স্টাইলে। সে পড়িত কলিকাতার সেণ্ট জেমস্ স্কুলে,—থাকিত সেখানকার বোর্ডিংয়ে; ছুটিছাটায় বাড়ি আসিত। বিনয়ভূষণের যখন মৃত্যু ঘটে, অবনীর বয়স তখন ষোল বৎসর।

তারপর বারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অবনী সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। শিকার করিয়া মোটরে লম্বা পাড়ি দিয়া, বন্ধুবান্ধব লইয়া তাহার দিন কাটে। বাপের ঘোড়া-রোগ তাহাকেও পায় নাই এমন নয়! তবে রেসে ঘোড়া পাঠাইয়াই সে তৃপ্তি পায়। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বা পিছনে ছুটিয়া ঘোড়াকেই সর্বস্ব করিয়া তোলে নাই।

মা থাকেন দেশে রাতারপাড়ার বাড়িতে। অবনী থাকে কলিকাতার লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে। সাহেবী-স্টাইলে বাস। মা থাকেন হিন্দু-বিধবার সাবেকী এবং মামুলি বিধি-নিয়মে শিরোধার্য করিয়া। ছেলের দেখা মা বড় একটা পান না। সেজন্ম মা যে খুব বেদনা বোধ করেন, তা নয়। বড় লোকের বৌ—স্বামি-পুত্রের অবহেলা তাঁহার সহিয়া গিয়াছে। ছেলে অবনী দেশে আসে—মায়ের সঙ্গে দেখা করে—মাকে ভালবাসে। কিন্তু মাকে লইয়া আর-পাঁচ জনের মত বাড়াবাড়ি করে না। বলে "মা—মা আছেন। এখন বড় হয়েছি, পদে-পদে মাকে বিব্রত করবার কি প্রয়োজন ?"

মা একবার বলিলেন "বিয়ে কর অবু!"

হাসিয়া অবনী জবাব দিল "দরকার বোধ করলেই করবো। সেজন্যে তোমার দুশ্চিন্তা কেন মা ? বিয়ে করলে যদি বুঝতুম বৌ নিয়ে থাকবে, তাহলে কথা ছিল,—কিন্তু তুমি আছ ঠাকুর-দেবতা নিয়ে···কাজেই বৌয়ের জন্যে তোমার এ আকাঙ্ক্ষা কেন ?"

মা বলিলেন "আমার আর কি···পাঁচ জনে বলে। তাছাড়া এখন বয়সও তো হয়েছে, এ বয়সে বিয়ে না করলে এর পরে আর কবে করবে ? সংসার-ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে তো! আমার কর্তব্য ছেলেকে সংসারে থিতু করা।"

অবনী জবাব দেয় "বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথা ভেবে দেখিনি মা।···অর্থাৎ যেভাবে মানুষ হয়েছি, তাতে না পেয়েছি বাপের আদর, না মায়ের স্নেহ। বোর্ডিংয়ে

পড়ে থাকতুম, সংসার কাকে বলে কোনদিন বুঝিনি। যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, হঠাৎ আজ কী সাহসে সে-জিনিস গড়তে যাবো, বলো তো মা ?"

মা বলিলেন "সে যা ভাল বুঝবে। তবে আমার বলবার, বললুম ; তোমার যা করবার করো। তোমাদের সংসারে এসে পরের মুখ চেয়েই বরাবর কাটিয়েছি বাবা, নিজের পানে কখনো তাকাইনি !···হঠাৎ মনে হলো, ইহকালে কী-বা পেলুম ! তাই পরকালের উপায় করবো ভেবে শ্যামসুন্দরের দিকে মন দিয়েছি ! তুই বিয়ে যদি না করিস অবু, আমার তাতে বাধবে না ; তোরই একদিন অসুবিধা হবে। তাই বলছিলুম !"

অবনী বলিল "রাগ কোরো না মা। এ কথা ঠিক, তুমি যদি আমাকে কোনও কিছু আদেশ করো, সে-আদেশ কঠিন হলেও আমি শিরোধার্য করবো ! তেমন করে কোন আদেশ তো তুমি আমায় করোনি কখনো !"

মা বলিলেন "এ বাড়িতে প্রথম যখন আসি, তখন আমার কতই বা বয়স ! এসে জানলুম, বড়লোকের বাড়িতে আমার নিজের সাধ ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না··· থাকতে পারে না। এ বাড়ির কর্তাদের ইচ্ছা মেনে আমাকে বাস করতে হবে। তারপর তোমায় পেলুম। মায়ের প্রাণ···স্নেহ-যত্ন করতে গেলুম,—চারদিক্ থেকে হাঁহাঁ করে সকলে ছুটে এলো। আমি চমকে উঠলুম। সকলে বললে,—এ-বাড়ির বৌয়েরা ছেলে মানুষ করবে কি ? এ-বাড়ির ছেলেরা চিরকাল লোক-জনের হাতে মানুষ হয়েছে। সেদিন যে-ব্যথা পেয়েছিলুম, তার পরিচয় জানেন আমার অন্তর্যামী ! তার পর থেকে তোমাদের ইচ্ছাতেই চলেছি ; যেখানে যেতে বলেছো সেখানে গেছি, যেখানে থাকতে বলেছো সেখানেই থেকেছি অবু। এত পরিচর্যা করেও কোনদিন তোমাদের কাউকে নিজের করে পাইনি, বাবা। আমি বাস করেছি বড়মানুষের বাড়িতে আর-পাঁচটা আসবাবের মত !···স্বামী···পুত্র···মনের মত পেয়েও কোনদিন তাদের মনে মন মেলাতে পারিনি ! ঠাকুর-দেবতার পায়ে শরণ নিয়েছি বলে তিনি রাগ করতেন···তুমিও অভিমান করো। কোনদিন যদি পারো, বোঝবার চেষ্টা কোরো, মনের মতো সব পেয়েও যে মা যে স্ত্রী সকলের কাছ থেকে সরে গিয়ে ঠাকুর-দেবতাকে আঁকড়ে ধরে—কতখানি ব্যথায় সে তা করে !"

ছেলের সঙ্গে মায়ের এমন কথা হইয়াছে একাধিক বার। কথা মাঝখানে থামিয়া যায়। সে-কথার ফলে কাজ কখনও অগ্রসর হয় না !

এবার দোলের সময় অবনী বাড়ি আসিয়াছে। পূজা-পার্বণে আসে। মা ভালবাসেন, তাই আসে।

ঠাকুরবাড়িতে পূজা হইতেছে, অবনী জুতা পায়ে দিয়া ঠাকুর-বাড়ির উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেশের মেয়ে-পুরুষ সকলে আসিয়া জড়ো হইয়াছে পূজা দেখিতে। অবনীকে দেখিয়া সকলে পাশ কাটাইয়া পথ দিল। সে-পথ দিয়া আসিয়া অবনী দাঁড়াইল একেবারে ঠাকুর-দালানের সিঁড়িতে। তখন আরতি হইতেছে।

আরতি শেষ হইলে অবনী সিঁড়ির উপরেই মাথা নোয়াইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখে, সিঁড়ির উপরে মা। মায়ের হাতে প্রসাদী ফুল আর চরণামৃত।

মা বলিলেন "এখন এলি বুঝি ?"

অবনী বলিল "হ্যাঁ। মনে ছিল না মা, আজ দোল। মোটর নিয়ে রাঁচি গেছলুম। ফিরেছি আজ বেলা চারটেয়। ফিরে দেখি, শহরের পথে আবীরের ছড়াছড়ি। তখন খেয়াল হল, তাইতো আজ দোল। বাড়ি ফিরে চান করে কিছু খেয়ে নিলুম, খেয়েই চলে এসেছি।"

ছেলের পানে চাহিয়া মা ছেলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অবনী হাত পাতিয়া বলিল "দাও মা ঠাকুরের চরণামৃত দাও।"

মা বলিলেন "হাত ধুসনি কিছু না···তার ওপর আবার জুতো পায়ে দিয়ে এখানে এসেছিস !"

অবনী একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু এই জনতার সামনে সে-ভাব যথাসম্ভব চাপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "খালি-পা না দেখে ঠাকুর যদি প্রসাদী দিতে না চান, তাহলে বড় দুঃখের কথা হবে।"

মা বলিলেন "ও-সব তর্ক কেন করছিস অবু ? তোর মা তো তোদের সংসারের কোনো তর্ক-আলোচনার মধ্যে কোনোদিন থাকেনি ! যদি প্রসাদী চরণামৃত চাস মায়ের তৃপ্তির জন্যে, তাহলে সে চরণামৃত নিতে হলে মা যে আচার ভালবাসে, সেটুকু পালন করতে হবে।"

মায়ের স্বর গম্ভীর। অবনী বলিল "সত্যি মা, হাত ধুতে বা জুতো খুলতে হয়, ভুলে গিয়েছিলুম। মোটর থেকে নেমে যেই শুনলুম আরতির বাজনা, অমনি ছুটে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি রাগ কোরো না মা, দুঃখ কোরো না। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এখুনি আমি আসছি। তখন তুমি আমাকে প্রসাদী চরণামৃত দিয়ো।"

সকলের কুতূহলী দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিড় ঠেলিয়া অবনী বাহির হইয়া গেল।

ভিড়ের মধ্যে যে সব নর-নারী ছিল সিঁড়ির কাছে, তাহারা মাতা-পুত্রের কথা শুনিল। শুনিয়া পরস্পরের পানে নীরবে যে-দৃষ্টিতে চাহিল, সে দৃষ্টিতে ছিল বিস্ময় আর শ্রদ্ধা।

এ ভিড়ে নর্মদা আর শঙ্করী দেবীও ছিলেন। তাঁহারাও একথা শুনিয়াছিলেন। নর্মদা বলিল "মাকে দেখে মনে হয়, উনি যেন ইহ-সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেক দূরে বাস করছেন। ছোটখাট স্নেহ-মায়া সুখ-দুঃখ যেন ওঁকে স্পর্শ করে না।"

শঙ্করী দেবী কহিলেন "ওঁর কাছে এ-সংসারের যে-কথা শুনেছি, তাতে সত্যি তাইই বটে। সেকালে যেমন ছিলেন রাজর্ষি জনক···রাজা হয়েও রাজ্যভোগ করেননি, ইনিও তেমনি। এত ঐশ্বর্য···এমন স্বামি-পুত্র···তবু সে-সবে নাকি কোনও মায়া নেই ! ঠাকুর-দেবতাকে সম্বল করে নিজের দুঃখ-সুখে উনি একেবারে উদাসীন।"

ঠাকুরবাড়ির কাজ শেষ করিয়া মহালক্ষ্মী দেবী গৃহে আসিলেন—রাত্রি তখন প্রায় একটা। দোতলায় তাঁর ঘরের সামনে খোলা বারান্দা। সেই বারান্দায় দুখানা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারে বসিয়া অবনী আর শরৎ গল্প করিতেছিল।

শরৎ মহালক্ষ্মী দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র,—মা নাই, বাপ নাই, এ-সংসারে ছোট বেলা হইতে মানুষ হইতেছে।

বি-এ পাস করিয়া শরৎ আইন পড়িতেছে। অবনীর চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোট। শরৎ এইখানে থাকে। মহালক্ষ্মী দেবীকে মায়ের মত বলিয়াই জানে; এবং মনের কোণে অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের যেটুকু স্নেহ অবশিষ্ট ছিল, শরতের উপর তার সবটুকু প্রায় তিনি উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন।

শরতের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন। মেয়ে দেখা চলিতেছে। কন্যাদায়গ্রস্তেরা ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর-দর্শনের ছলে মেয়ে আনে এবং সেইখানেই মহালক্ষ্মী মেয়ে দেখেন। তিন-চারটি মেয়ে দেখা হইয়াছে; কোনটি পছন্দ হয় নাই! পাঁচ নম্বরের মেয়ে দেখার আয়োজন হইতেছে, তখন শরৎ এ সংবাদ শুনিল। শুনিয়া অনুযোগ তুলিয়া ডাকিল "পিসীমা!"

মহালক্ষ্মী দেবী ঠাকুরঘরে বসিয়া নৈবেদ্য সাজাইতেছিলেন, বলিলেন "কেন রে?"

শরৎ বলিল "আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছো নাকি?"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "হ্যাঁ।"

শরৎ বলিল "বা রে, এ কোন্ দেশী ব্যবস্থা! বড় ভাই ময়ূরে চড়ে কার্তিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আইবুড়ো রেখে গণেশকে ধরে কলাবৌয়ের হাতে সমর্পণ! এ তোমার কী রকম ব্যবস্থা পিসীমা?"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "অবু যদি বিয়ে না করে, তোর বিয়ে হবে না? তা ছাড়া শাস্ত্রজ্ঞান তো তোর খুব দেখছি! গণেশ হল বড়, কার্তিক ছোট। কাজেই ও নজির খাটবে না শরৎ।"

শরৎ কহিল "না খাটুক! আচ্ছা, ঠাকুর-দেবতার নজির আমি উইথড্র করছি। আমার কথা, বড়র বিয়ে না হলে ছোটর বিয়ে হতে নেই। আগে তাকে ধরো···তারপর আমার পালা।"

একটা উদ্যত নিশ্বাস—মহালক্ষ্মী দেবী সে নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না। একরাশ কথা মনের গহনতল হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। একদিন কত সাধে কত আশায় মনে কত ছবিই না আঁকিতেন!

তিনি ডাকিলেন "শরৎ···"

—"কেন পিসীমা?"

—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। সত্যি জবাব দিবি?"

শরতের বুকখানা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। কোনোমতে সে বলিল "কী কথা?"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "অবুর সঙ্গে তোর যা সম্পর্ক, তা ঠিক বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মত নয়। পরস্পরকে তোরা বন্ধু বলে জানিস। দুজনে মনের কথাও হয়।

তা, অবু যে বিয়ে করতে চায় না, এর কারণ কিছু জানিস? কলকাতার কোন মেয়েকে কি ও মনে মনে পছন্দ করেছে?"

শরৎ কহিল "না পিসীমা। তাহলে আমার কাছে সে-কথা চাপা থাকতো না!··· তা নয়।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "তবে ও বিয়ে করতে চায় না কেন?"

শরৎ কহিল "যদি অভয় দাও, তাহলে বলতে পারি।"

—"তোর কোন ভয় নেই। তুই বল্···"

শরৎ বলিল "ওর মনে একটা মস্ত অভিমান আছে পিসীমা। সেবারে সেই রাসের সময় আমি বলেছিলুম,—অবুদা, রাসের কটা দিন এখানে থেকে যাও···কলকাতায় না লেখাপড়া, না কোনো বিষয়-কর্ম! শুধু তো হৈহৈ করে বেড়াও! পুজোর কটা দিন একসঙ্গে থাকি—তোমার ইচ্ছা হয় না? তাতে বললে, ছেলেবেলা থেকে সব পেয়েছি শরৎ, পাইনি শুধু মাকে! তখন এ-অভাব অত বুঝিনি···এখন বুঝছি। সব সময়েই মায়ের মন ভরে আছে ওঁর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে—তার মধ্যে ছেলের স্থান কোথায় শরৎ? কথাটা কিন্তু সত্যি পিসীমা···"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "হুঁ!"

আর কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মনে মনে বলিলেন, চাহিয়া চাহিয়া সে-চাওয়া কত বড় নৈরাশ্যে ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে,—না-পাওয়ার সে-ব্যথায় মন নিরবলম্ব হইয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, কোন্ মহাশূন্যে···তুই তার কি বুঝিবি, অবু?···সেই মহাশূন্যে অবলম্বন খুঁজিয়া দাঁড়াইবার সে কী প্রয়াস! অথচ অবলম্বন মেলে নাই। কতখানি দায়ে পড়িয়া মৌন-মূক পাষাণ দেবতাকে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন! ঠাকুরের কাছ হইতে কোনদিন এতটুকু সান্ত্বনা বা আশ্বাস পান নাই, তবু তাঁহাকে ধরিয়াই পড়িয়া আছেন! কেন এমন করিয়া পড়িয়া থাকা···ছেলেকে বলিয়াছেন! তবু মায়ের এ-ব্যথা ছেলে বুঝিল না!

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "ও কথা থাক, এবারে অবু এলে তার সঙ্গে একবার এ-কথা কয়ে দেখিস তো···আমার কাছে লজ্জায় যদি বলতে না পারে, তোর কাছে লজ্জা করবে না, মনে হয়।"

শরৎ বলিল, "বলবো পিসীমা···"

•

দোল-পূর্ণিমার রাত্রে দুই ভাইয়ে বসিয়া সেই কথাই হইতেছিল।

অবনী বলিল "বিয়ে-ব্যাপারটাকে তুমি যত সহজ বলে মনে করো শরৎ, আমি তেমন করি না। বিয়ে মানে, তেমন একটি স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়া নয়; পুঁচকে মেয়ে বিয়ে করে এক্স্পেরিমেণ্ট করতে যেমন ভয় হয়, ডাগর শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতেও ঠিক তেমনি ভয় আছে। ডাগর মেয়ে তার যে-মন নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াবে, তার সে-মনের লাগাম যদি ধরতে না পারি?"

হাসিয়া শরৎ বলিল "পাগলের মত কী যে বলো! বিয়ে করছে সকলে, করেছেও

সকলে—তোমার কার্লাইল, বার্নার্ডশ' থেকে আরম্ভ করে আমাদের ঐ নবদ্বীপ স্যাকরা পর্যন্ত। এতখানি মনস্তত্ত্ব না ঘেঁটে তাদের দিন চলেছে এবং মারাত্মক কোন রিপোর্ট এ-পর্যন্ত শোনা যায়নি! তোমার ও কথা স্রেফ হামবাগিজম্।"

অবনী বলিল "থাকো এখানে ছোট্ট গণ্ডী নিয়ে—তুমি কি বুঝবে? বেশ তো, আমার মনে যদি ভুল ধারণাই জন্মে থাকে, চিন্তা করে সে-ধারণা ত্যাগ করবার অবকাশ দাও। ভুল বুঝতে পারলেই বিয়ে করবো। আমার জন্যে তোমাকেও আইবুড়ো হয়ে নিঃসঙ্গতাদণ্ড ভোগ করতে হবে, এই বা তোমাদের কেমন আইন?"

শরৎ বলিল "আমার কথা স্বতন্ত্র। আমার বিয়ে আমি কল্পনাও করি না।"

—"তার মানে?"

শরৎ বলিল "প্রথমতঃ নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারা চাই আগে, তবেই আর-একজনকে পাশে দাঁড়-করানোর চিন্তা! যে-গাছ নিজে সুস্থ সবল হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, তাকে আশ্রয় করে কোন লতা কোনও দিন বেঁচেছে, উদ্ভিদ্-রাজ্য খুঁজে এমন একটি দৃষ্টান্ত তুমি দেখাতে পারো অবুদা?"

হাসিয়া অবনী কহিল "তুমি তো উদ্ভিদ-রাজ্যের উদ্ভিদ নও!"

কথাটা শেষ হইল না। মহালক্ষ্মী দেবী আসিলেন। আসিয়া কহিলেন "তোদের ব্যাপার কি রে? রাত একটা বেজে গেছে···এখনো ঘুমোসনি!"

শরৎ কহিল "আমাদের তর্ক চলেছে পিসীমা। অবুদা বলছে, বিয়ে কথাটা বেজায় শক্ত ব্যাপার। আমি বলছি, শক্ত বটে আমার পক্ষে, তোমার পক্ষে খুব সহজ!"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "সে সহজ-শক্তর তর্ক রাত একটায় বন্ধ রাখো বাছারা··· ঘুমোওগে। বুঝলে···

পরের দিন বেলা তখন প্রায় বারটা···ঠাকুরবাড়িতে পূজা শেষ হইয়াছে। পূজায় তেমনি ভিড়! পূজা শেষ হইলে সকলে বাহির হইবে, এমন সময় পাকা বনিয়াদী নহবতখানার কার্নিস ভাঙিয়া গেল! সে ভাঙ্গা কার্নিস পড়িল এক বৃদ্ধার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত রব তুলিয়া বৃদ্ধা সেইখানে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া মরিবার জো!

কলরব-কোলাহলে মুহূর্তে বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়া গেল। বৃদ্ধাকে ধরাধরি করিয়া বাড়িতে আনা হইল। ডাক্তার আসিলেন। ঔষধ-পথ্য আসিল; এবং এ-ব্যাপারের জের কাটিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাট হইতে ফিরিতেছিল কাবেরী। সঙ্গে ছিলেন শঙ্করী দেবী। শঙ্করী দেবী গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। কাবেরী সঙ্গে আসিয়াছিল তাঁহার প্রহরিণী সাজিয়া।

চাটুয্যেবাড়ির কাছাকাছি আসিয়া শঙ্করী দেবী কহিলেন "আরতি দেখে আমি বাড়ি ফিরবো বাছা···দাঁড়াতে পারবে তুমি?"

কাবেরী কহিল "বেশ তো···আমি কিন্তু ওদিকে আজ যাবো না। বাবাঃ। যে ভিড়! আমি বাইরে চাতালে বসে থাকবো।"

শঙ্করী বলিলেন "তোমার ইচ্ছা…"

চাতালের চারিদিকে বাতির ঝাড়। চাতালে ছিল যোগীন্দ্র ঘোষালের প্রতিবেশী মানিক দত্তর ভ্রাতৃবধূ যমুনা আর ছোট মেয়ে শান্তি। ভ্রাতৃবধূ যমুনা শহরের মেয়ে। তাহার সঙ্গে কাবেরীর ভাব আছে এবং তাহাকে দেখিয়াই কাবেরী সেইখানে বসিল।

যমুনা বলিল "মানিক দত্তর স্ত্রী গিয়াছেন ঠাকুরবাড়িতে; আরতি দেখিয়া ফিরিবেন।"

দুজনে নানা কথা কহিতেছিল…কথায় কথায় দুপুরের দুর্ঘটনার কথা উঠিল।

কাবেরী বলিল "পুরানো বাড়ি…দোলের জন্যে মিস্ত্রীরা একবার রঙ বুলিয়ে দেয়ালগুলোকে মানুষের মতো করে দ্যায় বই তো নয়—কোন্‌খানটায় মচকে রইলো, দেখে না। তার জন্যে ঐ কাণ্ড! শুনেছি, এ-বাড়ির গিন্নী নাকি ঠাকুরবাড়িটি আগাগোড়া মেরামত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে অবনীবাবু তাতে মত দেননি। দেশের বাড়িতে পয়সা খরচ করা তিনি অপব্যয় বলে মনে করেন। সংসারের কোন কথায় থাকেন না বলে গিন্নীও এ-কথা আর তুলতে চান না।…"

যমুনা বলিল "মায়ের হাতেই তো সব। মা বেঁচে থাকতে ছেলে এসব বিষয়ে হাত দেয় কি বলে?"

কাবেরী বলিল "মা কোন-কিছুতে থাকেন না। ছেলের ইচ্ছাতেই সব।…ছেলে শহরে নিজের খেয়াল আর সখ নিয়েই আছেন।…ভাবি, পূর্বপুরুষের এ কীর্তি বজায় রাখতে কেন যে তাঁর অবহেলা! কোনদিন যদি দেখা পাই, তাহলে ভদ্দরলোককে আমি বেশ দু'কথা শুনিয়ে দি।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে পুরুষ-কণ্ঠে শুনা গেল "কী উপদেশ শুনিয়ে দেবেন বলুন তো?"

চমকিয়া যমুনা মুখের উপর সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিল; কাবেরী স্বর লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিল।

দেখিল, সামনে এক তরুণ পুরুষ। কাবেরী তাহাকে না চিনিলেও লোকটি অবনী।

কাবেরী জবাব দিল না।

অবনী কহিল "কার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল আপনাদের?…মানে, আমি এ দেশে থাকি না—তবে এই দেশেরই লোক। এবং আমি এ-দেশের ভালো দেখতে চাই। আপনারা বুঝি দুপুরবেলাকার সেই accidentএর কথা বলছেন? মেরামতির অভাবেই যে ও-ব্যাপার ঘটেছে তা সত্যি। এ-সবের মালিক অবনী চাটুয্যে। আপনি ঠিক কথা বলেছেন, নিজের খেয়াল আর সখ নিয়েই সে দিন কাটায়…জীবনে যেন তার কোন কর্তব্য নেই! সত্যি, পারেন পাঁচ কথা শুনিয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার করে তুলতে?"

কাবেরীর মনে সন্দেহ জাগিল। গায়ে পড়িয়া আলাপ করে এবং সে আলাপ তাদের কথা ধরিয়া…নিশ্চয় এ-বাড়ির লোক! হয়তো অবনী স্বয়ং। অসম্ভব নয়।

তাই কৌতুকের উদ্দেশ্যে সে বলিল "পারি বইকি তাঁকে বলতে। ন্যায্য কথা বলবো, তাতে ভয় কিসের ?"

সহাস্যে অবনী কহিল "কি বলতে পারেন ?"

কাবেরী কহিল "কলকাতায় বসে বাবুয়ানা করবার আগে পিতৃপুরুষের এই সব কীর্তি রক্ষায় মনোযোগী হতে বলবো।"

অবনী কহিল "তা যদি পারেন, আঃ তাহলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

লোকটির গায়ে পড়িয়া এতখানি আলাপের প্রয়াস দেখিয়া যমুনা এক-পা এক-পা করিয়া ঠাকুরবাড়িতে গিয়া প্রবেশ করিল। কাবেরী একা···সেও যমুনার পন্থা-অনুসরণে উদ্যোগী হইল।

অবনী কহিল "আচ্ছা, আমি যদি অবনীর সঙ্গে দেখা করে আপনাদের এ নালিশ তাঁকে জানাই ?"

কাবেরী কহিল "জানাবেন।"

অবনী কহিল "এবং এ নালিশের কোন জবাব যদি তিনি দেন, এবং সে জবাব যদি জানাতে চাই, তাহলে কাকে কোন্‌খানে তা জানাবো ?"

কাবেরীর রাগ হইল। রাগের ঝোঁকে সে বলিল "তাহলে সে জবাব জানাবেন এখানকার কলেজের প্রোফেসর যোগীন্দ্রনাথ ঘোষালের বাড়িতে কাবেরী দেবীর কাছে। যোগীনবাবু ডালিমতলায় থাকেন।"

কলেজ হইতে ফিরিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল ডাকিলেন "ওগো······

ওদিককার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নর্মদা চুল বাঁধিতে ছিল, স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিল "কেন ?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "কাবেরী কোথায় ?"

নর্মদা কহিলেন "নীচে কুটনো কুটছে।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "নীচে একটি ভদ্রলোক এসেছেন।···এসেছেন অনেকক্ষণ। আমার জন্যে পথে অপেক্ষা করছিলেন।"

নর্মদা কহিল "কে এমন ভদ্রলোক যে আমাকে ডাকছো সে খবর দিতে ? আমাকে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে নাকি ?"

মৃদু হাস্যে যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "দেখা করলে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।"

ভ্রূকুটি করিয়া নর্মদা কহিল "তার মানে ?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "অবনী চাটুয্যে এসেছে। রাতারপাড়ার বিনয় চাটুয্যের ছেলে। মস্ত বড়লোক ওরা···ছেলেটিও খাসা।"

নর্মদা বলিল "শোনবার মতো কথা আছে ? না, চিরদিন যেমন ভূমিকা নিয়ে আছো, তেমন ভূমিকা ?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধে।

ভূমিকা হল মূলগ্রন্থের চুম্বক, মর্মকথা। ওটা বোঝবার ধৈর্য যদি না থাকে, তা হলে আসল বই বুঝবে কি করে ?···তুমি জানো না, কিন্তু কাবেরী জানে ভূমিকার দাম।"

নর্মদা কহিল "বেশ, আমার এখন ভূমিকা শোনবার সময় নেই। শোনো, মা একজন ঘটকীকে বলেছিলেন কাবেরীর জন্যে পাত্রের খোঁজ করতে। সে-ঘটকী আজ দুপুর বেলা এসেছিল। বলে গেছে, বারাকপুরে একটি ভালো ছেলে আছে। সাব ডেপুটি। বাপ ছিলেন ডেপুটি রায়বাহাদুর। তোমাদের কথা পেলে পাত্র মেয়ে দেখতে আসবে সামনের রবিবারে। ঘটকী সন্ধ্যার পর এখানে আসবে। তোমার মতামত জানতে বলে গেছে। ছেলেটি এসেছে ছুটি নিয়ে বিয়ে করতে।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "তোমরা যে রকম উঠে-পড়ে লেগেছো, তাতে কাবেরীকে অচিরে বাড়ি-ছাড়া না করে আর ছাড়বে না দেখছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীর প্রবেশ। কাবেরীর হাতে গ্লাস; গ্লাসে ডাবের জল। কাবেরী বলিল "কিন্তু এ-বাড়ি ছাড়ছে কে শুনি ?"

কাবেরীর এ কথায় নর্মদা কোন কথা কহিল না। যোগীন্দ্র ঘোষালের পানে চাহিয়া শুধু বলিল "সন্ধ্যার আগেই আমাকে দয়া করে জানিয়ো তোমার মনোগত অভিপ্রায়। বিদুষী শ্যালীর সঙ্গে যদি পরামর্শ থাকে, এর মধ্যে তা সেরে নিয়ো। লোককে কথা দিয়েছি—যা হোক একটা জবাব তাকে যেন দিতে পারি! আমার মুখ রেখো, বুঝলে···তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো।"

কথাটা বলিয়া নর্মদা গমনোদ্যত হইল।

কাবেরী স্থির দৃষ্টিতে এবার নর্মদার পানে চাহিল, তার পর চাহিল যোগীন্দ্র ঘোষালের পানে। বলিল "বুঝেছি। আমাকে নিয়েই আপনাদের গৃহবিবাদ শুরু হয়েছে দাদা। দুজনকেই আমি এবার শাস্তি দেবো, সত্যি। শুনুন, আপনি আপনার কলেজের প্রোফেসরদের নেমন্তন্ন করে আনুন একদিন···সেদিন আমি স্বয়ংবরা হবো।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "তাহলে তাদের দশা যা হবে, তা বুঝতেই পারছি দিদি! রাজ্যের শিশুপাল আমাকে একেবারে লাঠ্যৌষধি করে ছেড়ে দেবে! তুমি কি তাদের কারো গলায় মালা দেবে ?"

কাবেরী কহিল "দেবো। একজন, দুজন, যত-জন বলবেন, সক্কলের গলায় মালা দেবো। সত্যি, আপনার উপর দিদির পীড়ন আমার ভালো লাগে না!"

নর্মদা কহিল "দুজনে একত্র হয়েছো কি অমনি রঙ্গরসের ফোয়ারা চলবে! সংসারটা কিন্তু রঙ্গরসের রঙ্গভূমি নয়! মানুষের এখানে কর্তব্য আছে।···আমি যাই। তোমাদের যা খুশি, রঙ-তামাশা করো······"

নর্মদা চলিয়া যাইতেছিল, যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "চললে দেবী! যে জন্যে ডাকলুম··· ।"

নর্মদা বলিল "ভূমিকা রেখে বলতে পারতে, শুনতুম। ভূমিকার আদর যে জানে, সে এসেছে—তাকে শোনাও তোমার ভূমিকা। শেষ হলে আমাকে ডেকো···এসে গ্রন্থ শুনবো।"

হাসিয়া কাবেরী কহিল "বটেই তো! নীরস ভূমিকাটুকু শুনবো আমি, আর যেই interesting chapter আরম্ভ হবে, অমনি তুমি এসে আসন পেতে বসবে!"

নর্মদা কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাবেরী বলিল "এটা খেয়ে ফেলুন। দিদির কথায় বুকে যদি ব্যথার আগুন জ্বলে থাকে, ডাবের জলে তার নির্বাণ হবে।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল ডাবের জল পান করিলেন, তারপর কলেজের বেশ পরিবর্তনে মনোযোগী হইলেন।

গ্লাস লইয়া কাবেরী চলিয়া গেল।

মুখ-হাত ধুইয়া যোগীন্দ্র সামনের ছোট বারান্দায় আসিয়া ডেকচেয়ারে বসিলেন।

কি ভাবিতেছিলেন···

কাবেরী আবার আসিল। তার হাতে প্লেট। প্লেটে জলখাবার।

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ইস্ ভারি ভুল হয়ে গেছে দিদি। জলখাবার থাক···একটি ভদ্রলোক এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে।···তুমি দু'পেয়ালা চা তৈরি করে বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দাও শীগগির······আমি নীচে চললুম।"

বিরক্ত হইয়া কাবেরী কহিল "না। ভদ্রলোক এসে থাকেন, এখন বসে থাকুন। মানুষ জিরুবে না একটু!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এ তোমারি কৃতকার্যের জের ভাই! ভদ্রলোকের আর অপরাধ কি? অপরাধ তোমার।"

কাবেরী কহিল "তার মানে?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "কবে কাকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে এসেছো···সে এসেছে সেই উপদেশে উপদিষ্ট ব্যক্তি কতখানি সজ্ঞান সচেতন হয়েছে, তার রিপোর্ট দিতে।"

কথার আড়ম্বরে কাবেরীর বিস্ময়-কৌতূহলের সীমা রহিল না।

কাবেরী কহিল "আপনার আজ কী হয়েছে, এমন বক্তৃতা ছুটছে মুখে?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিল "তোমার বাণী যদি অজানা-প্রাণীকে বিমুগ্ধ সচেতন করে থাকে···"

বাধা দিয়া কাবেরী বলিল "থামুন আপনি! আপনার ভূমিকা আজকাল এত দীর্ঘ হয় যে ভয় করে, আমার মত নিরীহ ভক্তও বুঝি বা আর আপনার ভূমিকার মর্যাদা রাখতে পারবে না···দিদির মত কক্ষান্তরে গিয়ে আশ্রয় নেবে! কিন্তু ও কথা থাক, কি হয়েছে সত্যি বলুন তো?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "কার কাছে তুমি অবনী চাটুয্যের সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে এসেছো না কি! সে-উপদেশ শুনে অবনী স্বয়ং এখন আমার এখানে এসে হাজির!"

কাবেরী আরও বিস্মিত হইল!...সেই কথা! কাল দোল দেখিতে গিয়া ঠাকুরবাড়ি মেরামতের সম্বন্ধে...

কিন্তু সে তো শুধু কথার কথা...ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনো অর্থ লইয়া কাবেরী সে-কথা বলে নাই।

তবু সে-কথা লইয়া এতখানি উৎসাহ আগ্রহ।

কাবেরী বলিল "আপনার সে অবনী চাটুয্যে কি বলেছে?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ভদ্রলোক আমায় বললেন, আপনার শ্যালী শ্রীমতী কাবেরী দেবী একটা খবর জানতে চেয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ি মেরামত সম্বন্ধে। আমার উদ্দেশ্যে কাল তিনি অনেক কথা বলে এসেছেন। সেই সঙ্গে বলে এসেছেন, মানে challenge...যে অবনী চাটুয্যে যদি জবাব দিতে চায়, তাহলে সে যেন এ-বাড়িতে এসে জবাব দিয়ে যায়!"

কাবেরী কৌতুক বোধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে একটু আনন্দ জাগিল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "কথাটা তুমি যাকে বলেছিলে, সে অন্য লোক নয়... অবনী স্বয়ং!"

হাসিয়া কাবেরী বলিল "আমারো সে-সন্দেহ হয়েছিল দাদা। অবশ্য পরে। তাও বললো নাকি?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "বললো। বললো, আমাকে চেনেন না...মুখের উপর যেভাবে ও-কথা বললেন, তেমন কথা জীবনে আমি শুনিনি!"

কাবেরীর মাথার মধ্যে রক্ত ছলাত করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া কোথা হইতে মুখে একরাশ রাঙা আবীর ছড়াইয়া দিল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন "Blushing! আমারও মুশকিল হয়েছে...অবনীর বিমুগ্ধ সশ্রদ্ধ ভাব, তোমার সলজ্জ শ্রী...তাই তোমার দিদিকে ডেকেছিলুম একটু মনস্তত্ত্ব আলোচনা করবো বলে। তা আমার উপর ওঁর যে কি দারুণ অবিশ্বাস দাঁড়িয়েছে! ভাবেন, আমি শুধু ফাঁকির কারবার করি...কাজের মানুষ আমি মোটেই নই! তার উপর......"

কাবেরীর বুকের মধ্যে তখন কিসের স্রোত ছুটিয়াছে! কাবেরী তাহা বেশ উপলব্ধি করিতেছিল।

যোগীন্দ্র ঘোষালের কথায় কাবেরী কহিল "তার উপর...কি?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "আমাকে বলতে এসেছেন, মানে, ঠিক এই কথাগুলি উনি বললেন। বললেন, আপনার শ্যালী শ্রীমতী কাবেরী দেবীকে বলবেন, আজই সকালে কনট্রাক্টর ডাকিয়ে ব্যবস্থা করেছি, কাল থেকে তারা ঠাকুরবাড়ির আমূল সংস্কার শুরু করবে; অবনী চাটুয্যে পিতৃপুরুষের কীর্তিরক্ষা সম্বন্ধে যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকবে। এবং শেষ কথা বলেছেন, এমন সতেজ সুস্পষ্ট উপদেশের জন্য শ্রীমতী কাবেরী দেবীর ওপর ওঁর শ্রদ্ধা হয়েছে অপরিসীম।"

একাগ্র মনোযোগে কাবেরী কথাগুলি শুনিল। আনন্দ হইল। এমনি লোক উনি!

অবনীকে ভালো লাগিল।…

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ওঁর এই শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে আমি অনেক-কিছু দেখছি …অর্থাৎ, ওঁর মন আজ কাবেরীর করুণা-ধারার পিয়াসী!"

কৃত্রিম রোষভরে কাবেরী কহিল "আপনি দেখছি ক্ষেপে গেছেন! আমি না ছোট বোন হই…"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "বোন বোন…সাইকলজি সাইকলজি।…এখন তোমার দিদিকে চাই। মানভঞ্জন করে তাঁর চিত্তকে আজ যোগীন্দ্রমুখী করতেই হবে।…"

নর্মদা এ কথা শুনিল, শুনিয়া স্বামীকে বলিল "বাড়ি বয়ে এ-কথা যখন বলতে এসেছে…মনে হচ্ছে, দুরাশা হবে না। তুমি আলাপ-পরিচয় করো…আমি লুচি-তরকাবির ব্যবস্থা করি!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "বেশ কথা! দুদিক্ থেকে দু'রকম ফাঁদ পাতা যাক… দেখি, সোনার হরিণ ধরা পড়ে কিনা!"

এ-কথা বলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল আসিলেন বাহিরের ঘরে। আসিয়া দেখেন, শেল্ফ হইতে একখানা বই পাড়িয়া তার পাতায় অবনী চোখ বুলাইতেছে।

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "একটু-কিছু মুখে দিতে হবে…প্রথম আমার বাড়িতে এসেছেন!"

অবনী কহিল "আমায় 'আপনি' বলবেন না স্যর!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এ-কথাটি গোড়ায় বলে আমাকে যে কতখানি ফ্রী করলে, তা আর কি বলবো!…"

কথায় কথায় অনেক কথা হইল। অবনী বলিল "কাল থেকে আমি শুধু ওঁর কথা ভেবেছি। কী সতেজ ভঙ্গী! Inspiration দিয়েছেন। সত্যি জীবনে কি করেছি? কিছু না…idling away my time…উনি খুব বিদুষী নিশ্চয়?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ইউনিভার্সিটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পড়ার দিকে ওর খুব ঝোঁক। কিন্তু বাঙালীর ঘরে এ ঝোঁক নিয়ে কি-বা হবে? কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে হবে…cares and worries…সেই মামুলি ধারায় জীবন কাটবে…রান্নাবান্না, ছেলেমেয়ের ধকল…ধোঁয়া-ধুলো আর ঝুল-কালি!…অর্থাৎ বিদ্যা-বুদ্ধির চিতা-রচনা। আমার স্ত্রীকে আমি তাই বলি, প্রোফেসরি করছি…ছেলেদের বিদ্যা-বুদ্ধির খবর তো রাখি—এমন বুদ্ধি সত্যই কম দেখেছি!"

ভোজ্য-পানীয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া অবনী ফিরিল রাত্রি প্রায় সাড়েনটায় এবং এ সংবাদ সে জানিয়া গেল যে কাবেরীর বিবাহের জন্য পাত্রের চিন্তায় যোগীন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রীর মনে ব্যাকুলতার সীমা নাই!

তিন দিন পরের কথা।

অবনী কলিকাতায় ফেরে নাই ; এখানেই আছে।

মহালক্ষ্মী দেবী একটু বিস্ময় বোধ করিলেন, কহিলেন "ব্যাপার কি রে অবু ? কলকাতায় না গিয়ে এখানে আছিস !"

অবনী বলিল "মিস্ত্রীরা কোথায় কি করে, কেমন কাজ করে, দেখি। যখন এ-কাজে হাত দিয়েছি···"

হাসিয়া মা কহিলেন "শুনে খুশী হলুম বাবা।"

অবনী কহিল "তোমায় এবার খুশী করবো মা, সত্যি !"

মহালক্ষ্মী দেবী চলিয়া যাইতেছিলেন, অবনী ডাকিল "মা···"

মা ফিরিলেন।

একটা কথা অবনীর বুকের মধ্যে বাতাসের বেগে ঘুরিতেছিল। ভাবিয়াছিল, এখানে আর কেহ নাই, শুধু মা ! মায়ের কাছে লজ্জা কি !

মা বলিলেন "কিছু বলবি ?"

কে যেন অবনীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল ! সে কথা বলিতে পারিল না, শুধু বলিল "হ্যাঁ ! মিস্ত্রী লেগেছে, তোমার যদি কিছু করাবার থাকে, বলো।"

মা বলিলেন "করছিস যখন, তখন আমি বলি ঠাকুরবাড়ির পুকুরটা কাটিয়ে দে বাবা। জল বড় নোংরা হয়ে আছে। অনেক লোক ও পুকুর সরে। এ-পাড়ার যত লোক জল খেয়ে বাঁচবে। পুকুর কাটিয়ে সিঁড়িগুলো বাঁধিয়ে দিতে পারলে সকলের খুব সুবিধা হয়।"

অবনী কহিল "তাই হবে মা। তুমি যে কেন এ-সব করাওনি ! তুমি থাকতে আমি এ-সবে কি কথা কইবো, বলো তো ?"

মা বলিলেন "আমি তো তোদের এ-সবের মধ্যে কোনদিনই নেই অবু।···এখন আমাকে এ সবের মধ্যে জড়াস নে।"

অবনী কহিল "এইখানেই আমার অভিমান হয় মা। আমাকে তুমি ফেলে দিতে চাও ?"

মা বলিলেন "ফেলে দিতে চাই ! ছেলেকে মা কখনো ফেলে দেয় না ! তোমাদের এ-বাড়ির চালই অন্য রকম ! স্নেহ-মায়া···এসব চাপা পড়ে থাকে বনেদী চালের নীচে···চিরদিন দেখছি তো ! এই যে তোমার বিয়ে···সকলে বলছে, বিয়ে দাও···কিন্তু কাকে আমি বলবো বিয়ে করতে ?"

অবনীর বুকখানা দুলিয়া উঠিল। মস্ত সুযোগ ! সে বলিল "তুমি বিয়ে করতে বললে তোমার কথা আমি অমান্য করবো, এ-কথা তুমি কি বলে ভাবো ?"

মা খুশী হইলেন, বলিলেন "সত্যি বিয়ে করবি অবু ?"

অবনী কহিল "তুমি যদি তাতে খুশী হও···"

মা বললেন "আমি খুশী হবো !···ছেলে বড় হলে তার বিয়ে দিয়ে বৌ আনবে, এ-সাধ আমাদের দেশের মেয়েদের মনে জাগে ছোটবেলা থেকে। পুতুল নিয়ে তাই সে এই ছেলের বিয়ে-দেওয়ার খেলাই খেলে চিরদিন···"

এ-কথার প্রসঙ্গে অবনী মায়ের কাছে কাবেরীর কথা খুলিয়া বলিল। উচ্ছ্বসিত ভাষায় আবেগের বর্ণ-রাগ মিশিল অনেকখানি।

অবনী বলিল "এমন চমৎকার পরিবার তুমি আর গ্যাখোনি মা! তা ছাড়া বিয়ে করতে হলে এমনি মেয়েকেই বিয়ে করতে হয়। পুতুল নয়, চরকিবাজি নয়, অথচ জীবন্ত! যেমন তেজ, তেমনি বুদ্ধি।"

মা বলিলেন "বটে! তা বেশ তো, মেয়েটিকে দেখি।"

অবনী কহিল "না মা···মেয়ে-দেখা বলে দেখো না। একটা বুদ্ধি করে দেখতে হবে।"

মায়ের সঙ্গে ছেলের পরামর্শ হইল। এবং সে পরামর্শের ফলে মা নিজে একদিন ত্বপুর বেলা গেলেন যোগীন্দ্র ঘোষালের গৃহে।···

শঙ্করী দেবীকে বলিয়া আসিলেন সকলকে লইয়া আমাদের ওখানে যাইতে হইবে। ঠাকুরের আরতি দেখিয়া ঐখানে প্রসাদ···ইত্যাদি।

সকলকে লইয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল আসিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

নর্মদা ও কাবেরীকে দেখিয়া মা খুশী হইলেন; এবং অবনীর সঙ্গে কাবেরীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

শঙ্করী দেবী এ-বাড়ির অভ্যর্থনায়-আদরে এত খুশী হইলেন যে কাবেরীর উপর মনের সব বিরাগ মুছিয়া গেল এবং তিনি এ-প্রস্তাব শিরোধার্য করিয়া মহালক্ষ্মী দেবীকে কথা দিলেন! বলিলেন, মেয়ের এত বড় সৌভাগ্য হইবে, এ ছিল তাঁদের স্বপ্নের অগোচর।

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "ও কথা বলবেন না দিদি। ও মেয়েকে ঘরে পাওয়া ভাগ্যের কথা।"

নর্মদা ও কাবেরীকে লইয়া মহালক্ষ্মী দেবী ঘর-দ্বার দেখাইলেন, পূজার ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। কাবেরীকে বলিলেন "একটি কথা মনে রেখো মা···একাল একাল। তোমরা সেকালকে আঁকড়ে পড়ে থাকবে, এমন কথা আমি বলবো না এবং সে-প্রত্যাশা কখনো করবো না। তা নয়···লোক-জনের সামনে বেরোও, জুতো-মোজা পায়ে দাও, গান-বাজনা করো, সভা-সমিতি করো···সব করো; সেই সঙ্গে এই পূজার্চনা, ঠাকুর-দেবতার সেবা···সংসার থেকে এগুলোকে ছেঁটে দিয়ো না। প্রথম প্রথম হয়তো ভালো লাগবে না। কিন্তু বয়স হলে বুঝবে, সংসারে আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা এ-সবে যেমন সান্ত্বনা আরাম শান্তি, তেমনি ঠাকুর-দেবতার কাজেও মনে সাহস মেলে, সান্ত্বনা মেলে, আরাম মেলে। এ সংসারে আমি সুখ যেমন পেয়েছি, ত্বঃখও তেমনি! কত ত্বঃখ, কত বেদনা অনায়াসে সয়েছি শুধু ঐ ঠাকুর-দেবতাকে স্মরণ করে তাঁদের ডেকে, তা আমিই জানি। আমার এ-কথা চিরদিন মনে রেখো···"

সে-রাত্রে সকলে গৃহে ফিরিলেন খুব পরিতৃপ্ত মনে···যেন অন্য মানুষ!

সব চেয়ে বেশী তৃপ্তি কাবেরীর মনে। কাজে-কর্মে মাঝে মাঝে মনে হইত, বুকের

উপর যেন ভারি পাথর চাপানো! আজ ও-বাড়ি হইতে ফিরিয়া মনে হইতেছে বুকের সে-পাথর সরিয়া গিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথ সরল সুন্দর নিশ্চিন্ত নিরাময়!

সে-রাত্রে কাবেরী ভালো ঘুমাইতে পারিল না। কেবল মনে জাগে অবনীর কথা! ছোট্ট একটা কথা সে বলিয়াছিল! সে কথার গভীর কোন অর্থ ছিল না···দৈবাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। সে কথাকে এ-মানুষটি এতখানি মূল্য দিয়া বসিয়াছে! এ মানুষের আসন তো তবে অনেক মানুষের বহু-উর্ধ্বে!

পরের দিন রবিবার! দুপুরবেলার কথা বলিতেছি।

অবনী কোথায় গিয়াছে। দোতলায় নিজের ঘরে শরৎ একখানা আইনের কেতাব খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে-ঘরে প্রবেশ করিল জুবিলি।

পাড়ায় থাকেন প্রসন্ন গাঙ্গুলি, রায়বাহাদুর। জুবিলি তাঁর পৌত্রী। জুবিলির মা নাই, বাপ নাই। বিধবা। বয়স চব্বিশ বৎসর।

রায়বাহাদুরের স্ত্রী কুমুদিনী দেবীকে আজ পাঁচ বৎসর এমন শুচিবায়ুতে পাইয়া বসিয়াছে যে সংসারের আবর্জনা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গাজল ও গোবর লইয়াই তিনি সারাদিন কাটাইয়া দেন। সন্ধ্যার সময় গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া ঠাকুরঘরের কোণে গিয়া বসেন এবং সেই ঘরেই ঠাকুরের প্রসাদ দুধ-কলা, মিষ্টান্নাদি মুখে দিয়া আচার রক্ষা করিতেছেন। সংসার হাজিয়া-মজিয়া গেলেও সেদিকে তাকাইবেন, তার তিলার্ধ সময় নাই।

পুত্রকন্যা গেছে, পৌত্রী জুবি বিধবা হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং গৃহিণী কুমুদিনী দেবী গঙ্গাজল ও গোময়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এই ত্রিবিধ তাপ নিবারণকল্পে রায়বাহাদুর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র লইয়া বিভোর হইয়া আছেন। সংসারে দৃষ্টি নাই! ন্যায়দর্শনের সঙ্গে কাণ্টের দর্শনের কোথায় তফাত,—শঙ্করাচার্যের পাশে হেগেল দাঁড়াইতে পারেন না···এমনি বাক্য-জালে সকলকে তিনি জর্জরিত করিতেছেন। এবং সেই ফাঁকে সংসারকে এমন নির্বিকার দেখিয়া জুবিলি স্বাধীন মন লইয়া বৈধব্য-যাতনা ভুলিয়া আরামে আছে।

জুবিলির বিবাহ হইয়াছিল সাত বৎসর পূর্বে। স্বামী বিশ্বনাথ ছিল ধনীর পুত্র। তিন পুরুষ ধরিয়া বিলাস-সুখ লইয়াই তাহাদের কারবার। মানুষ সেকালে বিলাসিতায় মচকাইয়া ভাঙিয়া পড়িত না। বিশ্বনাথ একালে জন্মিয়া সেকালের বিলাস-লীলার সাধনা করিতে গিয়া প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। অনাচারে অনিয়মে এবং খোশখেয়ালে বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আজ এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথের আসনে এখন তার ভাই বিশ্বনাথ। বিলাসিতায় পূর্বপুরুষের চাল বজায় রাখিতে গিয়া শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাকে বিশ্বনাথ রীতিমত জটিল দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বনাথের বিলাসিতার বিস্তারিত পরিচয়ের প্রয়োজন আমাদের নাই! আমাদের প্রয়োজন জুবিলিকে লইয়া।

বিল্বনাথ ছিল যেমন রসিক, তেমনি উদার। জুবিলিকে লইয়া আসরের রঙ্গ হইতে শুরু করিয়া থিয়েটারের গ্রীনরুম পর্যন্ত তার গতি ছিল অবাধ। উদার ধনী বিল্বনাথের সহযোগিনী বিলাস-রঙ্গিণীদের সঙ্গে জুবিলির ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সে দিকে বিল্বনাথের না ছিল শাসন, না ভয়-ডর।

বিল্বনাথের মৃত্যুর পর জুবিলি পিতামহের কাছে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া দেখিল, তার জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বিল্বনাথ তাকে কি-মোহে যে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল!

আজ বিল্বনাথ নাই···সে বাঁচিয়া আছে। এবং তাকে বাঁচিতে হইবে। এ কয় বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া জুবিলি দেখিল, জীবনের ব্যর্থতা বা সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের নিজের হাতে। এ কটা বৎসর কোথা দিয়া কি কোলাহলের মধ্যে কাটিয়াছে···নিজের পানে কখনও চাহিয়া দেখে নাই! এখন নিজের পানে ফিরিয়া চাহিতে দেখিল, জীবনকে সফল করিয়া তুলিবার মত সব উপাদান তার মজুত আছে। জুবিলি লেখাপড়া শিখিয়াছে; পিতামহের আদরে এবং বিলাসী সমাজের প্রশ্রয়ে সংকোচ-শঙ্কার ধার ধারিতে শিখে নাই। স্বামীর কাছে ছিল যেমন বিলাস, তেমনি স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা!

বিধবা হইয়া দেশে ফিরিয়া জুবিলি নূতন চোখে শরৎকে দেখিল। ছোটবেলায় দুজনে খুব ভাব ছিল। দুজনকে না পাইলে দুজনের চলিত না। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মত দুজনে নদীর ধারে বসিয়া গল্প করিত, আকাশের তারা গণিত, গঙ্গায় সাঁতার কাটিত, তারপর বিচ্ছেদ ঘটিলে দূরে থাকিয়া দুজনে দুজনকে শুধু স্মরণ করিত।

আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর অনেক ঝড়-বাদল কাটাইয়া দেশে ফিরিয়া জুবিলি শরৎকে আবার দেখিল।

সেই শরৎ! তাকে আজ আরও ভালো লাগিল। মনে হইল, শরৎ যদি পাশে থাকে, তাহা হইলে জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে কোথাও বাধিবে না!

জুবিলি প্রায় আসে শরতের কাছে। পৃথিবীর সঙ্গে মেলামেশা করিয়া যে-বুদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাতে এ আসা-যাওয়ায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলে। শরতেরও জুবিলিকে ভাল লাগে। জুবিলি যেন তার জীবনে জোয়ার বহিয়া আনে। শুষ্ক চিত্তে বসন্ত-সমীরের স্পর্শ দিয়া অপরূপ মাধুরীতে তাকে ভরিয়া তোলে! জুবিলিকে দেখিলে শরতের মন বাসনায় কামনায় উজ্জ্বল হয়। প্রাণপণে মনকে সে দাবিয়া রাখে। জুবিলি বিধবা! শরৎ লেখাপড়া শিখিয়াছে···তার উপর সে পিসীমার অন্নে প্রতিপালিত।

কিন্তু মনকে যতই শাসনে রাখুক, মন তবু ভবিষ্যতের দিকে চাহিতে গিয়া সর্বাগ্রে এই জুবিলির হাত ধরে।

শরতের বুক কাঁপিয়া ওঠে। এ অন্যায়! জুবিলি শুধু বাল্যসখী, আর কেহ নয়! সে ভাবে, কোনমতে আইনটা পাস করিতে পারিলে হয়···দূরে সরিয়া যাইবে···জুবিলির নাগালের বাহিরে।

মন অস্থির হয়···বলে, পরের কথা পরে। যতদিন এখানে আছ, জুবিলিকে আসিতে দাও। জুবিলিকে ভাল লাগে! একটু দেখা···ছুটি কথা কহা···কী দোষ তাহাতে!

বইয়ের পাতায় শরৎ এমন নিমগ্ন যে জুবিলি আসিয়াছে, টের পায় নাই। জুবিলি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···ছু চোখের অপলক, অবিচল দৃষ্টি শরতের উপর নিবদ্ধ।

প্রায় পনেরো মিনিট চুপচাপ থাকিবার পর জুবিলি আসিয়া পাশে বসিল এবং শরতের বইয়ের পাতায় হাত চাপা দিয়া বলিল "তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করতে এসেছি!"

শরৎ চমকিয়া জুবিলির পানে চাহিল; কহিল "জুবি! কতক্ষণ এসেছো?"

—"অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার তপঃসাধনা দেখছিলুম।"

হাসিয়া শরৎ কহিল, "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ···জান তো!"

জুবিলি বলিল "জানি। তাই সে-তপস্যা আমি ভঙ্গ করতে এলুম।"

শরতের বুকখানা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। শরৎ বলিল "হঠাৎ এমন মহাব্রত-সাধনে ইচ্ছা হল কেন বলতে পার?"

নিশ্বাস চাপিয়া জুবিলি বলিল "হঠাৎ!···তার মানে?"

শরৎ কহিল "তার মানে অলস-মধ্যাহ্নে···প্রখর রবির কর! এ-সময় তপস্যা ভঙ্গ করতে স্বর্গের কোনো অপ্সরা স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমেছেন বলে পুরাণে তত্ত্ব মেলে না।"

সাহিত্য-রচনা জুবিলির ভালো লাগিল না। সে বলিল "আমি ঐতিহাসিক নই। অত তত্ত্ব-কথার ধার ধারি না···কোনদিন ধারিনি। একলাটি বসে রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম,—হঠাৎ মনটা হুহু করে উঠলো! মনে হলো, আকাশখানা যেন হুড়মুড় করে বুকের উপর এসে পড়বে! হাঁফিয়ে উঠলুম! বাড়িতে দেখি, সবাই নিজেকে নিজেকে নিয়ে বেশ আছে! বাবা কোথা থেকে এক পণ্ডিত ধরে এনেছেন—এনে তাকে নিয়ে একরাশ বই খুলে ভীষণ তর্ক করছেন! আর সকলে—কেউ শুয়েছে, কেউ নভেল পড়ছে, কেউ তাস খেলতে বসেছে! একা থাকতে পারলুম না। তোমার কথা মনে হল। ভাবলুম, দেখি যদি তোমার দেখা পাই···"

শরৎ বলিল "দেখা পেয়েছো তো!···এখন বল, কি আদেশ?"

জুবিলি কহিল "তামাশা কোরো না শরৎদা, সত্যি···তামাশা আমার ভালো লাগে না!···আমার কথা তুমি কখন সিরিয়াসলি ভাববে না?"

জুবিলির স্বরে যেমন অভিমান, তেমনই ক্ষোভ!

শরৎ জবাব দিল না, শুধু জুবিলির পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জুবিলি বলিল "কি দেখছো?"

শরৎ কহিল "তোমাকে।"

জুবিলি বলিল "নতুন কিছু দেখছো ?"

শরৎ কহিল "তোমায় দেখে রবিবাবুর সেই কবিতা মনে পড়ছে।"

—"কোন্‌টা ?"

শরৎ বলিল "সেই—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,—
তুমি বিচিত্ররূপিনী !
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী !"

জুবিলির দু'চোখে নিবিড় আবেশ ! শরতের পানে চাহিয়া শরতের কণ্ঠে জুবিলি শুনিল কবিতার আবৃত্তি।

এটুকু আবৃত্তির পর শরৎ চুপ করিল।

জুবিলি বলিল "চুপ করলে কেন শরৎদা ? বলো তোমার কবিতা···"

শরৎ বলিল "আর মনে পড়ছে না···সত্যি।"

জুবিলি বলিল "বই আনো, এনে পড়ো···আমি শুনবো।···লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি,—তোমার মুখে কবিতা শুনতে আমার এমন ভালো লাগে···তুমি তো জান ! আজ বলে নয়, চিরদিন !"

শরৎকে বই আনিতে হইল এবং বই আনিয়া শরৎ পড়িল···

"ধীর-গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী !
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-বাসিনী।"

জুবিলি শুনিল···বিমুগ্ধ চিত্তে ! শুনিতে শুনিতে সে দু'চোখ মুদ্রিত করিল।

শরৎ জুবিলির পানে চাহিয়া রহিল। অতীত-বর্তমানের একরাশ কথা মনকে চকিতে ফেনপুঞ্জের মত ছাইয়া ফেলিল।

সাধে জুবিলি নিজেকে লইয়া এতখানি অস্থির বিরক্ত হইয়া আছে ! শরৎ ভাল করিয়াই জুবিলির মনের পরিচয় জানে। আর কাহারও মনকে এমন ভাবে দেখে নাই। ছেলেবেলায় শরতের আশেপাশে ফিরিত। শরৎ কবিতা পড়িত, সব ফেলিয়া জুবিলি আসিয়া পাশে বসিত, বসিয়া কবিতা শুনিত। ডমরু বাজাইয়া বর্ষার মেঘ যখন জল-স্থল ঢাকিয়া দিত, জুবিলি তখন সে মেঘের পানে চাহিয়া জগৎ-সংসার ভুলিত। ডাকিলে জুবিলি চমকিয়া বলিত "মেঘ দেখলে আমার কি যে মনে হয় জানো শরৎদা ! কত কী যেন স্বপ্ন দেখি !···কেন আমায় ডাকলে বলো তো ?"

জুবিলির মন আর পাঁচজন মেয়ের মনের মত নয়! ও-মনে যেমন স্নিগ্ধতা, তেমনি ঝাঁজ! অভিমানে-বেদনায় অশ্রুর পাথার রচনায় যেমন পটু, তেমনি আবার ও-মন চকিতে তীব্র-ঝাঁজে জ্বলিয়া ওঠে!

জুবিলির বিবাহ হইয়া গেল। তুজনে স্বপ্ন রচনা করিত, কেহ জানিত না। জুবিলি স্পষ্ট ভাষায় বলিত "আর কারো সঙ্গে ধরে-বেঁধে যদি আমার বিয়ে দেয় শরৎদা, তুমি দেখে নিয়ো, সে বিয়ে আমার সইবে না..."

শরৎ হাসিত। বলিত "কী নভেলিয়ানা যে করো!"

জুবিলি বলিল "সত্যি। যদি হয়, দেখে নিয়ো।"

তারপর বিল্বনাথের মৃত্যু ঘটিলে শরৎ চমকিয়া উঠিয়াছিল। জুবিলির উপর ভয়ে মন ভরিয়া গিয়াছিল। জুবিলির বিরাগে এমন বিষ...সত্য?

তারপর জুবিলি ফিরিয়া আসিল। শরৎ তুদিন পলাইয়া বেড়াইয়াছিল, জুবিলির এ-বেশ সে কোন্ প্রাণে দেখিবে? তারপর নিজেকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। জুবিলি তাকে খুঁজিয়া বাহির করিল।

ছাদে চিল-কোঠার আড়ালে বসিয়া শরৎ কী একখানা বই পড়িতেছিল, জুবিলি আসিয়া ডাকিল "শরৎদা..."

শরতের বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে, এমন হইয়াছিল! জুবিলির পানে চাহিয়া পরক্ষণে মাথা নামাইল। নিজের হাতে শরতের মুখ তুলিয়া ধরিয়া জুবিলি বলিয়াছিল "তোমার কি হয়েছে? কদিন খুঁজছি...দেখা নাই! কোথায় গিয়েছিলে?"

জুবিলির সহজ বেশ এবং সরল কণ্ঠস্বরে শরৎ চমকিয়া উঠিয়াছিল! ভয়ে যার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল, সে ঠিক তেমনি আছে? এত বড় আঘাত তার দেহে-মনে এতটুকু রেখা আঁকিতে পারে নাই? আশ্চর্য!

শরতের মুখে কথা সরে নাই। হাসিয়া জুবিলি বলিয়াছিল "সে কথা মনে পড়ে?"

শরৎ সে-কথা নিমেষের জন্য ভুলে নাই। জুবিলির মুখে এখন এ কথা শুনিয়া শরতের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শরৎ অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারে নাই। জুবিলি অনর্গল বকিতেছিল। নিজের বিবাহিত জীবনের কাহিনী বলিতেছিল। সে কাহিনী যত করুণ হোক, তাহাতে অনেকখানি শ্লেষ মিশাইয়া জুবিলি যেন অট্টহাস্যের বেলুন রচনা করিয়াছিল। শরতের উদ্বেগের সীমা ছিল না! এই বয়সেই যদি জুবিলির মন এমন হইয়া যায়, সারা জীবন সে বাঁচিবে কি করিয়া?

সেই সব পুরানো স্মৃতি শরতের মনের পটে বিদ্যুতের রশ্মির মত সারাক্ষণ ঝিকমিক করিতেছে!

শরতের মনকে নাড়া দিয়া জুবিলি কহিল "উঠে পড়। তোমাকে আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় যেতে হবে। কটা জিনিস দরকার। ব্লাউজপিস; ক'খানা

নূতন গ্রামোফোন রেকর্ড; আর ছোট সাইজের একটা রেডিও সেট। বাবার কাছ থেকে চারশো টাকা আদায় করেছি···টাকাটা মিছে কেন পড়ে থাকে?”

শরৎ দুই কান দিয়া কথা শুনিল। তার যেন চেতনা নাই···

জুবিলি এ-ভাব লক্ষ্য করিল। কহিল “শুনছো? কথাগুলো কানে গেল? না, এখনো পেনাল কোডের ধারা ভাবছো?”

শরৎ বলিল “যেতে হবে? কিন্তু···”

জুবিলি নিশ্বাস ফেলিল, বলিল “বেশ, তবে থাক্! এতদিন জানতুম, পৃথিবীতে আমার আর কেউ না থাকে, তুমি আছো! তাই তোমার কাছে যখন-তখন ছুটে আসি। বুঝেছি, তোমার ভালো লাগে না।···কেন লাগবে? সত্যিই তো, তুমি··· কিন্তু সে-কথা যাক! আজ থেকে জানলুম আমার কেউ নেই···আমি একা! আর আসব না শরৎদা। এতদিন তোমার কাছে এসে তোমায় কতো জ্বালাতন করেছি, আমার সে-অপরাধ ক্ষমা করো···”

জুবিলির স্বর গাঢ়।

কথাটা বলিয়া জুবিলি সত্যই গমনোদ্যত হইল। শরৎ থাকিতে পারিল না, ডাকিল “জুবি···”

জুবিলি ফিরিল।

শরৎ কহিল “ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি! তুমি···তোমার·· মানে···”

জুবিলি মনে মনে হাসিল; বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিল না। দু'চোখে প্রশ্ন আর কৌতূহল ভরিয়া শরতের পানে চাহিয়া রহিল।

সে-দৃষ্টির স্পর্শে শরতের মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল।

জুবিলি কহিল “মানে···কি? বলো···”

শরৎ অপ্রতিভ!

জুবিলি কহিল “আসি শরৎদা।···দুঃখ কর না, সত্যি। তুমি প্রায় আমায় উপদেশ দাও—আমি যেন তোমার সঙ্গে এ-রকম দেখা করতে না আসি। এ-উপদেশের মানে আমি বুঝি না, ভাবো? বুঝি। পাছে তোমার কলঙ্ক হয়, আমি বিধবা···আমার বয়স বেশী নয়···”

এ-কথায় শরৎ শিহরিয়া উঠিল। এবং এ-কথার পর জুবিলি আর দাঁড়াইল না—একেবারে আসিল দ্বারের কাছে।

দ্বারের বাহিরে পা দিয়াছে, শরৎ আসিয়া হাত ধরিল। কহিল “রাগ কোরো না···”

নিশ্বাস ফেলিয়া জুবিলি বলিল “রাগ নয় শরৎদা, মনে দুঃখ হয়েছে বড্ড, তাই চলে যাচ্ছি। সেজন্য তুমি উতলা হও কেন? আমি দুঃখ পাই নিজের দোষে—সেজন্য তোমাকেও দুঃখ দেব? সত্যি, তার কী অধিকার আমার আছে বল? অনধিকার-চর্চা করেছি কতখানি, আজ তা বুঝেছি···তোমার সুনাম আছে··· আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে এর পরে হয়তো তোমার বিয়ে হবে না!···আমি আর আসব না শরৎদা।”

কথার শেষে জুবিলি নিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

জুবিলির কথাগুলোয় দুঃখ, না শ্লেষ? সত্য, না বিদ্রূপ? শরৎ বুঝিতে পারিল না এবং না বুঝিয়া বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

জুবিলি আবার গমনের উদ্যোগ করিল। শরতের চমক ভাঙিল। শরৎ ডাকিল "জুবি··

জুবিলি ফিরিল, কহিল "কিছু বলবার আছে? নতুন কোন উপদেশ?"

—"না।···"

সবিস্ময়ে জুবিলি বলিল "না?"

শরৎ কহিল "কী যে তুমি বলো! কথায় কথায় অভিমান! এখন মানায় না। সত্যি, তুমি এখন আর সেই ছোটটি নেই···"

জুবিলির দু'চোখের দৃষ্টিতে হাসির ঝিলিক! জুবিলি কহিল "তারপর·· কি? বলো···"

শরৎ কহিল "বাড়ি যাও। গিয়ে গাড়ি বার● করতে বলো। আমি এখনি তোমার chaperon to Tipperary হবো। না না, to Calcutta···যাবো।"

কলিকাতায় বাইশটা দোকান তোলপাড় করিয়া রেডিও-সেট কেনা হইল, গ্রামোফোন রেকর্ড কেনা হইল, ব্লাউজপিস কেনা হইল। তারপর ড্রাইভারকে জুবিলি বলিল "ইম্পিরিয়াল···"

এ-সব জায়গা জুবিলির অজানা নয়। একদিন···

ইম্পিরিয়ালে আসিয়া শরৎ বলিল "একটা কথা মনে হচ্ছে···"

জুবিলি কহিল "বলো···"

শরৎ বলিল "বাড়ি ফিরে আজ থেকে আমি পরব শাড়ি, আর তুমি পরবে ধুতি!···তোমার গাইড হয়ে আমি এসেছিলুম, আসলে তুমিই আমার গাইড!···কেন যে আমাকে সঙ্গে এনেছিলে, বুঝতে পারছি না। যেখানে-যেখানে গেছ, সর্বত্র তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক!"

হাসিয়া জুবিলি কহিল "তোমার সঙ্গে আসবার ইচ্ছা হল। একা এলে এ সব কাজ হয় না। পরামর্শ করবার জন্য যোগ্য সঙ্গী থাকা চাই!···"

ডিশ আসিল। কফি···পেস্ট্রি···পুডিং···

তারপর বাহিরে আসিয়া জুবিলি কহিল "ভাল ফিল্ম আছে দেখছি—Reluctant Sinners···চমৎকার গল্প। চল শরৎদা, দেখে যাই। আবার কবে আসব···আসব কি, আসব না···"

শরতের মনের মধ্যে যেন কামান দাগিল! সন্ধ্যা হইতে দেরি নাই! এখন বায়োস্কোপে গেলে ফিরিতে যার নাম সেই রাত্রি সাড়ে নটা বাজিবে!

কিন্তু উপায় নাই!

রোমান্টিক ছবি।···

ছবি শেষ হইলে তুজনে মোটরে উঠিল। গাড়ি চলিল।

শরৎ কহিল "আর কিছু কাজ আছে?"

জুবিলি কহিল "কর্ম্মময় জগৎ। কাজের অভাব কি, বল! কি করতে চাও তুমি?"

শরৎ কহিল "আমি তো কাষ্ঠ-পুত্তলি···তোমার ইঙ্গিতে চলেছি।"

জুবিলি বলিল "তা যদি চলতে পারতে, ভাল করতে।···"

শরৎ এ-কথার জবাব দিল না; চুপ করিয়া রহিল।

জুবিলি কহিল "আচ্ছা। একচক্কর ঘুরে যাওয়া যাক সার্কুলার রোডের সীমানা পর্যন্ত। নাহলে ভাববে, আমি স্বার্থপর! নিজের কাজটুকু সেরে নিলুম···না?"

বাড়ি ফিরিতে সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া শরৎ দেখে, বাড়িতে হৈ-হৈ ব্যাপার!

সন্ধ্যার সময় মহালক্ষ্মী দেবী গিয়াছিলেন যোগীন্দ্র ঘোষালের বাড়ি। সেখানে ঘণ্টাখানেক থাকিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন বাড়ির ব্রুহাম-গাড়িতে চড়িয়া। পথে একখানা লরির হর্ন শুনিয়া ঘোড়াটা কেমন ভড়কাইয়া ওঠে এবং ক্ষেপার মত ছুটিতে গিয়া ল্যাম্প-পোস্টে ধাক্কা খাইয়া গাড়ি উলটাইয়া দিয়াছে। মহালক্ষ্মী দেবীর মাথায় চোট লাগিয়াছে এবং সেই চোটের যাতনায় তাঁর অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থা!

বাড়িতে ডাক্তার আসিয়াছে। লোকজনের ভিড়···কলরব···হৈ হৈ ব্যাপার।

বাড়ির খবর শুনিয়া শরতের তু'চোখ কপালে উঠিল। তাড়াতাড়ি ছুটিল মহালক্ষ্মী দেবীর ঘরে।

বিছানায় শুইয়া আছেন। মাথায়-মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; এবং পায়ের কাছে নর্মদা ও কাবেরী বিশুষ্ক-মলিন মুখে বসিয়া আছে। বহু আত্মীয়পরিজনে ঘর ভরিয়া গেছে। সে-ঘরে নাই শুধু অবনী।

শরৎ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···অনেকক্ষণ। তারপর প্রশ্ন করিল "কথা কয়েছেন?"

কথাটা কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া উচ্চারণ করে নাই। কেহ জবাব দিল না।

শরৎ আসিয়া তখন পিসীমার কাছে বসিল। ধীরে ধীরে পিসীমার হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল। কাবেরী ও নর্মদা তু'পায়ে হাত বুলাইতেছিল। তাদের পানে চাহিয়া শরৎ প্রশ্ন করিল "জ্ঞান হয়েছে?"

নর্মদা কহিল "হয়েছে। কথা কয়েছেন।"

শরৎ চারিদিকে চাহিল। তারপর কহিল "দাদাকে দেখছি না?"

ভিড়ের মধ্য হইতে কে জবাব দিল "না। অবু জানে না। সে কলকাতায় গেছে। কাল সন্ধ্যার সময় ফেরবার কথা।"

শরৎ প্রশ্ন করিল "ডাক্তার কি বললেন? বেশী জখম?"

সেই লোকই জবাব দিল "না। সামান্য কেটে গেছে। তবে শকটা খুব বেশী।"

শরৎ কহিল "পুনর্জন্ম হয়েছে! গাড়িতে কোন্ ঘোড়া ছিল?"

জবাব হইল "কালো ঘোড়া। যে-ঘোড়া ওঁর গাড়িতে জোতা হয়।"

মোটর আছে; কিন্তু মহালক্ষ্মী দেবী কখনো মোটরে চড়েন না। সাবেক ব্রুহাম তাঁর বাহন। বলেন "না বাপু, চিরজন্ম ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যখন কাটলো, তখন তোদের একালের মোটরে নাই চড়লুম!"

অবনী অনেকবার বলিয়াছে "ঘোড়া-গাড়ি বেচে দাও মা।···ভগবানের জীব··· মুক্তি পাক্। কেন মিছে গাড়িতে বেঁধে কষ্ট দি!"

হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী জবাব দেন "যতদিন আমি আছি, ঘোড়া থাকবে। ঘোড়া বেচে দিবি, তারা যদি অযত্ন করে? যদি দিন-রাত খাটায়? না বাপু, সে আমার ভালো লাগবে না!"

সে-রাত্রে কাবেরী এ-বাড়িতে রহিয়া গেল। নর্মদা বলিল "ও এখানে থাক্। এ-বাড়ির বৌ হবে তো! এ-সময়ে যদি সেবার অধিকার না পেলো, তাহলে ওর সব মিথ্যা হবে।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ঠিক কথা।"

মহালক্ষ্মী দেবী এ-কথা শুনিলেন, বলিলেন "ছেলেমানুষ!···কষ্ট হবে মা। ওকে বাড়ি নিয়ে যাও।"

কাবেরী গেল না। মহালক্ষ্মীর পায়ে হাত রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল "আমি থাকবো।"

মহালক্ষ্মী দেবী খুশী হইলেন, বলিলেন "এর মধ্যেই আমার উপর মায়া হয়েছে! বেশ, থাকো। বড় খুশী হলুম মা। কিন্তু রাত জাগবার দরকার নেই। শরৎ আছে ···রাত জাগবে। তোমার জাগবার দরকার হবে না। তুমি ঘরে খাটে শুয়ে ঘুমোবে।"

কাবেরী শুইল না; সারারাত্রি মহালক্ষ্মী দেবীর গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কাটাইয়া দিল। সঙ্গে জাগিল শরৎ।

সকালের দিকে মহালক্ষ্মী দেবী ডাকিলেন "মা···"

কাবেরী বলিল "আপনার মুখ-হাত ধোবার জল আনি।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "লোকজন আছে, তারা আনবে। তুমি আমার কাছে বসো।"

শরৎ বলিল "বড্ড যাতনা হচ্ছে পিসীমা?"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "হচ্ছে বৈ কি বাবা!"

শরৎ কহিল "দুর্গ্রহ! এই জন্যই ঠাকুর-দেবতার ওপর বিশ্বাস থাকে না পিসীমা। তুমি শুধু ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছো, আর তোমারি কিনা এত বড় বিপত্তি!"

মৃদু হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "নিশ্চয় কোন অপরাধ করেছি। কিংবা তাঁর কোনো উদ্দেশ্য আছে এতে! নাহলে এমন হবে কেন বাবা?"

শরৎ কহিল "তোমার অপরাধ, পিসীমা!···তুমি ঠাকুর-দেবতার দিক নিয়ে যত ওকালতিই করো, তাঁদের কসুর তাতে কাটবে না। আমার বিচারে তাঁদের আমি দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেবো।"

হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন, "কি সাজা দিবি? জরিমানা? না, জেল?"

শরৎ কহিল "রায় এখন মুলতুবি রইলো। বিবেচনা করে শাস্তির ব্যবস্থা করবো।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "সেই ভালো। যদি ঠাকুর-দেবতার জরিমানা করিস, তাহলে আমায় কিছু খেসারত দিস।"

শরৎ কহিল "নিশ্চয়! Compensationএ তোমার দাবি আছে।"

সারাদিনটা মন্দ কাটিল না। কাবেরী রহিয়া গেল। মহালক্ষ্মী দেবী বারবার বলিলেন "তুমি বাড়ি যাও মা, তোমার অসুবিধা হচ্ছে। আবার না হয় এসো। আমি তো ভালো আছি।"

কাবেরী বলিল "ভালো কৈ। জ্বর হয়েছে।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "শোনো মেয়ের কথা। এত-বড় কাণ্ড হলো, জ্বর হবে না? এ ভয়ের জ্বর নয়···তাড়সের জ্বর।"

কাবেরী তবু গৃহে ফিরিল না। সেবা-পরিচর্যার কাজে শরতের পাশে রহিল। দু'জনের সেবায় দুশ্চিন্তা ঘুচিয়া সহজভাবে কোথা দিয়া সময় কাটিয়া গেল, কাবেরী বুঝিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় অবনী ফিরিল। মায়ের কথা শুনিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিল মহালক্ষ্মী দেবীর কাছে। ডাকিল "মা···"

কাবেরী বসিয়া মহালক্ষ্মী দেবীর গা টিপিয়া দিতেছিল···একটু দূরে ইজি-চেয়ারে শরৎ বসিয়া আছে। দুচোখের দৃষ্টি দিয়া সে কাবেরীকে দেখিতেছিল। মনের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে! কাবেরীকে এত ভালো লাগিতেছিল।

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "অবু!···আয়···"

অবনী আসিয়া মায়ের বিছানায় বসিল! ঝুঁকিয়া মায়ের মুখের উপর পড়িয়া বলিল "আমার গা কাঁপছে···"

হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "মাকে যে দেখতে পেলি, তোর ভাগ্য ভালো! না হলে যা হয়েছিল, মায়ের সঙ্গে আর দেখা হতো না!"

অবনীর বুক দুলিয়া উঠিল।

অবনী কহিল "এখন কেমন আছো?"

—"ভালো।"

অবনী চাহিল কাবেরীর পানে, প্রশ্ন করিল "জ্বর আছে?"

কাবেরী কহিল "সামান্য একটু হয়েছে। ডাক্তার শশধরবাবু বললেন এতে জ্বর বেশী হবার কথা! তার তুলনায় এ-জ্বর কিছুই নয়।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "ভাগ্য-গুণে এ ব্যাপার হয়েছিল অবু···তার ফলে আমার মস্ত লাভ হয়েছে রে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিয়া অবনী কহিল "লাভ !"

কাবেরীর হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "মস্ত লাভ ! মা-হারা আমি মা পেয়েছি ! আমার কাবেরী-মা ! মায়ের আমার কি সেবা···কি যত্ন ! যে-মার পেটে জন্মেছি, সে-মা যা করতো, আমার কাবেরী-মা তার এতটুকু কম করেনি !"

প্রীতির উচ্ছ্বাসে অবনীর মন ভরিয়া উঠিল। সস্মিত দৃষ্টিতে অবনী চাহিল কাবেরীর পানে। লজ্জায় কাবেরী মুখ নত করিল। তার দুই গালে তখন গোলাপ ফুটিয়াছে !

কাবেরী দু'তিন দিন এ-বাড়িতে রহিয়া গেল। মহালক্ষ্মী দেবীর ব্যস্ততার সীমা নাই। কবে বেচারীর বিবাহ হইবে, সেজন্যে এখন হইতে এ কি দুর্ভোগ তার !

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এর মধ্যেই এ-বাড়ির ওপর ওর মায়া পড়েছে, দেখছেন না ! আমি বললুম বাড়ি চলো দিদি—তাতে আমাকে জবাব দিলে, উনি সেরে উঠলেই যাবো।"

নর্মদা বলিল "যে-ভয় হয়েছিল, সত্যি। আমাদের দেশে কথা আছে, বৌয়ের পয়-অপয় !"

হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "অমন কথা মনে এনো না মা। আমার যে চোট্ লাগলো, তার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই ! যদি না বাঁচতুম, তা হলে কি ওর পয়-অপয়ে তা হতো ? না, মা। নিজের পয়-অপয়ে মানুষের ভালো-মন্দ হয়—পরের পয়-অপয়ে নয় !"

যোগীন্দ্র ঘোষাল চাহিলেন কাবেরীর পানে। কাবেরী ঘরে বসিয়া বেদানার দানা ছাড়াইতেছিল। যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "রাত হলো, আমরা আসি। তুমি তাহলে এইখানেই থাকো !"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "বেশ থাকবে'খন ! আমারো···তা মিছে বলবো না,··· দু'দিনে এমন হয়েছে, ও চলে গেলে আমার যেন বাঁচা দায় হবে ! পড়ে-পড়ে তাই আমি ভাবি···"

নর্মদা কহিল "বেশ তো, সেরে উঠুন, সেরে উঠে একটা দিন দেখিয়ে ঠিক করুন—এইখানেই ওর কায়েমিভাবে থাকার। এখান থেকে কে ওকে নিয়ে যেতে চায় ? আমি তো চাই না !"

এমনি সহজ হাসি-কথার মধ্য দিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল নর্মদাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

কাবেরী বিছানায় বসিয়া মহালক্ষ্মী দেবীর পায়ে হাত বুলাইতেছিল, মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "একটু জিরোও দিকিনি মা। চব্বিশ ঘণ্টা এমন পুতুলের মতো আমার কাছে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকলে বাঁচবে কেন ? ওঠো, যাও···ও-ঘরে অনেক বই আছে, পড়োগে।"

কাবেরীকে উঠিতে হইল। মহালক্ষ্মী দেবী ছাড়িলেন না।

হু'তিনটা ঘরের পর বড় ঘর। লাইব্রেরী। তার অর্থ, খুব একটা গবেষণার ব্যাপার নয়। কটা কাচের আলমারি আছে। আলমারিগুলা বাংলা বইয়ে ঠাসা। আদিযুগের *বঙ্গদর্শন*, *প্রচার* মাসিক-পত্র হইতে শুরু করিয়া একালের গল্প-কবিতার বই, কোনটা বাদ নাই। এ-বাড়ির সনাতন নিয়মে কলিকাতার বড়-বড় পাবলিশাররা নূতন বই ছাপিয়া বাহির হইলেই ভি-পি ডাকে পাঠাইয়া নগদ মূল্য আদায় করিয়া লয়। বই আসে। কোনটা কেহ পড়ে ; কোনটা না-পড়া অবস্থাতেই লাইব্রেরীর আলমারিতে গিয়া জমা হয়। লাইব্রেরীর ক্যাটালগ আছে। মোটা খাতায় সব বইয়ের নাম লেখা হয়। এ কাজ করেন পুরাতন সরকার মহাশয়। এটি তাঁর ডিউটির অন্তর্গত।

মহালক্ষ্মী দেবীর তাড়ায় কাবেরী আসিল লাইব্রেরী-ঘরে। আলমারি খুলিয়া বই বাহির করিবে, এতখানি স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারিল না। টেবিলের উপর একখানি বাংলা বই পড়িয়াছিল—মাসিক-পত্র। সেখানা খুলিয়া কাবেরী তার একটা পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিল।

পড়া হইল না। বইয়ের পাতা খুলিয়া এ হুদিনে এ-বাড়ীর যাহা যাহা চোখে পড়িয়াছে, সেই-সবের কথা ভাবিতে লাগিল।

অবনীর কেমন যেন এক ধরন! ঝড়ের মত সহসা আসিয়া উদয় হয়, আবার কখন না বলিয়া হুম্ করিয়া চলিয়া যায়, হুদিন কোন পাত্তাই মেলে না! মায়ের কাছে যেভাবে আসিয়া বসে, যেন ছোট-বয়সের ছেলে! আবদার, অভিমান, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ! মা ছেলেকে বুঝান, ছেলেও চট্ করিয়া বুঝিয়া চলিয়া যায়। কোনদিন মায়ের একটু সেবা করিতে বসা, বা মায়ের মাথায় একটু হাত বুলানো কিংবা ডাক্তার আসিয়া কি দেখিল, দেখিয়া কি বলিল, সে-সবের সন্ধান লইতে দেখিল না! কোথায় কখন থাকে, কোথায় যায়,···যেন রহস্য!

আর এই শরৎ। চব্বিশ ঘণ্টা মহালক্ষ্মী দেবীর পায়ে-পায়ে আঁটিয়া আছে। তাঁর সেবা করা···রাত্রে মশারি ফেলা হয় না, কোথায় একটা মশা উড়িতেছে পাছে তার দংশনে মহালক্ষ্মী দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সেজন্যে একেবারে অধীর আকুল হইয়া থাকে! কাবেরীর উপরও কি গভীর দরদ! কোনদিন রাত্রি বারোটার পর জাগিয়া থাকিতে দেয় নাই। কাবেরী অনুযোগ করিলে শরৎ বলে "না, তা হবে না। যখন এবাড়িতে বৌ হয়ে আসবেন, তখন যা খুশী করবেন। সম্পর্কে গুরুজন হবেন, তখন কোন কথা বলবো না। তখন সকলের ভার নেবেন, সকলকে দেখবার অধিকার হবে শুধু আপনারই। এখন হুটো দিন ধৈর্য ধরে আমাদের সুযোগ দিন, কর্তব্য-কাজ করি।"

কথায় সহজ সহাস ভঙ্গী! পিসীমার সমস্ত মন এই লোকটি কিভাবে জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ-হুদিনে কাবেরীর তাহা জানিতে বাকী নাই। এবং ইহাও সে বুঝিয়াছে যে পিসীমার মন জুড়িয়া বসিবার যোগ্যতা ও অধিকার শরতের আছে পূর্ণ মাত্রায়।

শরৎকে তারও তবু ভালো লাগিয়াছে। শিশুর মত সরল মন। হুদিনের পরিচয়ে মনে হয়, তাকে যেন কত কাল ধরিয়া জানে!

এমনি নানা কথায় কাবেরীর মন ভরিয়া আছে, সহসা তার মাঝখানে শরৎ আসিয়া কহিল "এই যে বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে···ভগবতী ভারতী দেবী···নমস্তে!"

মৃদু হাসিয়া কাবেরী কহিল "আপনার ভুল হলো! হাতে পুস্তক আছে বটে, কিন্তু বীণা নেই! বীণা থাকলে ভারতী দেবী বলে তামাশা করতে পারতেন!"

শরৎ বলিল "বীণা হাতে না থাকলেও কণ্ঠে আছে!···সে পরিচয় আপনি জানেন।"

সবিস্ময়ে কাবেরী কহিল "তার মানে?"

শরৎ কহিল "মানে, বেলা তখন দুটো বেজেছে, অবুদা বেরিয়ে গেলে ওপরে এলুম। পিসীমার ঘরের বাইরে থেকে শুনলুম, ঘরে যথাসম্ভব মৃদুকণ্ঠে গান চলেছে

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে!

বাইরে দাঁড়িয়ে গান শুনলুম। শুনে ঘরে প্রবেশ করা হলো না! আবার নীচেকার বৈঠকখানায় চলে গেলুন।

লজ্জায় কাবেরীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে কোন কথা বলিল না। শরৎ কহিল "চমৎকার গলা আপনার। রবীন্দ্রনাথের গান আরো দুচার কণ্ঠে শোনবার সুযোগ আমার মিলেছে এর আগে, কিন্তু এমন!"

সলজ্জ পুলকে কাবেরী কহিল " 'শুনি নাই, কভু শুনি নাই!'···না?"

মাথা নাড়িয়া শরৎ কহিল "তাই।···"

কাবেরী খুব আনন্দ বোধ করিল। প্রশংসায় কার না আনন্দ হয়?

শরৎ কহিল "এখন কি পড়া হচ্ছে?"

কাবেরী কহিল "পড়িনি···বই খুলে বসে আছি। আপনার পিসীমা জোর করে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে বসে বসে দু'একখানা বই নিয়ে পড়ো।"

বন্ধ আলমারিগুলার পানে চাহিয়া শরৎ কহিল "কি বই চান, বলুন—বার করে দি।"

কাবেরী কহিল "বই চাই না। তার কারণ, পড়বার ইচ্ছা নেই!"

শরৎ কহিল "দুদিনে যা দেখলুম, আপনার নিজের কোনও বিষয়ে কোন ইচ্ছা আছে, এমন পরিচয় পাইনি! তাই ভাবি, সত্যি, লেখাপড়া শিখে পাস করে' আমাদের দেশের মেয়েরা যদি এমন পুতুল বনে থাকেন, তাহলে লেখাপড়া শিখে লাভ?"

হাসিয়া কাবেরী কহিল "আমার ভাগ্যে কোন লাভই হলোনা কোনদিন। তামাশা করছি না···অহংকারও করছি না। সত্যি। আমার পড়ার একটা mood আসে···যতক্ষণ সে-mood না আসবে, আপনি বিশ্ব-সাহিত্য এনে সামনে ধরে দিন, আমি পুতুলের মত চুপচাপ বসে থাকবো···বইয়ে হাত দেবো না!"

শরৎ কহিল "তাইতো! তাহলে কি করবেন বলুন তো?"

কাবেরী কহিল "জানি না। আপনিই বলুন কি করা যায়! আপনার পিসীমা তো এখন কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ও-ঘরে থাকতে দেবেন না, বলেছেন।"

শরৎ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; কোন কথার জবাব দিল না। নির্নিমেষ নেত্রে এই কিশোরীর পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

কাবেরী আশ্চর্য বোধ করিল। কহিল "বলুন···একটা পরামর্শ দিন।"

শরৎ কহিল "পরামর্শ দিতে পারি···যদি অভয় দেন !"

—"অভয় !" কাবেরীর গায়ে রোমাঞ্চ-রেখা।

শরৎ বলিল "হ্যাঁ, অভয়।"

কাবেরীর কৌতুহলের সীমা নাই। কাবেরী কহিল "দিলুম অভয়। বলুন কি বলবেন···"

শরৎ কহিল "যদি একখানা গান···"

লজ্জায় কাবেরী কাঁপিয়া উঠিল। কহিল "না, না! কি যে আপনি বলেন! তার চেয়ে আপনি বরং গান করুন !"

—"আমি !" শরৎ কহিল "ভগবান আমাকে যে-কণ্ঠ দিয়েছেন, সেটি শুধু ভোজ্য-পানীয় গ্রহণ করতে পারে। আর কোন গুণ নেই তার। সত্য কথা বলছি···অকপট সত্য। আপনি বিশ্বাস করুন।"

কাবেরী কহিল "তবে আর কি করা যায়! আচ্ছা, যদি-আপত্তি না থাকে, আপনাদের এ-বাড়ির ইতিহাস একটু বলবেন ?"

শরৎ কহিল "ইতিহাস ?"

কাবেরী কহিল "হ্যাঁ। এ-বাড়িতে দুদিনে এত বৈচিত্র্য দেখছি···আমার ভারী চমৎকার লাগছে। অপরূপ শান্তি! মনে-মনে সব চমৎকার মিল। কারো কাজে যেমন বিধি-নিষেধ নেই···যার যা ইচ্ছা হচ্ছে তাই করছে, আর সেজন্য কোনখানে বিশৃঙ্খলা বা বিরোধ জাগছে না যেমন, তেমনি- অনাচারও দেখি না, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সয়ে চলেছে। . বেশ শান্তভাবে! এমন আমি কোথাও দেখিনি বা দেখবার কল্পনা করিনি !"

শরৎ বলিল "যা বলেছেন, সত্যি তাই! এ-বাড়িতে এত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে এই শৃঙ্খলা আর মিল, সকলকে সকলে আশ্চর্যভাবে সয়ে বাস করছে···বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, এ শুধু ঐ একজনের মহিমায়! আমার পিসীমার গুণে! সত্যি, ওঁর মত লোক আমি কখন দেখিনি···কোন বইয়েও এমন লোকের কথা পড়িনি !···এ-বাড়ির কাহিনী সত্যই ইতিহাসের মত। লোকে নানা খেয়াল নিয়ে এসেছে, গেছে, কাজ করেছে। এ-বাড়ির বৈচিত্র্য আপনিও লক্ষ্য করেছেন! আমিও বলছি দু'চারটে কাহিনী, যা জানি···মানে, পুরাতন তত্ত্ব এবং আধুনিক তত্ত্ব···কিন্তু এই ঘরে বসে শুনবেন ?"

কাবেরী শরতের পানে চাহিল।

শরৎ বলিল "তার চেয়ে ঐ পাশের ঘরে চলুন। দিব্যি জ্যোৎস্না ছাদে বসে বসে সে-কাহিনী শুনবেন !"

পরের দিন···বেলা তখন পাঁচটা বাজে। শরৎ খিড়কির পুকুরে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল। মহালক্ষ্মী দেবীর জন্য কাবেরী আজ স্বহস্তে মোহনভোগ তৈরি করিয়াছে। তিনি যাচিয়া কাবেরীর হাতের খাবার খাইতে চাহিয়াছেন, সেজন্য কাবেরীর আনন্দের সীমা নাই!

মহালক্ষ্মী দেবীর খাওয়া হইলে তিনি বলিলেন "তোমার নিজের জন্য রেখেছো তো মা?"

হাসিয়া কাবেরী বলিল "নিশ্চয়।"

—"শরতের জন্যে রেখেছো? ও মোহনভোগ খেতে ভালবাসে।"

কাবেরী কহিল "রেখেছি।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "তোমরা দুজনে খেয়ে নাও। এখনি খাবে। পরে খাবে বলে ফেলে রেখোনা, বুঝলে···"

কাবেরী কহিল "বুঝেছি।"

—"শরৎ বাড়ি আছে?"

—"আছেন। খিড়কির পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরছেন। আমার কাছ থেকে ময়দা চেয়ে নিয়ে গেছেন।"

হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "খেয়াল! কখন কি মাছ ধরেছে ও? মাছ ধরতে জানেও না!···তুমি তাহলে সেইখানেই ওর খাবার পাঠিয়ে দাও, মা।··· আমাকে চৌকি দিতে হবে না। আমি তো উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি···আবার মানুষ হয়েছি!"

কাবেরী চলিয়া যাইতেছিল,···মহালক্ষ্মী দেবী ডাকিলেন।

কাবেরী ফিরিল।

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "আগে তোমার মোহনভোগটুকু খেয়ে নাও, দেখি। আমার কাছে বসে খাবে। নিয়ে এসো এখানে। আমি দেখবো।"

সলজ্জ মৃদু হাস্যে কাবেরী কহিল "আমি খাবো'খন। সত্যি বলছি।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "'খন' খেতে হবে না, এখন খাবে, আর আমার সামনে।"

কাবেরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার লজ্জা করিতেছিল।

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "আমার কি সাধ যায় না, আমার ছোট্ট মার খাওয়া দেখতে? এতে লজ্জা কি! যাও মা, নিয়ে এসো···এসে আমার সামনে বসে খাও। আমি ভারী খুশী হবো। তারপর তোমার খাওয়া হলে শরতের খাবার তুমিই নিয়ে যেয়ো। কেমন?"

এ কথা না রাখিয়া উপায় নাই। কাবেরীকে খাইতে হইল।

তারপর প্লেটে করিয়া শরতের জন্য মোহনভোগ ও কাটা ফল লইয়া কাবেরী পুকুর-ঘাটে চলিল।

জলে ছিপ ফেলিয়া শরৎ বসিয়া আছে। তার পাশে বসিয়া জুবিলি।

জুবিলি বলিতেছিল "আমার সঙ্গে মিশতে হলে তোমার সর্বাঙ্গে কাঁটা ফোটে, না শরৎদা ? আর ঐ রূপসী কিশোরী···ওঁর সঙ্গ তো এক-মিনিট ছাড়তে পার না !··· দেখেছি তো, খুড়িমাকে দেখতে এসেছি মাঝে মাঝে···তোমাদের দুটির পানে লক্ষ্য রাখতে ভুলিনি···"

শরৎ বলিল "কি যে বলো জুবি ! ছি ! ওঁর সঙ্গে অবুদার বিয়ে হবে, মনে রেখো।"

জুবিলি কহিল "জানি। বোঠান ! গল্প উপন্যাস পড়ি। বোঠানের সঙ্গে সম্পর্ক যে কত মধুর, তা আমার জানা আছে ! তুমি বলতে চাও ওঁর সঙ্গে flirting চলে না তোমার ?"

—"জুবি···"

শরতের স্বর বেশ কঠিন।

জুবিলি বলিল "চুপ করো। আমার মুখের পানে চাও তো দেখি। বলো তো আমার পানে চেয়ে, ওকে তুমি ভালোবাসো না ? গল্পের নায়ক-নায়িকা যেমন ভালোবাসে !"

শরৎ কহিল "তুমি পাগল···তাই এমন কথা বলছো !"

—"ওকে ভালোবাসো না তুমি ?"

শরৎ কহিল "তুমি চলে যাও এখান থেকে।"

জুবিলি কহিল "বাস্‌রে, মনের কথা টেনে বলেছি···অমনি আঁতে ঘা লেগেছে ! একেবারে ফোঁস-কেউটে ! কুলোপানা চক্কর !"

এই কথার মধ্যে খাবারের প্লেট হাতে কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী কহিল "কটা মাছ ধরলেন ?"

শরৎ চমকিয়া কাবেরীর পানে চাহিল ; সেই সঙ্গে চকিতের জন্য জুবিলিকেও একবার লক্ষ্য করিয়া লইল।

তারপর কথা কহিল ; বলিল "কই আর মাছ ধরলুম ? কী ময়দা দিলেন, খেয়ে খেয়ে মাছগুলো আমাকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি পালাচ্ছে !"

কাবেরী কহিল "কথনো মাছ ধরেছেন ? না, ছিপ নিয়ে এই হাতে-খড়ি ?"

জুবিলি চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যঙ্গ স্বরে বলিল "ছিপ নিয়ে ঘোরেন চিরকাল—মাছ গাঁথতে পারেননি কথনো ! তবে এবারে আশা আছে, ছিপ ফেলা মিথ্যা হবে না !"

এ ছিপ ফেলার অন্তরালে যে গূঢ় অর্থ, শরৎ তাহা উপলব্ধি করিল ; এবং উপলব্ধি-মাত্র শরতের গায়ে কাঁটা দিল।

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল, "ও কি হচ্ছে জুবি !" তারপর কাবেরীর পানে চাহিয়া বলিল "ওর নাম জুবিলি। আমার সকল কাজে আমাকে ঠাট্টা করে।"

জুবিলি কহিল "বটেই তো ! এ পর্যন্ত কোন্ কাজটা তুমি মানুষের মতো করেছো বলো তো শরৎদা !"

শরৎ কহিল "তা সত্যি। আমার জীবনটাই মস্ত ভণ্ডুল চক্র!"

কাবেরী এ সব রঙ্গ-রহস্যের মর্ম বুঝিল না; কহিল "আপনি খাবার খেয়ে নিন। আপনার পিসী বললেন।"

শরৎ কহিল "হাত জোড়া—খাবো কি করে? ভগবান যদি আরও দুটো হাত দিতেন, তাহলে তৃতীয় হাতে প্লেট ধরে চতুর্থ হাতের সাহায্যে মুখে খাবার তুলতুম।"

কাবেরী কহিল "মাছ তো ধরা পড়ছে না···ছিপ না হয় একটু রেখে দিলেন! খেয়েদেয়ে তারপর গায়ে জোর করে আবার ছিপ ফেলবেন!"

শরৎ কহিল "বটে, আপনিও জুবির মত তামাশা করছেন! তবে আমারও পণ, মাছ না ধরে আর কোন কাজে মন দেবো না। ন খাদ্যায় চ!"

কাবেরী চাহিল জুবিলির পানে, সহায়তা প্রার্থনার ভঙ্গীতে। বলিল "তাহলে আপনি বলুন···মোহনভোগ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সে আর খাবার পদার্থ থাকবে না।"

তাচ্ছিল্য-ভরা দৃষ্টিতে কাবেরীর পানে চাহিয়া জুবিলি বলিল "তার চেয়ে আপনি ড্যালা পাকিয়ে ওকে গিলিয়ে দিন···পাখিকে যেমন করে খাওয়ায়, তেমনি ভাবে।"

শরৎ কহিল "চমৎকার আইডিয়া! তা যদি করেন, আঃ অশেষ ধন্যবাদ দেবো।"

যে-রকম অসহায়ের মত শরৎ এ-কথা বলিল, কাবেরী মমতা বোধ করিল। ইচ্ছা হইল, খাওয়াইয়া দেয়। হয়তো দিত, কিন্তু জুবিলি আছে বলিয়া লজ্জা বোধ করিল।

শরৎ কহিল "দিন খাইয়ে। না হলে ও-বস্তু কাই হয়ে যাবে। তখন আমার মুখে দিলে গলা এঁটে বাক্য বন্ধ···কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ!"

জুবিলির কৌতুকের লোভ হইল; সেই সঙ্গে আরও কিছু। কাবেরী দেখিতে ভাল ···কথাবার্তা চমৎকার, এবং তার উপর শরতের যে ভক্তি সে লক্ষ্য করিয়াছে···ঠেস দিয়া একটা কথা বলিতে শরৎ যে ভাবে ফোঁস করিয়া উঠিল···

জুবিলি কহিল "দিন না খাইয়ে। এতে লজ্জা কি!"

কাবেরীর কি মনে হইল। কাবেরী বলিয়া বসিল "আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমার চেয়ে আপনি বয়সে বড়···"

কথাটা জুবিলির গায়ে বাজিল। জুবিলি বলিল "ও···বটে। অন্যায় হয়েছে। আমি বর্ষীয়সী!···তা তোমার বয়স কত হবে? এখনো বিয়ে হয়নি দেখছি···কত বয়স? বারো? না, তেরো?"

এ-কথায় কাবেরী যেন মরিয়া গেল! সে মাথা তুলিতে পারিল না; চুপ করিয়া রহিল।

শরৎ রাগ করিল, কহিল "এ-কথার মানে কি জুবি?"

জুবিলি কহিল "যে ভাবে তোমার বোঠান কথাটা বললেন, তাতে আমি চমকে উঠলুম। মনে হলো, আমার বয়স যেন চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর!···সত্যি তো তা নয়।··· তুমিই ওঁকে বলে দাও শরৎদা, তোমার চেয়েও আমি বয়সে ছোট···বড় নই।"

শরৎ কহিল "তোমার ঝগড়াটে স্বভাব কোনদিন গেল না! আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করো, মানায়। তা বলে নতুন লোকের সঙ্গে? যাকে চেনো না, জানো না···"

জুবিলির লজ্জা নাই, সংকোচ নাই। জুবিলি বলিল "আমার সঙ্গে জানা নেই চেনা নেই, কে বললে? আমি ওঁকে জানি···ওঁকে চিনি। খুড়ীমার সেবা করতে দেখেছি ওঁকে। শুনলুম, অবুদার সঙ্গে বিয়ে হবে,—তোমার বোঠান হবেন উনি। এর বেশী যা জানবার, সেটুকু জানবো বিয়ের পরে। তবে হ্যাঁ, আমাকে উনি জানেন না!··· আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি···শোনো ভাই, আমার নাম জুবিলি। আমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু কোষ্ঠীর এমন জোর যে স্বামী-বেচারা টিঁকতে পারলো না।"

যে-রকম তাচ্ছল্যের সহিত জুবিলি এ-কথা বলিল, কাবেরী শিহরিয়া উঠিল। বিস্মিত নির্বাক দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল জুবিলির পানে।

জুবিলি বলিল "নাও, এখন পরিচয় হলো তো···আর লজ্জা নয়। শরৎদাকে খাইয়ে দাও···না হলে ওর সত্য ভঙ্গ হবে।"

কাবেরীকে খাওয়াইয়া দিতে হইল।

শরৎ করিল "চমৎকার হাত দেখছি। মোহনভোগটার উপর আমার প্রীতি চিরদিন, কিন্তু এখানকার বামুন এমনভাবে এ-বস্তু তৈরি করতো, দায়ে পড়ে এর নাম বদলে আমি নাম দিয়েছিলুম "মনভোগান্তি"। উড়ে-বামুন সার্টিফিকেট পেয়ে মহাখুশী!"

তারপরে তিনজনে বসিয়া হাসি-গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে ছিপ রাখিয়া শরৎ কহিল "পরিশ্রম হলো এতখানি, অথচ···"

হাসিয়া জুবিলি বলিল "অপব্যয় নয় শরৎদা···শেষ ফলটা যা হলো, চার্মিং! কি বলো বোঠান?"

এ ঠাট্টা কাবেরীর ভালো লাগিল না। কাবেরী চুপ করিয়া রহিল।

শরৎ কহিল "আপনি কথা কবেন না, বাড়ি যান। পিসীমার হয়তো দরকার হবে। সন্ধ্যা হয়েছে!"

কাবেরী বাঁচিয়া গেল। তখন জলখাবারের রেকাবি ও গেলাস লইয়া চলিয়া আসিল।

কাবেরী চোখের আড়ালে গেলে জুবিলির পানে চাহিয়া শরৎ কহিল "তুমি বড় দুষ্টু···"

জুবিলি কহিল "চিরদিনই তো ও-কথা শুনে আসছি তোমার মুখে। শিষ্ট হতে দিলে কৈ?"

সেই এক ইঙ্গিত! শরৎ কহিল "এখন চলো! মাছ ধরা যা হলো···"

হাসিয়া জুবিলি কহিল "ধরবার শক্তি থাকা চাই। শুধু ছিপ হাতে দিন কাটালে চলে?"

এ-কথার উত্তরে শরৎ কোন কথা বলিল না, ছিপ লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

জুবিলি দাঁড়াইয়া দেখিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাহিরে গলি-পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইবামাত্র একজন সাহেবী-পোশাক-পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি।

ভদ্রলোক কহিল "শ্রীমতী জুবিলিপ্রভা দেবী! আরে বাঃ! গুড ইভিনিং!"

ভদ্রলোককে দেখিয়া জুবিলি কাঁপিয়া উঠিল। কোনমতে কম্পিত স্বরে বলিল "তপনবাবু!"

—হ্যাঁ। মনে আছে তা হলে? আমার সৌভাগ্য!"

জুবিলি কহিল "এখানে?"

তপন বলিল "অবু ধরে নিয়ে এলো। হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা রেসকোর্সে! বললে, চলো শ্রীরামপুরে। এলুম।"

জুবিলি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তপন বলিল "শ্রীরামপুরে শুধু অবুর কথাতেই এসেছি, তা নয়। উদ্দেশ্যে ছিল। সে-উদ্দেশ্য তোমার সঙ্গে দেখা করা! ···নানা হাঙ্গামায় এ-দেশ ও-দেশ করে বেড়ালেও তোমার কথা আমার মন থেকে নিমেষের জন্যে বিলুপ্ত হয়নি!"

জুবিলি কহিল "আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি বিধবা।"

তপন কহিল "সে-কথা ভুলিনি বলেই তোমাকে ভোলা আমার পক্ষে আরও শক্ত হয়েছে!"

জুবিলির আকাশে হঠাৎ কালো মেঘের উদয়! বাড়ি আসিয়া নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে সে পড়িয়া রহিল।

ঘরে আলো নাই। মনের উপর অতীত দিনের কতকগুলো স্মৃতি দৈত্যের ছায়া-দেহ লইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল! এই তপন···বিল্বনাথের বন্ধু। জুবিলির সঙ্গে প্রথম দেখা বিল্বনাথের গৃহে! সে দেখায় কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না বৈচিত্র্যও ছিল না। নির্জনে নিরালায় জুবিলির দিন যেন তখন কাটিতে চায় না! স্বামীর ঘর যেন জতুগৃহ! প্রতি-নিমেষে দেহে-মনে অগ্নিদাহ জ্বালা! শরতের স্মৃতিটুকুকে সম্বল করিয়া কোনমতে সে পড়িয়া ছিল! সেই সময় এই তপন আসিয়া দেখা দিল জুবিলির জীবনপথে। অসাধারণ দরদ! পলকে তপন বুঝিয়া লইল জুবিলির দুঃখ কি, এবং সে দুঃখ কোথায়! সে-দুঃখে তপনের মায়ায়-দরদে এতটুকু কৃপণতা ছিল না! তারপর···

পলে পলে জ্বলিয়া পুড়িয়া জুবিলির মন যখন আক্রোশে ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন···

সেদিনের সমস্ত কথা কালো মেঘের মত উদয় হইয়া জুবিলির মনকে ছাইয়া ফেলিল। এখনি যেন প্রলয়-ঝড় উঠিবে! এবং সে ঝড়ে কি না ঘটিবে···ভাবিয়া জুবিলি কূল-কিনারা পাইল না!

কতক্ষণ ইজিচেয়ারে পড়িয়া আছে, খেয়াল নাই। সহসা বেয়ারা আসিয়া ডাকিল "দিদিমণি···"

নিশ্বাস ফেলিয়া জুবিলি বলিল "রাজু?"

বেয়ারা বলিল "হ্যাঁ।"

জুবিলি উঠিয়া বসিয়া, কহিল "কি চাই?"

রাজু বলিল "একটি ভদ্রলোক এসেছেন···কাড্ দিয়েছেন···"

জুবিলির বুকখানা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। জুবিলি বলিল "ও-কার্ড দাদুকে দাওগে···"

রাজু বলিল "কর্তাবাবু বাড়ি নেই। কলকাতায় গেছেন।"

জুবিলি বলিল "সে-কথা ভদ্রলোককে বলো গে···"

রাজু বলিল "বলেছিলুম। বললেন, তোমার দিদিমণিকে কাড্ দাও···তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।"

বুকে যেন মেঘ ডাকিল! জুবিলি বলিল "দেখি কার্ড···"

যা ভাবিয়াছিল, তাই। তপনের কার্ড।

জুবিলি বলিল "বলো গে, দিদিমণির শরীর খারাপ···আজ দেখা হবে না।"

রাজু চলিয়া গেল।

জুবিলির বুকের মধ্যে যেন সাগর ফুঁসিয়া উঠিল! তেমনি তরঙ্গোচ্ছ্বাস! তেমনি প্রমত্ত কাঁপন!

কেন আসিয়াছে? কী চায়?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তপনের মুখের কথায় কদর্য ইঙ্গিত। জুবিলির কথা তার মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই! মনে করাইয়া দিল, সে বিধবা! রূঢ় ভাষায় জুবিলি এ-কথা বলিয়াছিল। সে-কথায় কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে নাই! নির্লজ্জের মত জবাব দিল, তপন সে-কথা ভোলে নাই! এবং ভোলে নাই বলিয়া জুবিলিকে ভোলা তার পক্ষে আরও শক্ত হইয়াছে।

এত বড় স্পর্ধা! তার নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া তপন তাকে এমন অপমান করে! এতখানি সাহস তার হয় কি করিয়া?

রাজু ফিরিয়া আসিল।

অন্ধকার ঘরের দ্বারে কালো ছায়া পড়িল। জুবিলি চমকিয়া উঠিল; কহিল "কি হলো?"

রাজু কহিল "বললেন, খুব বেশী দরকার। একবারটি দেখা করা চাই।"

জুবিলির বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। তার গৃহে আসিয়া এতখানি আস্ফালন প্রকাশ করে।···

মনে পড়িল, এ আস্ফালন-প্রকাশের সুযোগ জুবিলিই তাকে দিয়াছে!

রাজু দাঁড়াইয়া আছে, জুবিলি অস্বস্তি বোধ করিল, বলিল "আচ্ছা দোতলায় দাদুর বসবার ঘরে এনে বসাও। আমি যাচ্ছি।"

জুবিলি একবার আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কেশগুলাকে সুবিন্যস্ত করিয়া লইল; তারপর বেশভূষার পানে লক্ষ্য করিল এবং মনকে শক্ত করিয়া দোতলার বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তপন বসিয়া একখানা অ্যালবাম উলটাইতেছিল, জুবিলি আসিবামাত্র অ্যালবাম বন্ধ করিয়া কহিল "শুনলাম, শরীর অসুস্থ। তবু জ্বালাতন করলুম।···কি করি? নিজের জ্বালায়!"

বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে তপনের পানে চাহিয়া জুবিলি বলিল "এমন কি দরকার যে মানুষের শরীর অসুস্থ শুনেও জোর-তলব ?"

মৃদু হাসিয়া তপন বলিল "রাগলে তোমাকে চিরদিন ভালো দেখায়। আজও দেখাচ্ছে ঐ বঙ্কিম-নয়নে শর-গুচ্ছ···সিম্‌প্‌লি চার্মিং !"

রাগে জুবিলির আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র দৃষ্টিতে তপনের পানে চাহিয়া জুবিলি কহিল "এটা ভদ্রলোকের বাড়ি···"

তপন কহিল "এবং সামনে রূপসী ভদ্রমহিলা···তুমি ভাবছো সে-জ্ঞান আমার নেই ?"

জুবিলি বলিল "সে জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে সেই সঙ্গে আর একটি জ্ঞান থাকা উচিত।"

—"কি শুনি···"

জুবিলি কহিল "কোন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে, সে-বাড়ির কোন মহিলাকে অপমান করলে শাস্তি পেতে হয়।"

তপন কহিল "কি-শাস্তি আমায় দেবে ?"

এখনও ব্যঙ্গ ! এত বড় নির্লজ্জ বেহায়া লোকের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক চলে না ! জুবিলি বলিল "কি দরকার, বলুন···আমার অবসর নেই।"

তপন কহিল "আমার কথা একরত্তিটুকু···এক মিনিটে শেষ হয়ে যাবে।"

সন্ধানী দৃষ্টিতে জুবিলি তপনকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। বলিল "কি কথা ?"

তপন কহিল "আমি বলতে এসেছি, তুমি আমাকে যে-সব চিঠি লিখেছিলে, সে-চিঠির একখানিও আমি নষ্ট করিনি ! সেগুলি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছে···চিরদিন। আজও ···এই এখানে এসেছি···"

জুবিলির সর্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল ! শিরা-উপশিরা ছিঁড়িয়া যেন রক্ত ঝরিতেছে ! দেহ-মন সে-রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। চাবুকের যাতনায় প্রাণটাও···

জুবিলি ভাবিল, প্রাণটা যদি বাহির হইয়া যায় তো সে বাঁচিয়া যায়। তার কণ্ঠ-তালু বিশুষ্ক হইল।

তপন কহিল, "চিঠিগুলি চমৎকার ! রোজ কতবার করে যে সে সব চিঠি পড়ি···"

পায়ের তলায় মাটি দুলিতেছিল, কোনমতে আর্তস্বরে জুবিলি বলিল "সেগুলো জমিয়ে রেখেছেন ! না না···পুড়িয়ে ফেলুন···দয়া·· দয়া করে···"

তপন কহিল "অসম্ভব ! জীবনে ঐ চিঠিগুলি আমার মস্ত সম্বল ! পাথেয় !··· শুনবে ? সব চিঠি আমার কণ্ঠস্থ।···বলবো ?"

জুবিলি টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল···সামনের চেয়ারে বসিয়া কোনমতে নিজেকে রক্ষা করিল।

তপন কহিল "বিশেষ করে সেই চিঠিখানি···যাতে তুমি করুণাময়ীরূপে আমায় আশা দিয়েছিলে। আমার হাতে নিজেকে তুমি সমর্পণ করবে বলে প্রস্তুত !···যে-মুহূর্তে আমি তোমায় ডাকবো, তুমি চলে আসবে···দুনিয়ার সব-কিছু ছেড়ে···সব-কিছুর ডোর

ছিন্ন করে! দুর্ভাগ্য, সে চিঠি যেদিন আমার ঠিকানায় এসে পৌঁছুলো, তার আগের দিন আমি বর্মা যাত্রা করেছি। সে-চিঠি এসে বাসায় পড়ে ছিল···ফিরে যখন সে-চিঠি আমি পেলুম, তখন বিশ্বনাথ মারা গেছে এবং তুমি সেখানকার সব বাঁধন কেটে শ্রীরামপুরে চলে এসেছো!···ফিরে এসে সে-চিঠি পড়ে আমার কি মনে হয়েছিল জানো? মনে হয়েছিল, বর্মা মুল্লুকটাকে উপড়ে ইণ্ডিয়ান ওশ্যনের জলে ডুবিয়ে দিই!···বর্মা দেশটাকে ভগবান যদি সৃষ্টি না করতেন!"

জুবিলি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল! তার যেন চেতনা নাই···চোখের সামনে সব ঝাপসা কালো···কথাগুলো কানে আসিয়া লাগিতেছে যেন কোন্ পাতালের রন্ধ্রতল হইতে।

তপন কহিল "মানে, বর্মা-দেশটা যদি না থাকতো, তাহলে আমি সেদিন বর্মা যেতুম না, এবং বর্মায় না গেলে তোমার-আমার মধ্যে আজ এই সমুদ্রের ব্যবধান গড়ে উঠতো না।···এ চিঠির আগের চিঠিখানিও চমৎকার! তাতে তুমি লিখেছিলে··· রবিবাবুর দুটি মাত্র লাইন কোট্ করেছিলে—'দিতে চাই, নিতে নাই কেহ!'···এ-কথার পর লিখেছিলে,—এর চেয়ে মেয়ে-মানুষের বড় দুর্ভাগ্য আর নেই। আপনি পুরুষ-মানুষ, চিরসুখী জীবন···আমার যাতনা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।"

অসহায়ের মত জুবিলি কহিল "চুপ চুপ, চুপ করুন তপনবাবু। সে সব কথা··· আমি পাগল হয়ে লিখেছিলুম!···তাছাড়া ও-কথার যে অর্থ আজ আপনি বলতে এসেছেন, সে-অর্থে আমি ও-সব কথা লিখিনি আপনাকে···সত্যি, সত্যি বলছি··· আপনি ভুল বুঝেছিলেন।"

হাসিয়া তখন কহিল "ভুল! বেশ, এ-চিঠি পাঁচজনকে দেখাই। তারা বিচার করে দিক। এ-সব সাদা কথার অর্থ খুব সাদা···খুব সহজ এবং খুব সরল! এর মধ্যে কোথাও ডবল মানে নেই। বিচারে পাঁচজনে যদি বলে, ও-চিঠির মানে বুঝতে আমার ভুল হয়েছে, তাহলে পাঁচশো চাবুক্ খেয়ে আমি চলে যাবো! আর বিচারে তারা যদি বলে···না, এ-কথার অর্থ আমি যা বুঝেছি, তাই?"

সচকিত দৃষ্টিতে জুবিলি চাহিল তপনের পানে···তপনের চোখের দৃষ্টিতে যেন ধারালো ছুরি! সে-ছুরি নির্মম আঘাত দিতে ভুল করে না···ভুল করিতে পারে না! তপনের মুখে হাসি···ও-হাসিতে প্রকাণ্ড অভিসন্ধির আভাস!

তপন কহিল "বলো···কি হবে তাহলে?"

জুবিলিকে কে যেন খুব উঁচু পাহাড় হইতে সবলে টানিয়া নীচে ফেলিয়া পদাঘাতে জর্জরিত করিয়া দিয়াছে···তেমনি অবলুণ্ঠিত মনে সে কহিল "যেদিন এ-চিঠি লিখেছিলুম, আপনি তো জানেন, কী অপমানে আমি জর্জরিত হয়েছিলুম! সেদিন বন্ধুর মত আপনি সান্ত্বনা দিয়েছেন।···তাই এ-চিঠি···আপনি তো সব জানেন···কেন তবে এ-সব কথা বলে আজ আমাকে আঘাত দিচ্ছেন?···এমন নিষ্ঠুর আপনি!"

তপন কহিল, "নিষ্ঠুর আমি!···না, নিষ্ঠুর তুমি!"

এ-কথা জুবিলির কানে গেল না···সজল কাতর চোখে তপনের পানে সে চাহিয়া রহিল।

তপন কহিল "এ-চিঠি কেন রেখেছি…জানো? তোমাকে আমি ভালোবাসি। যেদিন বিল্বনাথের ঘরে তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ, সেই দিন থেকে তোমার জন্যে আমি আকুল! তোমার অশান্তি, তোমার দুঃখ-বেদনা…যত দেখেছি, আমার মন তত আশা পেয়েছে। তোমার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবো…এই ছিল আমার পণ! তাতে নিজের স্বার্থ ছিল না…তা নয়! তোমার সে-চিঠি আমার অস্ত্র… আজ ঐ চিঠির জোরে তোমাকে আমি জয় করবো। তুমি রূপসী, তুমি বিদুষী, তুমি বুদ্ধিমতী…তাছাড়া তোমার দাদুর এত বিষয়-সম্পত্তির তুমিই হলে একমাত্র heiress!"

কোনমতে জুবিলি কহিল "টাকা চান? বেশ, বলুন কত টাকা পেলে ও-চিঠি আমাকে ফেরত দেবেন?"

হাসিয়া তপন কহিল "শুধু টাকার কাঙাল আমি, ভাবো?"

ভয়াতুর দৃষ্টিতে জুবিলি চাহিয়া রহিল তপনের পানে। বুকের মধ্যে প্রলয়ের কলরোল চলিয়াছে!

জুবিলি কহিল "তবে…"

তপন কহিল "বিধবা-বিবাহ একালে সচল জুবিলিপ্রভা দেবী। তোমাকে আমি কামনা করছি…বলেছি তো সেই প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ, সেই দিন থেকে। বিল্বনাথের বন্ধু আমি…আমিও লক্ষ্মীছাড়া, মানি। কিন্তু তোমাকে কোনদিন কাঙাল হয়ে আমার কাছে থাকতে হবে না! আমার হাতে তোমার অনাদর হবে না নিশ্চয়।"

পৃথিবী আরও জোরে দুলিতে লাগিল। সে-দোলায় সব যেন ভাঙিয়া চুরিয়া একশা হইয়া যাইবে!

কখন্…কখন্ এ-পৃথিবী ভাঙিয়া ধসিয়া যাইবে? জুবিলি সেই পরম ক্ষণটির কামনায় উদগ্র, এমন সময় শুনিল তপনের কণ্ঠস্বর "তোমার দাদু এলেন বুঝি…আমি চললুম। তবে মনে রেখো, শ্রীরামপুরে আমি এসেছি জয়-যাত্রায়। তোমার আশা ত্যাগ করে চলে যাবো, তেমন কাপুরুষ আমি নই!…আমার কথা তুমি ভেবে দেখো…"

জুবিলির চিত্র-করা চোখের সামনে দিয়া তপন চলিয়া গেল।

জুবিলির চেতনা জাগিল প্রসন্ন গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বরে। প্রসন্ন গাঙ্গুলী বলিলেন "কী… চুপ করে কি হচ্ছে? কবিতা লেখা? হাঃ হাঃ হাঃ!"

জীবনের কটা পরিচ্ছেদ যে কি হইয়া আছে…বিশেষ করিয়া বিল্বনাথের মৃত্যুর ছ'মাস পূর্বেকার পরিচ্ছেদগুলো! অনাদর-অপমান সহিয়া সহিয়া দিন কাটিতেছিল,— কেন যে হঠাৎ তপনকে চিঠি লিখিয়া দুঃখ নিবেদন করিতে গেল! সরল বিশ্বাসে চিঠি যা লিখিয়াছিল, বন্ধুকে বন্ধু যেমন দুঃখ জানাইয়া লেখে, তেমনি! তখন বোঝে নাই, পুরুষ-বন্ধুকে নারীর পক্ষে বন্ধু ভাবিয়া এতখানি বিশ্বাস করা উচিত নয়! পুরুষমানুষের মনে যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে সে-চিঠি একদিন মৃত্যুবাণের মত দেহ-মন বিঁধিয়া নারীকে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে!

এ লোকটা এত-বড় দুর্বৃত্ত···মনের মধ্যে এতখানি দুরভিসন্ধি এমন ভাবে গোপন রাখিয়াছিল !

সেদিনের সব কথা মনে পড়িল। গৃহে অসংকোচে রঙ্গ-বিলাসিনীদের আনিয়াই বিল্বনাথ খেয়াল-তৃপ্তি চুকাইয়া দেয় নাই, নেশায় মত্ত হইয়া তাদের সামনে জুবিলিকে যে-মূর্তিতে দাঁড় করাইত, সে-ভাব ক্রমে জুবিলির অসহ্য হইয়া ওঠে! অপমানে অভিমানে সে-দুরাবস্থার কথা কোনদিন সে প্রসন্ন গাঙ্গুলীর কর্ণগোচর করে নাই। ভাবিত, একদিন এই পীড়নযন্ত্রের তলে তার প্রাণখানা যদি চূর্ণ হইয়া যায়, সেদিন দাদুকে বলিবে, "তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে তো! পয়সা দেখিয়া যেমন একটা জানোয়ারের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলে···"

এ-সব পীড়ন-অপমানের মাঝখানে তপন তার পক্ষ লইয়া বিল্বনাথকে যৎপরোনাস্তি শাসন করিতে উদ্যত হইল। তপনের সে দৃঢ় শাসনে বিল্বনাথ ভড়কাইয়া যাইত। কিন্তু সে ভড়কানোর চতুর্গুণ শাস্তি জুবিলিকে ভোগ করিতে হইত যেদিন তপন এ-গৃহে অনুপস্থিত থাকিত। তার সে-অনুপস্থিতির অন্তরালে জুবিলি সে নির্যাতন ভোগ করিত, পত্র লিখিয়া তপনকে একদিন তা জানাইয়াছিল। লিখিয়াছিল—

"আমাকে যদি রক্ষা করিতে না পারেন, কেন তবে দুদিনের জন্য রক্ষার অভিনয় করিলেন! আপনি কাল ছিলেন না, কাল রাত্রে আমাকে দিয়া ঐ সব রঙ্গিণীদের পদসেবা করাইয়া তাদের সামনে কী লাঞ্ছনা! আরও কত সহিতে হইবে ভাবিয়া তাদের সেবা করিয়াছি! কিন্তু আর কতদিন ধরিয়া আরও কত অপমান সহ্য করিব? আপনি উপায় দেখুন। আপনি ছাড়া আমার মুখের পানে চাহিবার জন আর কেহ নাই।"

তারপর শেষের সে-চিঠি,—কারাগৃহের বন্দিনীর মত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ জুবিলি···এ-জীবনের আলো-বাতাস লাগিবার সকল সম্ভাবনার আশা যখন ত্যাগ করিয়াছিল··· জীবন যখন কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ···বাড়ি ছাড়িয়া দমদমার বাগানে জুবিলিকে একা রাখিয়া বিল্বনাথ ক'জন বিলাসিনীকে সঙ্গিনী করিয়া প্রমোদ-বিহারে বাহির হইল··· জুবিলি তখন তপনকে লিখিয়াছিল—

"আমাকে উদ্ধার করুন। আমি কিছু চাই না···শুধু আপনার ঘরের কোণে পড়িয়া থাকিতে দিবেন। এ বয়সে আমি কী পাইয়াছি? এখান হইতে আমাকে লইয়া যান। যেখানে রাখিবেন, সেখানে থাকিব। শ্রীরামপুরে যাইবার ইচ্ছা নাই। আর কোথাও নয়, আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। নহিলে আমি আত্মহত্যা করিব। সে-পাপ আপনাকে লাগিবে।"

চিঠির প্রত্যেকটি কথা মনে পড়িল। এতদিন কোথায় স্মৃতির ধূলিজালে হারাইয়া গিয়াছিল···চিহ্ন ছিল না! এখন সে ধূলি-জঞ্জাল ঠেলিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঝিকঝিক করিতেছে!

তাই অমন জোর-গলায় তপন বলিয়া গেল, এ-কথার অর্থ খুব সহজ এবং সরল এবং তার কোথাও দুটা অর্থ নাই!···

আজ যদি এ চিঠি সে প্রচার করিয়া দেয় ?

জুবিলি চমকিয়া উঠিল। তাহা হইলে ভবিষ্যতের যে-আশাটুকুকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চায়, সে-আশা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে! এ-চিঠি দেখিলে শরৎ কি কোনদিন তাকে ক্ষমা করিবে? না, তার পানে মুখ তুলিয়া চাহিবে?

চোখের সামনে অকূল পাথার···সীমা নাই, পার নাই!···

জুবিলি নিশ্বাস ফেলিল।···

বিশ্বনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সমস্ত দুঃখ-গ্লানি সে মন হইতে মুছিয়া সাফ করিয়া দিয়াছিল। এ-কয় বৎসরে ওদিককার স্মৃতির বিন্দু বাষ্পও মনের কোণে থিতাইতে দেয় নাই। ভাবিয়াছিল, কটা বৎসর যেন দুঃস্বপ্ন! সে-দুঃখ কাটাইয়া জীবনকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে!

কিন্তু কি করিয়া তা হয়? এতকাল পরে কোথা হইতে আজ তপন আসিয়া দেখা দিল এ কি সংহারের মূর্তি লইয়া! অত দরদ মায়া···তার পিছনে বীভৎস মনের এমন কদর্যতা!···

এখানে আবার তপন আসিয়া উদয় হইয়াছে শরতের দাদা অবনীকে আশ্রয় করিয়া!

কোনমতে রাত্রি কাটিলে সকালে স্নান করিয়া জুবিলি ছুটিল মহালক্ষ্মী দেবীর গৃহে।···মনে শঙ্কার সীমা ছিল না। তপন যদি এ বাড়িতে অবনী বা শরতের কাছে তার ঐ সব কথা তুলিয়া থাকে?

কি বলিয়া এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে? কাকেই বা প্রশ্ন করিবে?

নিঃশব্দে সে আসিল একেবারে শরতের ঘরে। শরতের ঘরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, শরৎ এবং কাবেরী মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। কাবেরী বলিতেছে "অনেক জ্বালাতন করে গেলুম, সে-কথা মনে রাখবেন না।"

শরৎ বলিল "এতখানি জ্বালাতনের কথা মানুষ ভুলতে পারে কখনো?···এ-জ্বালাতনের কথা মনে থাকবে, যতদিন বাঁচবো···"

কথার শেষটুকু জুবিলির কানে গেল···সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পা দিবামাত্র চোখে পড়িল কাবেরীর বাষ্পার্দ্র চোখে ব্যথাতুর করুণ দৃষ্টি এবং শরতের চোখে কেমন-এক উদাস ভাব!

জুবিলিকে দেখিবামাত্র দুজনে একটু সচকিত হইল। জুবিলির মনে হইল, এতক্ষণ যেন কিসের খেলা চলিয়াছিল···বেশ আরামে শান্তভাবে···সে আসিয়া যেন সে-খেলা ভাঙিয়া দিয়াছে!

জুবিলি চাহিল কাবেরীর পানে, তারপর শরতের পানে···

কাবেরী কহিল "বাড়ি যাচ্ছি। আপনার কাছেও ক্ষমা চাইছি যদি কোন অপরাধ করে থাকি···"

নিশ্বাস ফেলিয়া জুবিলি বলিল "আমার কাছে অপরাধ? একটা দিন তো আলাপ! তার মধ্যে অপরাধ হবে কোথা থেকে?"

কথাটা বলিয়াই শরতের পানে চাহিয়া জুবিলি বলিল "তোমাকে একটু পাবো শরৎদা ? মানে, আমার একটা পরামর্শ আছে—জরুরি পরামর্শ।"

শরৎ বলিল "অনেকখানি সময় চাই সে-পরামর্শের জন্যে ?"

জুবিলি কহিল "যদি বলি, হ্যাঁ ?"

শরৎ বলিল "তাহলে এবেলা সময় হবে না। মানে, এঁকে এঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে যাবো।···"

জুবিলি কহিল "বেশ, ফিরে এসে চান-টান করবে তো! বেলা দশটা-এগারোটায়·· তখন যদি আসি ?"

শরৎ একবার কাবেরীর পানে চাহিল, তারপর জুবিলির পানে চাহিয়া কহিল "ফিরতে বেলা এগারোটা বাজবে·· বারোটায় নেমন্তন্ন আছে···আমার আর অবুদার··· এঁদের ওখানে। যোগীন্দ্রবাবু নেমন্তন্ন করে গেছেন।"

জুবিলির বুকে বেদনার জায়গায় শরৎ যেন পা চাপাইয়া দিয়াছে···তেমনি ব্যথার ভারে জুবিলির বুক টনটন করিয়া উঠিল !

একটা নিশ্বাস···কোনমতে সে-নিশ্বাস চাপিয়া জুবিলি কহিল "ও · তোমাদের উৎসব-ভোজ ! ফিরে চাইবার একটুও অবসর হবে না ?"

নিশ্বাস পড়িল ; বলিল "একটা কথা, একটু চোখের জল প্রত্যাশা করবো, এমন-জন আমার কেউ নেই।"

বলিতে বলিতে তার দুই চোখের কোণে জলের রাশি উথলিয়া উঠিল।

শরতের বিস্ময়ের সীমা নাই! কাবেরী অভিভূত হইল। বুঝিল, খুব বেশী ব্যথা পাইয়াছে ! সে আসিয়া জুবিলিকে একেবারে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

নিজেকে মুক্ত করিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে জুবিলি বলিল "না ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে !··· জানি, আমার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী আজ চক্রান্ত করে বসে আছে···কোন দিক্ দিয়ে আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না!···আমার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে ! আমি মরতে বসেছি,···আর-আর সকলের আনন্দ-উৎসব চলেছে ! আমারি শুধু এ-পৃথিবীতে কেউ নেই···কিচ্ছু নেই···"

বলিতে বলিতে জুবিলি সে-ঘর হইতে ছুটিয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

কাবেরী অভিভূতের মত শরতের পানে চাহিয়া রহিল।

শরৎ কহিল "ভয় নেই। চিরদিন ও এমনি। পাগলের মত কখনো আনন্দে বিভোর···কখনো রাগে আগুন···আবার কখনো একটু কথার আঁচ লাগলে দু'চোখে জলের ধারা বয়ে যায় !"

কাবেরী বলিল "কিন্তু কাল সন্ধ্যার সময় অমন সহজ মানুষ···হঠাৎ একটি রাত্রে···"

শরৎ কহিল "এ-ভাবান্তরের জন্যে খুব বেশী সময় ওর লাগে না। চকিতে বিপ্লব ঘটে যায়।"

কাবেরী কহিল "কিন্তু বড় ব্যথা পেয়ে আপনার কাছে এসেছিল মনে হচ্ছে। হয়তো একটু সান্ত্বনার প্রত্যাশায়···"

শরৎ কহিল "দেখি, কোথায় গেল।"

শরৎ চলিয়া গেল জুবিলির সন্ধানে···কাবেরী ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বিশ মিনিট কাটিয়া গেল, শরৎ ফিরিল না। কাবেরী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির সামনে আসিল।

অবনী উপরে আসিতেছিল, কহিল "আপনি আজ বাড়ি যাচ্ছেন?"

লজ্জাজড়িত দৃষ্টিতে অবনীর পানে চাহিয়া মৃদু-কম্পিত স্বরে কাবেরী কহিল "কতদিন আর থাকবো? মা সেরে উঠেছেন।"

'মা' কথাটি বলিবামাত্র কাবেরী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

অবনী হাসিল, কহিল "মা পঞ্চমুখে আপনার সুখ্যাতি করছিল। এত সেবা! এত যত্ন! এজন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।"

কাবেরী আর দাঁড়াইতে পারে না···এত লজ্জা কোথায় ছিল···কেন তাকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিল!···

অবনী কহিল "শুনলুম, আপনাদের ওখানে আমাদের দু'ভায়ের আজ নেমন্তন্ন। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। যোগীন্দ্রবাবুকে বলবেন, আমার একটি বন্ধু এসেছে কলকাতা থেকে। তাকে নিয়ে এখনি আমাকে একবার চন্দননগর যেতে হবে। সেখানে সে একটা ব্যবসার পত্তন করছে কি না···এনগেজমেণ্ট করে এসেছি। আমার এ ক্রুটি আপনারা মার্জনা করবেন···"

কাবেরীর মুখে কথা বাহির হইল না। দেওয়ালে ঠেস দিয়া সে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল···

অবনী হাসিল, হাসিয়া নিঃশব্দে দোতলায় উঠিয়া ওদিকে চলিয়া গেল।

কাবেরী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে যে ছন্দ জাগিয়াছিল, সে ছন্দ অকস্মাৎ কাটিয়া গিয়াছে!

মহালক্ষ্মী দেবী আসিয়া বলিলেন "এসো মা···যখন শুভক্ষণ দেখে বাড়ি যাচ্ছো, তখন সে-ক্ষণটুকু না কাটিয়ে যাওয়াই ভালো।···গাড়ি তৈরী।···শরৎ গেল কোথায়? শরৎ বলছিল, সে গিয়ে বৌদিকে রেখে আসবে···"

মহালক্ষ্মী দেবী হাসিলেন। বলিলেন "ওকে দেখে মনে হয় যেন বৌদিকে ও পেয়ে গেছে!"

কাবেরীকে সঙ্গে লইয়া মহালক্ষ্মী দেবী নীচে নামিলেন। নীচে নামিতে শরতের সঙ্গে দেখা।

কাবেরীর পানে চাহিয়া শরৎ কহিল "না, পেলুম না। চকিতে কোথায় যেন উবে গেল!"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "কে?"

শরৎ বলিল "জুবি।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "ও···সে যে আমার ঘরে এলো। এসে মুখগোঁজ করে এক কোণে বসলো। আমি বললুম, কি হয়েছে রে? তাতে কোন কথা বললে না। ···তুই বুঝি ক্ষেপিয়েছিস? ঐ তোর ভারী দোষ! এখনো কি ও সেই ছোট্টটি আছে রে যে কথায়-কথায় ক্ষ্যাপাস! জানিস ও একটুতে ক্ষ্যাপে!"

শরৎ কহিল "না পিসীমা, আমি ক্ষ্যাপাইনি, সত্যি। বাড়ি থেকে ক্ষেপেই ও বেরিয়েছে। সে ক্ষ্যাপামির একটা ঝাপটা আমাদের গায়ে লেগেছে।···আমি কেন ক্ষ্যাপাবো? বিশ্বাস না হয়, তুমি বরং এঁকে জিজ্ঞাসা করো···মানে, বৌদিকে।"

মহালক্ষ্মী দেবী হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন "তুই যে বৌদি-বৌদি করছিস, ভগবান না করুন, বিয়ে যদি না হয়?"

শরৎ কহিল "তোমার মুখে এমন কথা বেরুচ্ছে পিসীমা! তা ছাড়া বিয়ে না হবে কেন, শুনি? বর রাজী, কনে রাজী···আমরা দুজনে আরও বেশী রাজী···বিয়ের বাকী তো শুধু মন্ত্র-পড়া আর আমাদের হৈহৈ করে খাওয়া! হুঁঃ, সেটা তোমাদের পুরুত ডাকার ওয়াস্তা শুধু!···তোমার অসুখ সেরেছে, এবারে পাঁজি খুলে দিনক্ষণ ঠিক করে ফ্যালো···রৈরৈ শব্দে ডাকাতের মত ওঁর বাড়িতে পড়ে আমরা ওঁকে লুঠ করে এখানে নিয়ে আসি!"

কাবেরীকে পাঠাইয়া মহালক্ষ্মী দেবী আসিলেন নিজের ঘরে। আসিয়া দেখেন, জুবিলি বসিয়া আছে ঘরের কোণে, মুখচোখ রীতিমত ভারী।

কহিলেন "কি হয়েছে রে জুবি?"

জুবিলি কহিল "শরৎদা আছে?"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন, "না। সে গেল কাবেরীকে পৌছে দিয়ে আসতে।"

-"ও···"

মনকে জুবিলি এতক্ষণে কোনমতে একটু সামলাইয়া খাড়া করিয়া তুলিয়াছে। মহালক্ষ্মী দেবীর কথায় মন আবার ভাঙিয়া দুমড়াইয়া নুইয়া পড়িল। সত্যই তার কেহ নাই···যার কাছে আজিকার এ ব্যথার কথা কহিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করিবে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জুবিলি উঠিল।

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "বাড়ি যাচ্ছিস?"

—"হ্যাঁ।"

জুবিলি আসিল নীচে,—উঠান পার হইয়া বাহির হইবে, সামনে অবনী এবং তপন। জুবিলি যেন সাপ দেখিয়াছে, ভয়ে চমকিয়া উঠিল! সে একেবারে নিস্পন্দ অবশ!

অবনী কহিল "কি খবর জুবি?"

কোনমতে জুবিলি কহিল "তোমার বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, দেখা হলো না।"

হাসিয়া অবনী কহিল "তুমি যে দেখছি রাম না হতে রামায়ণ রচনা করে বসে আছো!"

জুবিলি কহিল "তার মানে?"

অবনী কহিল "আগে বিয়ে হোক, তবে তো বৌ হবে।"

জুবিলি কহিল "পাঁজি দেখে শুধু একটা দিন ঠিক করাই বাকী।...বৌ এসে এখানে বাস করে গেল, শাশুড়ীর সেবা করে গেল..."

হাসিয়া অবনী কহিল "তা বটে! এটা unique..."

তারপর তপনের দিকে দেখাইয়া অবনী কহিল "এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই... ইনি আমার এক পুরনো বন্ধু। নাম তপন। খুব ভাল গান গাইতে পারে। একদিন শোনাবো..."

নিমেষের জন্য জুবিলি চাহিল তপনের পানে। তপনের দু'চোখে হাসির বিদ্যুৎ! সে বিদ্যুতের বহ্নি-কণা তাকে বিঁধিয়া দগ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে জুবিলির বুকের মধ্যে বজ্রের হুংকার, যদি তপন সব কথা বলিয়া বসে!

তপন পরিচয়ের কথা তুলিল না, শুধু বলিল "ইনি?"

অবনী কহিল "ইনি আমার এক-রকম বোন হন। রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবু আছেন ...তাঁর পৌত্রী।...নাম শ্রীমতী জুবিলিপ্রভা। আর্টিস্ট বলতে পারো। গান-বাজনা, ছবি আঁকা, শিল্প কাজ—এ সবে রীতিমত পাকা। তবে কোনটার চর্চা রাখেনি...সব ছেড়ে দিয়েছে। মানে, ভারী unfortunate...girl-widow।"

তপন কহিল "O! painful, really!"

এ-স্বরে কতখানি ব্যঙ্গ, কতখানি কৌতুক, জুবি বুঝিল। বুঝিয়া সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াইল না। পায়ে কোথা হইতে গতিশক্তি ফিরিয়া আসিল! জুবিলি চকিতে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ওদিকে যোগীন্দ্র ঘোষালের গৃহে রীতিমত উৎসবের আয়োজন।

কাবেরী আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে নিজের হাতের কতকগুলা সুখাদ্য রন্ধনের জন্য...

শরৎ এ-বাড়িতে আছে। গাড়ি ফিরাইয়া দিয়াছে। বলিয়া পাঠাইয়াছে, একেবারে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাড়ি ফিরিবে।

যোগীন্দ্র ঘোষাল আসিয়া ডাকিলেন "কাবেরী দেবী..."

কোমরে আঁচল জড়াইয়া কাবেরী তখন পোলাওয়ের হাঁড়িতে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছে; যোগীন্দ্র ঘোষালের কথার জবাব দিল না।

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "যার জন্যে এত আয়োজন, সে নাকি আসবে না?"

কাবেরী কহিল "তার মানে?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "অবনীবাবু নাকি আসতে পারবেন না!"

—"জানি।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল কহিলেন "তাই দেবর-লক্ষ্মণের মুখে তোমার রচিত অমৃত-বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করছো !"

হাসিয়া কাবেরী কহিল "সত্যি দাদা, আপনার উচিত সংস্কৃত কাব্য লেখা। এ ভাব-সম্পদের dignity বজায় থাকে একমাত্র সংস্কৃত কাব্যে।"

হাসিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "স্তুতি-রচনে চাটু-বচনে ভোলালে চলবে না দিদি ···আমার কথার জবাব দাও।"

কাবেরী কহিল "ইনি খেতে ভালোবাসেন···খাবারের মর্যাদা বোঝেন।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "খেতে আমিও ভালোবাসি এবং খাবারের মর্যাদাও বুঝি ···কালিয়া-পোলাও থেকে শুরু করে তোমার দিদির সুধা পর্যন্ত।"

ভর্ৎসনার স্বরে কাবেরী কহিল "সংস্কৃত কাব্য রচনা করতে বলেছি বলে তাতে আদি রসের ইঙ্গিত দিতে বলিনি !"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আদি রস বাদ দিলে কাব্য রচনা করা যায় না। তার প্রমাণ পাবে আমাদের মেঘদূত থেকে শুরু করে সব কাব্যে !"

কাবেরী কহিল "আচ্ছা, এখন আপনার কাব্য নিয়ে আপনি একটু সরে যান তো ! এখানে আমার গব্য রসের মাত্রা ভুল হলে দিদি আর আস্ত রাখবে না। তার উপর খাদ্য যা হবে, তাতে আপনাদের আপসোসের সীমা থাকবে না !"

কাবেরী উনুনে হাঁড়ি চাপাইয়া দিল···তারপর হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকিয়া সে-সরায় জল ঢালিয়া ডাকিল "দিদি···"

বারান্দা হইতে নর্মদা কহিল "কেন রে ?"

—"পেস্তা-বাদামগুলো ঠিক হলো ?"

নর্মদা কহিল "হয়েছে। নিয়ে যাচ্ছি···"

নর্মদা আসিবার পূর্বে শরৎ আসিয়া হাজির। কাবেরী তখন চুলগুলোকে ঝুঁটি বাঁধিয়া সামনের দিকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে···আঁচলখানা উত্তরীয়ের মত গায়ের উপর দিয়া টানিয়া কোমরে জড়ানো···কপালে ঘর্মবিন্দু···মুখের রঙ অগ্নিতাপে লাল টকটক করিতেছে !

শরৎ দেখিল। দেখিয়া বলিল "আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন ?"

দু চোখে আবেশ···সস্মিত স্বরে কাবেরী কহিল "কি—শুনি ?"

শরৎ কহিল "যেন ব্রজাঙ্গনা !"

পিছন হইতে যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "Exactly. সুবল-সখা ব্রজাঙ্গনা দেখে এখানে এসেছেন···এখন এঁকে দূত করে শ্যামকে সংবাদ পাঠাও, শ্রীমতীর পোলাও শীঘ্র নামবে, তুমি এসো হে ব্রজাঙ্গনা জীবন-বল্লভ, এসে তার সাধন দুর্লভ পোলাও-অর্ঘ্য গ্রহণ করে সার্থকোদর হও !"

হাসিয়া কাবেরী কহিল "যান···খালি বদ রসিকতা আপনার !"

হাসিয়া শরৎ কহিল "আপনার সঙ্গে আজ ভালো করে আলাপ হলো···সত্যি ভাবি, আপনি লেখেন না কেন ? এত বড় humorist···"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "কাগজের বুকে আমার এ humor খোলে না ভাই···আমার humor উৎসারিত হয় শুধু এই শ্রীমতীর সাহচর্যে!···অগ্নি-সংযোগে হবি যেমন বিগলিত হয়, এঁর দর্শন-সংযোগে আমার humor তেমনি বিগলিত-ধারে উৎসারিত হয়।"

কাবেরী কহিল "আপনারা যান তো এখান থেকে···খাবার হলে ডাকবোখন! এখন থেকে এখানে ভিড় জমাবেন না।"

শরৎ কহিল "যা গন্ধ বেরুচ্ছে···"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এ-গন্ধে অন্ধ ছুটে আসে, আমরা কোন্ ছার।"

কাবেরী কহিল "আচ্ছা আচ্ছা, ছারের দল এখানে এখন জটলা চীৎকার করবেন না ···আপনাদের সঙ্গে কথা কয়ে আপনাদের মান রাখতে গেলে খাবারের মানহানির ভয় আছে। যান আপনারা। না হলে দিদিকে ডাকবো···"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ঐ তো তোমার দোষ!" তারপর শরতের পানে চাহিলেন, বলিলেন "আমার এই weak point-এর advantage নিয়ে উনি আমায় কেবল ভয় দেখান···জানেন, শাসন ছাড়া ওঁর দিদির কাছ থেকে আমি আর কিছু পাই না।"

নর্মদা আসিল; আসিয়া কহিল "বেশ হচ্ছে কাবেরী···এ-সব রান্না করতে হলে ভগ্নীপতির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা চলে না···রান্নাটা serious জিনিস।"

কাবেরী কহিল "আমার কি দোষ? বা রে! আমি ওঁদের ডাকতে গিয়েছিলুম নাকি! তোমার এই কর্তাটি আমার এত-বড় serious business-কে comic করে তোলবার জন্যে রীতিমত কোমর বেঁধে এসেছেন। শাসিত করো তোমার আপন-লোকটিকে···"

শরৎকে নির্দেশ করিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আগে তোমার লোকটিকে তুমি শাসিত করো···উনিই বা কেন এখানে থাকবেন? ওঁকে দেখে তোমার আপন-জনকে স্মরণ করে তুমি যখন বিরহ-বিধুরা হবে, তখন রান্না সম্বন্ধে তোমার ঔদাস্য ঘটবে না, তার কী গ্যারান্টি দিতে পারো?"

কৃত্রিম বিরক্তি ভরে নর্মদা কহিল "বাবারে বাবা, পণ্ডিত হলে সে পাণ্ডিত্য জাহির করবার চেষ্টায় মানুষ ত্বনিয়াকে পাগল করে তোলে দেখছি! ওগো প্রোফেসর-মানুষ, আমরা জানি তোমার পাণ্ডিত্য অগাধ এবং humor-এ তোমার প্রগাঢ় শক্তি! কিন্তু সে-পাণ্ডিত্য আর humor এ-রান্নাঘরের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ না করে এই কুটুম্ব-জনকে ঘরে বসিয়ে বোঝাওগে···দোহাই তোমার! আমি ব্যাগোর্তা করছি!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আসুন কুটুম্ব-মশাই,···এ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে যেতে মন ব্যথাতুর হলেও সে-ব্যথা দমন করতে হবে! না হলে ব্রজাঙ্গনারা হয়তো এ-পাকাঙ্গনকে রণাঙ্গন করে তুলবেন!"

তারপর দু'চারদিন উপর্যুপরি শরৎ আসিয়া এ-গৃহে উদয় হইল।

সেদিন যোগীন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে দু-চারিটা কথা হইতেছে, কাবেরী আসিয়া বলিল "দুজনে ফিলজফির তর্ক হচ্ছে? না, সেক্সপীয়রকে বাহবা দিচ্ছেন?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "গলার স্বর যেমন শুনেছো অমনি ছুটে এসেছো! উনি গোকুলের সংবাদ আনেননি!…অর্থাৎ…"

লজ্জায় কাবেরীর মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল! কাবেরী কহিল "গোকুলের সংবাদ কে চায়? আপনি ভাবেন, উনি বুঝি…"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আমার ভাবা-না-ভাবায় কিছু এসে যাবে না সুন্দরী! তুমি যেভাবে এসে উদয় হয়েছো, কবিরা সে-ভাবের বহু ব্যঞ্জনা করে গেছেন।…আমি কি বুঝি না? তোমার দিদি আমাকে আজ চর্বিত-শুষ্ক ছোবড়া ভেবে বাতিল করে দিলেও আমার বুকে রস এখনো যা আছে…"

কাবেরী বলিল "জানি জানি, তাতে রসগোল্লার পাক হয় খুব আচ্ছা রকম।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল চাহিলেন শরতের পানে, বলিলেন "না ভাই, আমার ঘরে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে, শ্রীমতীর তা সহ্য হবে না।…কাজ কি, ওঁর দিদির বিরাগ-ভাজন হয়ে বহু দুঃখে মলিন হয়ে আছি…শেষে ওঁরও বিরাগভাজন হবো? তুমি যাও, ওঁর সঙ্গে কথা কওগে। বলোগে, শ্যাম আজ বাঁশীতে কি-সুর দিয়েছেন…"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কাবেরী কহিল "আমি ওঁকে ডাকতে আসিনি। শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলুম, আপনাদের চা দেবো কি না…"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "বেশ, ওঁকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে চা দাওগে…কিন্তু তোমার জন্যে ইনি মোহন-সন্দেশ এনেছেন মনে হচ্ছিল!" এই অবধি বলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল চাহিলেন শরতের পানে, বলিলেন "যাও ভাই…বুকে বয়ে যে সন্দেশ-পশরা এনেছো…একান্তে ওঁকে দাওগে! সে-সন্দেশ উনি যেমন উপভোগ করবেন, এমন আর কেউ নয়।"

শরৎ উঠিল। কাবেরী বলিল "ওর কথায় আপনি উঠবেন না। উনি আমায় কি-রকম ঠাট্টা করছেন, দেখছেন তো!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ঠাট্টা করছি? ভুল বুঝেছো সুন্দরী…এত বড় সহজ এবং সরল সত্য আমি আর কখনো বলিনি।…তা নয়। যাও ভাই…আমাকে টার্মিনাল-এগজামিনের জন্যে কতকগুলো কোয়েশ্চেন সেট করতে হবে…সামনের হপ্তায় ছেলেদের এগজামিন। তুমি যাও…তোমার জন্যে দু'চার রকম খাবার উনি তৈরি করবেন…আমরা তার রসাস্বাদে বঞ্চিত থাকবো কেন!"

শরৎকে লইয়া কাবেরী আসিল তার নিজের ঘরে। বিছানার উপর একখানা সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজী নভেল পড়িয়া আছে…Self…

শরৎ বলিল "এটা…"

কাবেরী কহিল "দাদা কাল পড়েছেন, আজ আমায় পড়তে দিয়েছেন।"

শরৎ বলিল "আপনার এই পড়ায় রুচি এবং অভ্যাসটা আমার ভারী ভালো লাগে! কত বই আপনি পড়েছেন বলুন তো?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কাবেরী কহিল "কি-বা পড়ি! সময় কাটানো নিয়ে কথা···"

শরৎ কহিল "আমাদেরও সময় কাটে, কিন্তু সে যে কী করে! হুঁঃ, তাই ভাবি, আপনাদের লেখাপড়াই সার্থক···আমরা পড়ি শুধু এগজামিন পাস করতে হয়, সেই জন্য।"

হাসিয়া কাবেরী কহিল "আমাদেরো প্রায় তাই···"

শরৎ কহিল "তা নয়! আমরা পড়ি, দুদিন পরে সে-পড়া ভুলে যাই। কিন্তু আপনারা যা পড়েন, তা একেবারে মন ঢেলে পড়েন। পড়ে আপনারা যে-কোন বইয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে পারেন। আমরা কজন তা পারি?···আপনার সঙ্গে কথা কয়ে দেখছি···আপনার exceptional intelligence. মনে কোন অন্ধ সংস্কার নেই! আপনার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে কথা কইলে মনে হয় অনেক কিছু শিখলুম। I admire you...adore you. বাঙালীর সংসার সমৃদ্ধ হয় আপনাদের মত মেয়ের সংসর্গ পেলে!"

এ-কথায় কাবেরী আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিল।···হাসিয়া সে বলিল "থামুন আপনি ···খুব খোশামোদ করতে জানেন!"

শরৎ কহিল "খোশামোদ করবো কি জন্য বলুন? খোশামোদ করে তারা, যারা কোন-কিছুর প্রত্যাশী। সত্যি, আপনার হাতে পড়লে অবুদা একেবারে নতুন মানুষ হবে! দেখতে তো পাই, বাজে এত ঝামেলা নিয়ে তার দিন কাটে।···দেখুন না, নিজে থেকে বিয়ে করতে চাইলো···বাড়িতে পিসীমা তাড়া দিচ্ছেন, আমি তাড়া দিচ্ছি, দেরি কেন? তা অবুদা বলে, দাঁড়া···বিয়ের কথা তো হয়ে আছে···শুধু একটা দিন দেখে তোদের হৈহৈ করা! আরে আমাদের হৈহৈ করা কি! তুমি বিয়ে করছো— নিজের জীবনকে গড়ে তোলবার জন্যে তুমি চাইছো স্ত্রী! এ কি আমাদের হৈহৈ করবার ব্যাপার!"

কাবেরী এ-কথার কোন জবাব দিল না···মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল।

শরৎ বলিল "আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আমি কত কি শিখি! আমার মনে হয়, ছাই লেখাপড়া শিখছি···কোন বিষয়ে মতামত দিতে গেলে কলেজে-পড়া বাঁধা বুলি ছাড়া আর কোন কথা মনে আসে না। পাস করেছি···লোকে বলে পণ্ডিত···কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আমার সে পাণ্ডিত্যের অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছে।"

এ-কথার পর কাবেরী আর মুখ তুলিতে পারিল না···

শরৎ বলিল "অবুদার exceptional luck, তাই আপনাকে পাচ্ছে কমপ্যানিয়ন··· ওকে কোন দিন পড়ার হ্যাবিট ধরাতে পারলুম না।"

কাবেরী বলিল "বসুন, আপনার চায়ের যোগাড় করি।"

কাবেরী উঠিয়া নীচে গেল।

স্টোভ জ্বালিবার যোগাড় করিতেছে, পাশের ঘরে শঙ্করী দেবী নর্মদার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, সে কথা কানে গেল।

শঙ্করী দেবী বলিলেন "সোমত্ত ছেলে, সোমত্ত মেয়ে···বিয়ে হলে তবে সে গ্যাওর হবে! গ্যাওর হলে তখন এমন মেলামেশায় কেউ কিছু বলতে যাবে না। তা নয়, কোথায় বিয়ে, এখনই রোজ আসছে। দুজনে একলা বসে কিসের এত কথা···তোমরাই বোঝো বাপু! আমরা সেকেলে মানুষ ··"

কথাগুলো তপ্ত শলাকার মত কাবেরীর বুকে বিঁধিল···স্টোভে তেল ঢালিতে গিয়া হাত কাঁপিল···তেল উপছিয়া পড়িল।

নর্মদার কথাও কানে আসিয়া লাগিল। নর্মদা বলিল "আপনি কিছু ভাববেন না মা···লেখাপড়া জানে দুজনে···লেখাপড়ার কথাই ওরা কয়। আপনি ভাবেন, অবনীর কথা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা? তা নয়! আমি ওদের দুজনকেই তো জানি··· "

শঙ্করী দেবী বলিলেন "কি জানি বাছা! তোমরা কেন যে এ-সব সহজ কথা বোঝো না! ··আমার কি দায়? তবে একসঙ্গে আমি, তাই···নাহলে তোমার বোন···ধরতে গেলে আমার কে···সাতপুরুষের কুটুম!"

ও-ঘরের কথা এখানেই থামিল।

কথা থামিলেও এ-কথা কাবেরীর মনকে একেবারে উলট-পালট করিয়া দিল। কোনমতে স্টোভ জ্বালিয়া একপেয়ালা চা তৈরি করিয়া পেয়ালা লইয়া সে আসিল দোতলার ঘরে। শরৎ তখন Self বইখানা খুলিয়া তার একটা পাতায় মনঃসংযোগ করিয়াছে।

কাবেরী নিঃশব্দে তার সামনে পেয়ালা রাখিল।

বই রাখিয়া শরৎ কাবেরীর পানে চাহিল। কহিল "এক পেয়ালামাত্র?"

কাবেরী কহিল "দু'পেয়ালা খাবেন?"

শরৎ কহিল "না। আমি.একপেয়ালা খাবো, আপনি একপেয়ালা খাবেন।"

কাবেরী কহিল "আমি এবেলা চা খাই না।"

শরৎ কহিল "আমিও খাই না।"

কাবেরী কহিল "তাহলে চা খাবেন না?"

শরতের বুকখানা ধক করিয়া উঠিল। শরৎ কহিল "রাগ করবেন না। আপনি যত্ন করে চা তৈরি করে আনলেন, আর আমি খাবো না? এত বড় অভদ্র আমি নই।"

কাবেরী কহিল "না না, যা করেন না, জোর করে ভদ্রতার খাতিরে তা না হয় নাই করলেন! এতে আমি খুশী হবো ভেবে থাকেন যদি তাহলে আপনি আমাকে চেনেননি!"

শরৎ কেমন ভড়কাইয়া গেল। একপেয়ালা চা লইয়া কি এমন ঘটিল···

শরৎ চাহিল কাবেরীর পানে···কাবেরী যেন কেমন উন্মনা! কহিল "কি হয়েছে, বলুন তো?"

কাবেরী চমকিয়া উঠিল···কহিল "কিসের কি হয়েছে?"

শরৎ কহিল "একটা পুরোনো গান মনে পড়ছে আপনাকে দেখে…"

কাবেরী জবাব দিল না। তার মনের মধ্যে শঙ্করী দেবীর কথাটা রীতিমত ঝড় তুলিয়াছে! মনে হইতে পরের গৃহে আশ্রয় লইয়াছি বলিয়া এত কথা শুনিতে হয় কি উনি ভাবেন…

প্রতিবাদ তুলিবে, সে উপায় নাই! নিজের মনের সঙ্গে সে বুঝাপড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। তার আচরণে কি কোনদিন এমন কিছু…

শরৎ বলিল "সে-গানটা জানেন না বোধ হয়…সেকালের লেখকের লেখা…"

সহসা কাবেরীর দৃষ্টি পড়িল শরতের মুখে। কী-আগ্রহে চাহিয়া আছে তার পানে··

কাবেরী কহিল "কি গান?"

শরৎ কহিল "হাসি-ভরা মুখে ফুল্ল নলিনী

গিয়েছিল হেলে-দুলে—

মন-মরা মুখে ম্লান নলিনী

ফিরে এলো আঁখিজলে!…"

কাবেরী শুনিল। তার মনের উপর একরাশ মেঘ জমিয়া মনটাকে কালোয় কালো করিয়া দিল। মেঘের ভারে বুকের যত হাসি-কথা সব চাপা পড়িয়া গেল।

শরৎ চা পান করিল। কথাবার্তা হইল। কিন্তু কথাবার্তা জমিল না।…শরৎ ভাবিল, হয়তো কোন কারণে ওঁর মন ভালো নাই! কিংবা শরীরের অসুস্থতা…

শরৎ কহিল "আমার একটু কাজ আছে…আজ আসি বৌদি…"

কাবেরী কি ভাবিতেছিল…ফস করিয়া বলিয়া বসিল "দয়া করে আমায় আর বৌদি বলবেন না।"

শরৎ চমকিয়া উঠিল। বৌদি বলিবে না?

এতদিন বৌদি বলিয়া ডাকিতেছিল…নিষেধ ওঠে নাই! সহসা আজ…

নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ চলিয়া গেল। অন্য দিনের মত কাবেরীর দিক্ হইতে আজ এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই…কাবেরী নিঃশব্দে শুধু সে-যাওয়া দেখিল।

শরৎ চলিয়া গেলে দু'চোখ ছাপাইয়া জল আসিল। কাবেরী উঠিয়া খোলা জানলার সামনে দাঁড়াইল।

বাহিরে আকাশের গায়ে কালো মেঘের কয়েকটা টুকরা…কাবেরী শার্সির কাঁচে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিল।

ক'দিন তপনের সঙ্গে হৈহৈ করিয়া ঘুরিয়া অবনী একদা বাড়ি ফিরিল।

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "তোমার কোন কথায় আমি কোন দিন থাকিনি অবু··তবে আমার উপর মস্ত ভার দিয়েছ যখন…"

অবনী বলিল "বুঝেছি মা, আমার বিয়ের কথা বলছো!"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "তাই।...ওঁদের কথা দিয়েছি, কিন্তু সে-কথা কবে যে রক্ষা করতে পারবো, তা তুমিই জানো!...যদি বিয়ে করো, বলো। আর যদি বলো খেয়াল-বশে ও-কথা বলেছিলে, তা-হলে ওঁদের কাছে সে-কথা আমি জানিয়ে দিতে চাই। বিয়ের কথা নিয়ে মানুষকে বসিয়ে রাখা চলে না।"

অবনী কহিল "না মা, তুমি দিন ঠিক করে ওঁদের জানাও...তুমি যেদিন বলবে..."

কথাটা বলিয়া অবনী চলিয়া যাইতেছিল, মহালক্ষ্মী দেবী তার পানে চাহিয়া ছিলেন। অবনী চলিয়া যায় দেখিয়া ডাকিলেন "অবু..."

অবনী ফিরিল।

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "একটা কথা ছিল..."

—"বলো..."

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "বিয়ে করে বৌ এনে তোমাদের বাড়ির রীতি মেনে তাকে এখানে ফেলে রেখে হৈহৈ করে বেড়াবে, তা যদি মনে করে থাকো, তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ো না!...তোমাদের সংসারে বাস করলেও এ-সংসারের ভাল-মন্দয় আমার কোন কথা কোন দিন থাকেনি। সেজন্য দুঃখ ছিল না; মনকে বুঝিয়ে সুস্থির করেছিলুম। তোমাদের সংসারের কাজে আবার যখন হাত দিয়েছি, তখন আমার দায়িত্ব আছে বুঝেই দিয়েছি..."

অবনী কহিল "বলো, কি বলতে চাও..."

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "বিয়ে করছো...বৌ নিয়ে মানুষ যেমন ঘর-সংসার করে, তেমনি ঘর-সংসার তুমি করো যদি, ভালো। নাহলে বনেদী পরিবারে আসবাব চাই, তাই বিয়ে করে বৌকে আসবারের মত এনে ঘরে ফেলে রেখে দেবে, এ যদি ভেবে থাকো, আমাকে তাহলে মুক্তি দাও!...এ মেয়েটি লেখাপড়া জানে। এর মন আছে... জীবন্ত জাগ্রত মন...সে পরিচয় আমি পেয়েছি। আসবাবের মত একে যদি ফেলে রাখো, তাহলে এ-মেয়ের নিশ্বাস আমার বুকে কাঁটার মত বাজবে।"

হাসিয়া অবনী বলিল "না মা...তোমার কোন চিন্তা নেই!...বৌ এনে সংসার-ধর্ম করবো...তুমি যেমন চাও, সত্যি বলছি।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "তোমাদের সংসারে এসে অনেক দুঃখ সয়েছি বাবা। পরের মেয়ে আনবো সে এ-দুঃখ পাবে, তা আমি সহ্য করতে পারবো না...এ আমার স্পষ্ট কথা।"

অবনী কহিল "আমিও তোমাকে আমার কথা স্পষ্ট জানিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিয়ের জোগাড় কর...আমি শুধু চার দিনের ছুটি চাইছি...তপনের সঙ্গে কলকাতায় যাবো। ও একটা ঘোড়া কিনবে স্থির করেছে—সে-ঘোড়া আমাকে দেখে দিতে হবে।...চারদিন পরে সত্যি ফিরে আসবো আমার মায়ের কাছে।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "ভালো কথা।...তাহলে ভট্‌চায্যি মশায়কে আমি খবর পাঠাই। কাল সকালে উনি পাঁজি দেখে দিন। ওঁরা বড্ড অস্থির হয়েছেন...যোগীন্দ্রবাবু আর তাঁর স্ত্রী। বুঝতে পারি ওঁদের আগ্রহ। এত-বড় ডাগর মেয়ে ঘরে..."

অবনী কহিল "বেশ, তুমি বলে পাঠাও, ওঁদের ঘরে আর বেশী দিন রাখতে হবে না।···তোমার ঘরে তাকে আনবার জন্যে তুমিও ব্যাকুল!"

কথাটা বলিয়া অবনী চলিয়া গেল। মহালক্ষ্মী দেবী ভৃত্যকে দিয়া পুরোহিতের বাড়ি সংবাদ পাঠাইলেন।

রাত প্রায় দশটা···মহালক্ষ্মী দেবী ঠাকুরঘরে, শরৎ চোরের মত আসিয়া ডাকিল "পিসীমা···"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন, "ব্যাপার কি রে? সারাদিন তোর দেখা নেই! ছিলি কোথায়? যোগীনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলি বুঝি, তোর বৌদির কাছে?"

ম্লান হাস্যে শরৎ কহিল "না।"

—"তবে?"

শরৎ বলিল "আমি কলকাতায় গিয়েছিলুম···ভোরের ট্রেনে। আমার এক বন্ধু আছে শিবেশ···তার কাছে।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "এবেলা খাওয়া হয়েছে?"

—"না···"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "কী যে তোমাদের কাণ্ড, কিছু বুঝি না।···যার যখন খুশি, বেরিয়ে যাচ্ছো···যখন খুশি ফিরছো! এমন করলে যারা সংসার চালায়, তারা কি করে ব্যবস্থা করবে? ঐ অবু···হুম করে কাকেও কিছু না বলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! সাত আট দিন পরে আবার হুম করে ফিরলো!···সত্যি, এটা হোটেল নয়! তাছাড়া কোন্ লোকটি এ-বাড়িতে বাস করছে, কে-বা বাস করছে না, তা জানবার কোন উপায় থাকে না। এখন যাও, ঠাকুরকে বলোগে, দুটি অন্ন যদি ধরে দিতে পারে! না পারে, এসে আমায় বোলো···"

শরৎ কহিল "ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি···কিন্তু তুমি রাগ কোরো না পিসীমা···তোমাকে না বলে যাবার ইচ্ছা ছিল না! মানে, ভোরে উঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম! কী খেয়াল হলো, স্টেশনের দিকে গিয়েছিলুম, হঠাৎ মনে পড়লো শিবেশের কথা···গেলুম কলকাতায়।"

মহালক্ষ্মী দেবী কহিলেন "এত খেয়ালী হলে চলবে কেন বাবা? নিজে সুখ পাবে না···অপরেও যে জ্বালাতন হবে তোমাদের এ খেয়ালের খেলায়!···তো বেশ, আমার পুণ্যে যখন ফিরেছো তখন দাঁড়িয়ে থেকো না। ঠাকুরের কাছে যাও···গিয়ে খাবার কথা বলোগে।"

শরৎ কহিল "তোমার কত দেরি?"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "আধ ঘণ্টাটাক। কেন রে? কোন কথা আছে?"

শরৎ কহিল "বলবোখন! এমন-জরুরি কথা নয়···কাল তোমাকে বলবো।"

শরৎ চলিয়া যাইতেছিল, মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "হ্যাঁ, ভালো কথা, কাল সকালে কোন কাজ আছে?"

শরৎ ফিরিল, ফিরিয়া বলিল "কেন ?"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "আজ আর-একজন খেয়ালীকে ধরেছিলুম···বললুম, বিয়ের সম্বন্ধে এমন উদাস হয়ে আছো কি করে ?"

শরৎ কহিল "কি জবাব দিলে ?"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "বললে, বেশ পাঁজি দেখাও···তাই ভট্‌চায্যি মশাইয়ের কাছে চণ্ডীকে পাঠিয়েছিলুম। তিনি কাল সকালে আসবেন। সে-সময়ে থেকো···পাঁজি দেখিয়ে একটা দিন ঠিক করো। আর কিছু না হোক আমি কথা দিয়েছি, আমার সে-কথা রক্ষা পাবে।"

শরৎ কহিল "খুব ভাল কথা পিসীমা। সকলেই নিশ্চিন্ত হবো···তারপর অবুদা একবার সংসারী হলে···বিশেষতঃ অমন বৌ পেলে, ওঃ এ-সংসারের সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তখন তোমার ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তুমি তন্ময় থেকো।"

হাসিয়া মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "তাই হোক। তবে ভয় হয়, এ-জন্মটা শুধু কলুর ঘানি টানতে এসেছি, সেই ঘানি টানতে টানতেই না বিদায় নিতে হয়!···"

শরৎ কহিল "ঘানি টানবার মেয়ে কিনা তুমি! আর এ তুমি ঘানি টানছ কি রকম ?"

বাধা দিয়া মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "যা যা···আর কথার জাল বুনতে হবে না এই রাত সাড়ে দশটার সময়। ওদিকে ঠাকুর হাঁড়ি-হেঁশেল না তুলে বসে!'

শরৎ চলিয়া গেল। মহালক্ষ্মী দেবী ঠাকুরঘরের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। এ তাঁর নিত্য কাজ। লোকজন থাকিলেও এ-পরিচর্যার কাজ কাহারও হাতে দিয়া কোনদিন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। সংসারে কীই বা পাইয়াছেন! তাই সংসারের বাহিরে এই ঘরটিতে, ঠাই সংগ্রহ করিয়া ঐ পাথরের বিগ্রহ-মূর্ত্তিকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া কোনমতে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া পড়িয়া আছেন।

•

সকালে ঘুম ভাঙিবামাত্র শরতের দ্বারে করাঘাত। দ্বার খুলিয়া শরৎ দেখে, জুবিলি।

মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর···দুই চোখের কোণে কালির রেখা।

দেখিয়া শরতের বুঝিতে বাকী রহিল না, কাল সারা রাত্রি জুবিলি জাগিয়া কাটাইয়াছে।

শরতের বিস্ময়ের সীমা নাই। শরৎ কহিল "সুপ্রভাত! কিন্তু ব্যাপার কি ?"

জুবিলি কহিল "অনেক কথা আছে। একটু সময় হবে শোনবার ?"

শরৎ কহিল "বসো, মুখ-চোখ ধুয়ে আসি!"

জুবিলি বলিল "তবু ভালো···অবসর হবে তাহলে দুঃখী-গরিবের কথা শুনতে!"

শরৎ কহিল "তার মানে ?"

আঘাতের প্রলোভন জুবিলি সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল "মানে নতুন রূপসীর ধ্যানে তন্ময়।—তাঁর সেবায় ব্যস্ত!"

—"ওঃ···"

কোন তর্ক না তুলিয়া শরৎ মুখ-হাত ধুইতে গেল।

মহালক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে দেখা। তিনি কহিলেন "জুবি এসেছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"ব্যাপার কি রে?···আমি ডাকলুম···বোধ হয় শুনতে পায়নি।"

শরৎ কহিল "কিছু হয়েছে মনে হলো।···আমাকে কি বলতে এসেছে তাই!···দাদুর সঙ্গে বোধ হয় ঝগড়া হয়েছে।"

মহালক্ষ্মী দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন "দুঃখ হয় এ-বয়সে মেয়েটা সত্যি ভেসে বেড়াবে! এই সব মেয়েকে দেখলে বিদ্যাসাগর মশায়কে মনে পড়ে! এদের জন্যে সাধে তিনি অত কাতর হয়েছিলেন!"

কথাটা শরতের বুকে বিঁধিল। সে কোন জবাব দিল না।

মহালক্ষ্মী দেবী স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

মুখ-হাত ধুইয়া শরৎ দোতলায় আসিল। আসিয়া দেখে, ঘরের সামনে বারান্দায় জুবিলি দাঁড়াইয়া আছে।

শরৎ কহিল "ঘরে বসতে পারোনি?"

জুবিলি কহিল "ভয় করে।"

—"ভয়!"

জুবিলি কহিল "সব-তাতেই আমার এখন ভয় হয়!···"

জুবিলি কহিল "বড্ড বেশী ইঁচড়ে-পক্ক হয়ে উঠেছো দেখছি! কিন্তু যাক, ও-তর্কে ফল নেই। এখন বলো, কি কথা আছে···কিন্তু তার আগে·· ভালো কথা, এক-পেয়ালা চায়ের ফরমাশ করবো তোমার জন্যে?"

জুবিলি কহিল "না।"

শরৎ কহিল "বেশ, তাহলে ঘরে এসে বসো। বসে বলো।"

জুবিলির সামনে একখানা চেয়ার টানিয়া দিয়া শরৎ নিজে বসিল বিছানায়। মশারিটা আগেই তুলিয়া দিয়াছিল।

জুবিলি বসিলে শরৎ কহিল "Ready···"

জুবিলি একখানা খামে-মোড়া চিঠি দিল শরতের হাতে। চিঠি দিয়া বলিল "এইটে আগে পড়ো শরৎদা···"

চিঠিখানা ডাকে আসিয়াছে। খামে লেখা জুবিলির নাম···ইংরেজীতে! শরৎ কহিল "কার চিঠি?"

জুবিলি কহিল "তোমার দাদার কাছে এসেছেন মান্য-অতিথি তপনবাবু···তাঁর চিঠি।"

শরৎ কহিল "তোমাকে লিখেছে?"

—"হ্যাঁ। চিঠিখানা আগে পড়ো, তারপর সব কথা বলবো। কোন কথা লুকোবো না···মিথ্যাও বলবো না। জানি, যত ঘৃণাই করো আমাকে, অন্ততঃ মিথ্যাবাদী বলবে না!"

দু'চোখ কপালে তুলিয়া শরৎ চিঠি খুলিল। ছোট চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে :

"এখানেই আর থাকা চলে না। কি-ছলে বা থাকি? তাই যাইবার আগে জানিতে চাই, আমার প্রার্থনাপূরণের কি হইবে? নিরাশ হইয়া ফিরিব, এমন-ধাতুতে আমার মন গড়া নয়। আমার হাতে অস্ত্র আছে, মনে রাখিয়ো।

একটা কথা,—আমাকে তুমি বিশ্বাস করিতে পারো। জীবনে নূতন চ্যাপ্টার শুরু করিব এবং সে কাজে তুমি হইবে আমার সহায়!

প্রার্থী"

চিঠি পড়িয়া শরৎ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জুবিলির পানে চাহিল। জুবিলি যেন পাথর হইয়া গিয়াছে!

শরৎ কহিল "এ-চিঠির মানে?"

জুবিলি বলিল "আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন এই ভদ্রলোকটি! কী করে সে সময় আমার দিন কাটতো সেকথা তোমার জানা আছে। আমি বলেছি সে-সব···"

জুবিলি সব কথা খুলিয়া বলিল। বলিল, একবার কী দুর্মতি হইয়াছিল, অপমানের বোঝা অসহ্য ভারী হইলে সে চিঠি লিখিয়াছিল এই তপনকে। তারপর এখানে··· সেদিন বাড়ি যাইবার পথে তপনের সঙ্গে দেখা,—একদিন বাড়িতে গিয়া উদ্ধত স্পর্ধার কথাও তপন বলিয়া আসিয়াছে···

শরৎ শুনিল, শুনিয়া কহিল "অবুদার অতিথি হয়ে এ-বাড়িতে সে বাস করছে?"

নিশ্বাস ফেলিয়া জুবিলি কহিল "তাই!"

শরৎ কহিল "এখনি আমি গিয়ে অবুদাকে এ-চিঠি দেখাবো। দেখিয়ে এ রাসকেলকে···"

বলিতে বলিতে শরৎ উত্তেজনাবশে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জুবিলি কহিল "সেইটি করা হবে না শরৎদা।···তা নয়···"

বিমূঢ়ের মত শরৎ কহিল "তবে কি করতে হবে, শুনি?"

জুবিলি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল শরতের পানে···অবিচল দৃষ্টি।

সে-দৃষ্টির স্পর্শে শরতের মনের উত্তেজনা ঘুচিল। শরৎ শান্ত হইল।

জুবিলি কহিল "একটি উপায় আছে···"

—"বলো···"

জুবিলি কহিল "তুমি বিশ্বাস করো, আমার জীবনে এতটুকু কালি নেই···দেহে নয়, মনেও নয়। তবু এ-চিঠি নিয়ে তুমি কিছু বলতে গেলে বিশ্রী একটা হৈহৈ রব তোলা তার পক্ষে বিচিত্র নয়।···সে কত-বড় শয়তান, তুমি জানো না শরৎদা। যে-লোকের বন্ধু ছিল, তার পরিচয় থেকে এ-লোকটির পরিচয় বোঝা শক্ত হবে না!···দুজনে হরিহর আত্মা ছিল। আমার উপর এ লোকটি দরদ জানাতো, আমি ভুলে যেতুম···বিশ্বাস করতুম ওকে বন্ধুর মত! তখন বুঝিনি, মনে অভিসন্ধি পুষছে!"

শরৎ একাগ্র মনে এ-কথা শুনিল।···ভাবিল, হৈহৈ রব তুলিবে এই ভয়ে জুবিলি

কাঁটা হইয়া আছে! মনে পড়িল, ঠিক, নারীর মন বাতাসের ভর সহে না!···কিন্তু তাই বলিয়া এতখানি জুলুম মুখ বুজিয়া সহিতে হইবে!

মন বিদ্রোহে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আদিম-সংস্কারকে দু'পায়ে চাপিয়া মন গর্জন করিল, মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে সংস্কারের দায়ে এতখানি অভদ্রতা, এত-বড় জুলুম চুপ করিয়া মুখ বুজিয়া সহিব?

শরৎ ফুঁসিয়া উঠিল, কহিল "কী তুমি বলো জুবি! চোখ রাঙিয়ে এভাবে ও তোমায় অপমান করবে, আর আমি ওকে ছেড়ে দেবো?"

জুবিলি কহিল "তার পর?"

জুবিলি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল।

শরৎ কহিল "তারপর···মানে, তুমি নিশ্চিন্ত হবে।"

মলিন মৃদু হাস্যে জুবিলি কহিল "যত সহজ তুমি ভাবছো, ব্যাপার তত সহজ হবে না।···ও যদি ঐ চিঠি দেখিয়ে একটা সোরগোল তোলে কিংবা লোকজনকে ও-চিঠি দেখায়, তাহলে এদেশে আমি কোন্ মুখে বাস করবো? এমনিতেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, ও-চিঠি দেখিয়ে ও যদি মন-গড়া কিছু বলে, পারবে তুমি আমাকে রক্ষা করতে?"

কোন-কিছু না ভাবিয়াই শরৎ কহিল "পারবো···করবো তোমাকে রক্ষা।"

একথায় নিশ্বাস ফেলিয়া জুবিলি বলিল "যতদিন আমি বাঁচবো, করবে রক্ষা?"

শরৎ জুবিলির পানে চাহিয়া রহিল···

জুবিলি কহিল "চুপ করে রইলে যে! বলো···"

শরৎ কহিল "অসম্ভব ভাবছো তুমি?"

মাথা নাড়িয়া জুবিলি বলিল "তাই! এ অসম্ভব! দুদিন পরে বিয়ে করে সংসার নিয়ে কোথায় থাকবে তুমি আর কোথায় থাকব আমি। তখন আমার সে অসহায়তা ··"

শরৎ বুঝিল, বুঝিয়া কহিল "হুঁ···"

জুবিলি কহিল "এ-চিঠি পেয়ে অবধি কাল থেকে কত রকমের কত কথা যে আমি মনে-মনে ভেবেছি···সারা রাত এক-মিনিটের জন্যে ঘুমোতে পারিনি···কেবলি ভেবেছি আর ভেবেছি!"

শরৎ নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কী ভেবেছো?"

জুবিলি নিশ্বাস ফেলিল; কোন কথা বলিল না।

শরৎ কহিল "কী ভেবেছো, শুনি? এর বিহিত করা দরকার···এবং আজই··· এখুনি!"

জুবিলি কহিল "সে কথা বলতে আমার ভয় করে···"

শরতের রাগ হইল। এমন সঙ্গীন অবস্থা···আসিয়াছ সাহায্য চাহিতে···অথচ প্রতি কথায় এত কী ভাবো!

শরৎ কহিল, "ভয় হয়, বোলো না! আমার সাহায্য তুমি চেয়েছো···বলছি, আমি

সাহায্য করতে প্রস্তুত···এখনি। তুমি বলছো তোমার মনে কোন কালি নেই, শুধু পাঁচ-জনের অপবাদ কল্পনা করে তোমার ভয়! এ যে পাগলের কথা জুবি। আমি তোমার কথা সত্যি বুঝতে পারছি না, আমার আশ্চর্য লাগছে!"

জুবিলি কহিল "তুমি জানো শরৎদা···"

কথা শেষ হইল না···বাধিয়া গেল।

শরৎ কহিল "বলো।"

জুবিলি কহিল "আমাকে মুখ ফুটে সেকথা বলতে হবে, এ আমি কখনো ভাবিনি সত্যি! ভেবেছিলুম, এ কথা আমিই একদিন শুনবো তোমার মুখে···"

—"আমার মুখে!···কি-কথা জুবি?"

একটা উদ্গত নিশ্বাস অতিকষ্টে রোধ করিয়া জুবিলি কহিল "আমি এমন করে আর থাকতে পারছি না শরৎদা···সত্যি! তুমি ভাবো, আমার সাধ নেই আমি সংসার পেতে বসি? স্বামী···ছেলেমেয়ে···সব-কিছুতে আমি বঞ্চিত থাকবো? ধরে-বেঁধে একটা জানোয়ারের হাতে আমাকে ফেলে দিয়েছিলে···তার আঁচড়ে-কামড়ে আমার দেহ-মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে!···যদি আমাকে বাঁচতে হয়, সুখে আমার অধিকার থাকবে না··· কেন? কেন? কেন?"

এ-কথা শুনিয়া শরৎ চমকিয়া উঠিল।

বাষ্পজড়িত কণ্ঠে জুবিলি বলিতে লাগিল "তুমি একা শরৎদা, তোমার কেউ নেই··· পিসীমার স্নেহ আশ্রয় করে এখানে পড়ে আছো!···চিরদিন এমনি থাকবে? সংসারে তোমার সাধ নেই? স্ত্রী? তোমাকে আদর করবে, যত্ন করবে···এমন স্ত্রী?···বলো··· বলো শরৎদা···"

বলিতে বলিতে অশ্রুর বন্যায় সে একেবারে ফাটিয়া গলিয়া পড়িল।

শরৎ হতভম্ব?

জুবিলি বসিয়া রহিল না···চেয়ার ছাড়িয়া একেবারে শরতের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

দু-হাত ধরিয়া জুবিলিকে তুলিয়া শরৎ কহিল "কী করো জুবি! কি। কেউ যদি আসে···কি ভাববে?"

জুবিলি কহিল "ভাবুক···কাকেও আমি ভয় করবো না। সকলের সামনে আমি বলবো, তোমাকে আমি ভালবাসি···তোমাকে আশ্রয় করে আমি দাঁড়াতে চাই···সংসার পাততে চাই। জীবনে আমার সাধ আছে, মমতা আছে···জীবনে আমার কোন সাধ মেটেনি! আমি যদি মানুষের মত বাঁচতে চাই, সে আমার অপরাধ?···বলো, বলো তুমিই বলো, তুমি যা বলবে—আমি শিরোধার্য করবো। তুমি যদি বলো, জীবনে আমার এ-সাধ অনুচিত—যেমন করে পারি, এ-সাধ মাড়িয়ে উপড়ে আমি চুর করে দেবো। বলো তুমি—"

শরতের মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। পা টলমল করিতেছিল—সারা পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিয়াছে!—

শরতের মনে হইল, পৃথিবীতে কোথাও যেন তার কেহ নাই! শুধু সে আছে বড় গাছের মত নিশ্চল নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া, আর ঝড়ের আঘাতে লুণ্ঠিতা লতার মত তার পায়ের উপরে পড়িয়া এই জুবিলি!

বেচারী!

শরৎ কহিল "ওঠো জুবি···স্থির হয়ে শোনো···পাগলামি কোরো না।"

জুবিলি কহিল "আমাকে আশ্রয় দাও শরৎদা। সব থেকেও আমার কেউ নেই, কিছু নেই···তোমাদের ক'দিনের উৎসব-আনন্দের মাঝখানে আমাকে তুমি ভুলে গেছ! ক'দিন এসে একটি মুহূর্তের জন্যে তোমার দেখা পাইনি···সে-কষ্ট···তার উপর এই অপমান···তুমি ছাড়া আর-কাকেও এ-কথা আমি বলতে পারতুম না! তোমার কাছে এসেছি কতখানি বিশ্বাস নিয়ে···"

শরৎ কহিল "কেঁদো না জুবি···আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সব দায় আমি আমার বলে গ্রহণ করবো!···কিন্তু এ-ব্যাপারে আমায় তুমি ভাবতে দাও। যে লোক এতখানি স্পর্ধায় তোমাকে অপমান করতে সাহস পায়, তাকে শায়েস্তা করবার ভার আমাকে দাও। যদি কথা ওঠে, যদি সে তোমার নামে অপবাদ রটায়, সে-অপবাদের ভারও আমি বইবো···তোমার সঙ্গে সঙ্গে!"

শরতের পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া জুবিলি পড়িয়া রহিল···নিস্পন্দ···যেন পুতুল!

ঘরের বাহিরে ভৃত্য চরণ আসিয়া কহিল "চা···ছোটদাদাবাবু···"

শরৎ কহিল "ওঠো জুবি···চরণ এসেছে।"

কথাটা বলিয়া শরৎ আসিল ঘরের বাহিরে বারান্দায়।

চরণ দাঁড়াইয়া আছে হাতে চায়ের পেয়ালা।

চরণের হাত হইতে পেয়ালা লইয়া শরৎ কহিল "তুই যা চরণ।"

চরণ চলিয়া গেল। পেয়ালা হাতে শরৎ ঘরে ঢুকিল।

পিসিমার কথায় শরৎকে দূত হইয়া ছুটিতে হইল।

পাঁজি দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া দিলেন। মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "লোকজনের মুখে এ খবর পাঠানো উচিত হবে না বাবা, তোমাকেই যেতে হবে। দিন-কুড়িক সময় আছে মাত্র,—ওঁরা যদি কোন রকম আয়োজন করেন, ওঁদের সময় দেওয়া দরকার!"

শরৎ গুম হইয়া বসিয়া ছিল। তার মনে নানা কথা, নানা চিন্তার মাঝখানে জুবির কথাই সবচেয়ে বড় হইয়া বাজিতেছে!

ভাবিতেছিল, ছেলেখেলার মধ্য দিয়া যে-প্রীতির উদয় সে-প্রীতি জুবির জীবনে আজ এমন পরম এবং চরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে! এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া জুবি আজ বাঁচিতে চায়! নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে জুবি শরতের উপর সঁপিয়া

আভাসে-ইঙ্গিতে শরতের মনে এ-সংশয় কখনো জাগে নাই, এমন নয়! অস্পষ্ট আবছায় সংশয় জাগিলেও চিরাচরিত সংস্কারবশে শরৎ মন হইতে তখনি তা সরাইয়া দিয়াছে। সরাইয়া দিলেও জুবির সুস্পষ্ট ভাষা মনকে আজ সবলে ধাক্কা দিয়াছে। সংস্কারের দোহাই পাড়িয়া প্রবন্ধ রচনা করা চলে, মানুষকে জ্ঞানগর্ভ হিতোপদেশের বাণী শুনানো চলে, মানুষের সামনে ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ ধরিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাও চলে; কিন্তু যে-মানুষ বাঁচিবার জন্য আর-পাঁচজনের মত সংসারকে কায়-মনে অবলম্বন করিতে চায়—সংস্কারের দোহাই মানিয়া মনকে সে পাথর করিয়া ফেলিবে, এ কি সম্ভব!

ভাবিয়াছিল, জুবিকে যদি বুঝাইয়া বলে, তুমি হিন্দু-ঘরের কিশোরী কন্যা এবং বিধবা; ভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া তোমার উচিত মনকে গৈরিক রঙে রঞ্জিত করিয়া রূপ-যৌবন বাসনা-কামনাকে দলিয়া চূর্ণ করিয়া ঐ পাথরের ঠাকুর-দেবতার পায়ে ফেলিয়া দাও—জুবি সে কথা মানিবে কেন?

কি করিয়া মানিবে? লেখাপড়া শিখিয়াছে···ভালো-মন্দর জ্ঞান তার বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। যে-বস্তুকে একান্ত সত্য বলিয়া মন মানিতে চায় না, যে-বস্তুতে পাপের বিন্দুবাষ্প আভাস সে পায় না, সে-বস্তুকে জোর করিয়া মানিতে হইবে, এ-কথা জুবি শুনিবে না। তার উপর যদি বলি, তোমার বিবাহ হইয়াছিল—সে স্বামী অদৃষ্টবশে বাঁচিল না—উপায় কি? এ-কথার উত্তরে জুবি যদি বলে—সে'কি স্বামী? কঠোর পীড়নে যে জুবিকে অহরহ নিগৃহীত লাঞ্ছিত করিয়াছে···কোনদিন মানুষ বলিয়া মনে করে নাই! সে লাঞ্ছনা-অপমান হইতে মুক্তি পাইবার আশায় যে লোকের কাছে দুর্দিনে জুবি প্রার্থনা জানাইয়াছিল, সে-লোকটা মনে কত-বড় অভিসন্ধি বহিয়া তাকে আশ্বাস দিয়াছিল! এবং জুবির সেই সরল নির্দোষ প্রার্থনা-নিবেদনের সুযোগ লইয়া সে-লোক আজ তাকে কত-বড় অপমানের আঘাত দিতে বসিয়াছে! এ-আঘাত কিশোরী বিধবার জীবনে কতখানি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে! অপমানের এত-বড় আঘাত না পাইলে হয়তো জুবি নীরবে নিজের দুঃখ সহিয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু···

আঘাতের বেদনা এত বেশী যে জুবি তাহা সহিতে পারে নাই এবং ভয়ে আর্ত-আতুর বেচারীর মত অবশেষে শরতের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছে! বড় নিরুপায় না হইলে মেয়েমানুষ এমন কান্না কাঁদে না!

পিসীমা আসিয়া বলিলেন "যাবি কখন রে? এর পরে যোগীনবাবু কলেজে বেরিয়ে যাবেন।"

শরতের চেতনা হইল। শরৎ বলিল "এখনি যাচ্ছি পিসীমা। কিন্তু বর যে বর্বরের মত নিরুদ্দেশ হয়ে আছে!"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "অবু চার দিনের ছুটি নিয়েছে। বলে গেছে, ওর ঐ বন্ধু তপন—কি তার দরকারী কাজ আছে, সে-কাজটুকু করে দিয়ে চারদিন পরে ও এসে বর সাজবে।"

শরৎ বলিল "ও···তাহলে তোমাদের পাকা দেখা, আশীর্বাদ এগুলো যা আছে, সে-সব কবে হবে ?"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "অবু ফিরে এলে ভালো দিন দেখে ও-কাজগুলো সেরে নিয়ো।"

শরৎ ছুটিল যোগীন্দ্রবাবুর গৃহাভিমুখে।

বাহিরের ঘরে যোগীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা। যোগীন্দ্রবাবুর যেন একটু ব্যস্ত ভাব !

শরৎকে দেখিয়া যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "এই যে···"

তারপর কণ্ঠ উচ্চ করিয়া ডাকিলেন "ভো ভো কাবেরী স্থলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু···"

শরৎ বলিল "আমি পিসীমার কাছ থেকে আসছি। কাবেরী দেবীর কাছে নয়··· আপনার কাছে।"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "বটে ! তাহলে বসি। কিন্তু ভাই, অবসর বড় কম। আজ ক্লাস-আওয়ার্সের আগে আমাদের একটা মিটিং আছে···"

শরৎ কহিল "যে-কাজে এসেছি, সে-কাজ সারতে দু'মিনিট সময় লাগবে।"

—"হুঁ।" যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "শুনি।"

শরৎ বলিল "পিসীমা বলে পাঠালেন, তিনি পাঁজি দেখিয়েছেন। বিয়ের জন্যে বাইশে তারিখ দিন স্থির। এতে আপনার মত আছে কিনা পিসীমা জানতে চান—জেনে বিয়ের গোছগাছ করবেন।"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "তা হলে বসো ভাই। তুমি এসেছো হংসদূত হয়ে···বাইরের ঘরে বসে দু'কথায় তোমায় অভ্যর্থনা করলে চলবে না ! এসো দময়ন্তী-সকাশে তোমাকে নিয়ে যাই,—সেখানে তাঁর মত এবং তাঁর অম্বালিকা-দিদির মতটুকু জেনে নাও। আমার আবার মতামত কি ! পাশে আছেন রূপসী শ্যালিকা···তরুণী চ। তাঁর পানে মাঝে মাঝে তাকাই আর মনে শুধু সান্ত্বনা সংগ্রহ করি, আমার ভার্যাও একদা ছিলেন ওঁর মত রূপসী তরুণী চিত্ত-মুগ্ধকারিণী !"

শরৎ শুধু হাসিল, এ-কথার কোন জবাব দিল না।

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "এসো ভাই···"

শরৎকে লইয়া যোগীন্দ্রবাবু অন্দরে আসিলেন। সামনে উঠানে বসিয়া শঙ্করী দেবী গুল্ পাকাইতেছিলেন। যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ইনি এসেছেন। মানে, কাবেরীর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে বাইশে তারিখে—সেই খবর নিয়ে।"

শঙ্করী দেবী বলিলেন "যাঁদের কাজ, তাঁদের বলোগে।"

কথাটা যোগীন্দ্রবাবুর কানে গেল কিনা সন্দেহ ! তিনি দাঁড়াইলেন না ; অগ্রসর হইয়া রন্ধনশালার দিকে চাহিলেন। নর্মদা ছিল রন্ধনশালায়। এ-সময়টায় শত কাজ থাকিলেও তাহা ফেলিয়া নর্মদা এ-ঘরে থাকে। স্বামি-পুত্র-কন্যার খাবারের তদ্বির নিজে না করিলে তার তৃপ্তি হয় না।

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "কোথায় গো গৃহলক্ষ্মী ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নর্মদা বাহির হইয়া আসিল ; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল "কি যে বলো ! ওখানে মা রয়েছেন না ?"

হাসিয়া যোগীন্দ্রবাবু কহিলেন "মনে যে-ভাব উদয় হয়, সে ভাব গোপন রেখে অন্য ভাষা ব্যবহার করতে শিখিনি যে। পেশা মাস্টারী···কাজেই! উকিল-ডাক্তার হলে মনের সত্য-ভাব গোপন রেখে ভাষায় মিথ্যা ভাব প্রকাশ সহজেই করতে পারতুম !"

নর্মদা কহিল "কি বলবে বলো···এখন আমার বাক্যবিন্যাস তারিফ করবার সময় নেই।"

কথার শেষে নর্মদার দৃষ্টি পড়িল স্বামীর পিছনে শরতের উপর ; তাকে কহিল "কি খবর ?"

শরৎকে লক্ষ্য করিয়া যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "ইনিই তো আসল খবর আজ। আজ ইনি শ্রীমান শরৎ নন···হংস-দূত !"

নর্মদা কহিল "তার মানে ?"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "বাইশে তারিখ বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে। শ্যালিকাটি এবার আমার চিত্ত-বৃন্দাবন আঁধার করে···"

নর্মদা এ-কথায় ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করিয়া শরতের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "সত্যি ?"

শরৎ কহিল "হ্যাঁ, এ-খবর বলবার জন্যে পিসীমা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যদি কোন অসুবিধা না হয়, আর ঐ তারিখেই যদি মত হয়, জানাবেন।"

নর্মদা কহিল "আমার আর অসুবিধা কি ভাই! যত শীগগির ওদের চার-হাত এক হয়, মঙ্গল!···তবে তোমার এই দাদাকে জিজ্ঞাসা করো···উনি হলেন কাবেরীর গার্জেন।"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "আমি গার্জেন! হুঁঃ! বলো, চিনির বলদ! চিনি বয়েই খালাস।"

নর্মদা আবার ভর্ৎসনা করিল, বলিল "চুপ করো!···রসিকতা আজও ভদ্রভাবে করতে শিখলে না! অথচ ছেলে পড়াবার ভার তোমার উপর!"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "যাকগে ও-সব কথা। যাঁর বিয়ে, তাঁর মতটা একবার নাও। ও-তারিখে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না তো? মানে, ও-তারিখে তাঁর অন্য-কোন এনগেজমেন্ট থাকে যদি ?"

হাসিয়া নর্মদা কহিল "সে তত্ত্ব শরৎ গিয়ে নিক!···তোমার পিসীমাকে তুমি গিয়ে বোলো ভাই, আমাদের খুব মত আছে। ও-তারিখে কোন অসুবিধা হবে না। তবে তার আগে আশীর্বাদ, পাকা দেখা···আমি আজ দুপুরবেলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবোখন!···"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "সেই ভালো! আমাদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে ভাই, এখন একবার যাঁর বিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে ব্যাপারটি পাকা করে ফ্যালো! কথায় বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই ?···আমরা হলুম পাড়াপড়শী···"

নর্মদা বলিল "কাবেরীর সঙ্গে দেখা করে যাও। আমাকে এখন ছুটি দাও···না হলে

নতুন ঠাকুর, তোমার দাদার পাতে যে-খাদ্য ধরে দেবে, উনি তাতে রাগ করে হয়তো আমার মাংস খেতে চাইবেন !"

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন "বলবো তবে সত্য কথা ? যখন তোমার মাংস-ভোজনের কথাই তুললে…"

সলজ্জ মৃদু-হাস্যে নর্মদা কহিল "ক্ষমা করো…সত্য-কথা তোমার মুখে কতখানি অপ্রিয় হয়ে ওঠে, তুমি তা জানো না, কিন্তু আমি জানি হাড়ে-হাড়ে !"

—"ও, afraid ? আচ্ছা…" বলিয়া যোগীন্দ্রবাবু বিদায় লইলেন।

শরৎ কহিল "আসি তাহলে দিদি…"

নর্মদা কহিল "কাবেরীর সঙ্গে দেখা করবে না ? সে ওপরে আছে…ছেলেদের ট্রানশ্লেসন দেখিয়ে দিচ্ছে। যাও না ওপরে…"

নর্মদা ছুটিল রন্ধনশালায়। শরৎ চলিয়া যাইতে গিয়াও যাইতে পারিল না… দোতলার সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সিঁড়িতে উঠিতে হইল না…উপর হইতে কাবেরী নামিয়া আসিতেছিল।

শরৎকে দেখিয়া কাবেরী দাঁড়াইল। শরৎ কহিল "পিসীমা আমাকে পাঠিয়েছিলেন…।"

কাবেরী কোন জবাব দিল না ; শরতের পানে চাহিয়া নীরবে দাড়াইয়া রহিল।

শরৎ বলিল "বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে—বাইশে তারিখ।"

কাবেরী এবারও কোন কথা কহিল না।

শরৎ কহিল "আমি তাহলে আসি।"

কাবেরী শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

শরতের বুকে ছোট একটা ধাক্কা লাগিল। কাবেরী এমন গম্ভীর কেন ? এমন তাকে কোনদিন দেখে নাই !…সেদিনকার কথা মনে পড়িল…সেই উচ্ছ্বসিত নিষেধ ! সে নিষেধের অর্থ ?

কাবেরী দাড়াইয়া রহিল না, সিঁড়ি হইতে নামিয়া শরতের পাশ দিয়া রন্ধনশালার দিকে গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ চলিয়া আসিল।

তারপর দু'তিন দিন শরৎ কলিকাতায় ঘুরিয়া কাটাইয়া দিল ; বাড়িতে তার দেখা পাওয়া গেল না।

জুবি নিত্য দু'চার বার করিয়া আসিল শরতের সন্ধানে ; দেখা পাইল না। যোগীন্দ্রবাবুর ওখানে যদি কোন সংবাদ পায়, ইহা ভাবিয়া সে আসিল কাবেরীর কাছে।

কাবেরী বসিয়া একখানা ইংরেজী বই পড়িতেছিল, জুবি আসিয়া কহিল "বই পড়ছো ?"

বই রাখিয়া কাবেরী উঠিয়া বসিল, বলিল "হ্যাঁ।"

একটা উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া জুবি বলিল "শরৎদার কোন খবর জানো ?"

এ-প্রশ্নে কাবেরী নিজের অজ্ঞাতে কেমন চমকিয়া উঠিল! তারপর সে-ভাব সংবরণ করিয়া ছোট্ট প্রশ্ন করিল "কেন ?"

জুবি বলিল "ক'দিন তাকে খুঁজছি, দেখা পাচ্ছি না। শুনলুম, অনেক রাত্রে বাড়ি আসে, তারপর ভোরে সকলের ঘুম ভাঙবার আগেই বেরিয়ে যায়।"

একাগ্র মনোযোগে কাবেরী এ-কথা শুনিল। তার মনের মধ্যে নিমেষে একরাশ প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল,—কেন ? কেন ? কেন এমন লুকোচুরি করিয়া বেড়াইতেছে ?

উত্তর না পাইয়া জুবি বলিল "শুনলুম সামনের বাইশে তারিখে তোমাদের বিয়ে হচ্ছে,—তাই ভাবলুম, শরৎদা হয়তো বিয়ের আয়োজনে লেগেছে। তা জানো তুমি, শরৎদা কোথায় যায় ?"

কাবেরী কহিল "না।"

—"তোমার সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছে, বলতে পারো ?"

কাবেরী খুব বলিতে পারে! এই তো সেদিন! সেদিন খুশী-মনে আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছে···

কাবেরী কহিল "দু'দিন আগে তিনি এসেছিলেন। আমার সঙ্গে এক-মিনিটের জন্যে দেখা হয়েছিল।"

জুবি বলিল "কোথায় সে যাবে, কিছু বলেছিল ?"

—"না।"

জুবি কি ভাবিল···তারপর নীরবে অনেকক্ষণ কাবেরীর পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিবার পর বলিল "আমার কোন কথা শরৎদা তোমাকে বলেছে ?"

কাবেরীর মন বলিল, কি কথা ?

মুখ বলিল "না।"

—"হুঁ···"

তারপর দুজনেই নীরব। কাবেরী ভাবিতেছিল, এত লোক থাকিতে শরতের খবর জানিতে কাবেরীর কাছে জুবি আসিল কেন ?

জুবি ভাবিতেছিল, শরতের সঙ্গে ইহারই মধ্যে কাবেরীর এত ভাব—শরৎ যখন-তখন কাবেরীর কাছে ছুটিয়া আসে···এবং এই কাবেরীর কথায় শরৎ যেন কবি হইয়া কাব্য রচনা করিতে বসে! কেন ?···তবে কি শরৎ···

নিশ্বাস ফেলিয়া জুবি বলিল "তোমাকে আর বিরক্ত করবো না, তুমি পড়ো। আমি আসি।"

কাবেরী কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেমন একরকম উদাস দৃষ্টিতে শুধু জুবিলির পানে চাহিয়া রহিল।

জুবি চলিয়া গেলে বই ফেলিয়া কাবেরী জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিনের রৌদ্রের উপর কখন একরাশ মেঘ নামিয়া ছায়ায় দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে··· মনের উপর সে-মেঘ পাথরের মত ভারী হইয়া বসিল।

কাবেরী একা এ-ঘরে থাকিতে পারিল না; ঘর ছাড়িয়া নর্মদার কাছে আসিল।

নর্মদার ঘরে নর্মদা সেলাইয়ের কল চালাইয়া বালিশের ঝালর সেলাই করিতেছিল। কাবেরীকে দেখিয়া সে বলিল "একটু বসবি রে? আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

কাবেরী কহিল "কিসের সাহায্য, দিদি?"

নর্মদা বলিল "উনি এই এক-থান কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোর বিয়ের দানে যে-বিছানা দেওয়া হবে, ঘরে যতখানি পারি, তারই বালিশের ওয়াড় তৈরি করছি। তোশক-বালিশের অর্ডার উনি দিয়েছেন। সেই বালিশের মাপেই ওয়াড় হবে। কাজেই ওয়াড়গুলো যদি তৈরি করে রাখি, ক্ষতি হবে না।"

কথাটা বলিয়া নর্মদা চাহিল কাবেরীর পানে। ভাবিয়াছিল, বোনের মুখে লজ্জার রক্ত-রাগে হাসির জ্যোৎস্না দেখিবে!

কিন্তু তা দেখিল না। তার পরিবর্তে দেখিল কাবেরীর শুষ্ক উদাস ভাব! এ যেন সে-কাবেরী নয়,—কাঁচের তৈরী চেতনা হীন কাবেরীর প্রতিমূর্তি। এ মূর্তি দেখিয়া নর্মদার মনের কোণে কোথায় একটু আঘাত বাজিল!

চট্ করিয়া নর্মদা আর কোন কথা বলিতে পারিল না। বিস্ফারিত নেত্রে রাজ্যের কৌতূহল লইয়া শুধু কাবেরীর পানে চাহিয়া রহিল।

সে-দৃষ্টি কাবেরীর দেহে-মনে কাঁটার মত বিঁধিল। কাবেরী বলিল "বলো, কি করতে হবে।"

নর্মদা একটা নিশ্বাস ফেলিল, জবাব দিল না।

কাবেরী অস্বস্তি বোধ করিল, বলিল, "বা রে, চুপ করে রইলে কেন মুখের পানে চেয়ে? বলো, কি কাজ করবো···?"

নর্মদা বলিল "কাছে আয়···"

কাবেরী কাছে আসিল। তার হাত ধরিয়া নর্মদা সাগ্রহে বলিল "সত্যি কথা বলবি?"

কাবেরী বলিল "কিসের সত্যি?"

—"যা জিজ্ঞাসা করবো?"

—"তোমার প্রশ্ন আগে শুনি···"

ভূমিকা রাখিয়া নর্মদা বলিল, "বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল, তোর মুখ তবু মলিন দেখছি যে?"

ম্লান মৃদু হাস্যে কাবেরী বলিল "বিয়ে হচ্ছে শুনলে খুব হেসে বেড়াতে হয় বুঝি?"

এ-হাসি, এ-কথা নর্মদার ভালো লাগিল না। নর্মদা কহিল "আমাকে তুই কথায় ভুলোতে পারবিনে কাবেরী, আমি তোর দিদি হই।"

কাবেরী এবার যেন প্রমাদ গনিল!

বাহিরে আকাশে মেঘের ভার দেখিয়া প্রাণটা কেমন আর্ত বোধ করিতেছিল, সে আর্তি-মোচনের জন্য কাবেরী আসিয়াছিল দিদির কাছে…পাঁচটা কথায় মনের এ-ভার ফেলিয়া মনকে হালকা করিয়া লইবে বলিয়া। কিন্তু এখানে দিদি এ কী প্রশ্ন করিয়া বসিল!

নর্মদা কহিল "অবনীর সঙ্গে বিয়েয় তোর মত নেই?"

কাবেরী চমকিয়া উঠিল! তার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছায়া নামিল! মুখ নিমেষে নীল হইয়া গেল!

নর্মদা বলিল "তাই যদি হয়, আমাকে বল্ কাবেরী। ছোট্টটি নোস তুই…বয়স হয়েছে…সব বুঝতে শিখেছিস। আমার কাছে কোন কথা লুকোসনে।"

এ-কথায় কী গভীর মমতা…প্রীতি…

এ-কথায় কাবেরী নিজেকে আর সংবরণ করিতে পারিল না। তার দুই চোখে জল দেখা দিল। কাবেরী আসিয়া দিদির কোলে মুখ লুকাইল।

নর্মদার বুকের উপর যেন আকাশখানা নিমেষে ভাঙিয়া পড়িয়াছে! তার হাত কাঁপিল।

দিদির কোলে মুখ গুঁজিয়া কাবেরী পড়িয়া রহিল অনেকক্ষণ…নিরুপায় অসহায়ের মত। নর্মদা কাবেরীর মাথায় হাত রাখিল। দুজনে নীরব নিস্পন্দ…

বাহিরে আকাশ ভরিয়া মেঘের পর মেঘ জমিয়া সারা পৃথিবীকে আঁধারের আবছায়ায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।…

অনেকক্ষণ পরে নর্মদা ডাকিল "কাবেরী…"

দিদির কোলে মুখ ঢাকিয়া ঘষিয়া চোখের জল মুছিয়া কাবেরী মুখ তুলিল। তার সে-মুখ দেখিয়া নর্মদার মনে হইল…অনেক কথা…কাবেরী ছোট বোন! মাতৃ-পিতৃহীন একান্ত নিরাশ্রয়, অসহায়! নর্মদার পাশে নর্মদার উপর ভর রাখিয়া কাবেরী কোনমতে নিজেকে দাড় করাইয়া রাখিয়াছে! নর্মদা ছাড়া কাবেরীর কথা কে বুঝিবে?

নর্মদা কহিল "সত্যি, অবনীর সঙ্গে বিয়েতে তোর মত নেই?"

দু'চোখে অপরাধিনীর শঙ্কিত দৃষ্টি…কাবেরী নর্মদার পানে চাহিয়া রহিল। তার চোখে পলক পড়ে না!

নর্মদা বলিল "কিন্তু তোর মতেই তো কথাবার্তা হয়েছে ভাই।"

কাবেরী কোন কথা বলিল না…শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে আর এক পশলা উদ্গত অশ্রু!

নর্মদার মনে ধূম-বাষ্পের মত উদয় হইল…একটা প্রশ্ন!…তবে কি…

মৃদু স্বরে নর্মদা কহিল "শরৎকে তুই ভালবাসিস?"

কাবেরীর চোখে অশ্রুর সাগর নামিল।

নর্মদা বলিল "ও কিছু নয়। একসঙ্গে কথাবার্তা বলিস, মেলামেশা করিস, তাই শরৎকে ভাল লাগে।…সেজন্যে মন খারাপ করিসনে! যা ভেবে তুই কাঁদছিস, এ তা নয়। নাটক-নভেলে পড়িস love at first sight…প্রেম ভালবাসা…ও-সব ঐ নাটক-

নভেলেই হয়! শরৎকে ভাল লাগে···ভাল কথা। সম্পর্কে দ্যাওর···দ্যাওরকে মেয়েরা চিরদিন বন্ধুর মত ভালবাসে। তা বলে···শোন্, আমি সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছিনে, সত্য বলে জানি বলেই বলছি! অবনী ভাল ছেলে। সংসারে মন নেই···তার কারণ এমনি নির্লিপ্ত ভাবেই মানুষ হয়েছে। স্বভাব-চরিত্র ভাল! কোন দোষ নেই। নরম মন। না হলে কবে তুই অপর-লোক ভেবে নিন্দা করেছিলি, সে-নিন্দা শুনে বাড়ি-ঘর সারানো, পুরোনো কীর্তি গড়ে সাজায় তার জন্যে? পাগলামি করিসনে···শরতের উপর তোর অভিমান হয়েছে আমি বুঝেছি···দুদিন আসেনি, তাই। বড় লোকের বাড়ির বিয়ে···তার উদ্যোগ-আয়োজন ওকেই করতে হচ্ছে। আর শরৎকে অবনী মায়ের পেটের ভাইয়ের মত ভালবাসে। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুই বরং চুপচাপ নিজের মনকে analyse করে দ্যাখ···আমি বড়-গলা করে বলতে পারি, শরতের উপর অভিমানে তোর যা মনে হচ্ছে, তার একটুও সত্যি নয়। বিয়ে হয়ে গেলে আমার এ-কথা আরও ভাল করে বুঝতে পারবি। আমি তোর দিদি···তোর সুখ তোর ভাল আমি বুঝি না?"

কথাগুলা কাবেরী শুনিতেছিল মৌন নির্বাকভাবে। তাহাকে প্রায় বক্ষলগ্ন করিয়া নর্মদা বলিল "তা ছাড়া মন যদি একদণ্ডের জন্যে ভুল করে বলে যে,—না, এ ভালবাসা ···তাতেই অমনি মনের কথায় সায় দিয়ে ঐ দিকে ঝোঁক দিতে হবে?···মন যদি দুর্বল হতে চায়, জোর করে তাকে ঠিক করতে হবে। যে-কথা হয়ে আছে···মনের একদণ্ডের খেয়ালকে বড় করে সে-কথা ভেঙে চুরমার করে দিবি? বলবি,—না অবনীর সঙ্গে নয়···শরতের সঙ্গে হবে বিয়ে। লোকে তাহলে কী বলবে?···মন অনেক সময় অন্যায় আবদার ধরে,—সব সময় সে-অন্যায়ের প্রশ্রয় যদি আমরা দিই, তাহলে ঘর-সংসার আর সংসার থাকবে না বোন, অরণ্য হয়ে দাঁড়াবে!···"

কাবেরী কাঠ হইয়া এ-কথাও শুনিল। নর্মদার মনে জাগিতেছিল শঙ্করী দেবীর সেই নির্মম কদর্য ইঙ্গিত! সঙ্গে সঙ্গে গায়ে তার কাঁটা দিল।

নর্মদা বলিল "যদি সত্যিই তাই ভেবে থাকিস, তাহলে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনকে ঠিক করে ফ্যাল কাবেরী!···মানুষের জীবন ছেলে-খেলা নয়, নাটক-নভেল নয়! সে-জীবনের কথার দামকে তুচ্ছ করা চলে না!"

সকালে শরৎ বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে—হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সদরের সামনে তপন আসিয়া উপস্থিত।

শরৎকে দেখিয়া তপন বলিল "অবু আছে?"

শরৎ কহিল "আছে।"

তপন ঘোড়া হইতে নামিল।

শরৎ চলিয়া যাইতেছিল, তপন বলিল "অবুর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে?"

—"হয়েছে।"

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া শরৎ দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা দৈত্য চীৎকার তুলিতেছিল, বলিতেছিল,—জুবির কথা মনে নাই? একবার ছাখো, বুঝা-পড়া করো।

কিন্তু এই সকালেই?···কাল রাত্রি হইতে তার মাথায় সমস্ত পৃথিবীখানা যেন হুড়মুড়িয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে···এত রকমের চিন্তায় সে কাতর···

তপন ডাকিল "ওহে শরৎ, শুনছ?"

শরৎ ফিরিল।

তপন বলিল "ঘোড়াটা কেমন দেখছ? কিনলুম···অবুই দেখেশুনে কিনে দিয়েছে।"

শরৎ বলিল "ঘোড়ার কারবার কখনও করিনি যে ঘোড়ার পরিচয় জানব!"

শরৎ দাঁড়াইয়া রহিল! তপন তার পানে চাহিয়া···দৃষ্টি স্থির।

শরৎ কহিল "আর কোন কথা আছে?"

তপন একবার চারদিকে চাহিল···তারপর বলিল "ছিল কথা···"

শরৎ বলিল "বলুন···"

তপন কহিল "অবুর সঙ্গে আমার অল্পদিনের বন্ধুত্ব নয়। তাকে আমি ভাইয়ের মত দেখি, সেও আমাকে সেই রকম দেখে।"

শরৎ একাগ্র মনোযোগে শুনিল এবং যথাসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "এ-কথা আমাকে শোনাবার প্রয়োজন?"

তপন বলিল "প্রয়োজন আছে।"

—"বলুন···"

তপন বলিল "বিল্বনাথের স্ত্রী জুবিলি দেবী তোমার বন্ধু···"

শরৎ বলিল "হ্যাঁ।"

শরতের বুকের মধ্যে একটা সাপ ফণা তুলিল!

তপন বলিল "বেচারী···অমন মেয়ে···অথচ জীবনে শুধু দুঃখই পেয়েছে! বিল্বনাথ আমার বন্ধু ছিল···আমি সব জানি।"

শরতের মনের সাপটা এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না···ফোঁস করিয়া চক্র ধরিল! শরৎ বলিল "আমিও জানি। জানি, সে-দুঃখে আপনাকে ভদ্র ভেবে সাহায্য চেয়ে কখানা চিঠি বেচারী লিখেছিল এবং সেই সব চিঠি দেখিয়ে আপনি এখন ওকে প্রত্যহ অপমান করছেন!"

মনে দুরভিসন্ধি আঁটিয়া যে-মানুষ সে-অভিসন্ধি কাজে খাটাইতে উদ্যত, সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে পরের মুখে সে অভিসন্ধির ইঙ্গিত পাইলে সে চমকিয়া ওঠে! শরতের কথায় তপন চমকিয়া উঠিল; এবং চমকের প্রথম মুহূর্তে তার মুখে কোন কথা বাহির হইল না···মুখ বিবর্ণ হইল।

শরৎ বলিল "আপনি অবুদার বন্ধু···সেই বন্ধুত্বের জোরে এ-বাড়িতে আপনি যাতায়াত করেন। আগে এ-কথা জানতুম না···এখন জেনেছি। এবং আপনি যখন সকালেই নিজে থেকে এ-কথা তুললেন, তখন আমার মনে হয়, শুভস্য শীঘ্রং···কি বলেন?"

শরতের কথায় অনেকখানি শ্লেষ! সে-শ্লেষের মর্ম তপন ঠিক বুঝিল না! কুতূহলী দৃষ্টিতে শরতের পানে চাহিয়া রহিল।

তার সে নির্লজ্জ দৃষ্টি দেখিয়া শরৎ বলিল "শুভস্য শীঘ্রং কথার মানে, আমি আজ আপনার এ-অভিসন্ধির কথা অবুদাকে বলবো। একজন ভদ্রমহিলাকে অভদ্র কাপুরুষের মত যে অপমান করে, এ বাড়িতে তার বাস এবং এ-পাড়ায় তার আসা চলবে না! আমি চলতে দেব না!...শুধু তাই নয়! এ অপমানের প্রতিকার যাতে হয়, সে-চেষ্টাও করব। জুবির ঠাকুরদা হেঁজিপেঁজি লোক নন—তাঁর বাড়িতে চাকর আছে, দরোয়ান আছে এবং তাদের হাড় ম্যালেরিয়ায় ভুগে জিরজিরে হয়নি! তারা হাতে লাঠি ধরতে পারে এবং হাতের সে-লাঠি বেশ সতেজে চালাতে তারা কার্পণ্য করবে না!"

বলিতে গিয়া কথা বেশ দীর্ঘ হইয়া উঠিল এবং সে কথায় তপন প্রথমে কেমন হকচকাইয়া গেল! পরক্ষণে সে-ভাব সংবরণ করিয়া বলিল "কি বলতে চাও? আমাকে মারবে?"

শরৎ কহিল "আমি মারব না। এমন ইতরের গায়ে আমি হাত তুলি না...চাকর-বাকররাই এ-সব ইতরকে শায়েস্তা করতে পারবে।"

তপনের চোখে সকালের আলো সহসা যেন মলিন ম্লান হইয়া গেল!...মনটাও কেমন সেই সঙ্গে...

মনকে জোরে সে নাড়া দিল, দিয়া বলিল "তুমি আমাকে এমন অপমান করছ শরৎ!"

শরৎ কহিল "অপমান!"

তপন বলিল "নিশ্চয়। একথা জেনো, তোমাদের এখানে আমি অবনীর অন্নদাস হতে আসিনি...অবনীর চেয়ে আমার পজিশন এতটুকু খাট নয়! আমি তার আশ্রিত নই যে আমাকে তুমি এভাবে তোমার সমযোগ্য লোক ভেবে..."

তার কথা শেষ হইবার পূর্বেই শরৎ কহিল "আপনি যদি আমার সমযোগ্য লোক হতেন, তা হলে আপনাকে এ-সব কথা বলবার প্রয়োজন হত না! কিন্তু..."

সহসা দোতলার বারান্দা হইতে অবনীর কণ্ঠ শুনা গেল। অবনী কহিল "কিসের তর্ক হচ্ছে তোমাদের?"

অবনীর স্বর লক্ষ্য করিয়া শরৎ এবং তপন দুজনেই তাহার দিকে চাহিল। তপন বলিল "তোমার এখানে দুদিন আশ্রয় নিয়েছি বলে তোমার এই আপরাইট্ ভাইটি আমাকে যা-খুশি অপমান করছে..."

অবনী ডাকিল "শরৎ..."

শরৎ কহিল "তুমি একবার নীচে এলে ভাল হয় অবুদা। যে-লোকটিকে বন্ধু বলে তুমি নিজের ঘরে এনে আপ্যায়িত করছ, সে যে কত বড় ছুঁচো তা তুমি জান না! কৃপা করে কেন উনি তোমার অতিথি হয়েছেন...শুনলে তুমি বোধহয় ওঁর মুখদর্শন করবে না!"

কথা শুনিয়া অবনী অবাক্! দু'চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল "আমার নীচে যাবার চেয়ে তোমাদের দুজনের উপরে এলে ভাল হয় না? পথের উপর দাঁড়িয়ে তর্কবিতর্ক উচিত হবে কি! You will excite idle gossip-mongers."

এ-কথায় তপনের পানে চাহিয়া শরৎ কহিল "চলুন…"

তপন চুপ করিয়া রহিল। কি ভাবিল! তারপর বলিল "এখনি যেতে পারছি না অবু! মানে ঘোড়াটাকে এখনও টহল দেওয়া হয়নি। একটু পরে আসব…"

কথাটা বলিয়া তপন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল এবং পথের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

শরৎ তার পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তারপর অবনীর পানে চাহিল। অবনী কহিল "কী হয়েছে শরৎ?"

শরৎ কহিল "উনি নেই, ওঁর অসাক্ষাতে আমি কোন কথা বলতে চাই না।"

অবনী বলিল "বেশ!…"

শরৎ চলিয়া গেল।

কোথাও যাইবে বলিয়া সে বাড়ির বাহির হইল না! বাহিরে আসিবামাত্র মন বলিল, প্রসন্নবাবুর বাড়ি চল…জুবিলির সঙ্গে দেখা করিয়া তাকে একবার খবরটা দিয়ে আসিবে না?

বাড়ি ঢুকিতে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা। রায়বাহাদুর বলিলেন "শরৎ যে! কি মনে করে?"

শরৎ কহিল "আজ্ঞে, এ-পথে যাচ্ছিলুম, তাই একবার…"

রায়বাহাদুর বলিলেন "ভাল করেছ! আমি মনে মনে তোমাদের কাউকে খুঁজছিলুম একবার…"

শরৎ কহিল "কেন বলুন তো?"

রায়বাহাদুর বলিলেন "মানে, মিস্টিসিজ্‌ম সম্বন্ধে আমি খানিকটা পড়াশুনা করছি। তোমরা একালে সব ভারী রিয়ালিস্ট হয়ে যাচ্ছো…এ ভাল নয়। রিয়ালিস্ট হয়ে থাকলে মনে মরচে ধরে—মন বিকল হয়। মিস্টিসিজ্‌মের দিকে লক্ষ্য রাখলে মন ধারালো থাকে। তার কারণ reason-এর ছোট্ট গণ্ডী ছাড়তে না পারলে আমাদের জ্ঞানের প্রসার বাড়বে না!"

সর্বনাশ! এই ভয়েই শরৎ এদিকে বড়-একটা আসে না। রায়বাহাদুর পড়িয়াছেন অনেক; জানেনও অনেক; কিন্তু সেই পড়া ও জানার ভার পরের মাথায় চাপাইতে পারিলে কাহাকেও ছাড়িয়া দেন না!

শরৎ বলিল "তা বেশ, আর এক-সময় আসব।"

রায়বাহাদুর বলিলেন "আর এক-সময় আবার কেন? এইত এখন এসেছ। এস আমার ঘরে…তোমাকে একটা মজা দেখাব…ইওরোপে আজ মিস্টিসিজ্‌মের কদর হচ্ছে খুব। কিন্তু এ মিস্টিসিজ্‌মের জন্ম কোথায় জান? In our higher

Hindu and Buddhist system. কথার কথা নয়···আলফ্রেড লায়ালের মত লোক পর্যন্ত বলে গেছেন, ভারতবর্ষের এক মূর্খ চাষাকে জিজ্ঞাসা কর—মানুষের লক্ষ্য কি? এতটুকু চিন্তা না করে সে জবাব দেবে,—মুক্তি···Liberation! অর্থাৎ Freedom of the soul from its bondage of union to the body, to anything that has sensation and its infinite spirit whence it issued."

রায়বাহাদুরের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইলেও শরতের ভয়ের সীমা রহিল না। ভাবিল, সকালে প্রথমেই তপনের সঙ্গে অপ্রিয় বিরোধ···তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপে রায়বাহাদুরের মিস্টিসিজ্‌ম দিনটা আজ কী করিয়া যে শেষ হইবে···

রায়বাহাদুর বলিলেন "এসো···"

শরৎ ভাবিল, দিন কাটা তো পরের কথা···এ মুহূর্তটা এখন কী করিয়া কাটে!

বুদ্ধি করিয়া সে বলিল "আজ্ঞে, একটু পরে এলে হয় না?"

—"একটু পরে!···কেন, এখন তোমার কাজ আছে?"

একটা ঢোক গিলিয়া শরৎ বলিল "আছে। মানে, অবুদার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে কিনা···সামনের এই বাইশে তারিখে—তাই মিস্ত্রীকে তাড়া দিতে হবে। আজ থেকে তাদের কাজে লাগানো চাই···বাড়িঘর সাফ করা···চুপোচ কলি বুলোনো—"

রায়বাহাদুর বলিলেন "ও···তা কত দেরি হবে তোমার?"

শরৎ কহিল "এই বিশ-পঁচিশ মিনিট···"

রায়বাহাদুর বলিলেন "বেশ···আমি এই সামনের রোয়াকেই থাকবোখন। তারপর তুমি এ-পথেই ফিরবে···তা বেশ···তোমার খুব ইনটারেস্টিং লাগবে হে! মানে, এ-সম্বন্ধে তোমাদের চর্চা করা দরকার!···করলে সমাজ, নীতি···এসবের অনেক ব্যবস্থা করতে পারবে। এই যে মরালিটি···এ মরালিটির সম্বন্ধে নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে নানা স্টাণ্ডার্ড! মিস্টিসিজ্‌মের ব্যাপার বুঝলে দেখবে the relation of mysticism to morality কি রকম peculiar!"

শরতের চমকের শেষ নাই! চমকের মধ্যেও একমাত্র চিন্তা, কী করিয়া নিস্তার পাই!

রায়বাহাদুর বলিলেন "জুবিকে বলি, কী নিয়ে সময় কাটাস?···সংসারে ছেলে মেয়ে নেই, স্বামী নেই! মানে, কারও কোন ঝক্কি সইতে হচ্ছে না···আমার মত ঝাড়া হাত-পা। আমার কাছে এসে বোস···বসে এ-গুলো পড়···যে আনন্দ পাবি, মশগুল হয়ে থাকবি! তা শোনে না!"

শরৎ বলিল "বুঝতে পারে না বলেই শোনে না।"

রায়বাহাদুর বলিলেন "আরে, কি করে বুঝবে যদি কোনদিন না শোনে? আমি জোর গলায় বলতে পারি, দুদিন বসে মন দিয়ে শুনুক, বিষয়টা জলের মত বুঝে ফেলবে! বুঝলে শরৎ, যা সত্য, তা বুঝতে মানুষের যেমন বেশী দেরি হয় না, তেমনি তা বুঝতে বেগ পেতেও হয় না!···"

শরৎ কহিল "নিশ্চয়! আমি তাহলে আসি। দেরি করব না।···মিস্ত্রীর কাছে যেতে দেরি হলে এখানে ফিরতেও দেরি হবে!"

রায়বাহাদুর বলিলেন "ও···তাহলে আর তোমাকে আটকে রাখবো না···তুমি এস।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শরৎ দ্রুতপায়ে অগ্রসর হইয়া গেল!···

ভাবিল, পলাইয়া আসিলে তো চলিবে না···জুবিলিকে খবর দেওয়া দরকার এবং সে যদি মনে করে, তাহারও সে সময় ও-বাড়িতে থাকা ভালো; তর্ক-বিতর্কে মনের আতঙ্ক কাটিবে। তার উপর চিঠিগুলা ও-রাসকেলের কাছ হইতে আদায় করা উচিত; নহিলে পরে কি যে ও না করিতে পারে···

বেশীদূর সে অগ্রসর হইল না; লক্ষ্য রাখিয়া রায়বাহাদুরকে যেমন একটু অসতর্ক দেখিয়াছে, অমনি সেই ফাঁকে ওদিককার দ্বারপথে প্রসন্নবাবুর গৃহাভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িল।

ঢুকিয়া সোজা দোতলায় উঠিল। জুবিলির ঘর জানে। একেবারে সেই ঘরের সামনে আসিয়া ডাকিল "জুবি আছো?"

স্নান সারিয়া জুবি বেশভূষা করিতেছিল···

বাড়িতে এক বুড়ী পিসীমা আছেন। বিধবা। তিনি বলেন, "বেশী সাজগোজ করিসনে—পাঁচজনে নিন্দে করবে। বরাত যখন ভেঙেছে···"

কিন্তু জুবির বহিয়া গিয়াছে সে-কথায় কান দিতে! সাজ-সজ্জায় তার চিরদিন ঝোঁক। এবং বিশ্বনাথ নামেমাত্র স্বামী ছিল—তার সম্বন্ধে সেই অপমান এবং পীড়ন ছাড়া স্মরণ করিবার মত আর কিছু নাই। কাজেই তাকে মনে করিয়া বেশভূষা ত্যাগ করিবার কথা জুবির মনে নিমেষের জন্য উদয় হয় না।

জুবি ডাকিল "এসো শরৎদা···"

শরৎ ঘরে আসিল···জুবির শিথিল বেশ···জুবি কেশ-প্রসাধন করিতেছিল···

ঘরে ঢুকিতে গিয়া শরৎ ফিরিতেছিল, জুবি বলিল "চললে যে?"

শরৎ কহিল "তোমার হোক, আমি বাইরে দাঁড়াই ততক্ষণ।"

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া জুবি আসিয়া শরতের সামনে দাঁড়াইল, কহিল "তার মানে?"

শরৎ মানে বলিল না।

জুবি বলিল "আমি চুল বাঁধছি···তাই ও-ঘরে দাঁড়াতে-বসতে তোমার বাধছে!"

শরৎ বিরক্ত হইল! জুবি বলে কি? বলিল "যদি বলি, বাধে?"

জুবি বলিল "তাহলে বলব, তুমি অধঃপাতে গেছ! আমাকে আজ নতুন দেখছো না শরৎদা···ছোট বেলায় তুমি নিজে কতদিন আমাকে তোমার ঐ হাতে সাজিয়ে দিয়েছ!"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিল "তোমাকে আমি এ তত্ত্ব বোঝাতে পারবো না জুবি! কিন্তু তর্ক আর করতে হবে না। আমি বসতে বা দাঁড়াতে আসিনি···একটা খবর দিতে এসেছিলুম।"

জুবি বলিল "কি খবর? তোমার সখী···না না বৌঠান কাবেরী দেবী, তোমাদের বাড়ি শঙ্খধ্বনি করে আসছেন, সেই খবর?"

শরৎ বলিল "পরের খবর দিতে আমি আসিনি। তোমার খবর দিতেই এসেছি। মানে, তোমার ব্যক্তিগত খবর।"

—"আমার ব্যক্তিগত খবর?"

জুবির স্বরে বিস্ময়···চোখে আশার চকিত উচ্ছ্বাস!

শরৎ কহিল "হ্যাঁ। তপনকে আজ এই মাত্র চ্যালেঞ্জ করেছি···তাকে স্পষ্ট বলেছি, তোমাকে যে-ভয় দেখিয়েছে আর অপমান করেছে তার শাস্তি দেবো! আমাদের বেশ ঝগড়া চলেছিল—মানে, যাত্রার দলের বাক্‌যুদ্ধ···এমন সময় অবুদা এসে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের তর্ক? আমি বলেছি, এ-লোকটিকে বন্ধু ভেবে ঘরে স্থান দিয়েছ, কিন্তু ও এমন অভদ্র যে ওর ছায়া মাড়াতে ঘৃণা হবে!···এ-নালিশের বিচার হবে আধ ঘণ্টা পরে। তুমি যদি মনে করো, আমাদের ওখানে আসতে পারো। চিঠিগুলোও ওর হাত থেকে আদায় করা চাই!"

জুবি বলিল "কিন্তু আমি···মানে, অবুদাকে সব বলেছো?"

—"বলিনি। বলবো।"

জুবি বলিল "না না,···তাতে আমার ভারী লজ্জা করবে। অবুদা যদি কিছু ভাবে?"

শরৎ বলিল "কী আবার ভাববে?"

জুবি বলিল "ও হল অবুদার বন্ধু···ওর কথায় অবুদা যদি ভাবে, ও···মানে, চিঠির মানে···আমি যা বলেছি···মিথ্যে?"

শরৎ কহিল "কেন তা ভাববে? আমি তা ভাবিনি।"

জুবি বলিল "তার মানে, তুমি আমাকে যেমন জানো, অবুদা তেমন জানে না!"

শরৎ কহিল "কে কি ভাববে, সে-কথা মনে করে যদি বসে থাকো, তাহলে সারাজীবন তোমার এ-ভয় কাটবে না···আর তাহলে আমার কাছেই বা সাহায্য চেয়েছো কেন? এর প্রতিকার করতে হলে মূল উৎপাটন করা দরকার!"

শরতের কথাগুলো একটু কঠিন, এবং তার মুখের ভাব গম্ভীর। জুবি ভাবিল, শরত যদি চটিয়া যায়? যদি বাঁকিয়া বসে? এই শরতের উপর জুবির কতখানি নির্ভর! কাজেই সে আর তর্ক করিল না, কণ্ঠস্বর সহজ শান্ত করিয়া বলিল "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না শরৎদা! তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো। তবে···"

জুবির স্বরে একটু কুণ্ঠা!

শরৎ বলিল "তাহলে আমি যা বলি করো। তোমার হলে তুমি বরং আমাদের ওখানে এসো···অবুদা থাকবে, তপন আসবে। তখন এর হেস্তনেস্ত করে ফেলবো। তোমার ভয়ের কাঁটা নিশ্চিহ্ন হবে।"

জুবি বলিল "তাহলে একটু দাঁড়াও। পাঁচ মিনিট! তার মধ্যে আমার হয়ে যাবে!"

শরৎ বলিল "আমি যদি এগুই?"

জুবি বলিল "ভয় নেই। তুমি বাইরেই দাঁড়াও। ঘরে দাঁড়াতে হবে না। তোমার যখন এত লজ্জা···"

কথাটা শরতের ভাল লাগিল না। জুবি ভাবিয়াছে কি? শরৎ বলিল "আমি বেশ আছি···তুমি সেরে নাও তোমার সাজসজ্জা···"

কথায় ছোট একটু শ্লেষের কাঁটা! সে-কাঁটা জুবির মনে বিঁধিল! জুবি বলিল "মানে, আমি স্বয়ংবর-সভায় যাবো বলে সাজসজ্জা করছি না···চান করে এলুম—চুলগুলো একটু ভদ্রভাবে আঁচড়ে নিচ্ছি। রোজই তাই করি···মুনি-ঋষির ধ্যান ভাঙতে যাই না কোনদিন!"

শরৎ কোন জবাব দিল না···চুপ করিয়া রহিল।

জুবি তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল···যেন উত্তরের প্রত্যাশায়।

শরৎ বলিল "দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও···"

জুবি বলিল "যাই!"

জুবি ঘরে ঢুকিল।···

তারপর দুজনে আসিল অবনীর গৃহে।

অবনী কহিল "কি হয়েছিল রে?"

শরৎ কহিল "তুমি জানো না অবুদা, এখানে তোমার অতিথি হয়ে বাস করছে মনে ও মস্ত দুরভিসন্ধি নিয়ে!"

—"দুরভিসন্ধি!" অবনী চমকিয়া উঠিল।

শরৎ কহিল "তাই!···তুমি জানো না, জুবির স্বামী বিশ্বনাথের ও ছিল বন্ধু···যাকে বলে অন্তরঙ্গ!"

অবনী কহিল "হুঁ···"

শরৎ বলিল "বিশ্বনাথ ছিল দারুণ পাজী! দুনিয়ার কাকেও কোনদিন ভালো চোখে ভদ্রভাবে ভাখেনি···জুবির উপর তার পীড়নের অন্ত ছিল না।"

অবনী রুদ্ধ নিশ্বাসে একাগ্র মনোযোগে শুনিল।

শরৎ বলিল "দু একবার তার অপমান এমন মর্মান্তিক হয় যে জুবি বেচারী সে-দুঃখের কথা ঐ হতভাগাকে বলে উদ্ধারের জন্যে মিনতি জানায়! চিঠি লিখে সে-মিনতি জানিয়েছিল। আজ তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়ে জুবিকে সেই সব চিঠি দেখিয়ে ও-রাসকেল ভয় দেখাচ্ছে···এবং মেয়ে-মানুষকে যে-কথা কোন ভদ্রলোক বলতে পারে না, যে-কথা বলতে ইতর-লোকও লজ্জা পায়, তেমনি সব কথা বলে অপমান করেছে! নিরুপায় হয়ে জুবি চেয়েছে সাহায্য আমার কাছে। এই সকাল বেলাই জুবির সম্বন্ধে ও আলোচনা জুড়ে দিয়েছিল! ভাবো একবার ওর আস্পর্ধার কথা!—ওর সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। আমি বলেছি ওর ঐ অভদ্র ইতরমি আমি শায়েস্তা করে দেবো।···"

অবনী বলিল "এমন! তা তো জানি না। মানে, কলকাতায় আমার সঙ্গে

আলাপ। খুব ফ্যাশনেবল্‌···সব রকম ব্যাপারে আছে। রেসের মাঠে···এম্পায়ারের চ্যারিটি-শোতে পর্যন্ত। কথাবার্তাতেও চমৎকার! ভারী সোশ্যাল···এটিকেট দুরস্ত···"

শরৎ বলিল "ওগুলোর দৌলতে ভদ্রসমাজের সদরে-অন্দরে দরজা খোলা পায়! তারপর ভিতরে এসে নিঃশব্দে ফাঁদ পাতবার অবসর খোঁজে। এ ধরনের ব্ল্যাক শীপের কথা বইয়ে পড়েছি অবুদা। ও-জীবকে তোমার এখানে এই সর্ব-প্রথম চোখে দেখলুম।"

অবনী বলিল "আসুক। এর হেস্তনেস্ত করা এখনি দরকার। সত্যি, জুবির ভবিষ্যৎ যাতে নিরাপদ নিঃশঙ্ক হয়, করা উচিত। ওর কে সহায় আছে? বুড়ো দাদু ···তিনি তো পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। এরপর জুবির সামনে সারা জীবন অকূল-পাথার হয়ে দেখা দেবে···"

অবনীর এই দরদের কথায় জুবির বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল! সজল নয়নে সে চাহিল অবনীর পানে।

অবনী সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিল, বলিল "ভয় নেই জুবি···তবে বড্ড delicate ব্যাপার। তপনের সঙ্গে এর শেষ করতেই হবে। তুমি কিন্তু এখানে থেকো না···you must be spared all shame, all indignities. মানে, এ-সব আলোচনা তোমার সামনে চলে না। তুমি চলে যাও।"

শরৎ বলিল "না অবুদা,—তুমি বোঝো না। জুবি থাকুক। ও থাকলে সে দুর্বৃত্তকে confront করা সহজ হবে!—জুবি না থাকলে সে মহা আস্ফালন তুলবে···নানা কথা বলবে···এ-ব্যাপারের মীমাংসাও হবে না।"

অবনী একবার চাহিল জুবিলির পানে, তারপর শান্ত স্বরে বলিল "থাকবে জুবি?"

মুখ নত করিয়া জুবি বলিল "থাকবো।"

—"তাহলে এখন তুমি মার কাছে যাও। সে এলে শরৎ তোমাকে ডেকে আনবে।"

মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া জুবিলি ভিতর-বাড়িতে গেল।

শরৎ বলিল "তুমি ভাবছো, তোমার ও-বন্ধুটি আসবে?"

অবনী বলিল, "কেন আসবে না? বলে গেল, আধ ঘণ্টা পরে···"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া শরৎ কহিল "কখ্‌খনো না। এ সব দুর্বৃত্ত দারুণ কাওয়ার্ড! ও face করবে তোমার সামনে ordeal? স্বপ্নেও ভেবো না।···আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি অবুদা, ঐ ঘোড়ার পিঠে বসে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা সে কলকাতায় চম্পট দিয়েছে!"

অবনী কহিল "না রে, না।"

শরৎ বলিল "নারে-না নয় অবুদা। আমি কাগজে-কলমে লিখে রাখছি বরং। যদি আমার কথা সত্যি না হয়, তুমি আমার দুটো কান ধরে সারা পথ ঘোড়দৌড় করিয়ে বেড়িয়ো।"

শরতের পানে দু'চোখের অবিচল দৃষ্টি ক্ষণকাল নিবদ্ধ রাখিয়া অবনী কহিল "ঘরে আয় শরৎ, তোকে একটা জিনিস দেখাবো।"

—"কি জিনিস ?"

সলজ্জ মৃদু হাস্যে অবনী বলিল "তোরা বলিস, সংসারে আমার মন নেই !···তোর যে-বৌদি আসছেন, তাঁর জন্যে একটা প্রেজেণ্ট কিনে এনেছি। কি চমৎকার গড়নের ডায়মণ্ড ব্রচ্ ! মার কাছে বলিসনে যেন ! আমার লজ্জা করবে।"

তপন ফিরিল না। আধঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টা কাটিয়া গেল, দেখা নাই—কোন খবর পর্যন্ত নাই !

বৈকালের দিকে শরৎ আসিয়া দাঁড়াইল মহালক্ষ্মী দেবীর কাছে। মহালক্ষ্মী দেবী ঠাকুরঘরে ছিলেন। বলিলেন "কি রে ?"

শরৎ কহিল "তোমার অনুমতি চাইতে এসেছি পিসীমা।"

—"কিসের অনুমতি ?"

কুণ্ঠিত জড়িত স্বরে শরৎ বলিল "একটা ভালো চাকরির দরখাস্ত করেছিলুম। তাদের ওখান থেকে চিঠি এসেছে···এইমাত্র পেলুম। আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "চাকরি ?"

—"হ্যাঁ। চিঠি দিয়েছে, তিন-চার দিনের মধ্যে চাকরিতে যোগ দিতে হবে।"

মহালক্ষ্মী দেবী কোন কথা বলিলেন না; শরতের মুখে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শরৎ বলিল "চাকরি এখানে নয় বোম্বাইয়ে। সেখানে একখানা খবরের কাগজ আছে—The Swan--সেই কাগজে অ্যাসোসিয়েট এডিটরের কাজ। মাইনে দেবে তিনশো টাকা আর থাকবার ঘর।"

এ-কথারও মহালক্ষ্মী দেবী কোন জবাব দিলেন না।

শরৎ বলিল "উন্নতি আছে। কাজে যোগ্যতা দেখাতে পারলে সাত-আটশো টাকা পর্যন্ত মাইনে হতে পারে।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "চাকরিই যদি করবি, বাঙলা দেশে চাকরি মিলবে না, হ্যাঁরে ?"

শরৎ বলিল "সে রকম করে চাকরি খুঁজিনি তো। কাগজে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখলুম···দিলুম একখানা দরখাস্ত ছেড়ে। লেগে গেল তুক্ ! আমার লাক্ আছে •••নয় ?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "যদি ভালো হবে মনে করে থাকিস, বারণ করবো না···আমি তো তোদের কোনকিছুতে থাকি না শরৎ···তোরা যা ভালো মনে করবি, করবি।···কিন্তু অবুর বিয়ে···তোর উপর এখন সব কাজের ভার···আর তুই চলে যাবি ?"

অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে শরৎ বলিল "বুঝি পিসীমা ! আমি জানতুম না, আমার দরখাস্ত তারা মঞ্জুর করে চাকরি দিয়ে এত শিগগির আমাকে যেতে লিখবে।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "তোমার কিন্তু অতদূরে চাকরি না নিলে ক্ষতি ছিল না বাবা!···আমাদের যা ধুলোগুঁড়ো আছে···বুঝে চললে তাতে কারও কোন দিকে অস্বাচ্ছন্দ্য হবার কথা নয়।"

শরৎ কহিল "তা নয় পিসীমা। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না! পুরুষমানুষ! যে-সামর্থ্য ভগবান দিয়েছেন, আর তোমরা সে-সামর্থ্য যে ভাবে গড়ে দিয়েছো, এ-বয়সে তার সদ্ব্যবহার না করলে অপদার্থ হয়ে যাবো!"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "কবে যেতে হবে?"

শরৎ কহিল "এখান থেকে বেরুতে হবে কাল। মানে, ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখ থেকেই তা হলে কাজে লাগতে পারবো।"

মহালক্ষ্মী দেবী কোন জবাব না দিয়া আপন-কাজে মন দিলেন।

শরৎ কহিল "তোমার অনুমতি না পেলে যেতে পারবো না পিসীমা।···তোমার এতে অমত বা আপত্তি নেই তো?"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "এ জীবনে কারও কোন কাজে কোন দিন মনে-জ্ঞানে আমি আপত্তি বা অমত জানাইনি শরৎ; তা তো জানিস। স্বামী···ছেলে···লোকজন ··কারও কিছুতে এতটুকু বাধা তুলিনি কোনদিন। তোকে আজ বাধা দেবো, এ-কথা তুই মনে আনিস কি বলে বাবা?"

শরৎ বলিল "তবু মুখের কথায় তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাবো না পিসীমা। আমার যাওয়া হবে না।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "বেশ, অনুমতি আমার রইলো।"

শরতের বুক জুড়িয়া যেন করুণ অশ্রুর লহর বহিল···সমস্ত বুক তাহাতে সিক্ত হইল।

টিপ করিয়া মহালক্ষ্মী দেবীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিয়া তাঁর দুই পায়ে মাথা ঘষিতে ঘষিতে শরৎ বলিল "তোমার কাছ থেকে বেশী দিন দূরে থাকতে পারবো না পিসীমা।···খেয়াল হয়েছে···দুদিন চাকরি করে খেয়ালের নিবৃত্তি করে আসবো।"

শরতের মাথায় দু'হাতে আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "আসিস··· আমার কথা মনে করে আসতে বলি না···যদি বুঝিস এলে ভালো হবে, তাহলেই আসিস। আমার মুখ চেয়ে নিজের কোন অসুবিধে করিসনে বাবা···"

এ কথায় শরতের দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। বাষ্পার্দ্র গাঢ় স্বরে শরৎ বলিল "মাটির পৃথিবীতে থেকে মাটির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কেন তুমি চলো পিসীমা? এতে আমার মনে কি কান্না উথলে ওঠে, তোমাকে তা কি করে বোঝাবো?···"

—"কাঁদিসনে···মাটির ছোঁয়াচ কোথায় বাঁচিয়ে চলি রে?···তোদের নিয়ে, তোদের এই মাটি কামড়েই তো আমি পড়ে আছি!···নে, যা—যেতে যদি হয়, গোছগাছ কর, নাহলে বিদেশে মহা অসুবিধায় পড়বি। ঘর ছেড়ে পিসীমার কোল ছেড়ে কখনও তো থাকিসনে! সেখানে পিসীমাকে পাবিনে! মাথা ঠাণ্ডা করে সব ঠিক্‌ঠাক্ করগে যা। টাকা-কড়ির যা দরকার, আমাকে বলিস! এখন যা আমাকে কাজ করতে দে।"

শরৎ চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল।

নিজেকে এমন নিঃস্ব, এমন অসহায় মনে হইতে লাগিল যে সে নিঃস্বতার ব্যথায় শরৎ আর্ত আতুর হইয়া উঠিল।

কোনমতে এখানে-ওখানে ঘুরিয়া সকলের দৃষ্টি বাঁচাইয়া নিজেকে লইয়া অস্থির হইয়া অনেকখানি সময় কাটাইয়া সন্ধ্যার পর শরৎ গঙ্গার ঘাটে আসিল। মাথার উপর দ্বাদশীর চাঁদ। নির্মল নির্মেঘ আকাশের বুক ছাপাইয়া পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না সারা পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘাটে লোকজন বেশী নাই। নীচেকার চাতালে এক তরুণ বসিয়া গান গাহিতেছে। তরুণ গাহিতেছে—

নাই, কেহ নাই, সাথী নাই—
পথে একা তুই ওরে যাত্রী!
বিপুল এ বিশ্ব—ওরে তুই নিঃস্ব,
কোথা যাস? সম্মুখে আসে ঐ রাত্রি!

সুরে কথায় এ গান যেন পাথরের মত বুকের উপর চাপিয়া বসিল! বুক যেন ফাটিয়া যাইবে, এমন সে পাষাণ-ভার!

শরৎ উঠিয়া পড়িল।

এবং লক্ষ্যহীন ভাবে পথে আসিল।

হঠাৎ সজোরে হাতখানা কে চাপিয়া ধরিল! কহিল "বন্ধু হে, পরমাত্মীয় মোর!"

চমকিয়া চোখ তুলিয়া শরৎ দেখে, যোগীন্দ্র ঘোষাল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আনমনে একা কোথা চলিয়াছ পান্থ?"

শরৎ হাসিল। মলিন হাসি! বলিল "এমনি···একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুম!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "ভারী বিপ্লব বাধিয়ে তুলেছো তো! তোমাদের ওখান থেকে আসছি। মানে, সেই কথা আছে না, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই? আমার ঠিক সেই দশা হয়েছে। সন্ধ্যার সময় গৃহিণী বললেন, জামাইয়ের আঙুলের মাপ আনো, আংটি দিতে হবে! গেলুম। গিয়ে আংটির মাপ নিলুম। সেই সঙ্গে খবর পেলুম, বিয়ের মিতবর নাকি চলেছে বোম্বাই এবং পরশু দিন!"

অপ্রতিভ ভাবে শরৎ কহিল "হ্যাঁ। মানে, হঠাৎ একটা ভালো চাকরি পেলুম কিনা···"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "চাকরি আমরাও একদিন পেয়েছিলুম লক্ষ্মণ-ভাই···হঠাৎ না পেলেও সেটা চাকরি এবং চাকরির ব্যাপারে গুরু গৃহকর্তব্য জানিয়ে দুচারদিন সময় পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়—বিশেষ সে-চাকরিতে যদি দূর থেকে গিয়ে যোগ দিতে হয়···"

এই পর্যন্ত বলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল শরতের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শরৎ বলিল "সে কি ভালো হবে? জানেন তো চাকরির বাজার আপনাদের সময়ে যে-রকম ছিল, এখন আর সে-রকম নেই?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "তা না থাকতে পারে! কিন্তু দু'এক হাজার দরখাস্তর মধ্য থেকে পাঞ্জাব-বোম্বাই-গুর্জর-মাদ্রাজ ছেড়ে বাঙলা দেশের শ্রীমান শরৎচন্দ্রের যখন

ও চাকরিতে ডাক পড়েছে, তখন নিয়োগকর্তারা শরৎচন্দ্রে এমন দীপ্তির পরিচয় পেয়েছেন নিশ্চয়, যার জন্যে ভারতের নক্ষত্রবৃন্দকে ছেড়ে তাঁরা বাঙলার চন্দ্রকে সেখানকার আকাশে বরণ করতে উদ্‌গ্রীব।"

শরৎ বলিল "ঢোকবার মুখেই ছুটি চাইবো?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এখানকার এ-সংবাদ তাদের লিখলে নিশ্চয় তারা সে-কথা রক্ষা করবে। কিন্তু এ নিয়ে পথে আলোচনা নয়—এসো আমার ওখানে। যোগীন্দ্র ঘোষালের কথায় তোমার মন যদি না টলে, ওখানে আছেন নর্মদা-কাবেরী—তাঁদের বিগলিত মিনতি-স্রোতে শরৎচন্দ্র বিচলিত হয় কিনা দেখি।"

কথাটা বলিয়া শরৎকে একরকম পাকড়াও করিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে পদার্পণ করিয়া দালানে ঢুকিয়া হাঁকিলেন "ওগো নর্মদা-কাবেরী···লক্ষ্মণকে বন্দী করে এনেছি।"

নর্মদা আসিল। কাবেরী আসিল।

নর্মদা কহিল "ব্যাপার কি? এমন করে চোরের মত ধরে রাখার মানে?"

কাবেরীর মুখ মলিন।···বুকে স্পন্দন!

যোগীন্দ্র ঘোষাল সংক্ষেপে চাকরির সংবাদ দিলেন, দিয়া বলিলেন "তোমরা বলে ছ্যাখো···বিয়ের সময় ইনি যদি এখানে না থাকেন, তাহলে বিয়ের অনেকখানি আনন্দ জখম হবে।"

কথাটি বলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল মাপের আংটি দিলেন নর্মদার হাতে; দিয়া বলিলেন "আংটি আঙুল থেকে খুলে এনেছি। এখন কাবেরীর আঙুলে পরিয়ে দাও, দয়িতের করস্পর্শে মনে আরাম পাবেন।"

নর্মদা কহিল "আংটি আমি রাখছি।" বলিয়া নিজের আঙুলে আংটি পরিল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "রত্নটিকে দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, আগুন! ভালো কাজ করলে না দেবী, তোমার এ-লোভ দেখে তোমার ভগ্নী কাতর হবেন।"

—"তুমি যাও তো···"

নর্মদার ভর্ৎসনায় যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "যাবো নিশ্চয়। জানি, নূতন পাইলে কেবা পুরাতনে চায়? হায় রে পুরাতন, তোর কর্তব্য এখন পলায়নে জীবনরক্ষা।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল চলিয়া গেলে নর্মদা কহিল "বোম্বাই যাচ্ছো? সত্যি?"

শরৎ কহিল "একটা চাকরি পেলুম। হঠাৎ। ভালো চাকরি। ছাড়া উচিত নয়।"

জবাব দিয়া শরৎ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার মুখ আনত।

নর্মদার বুকখানা চকিতের জন্য স্পন্দিত হইল। দালানে আলো জ্বলিতেছিল। নর্মদা কাবেরীর পানে চাহিল। কাবেরীকে কে যেন চাবুক মারিয়াছে—তার মুখ তেমনি মলিন, বিবর্ণ!

একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য শান্ত-সংযত করিয়া নর্মদা বলিল "সব কথা শুনবো ভাই। আমাদেরও অনেক কথা আছে। তুমি একটু বসবে চলো। হাতে আমার কাজ আছে, সে-কাজটুকু সেরে আমি আসছি। তুমি যেন্দ্ৰা পালিয়ো না!"

এই পর্যন্ত বলিয়া নর্মদা চাহিল কাবেরীর পানে, চাহিয়া বলিল "শরৎকে ওপরে নিয়ে বসা গে কাবেরী। ও যেন না পালায়! আমি এখনি আসছি। ছেলেমেয়ে দুটো এখনি খেতে বসবে···মাংসটা নামিয়ে আমি আসছি। দশ মিনিটের বেশী দেরি আমার হবে না। যাও ভাই, তোমরা দুজনে ওপরে।"

দুজনের কেহই একথা ঠেলিতে পারিল না। কথায় যেন মন্ত্র ছিল! সেই মন্ত্রবলে দুজনে পুতুলের মত দোতলায় চলিল।

কাবেরীর ঘরের সামনে ছোট ছাদ। শরৎ বলিল "বাইরে বসি। ঘরে বড্ড গরম। কি বলেন?"

কাবেরী কোন জবাব দিল না; ছোট একখানা সতরঞ্চ আনিয়া ছাদে বিছাইয়া বলিল "বসুন।"

শরৎ বসিল। কাবেরী একধারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছাদে গোটা-কয়েক টব,—টবে বেলফুলের গাছ। তাহাতে কতকগুলা ফুল ফুটিয়াছে। গন্ধে ছাদ ভরিয়া আছে। মাথার উপর দ্বাদশীর চাঁদ···শরৎ একবার আকাশের দিকে চাহিল। গঙ্গার ঘাটে গিয়া যখন বসিয়াছিল, দেখিয়াছিল এই চাঁদ কেমন যেন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া আছে···শরতের মনে একরাশ জমাট অন্ধকার দেখিয়া চাঁদ যেন অধীর আকুল···জ্যোৎস্নাধারায় সে অন্ধকার কাঁসাইয়া চুর করিয়া দিবে! এখানেও সেই চাঁদ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। এখানেও চাঁদের চোখে সেই অধীর-আকুল দৃষ্টি! চাঁদ যেন শরতের মনের অন্ধকার সহিতে পারিতেছে না!

শরৎ ভাবিল, এ-অন্ধকার কি ভালো লাগে?

ভালো না লাগিলেই বা উপায় কি?

তবু মনে হইল, তার মনের এ-অন্ধকারে এখানকার আকাশ-বাতাস কেন মিছা ভরিয়া তোলে!

তাই সে কাবেরীর পানে চাহিল। ছাদের আলিসা ধরিয়া কাবেরী দাঁড়াইয়া আছে···নিঃশব্দ, স্থির···ছায়ার মত!

শরৎ বলিল "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন!"

ছোট একটা নিশ্বাস কাবেরী রোধ করিতে পারিল না। নিশ্বাসের বাষ্পেভরা মৃদু কণ্ঠে কাবেরী বলিল "কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

শরৎ বলিল "কষ্ট না হতে পারে। কিন্তু ভারী অশোভন দেখাচ্ছে।"

কাবেরী আর একটা নিশ্বাস ফেলিল।

শরৎ লক্ষ্য করিল। বলিল "সম্পর্কে আপনি আমার গুরুজন!"

কাবেরী কোন কথা বলিল না···উন্মনা অন্য দিকে তাকাইয়া রহিল।

কাবেরী কি ভাবিতেছে? ক'দিন ধরিয়া কাবেরী যেন কেমন! শরৎকে পাইলে যে-কাবেরীর কণ্ঠ মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইত, সে-কাবেরী এমন্ চুপচাপ থাকে কেন?

শরৎ বলিল "আজ এই একটা দিন না হয় আমার কথা শুনলেন, উপদ্রব সহ্য করলেন!"

কাবেরী চাহিল শরতের পানে। আকাশের জ্যোৎস্নার উপর কেমন মলিন ছায়া পড়িল!

শরৎ বলিল "কাল-পরশু বোধ হয় আমাকে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে যেতে হবে। কতকাল হয়তো দেখা হবে না। জ্বালাতন করতে আসবো না! কখনো হয়তো আর দেখাই হবে না। তাই বলছিলুম, শেষ-দিনটায় আমার কথা রেখে না হয় বসলেন!"

এ-কথায় কাবেরীর কি যে মনে হইল…

সে আর এক-মুহূর্ত বিলম্ব করিল না, যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই বসিল।

শরৎ বলিল "এতবড় সতরঞ্চিখানায় বসবার জায়গা হল না?"

কাবেরী কোন জবাব না দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মুখ আনত।

শরৎ নীরব রহিল। কাবেরীও নীরব।

এ নীরবতা দুজনের কানে প্রচণ্ড কোলাহলের মত বাজিতে লাগিল। পৃথিবীর যত কোলাহল একসঙ্গে মিশিয়া মনের উপর যেন দারুণ হট্টগোল জুড়িয়া দিয়াছে!

হঠাৎ এক-সময় কি ভাবিয়া কাবেরী কথা কহিল। বলিল "সত্যি আপনি বোম্বাই যাচ্ছেন?"

শরৎ কহিল "হ্যাঁ।"

—"চাকরি করতে?"

শরৎ বলিল "তাই।"

—এ-চাকরির চেষ্টা কদ্দিন চলছিল?"

শরৎ কহিল "কদিন আগে একটা বিজ্ঞাপন দেখে হঠাৎ একখানা দরখাস্ত পেশ করেছিলুম…কিন্তু আপনি মুখ নীচু করে গম্ভীর হয়ে কথা বলছেন যে! আমার মুখ দেখবেন না…পণ করেছেন?"

কাবেরীর দেহ-মন এ-কথায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে-কাঁপনের বেগে মাথা ঘুরিয়া বুঝি পড়িয়া যাইবে! প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সে আঁটিয়া রাখিল। মাথা ঘুরিলে চলিবে না।

কাবেরী কহিল "না।"

কণ্ঠতালু শুকাইয়া টাক্‌রার কাছটা জ্বলিয়া যাইতেছে। রসনা শুষ্ক! কণ্ঠনালী পার হইয়া স্বর বাহির হইতে পারে না!

শরৎ বলিল "বিয়ের সময় থাকতে পারবো না, এ-দুঃখ আমার বুকে কাঁটার মত বাজছে! ভাবিনি, দরখাস্তর জবাবে মঞ্জুরী পরোয়ানা আসবে! অবুদা এখনও এ-

কথা শোনেনি। শুনলে রাগে সে কাঁই হয়ে উঠবে। অবুদা আমাকে ভালোবাসে। নিজের সহোদর ভাই থাকলে যেমন ভালোবাসতো, তেমনি···”

কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কাবেরী কহিল “এত যদি বোঝেন, তাহলে যাচ্ছেন কেন এখন? আমার দাদাও তো বললেন, তাঁদের লিখে দিন, দু'দিন পরে যাবেন।”

শরৎ শুধু বলিল “হু···”

তারপর আর কোন কথা নয়। কাবেরীও নীরব।

শরৎ একটা নিশ্বাস ফেলিল! নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “আপনারো মনে দুঃখ হবে, বিয়ের সময় আমি থাকবো না বলে?”

একটু থামিয়া কাবেরী বলিল “হবে।”

স্বর খুব মৃদু···কথাটা যেন বাহির হইতে চাহে নাই, কাবেরী জোর করিয়া ঘাড় ধরিয়া কথাটাকে বাহির করিয়াছে!

শরৎ বলিল “আমার মনেও দুঃখ হচ্ছে না, ভাবেন? খুব দুঃখ হচ্ছে। অবুদাকে আমিও ভালোবাসি। অবুদার সন্তোষের জন্যে আমি···”

বাষ্পোচ্ছ্বাসে শরতের কথা বাধিয়া গেল। সে চুপ করিল।

কাবেরী তার পানে চাহিল। শরতের মুখ মলিন, ম্লান।

কাবেরীর বুকের মধ্যে কি হইতেছিল, অন্তর্যামী জানেন!

কাশিয়া কণ্ঠ সাফ করিয়া শরৎ বলিল “কিন্তু এখন আর সে ব্যবস্থা চলে না। বিয়ের সময় আমার থাকা হবে না।”

শরৎ চুপ করিল। কাবেরীর মুখে কথা নাই—বুকের মধ্যে রক্তস্রোত ফুঁসিয়া তীব্র-তরঙ্গে বহিতেছে!

দূরে কে গান গাহিতেছিল—না ছিল তার কণ্ঠ, না সুর জ্ঞান।

কাবেরীর মন মুহূর্তে অধীর···মনে একটা প্রশ্ন উত্তাল হইয়া জাগিল। কেন থাকা হইবে না? কেন শরৎ থাকিবে না?···গল্প-উপন্যাসে যেমন পড়িয়াছে, বিবাহের দিন ···তাই?

কিন্তু কি করিয়া এ-প্রশ্ন তুলিবে? মনে হইল, জানিয়া লাভ? জানিলে মনের এ-ঝড় যদি বাড়িয়া ওঠে? কাজ নাই।

মনকে চড় মারিয়া থামাইতে চাহিল। মন থামিতে চায় না!

কোনমতে স্খলিত স্বর বাহির হইল। শবতের পানে চাহিয়া কাবেরী এক-নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল “আমি যদি বলি, থাকুন?”

শরতের মুখে বিবর্ণতা! চাঁদের আলোয় সে-বিবর্ণতা কাবেরী লক্ষ্য করিল।

শরৎ জবাব দিল না।

কাবেরী বলিল “আমাকে বলবেন, কেন আপনার থাকা হতে পারে না?”

শরতের বুকে কাবেরীর এ-কথা কশার মত তীব্র হইয়া বাজিল! শরৎ বলিল “থাকা সম্ভব নয়।”

তারপর কি ভাবিয়া শরৎ আবার বলিল "এ-বিবাহে আমার কত আনন্দ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের দুজনের এ মিলন অক্ষয় হোক, সুখময় হোক! আমি সে সময় না থাকলেও আমার শুভ ইচ্ছা এ-রাত্রিটিকে ঘিরে থাকবে।...কিন্তু ক্ষমা করবেন, আপনি আমাকে থাকতে বলবেন না। আমি থাকতে পারবো না। আমায় বোম্বাই না গেলেই নয়। আমার না-থাকার জন্যে আপনাদের মনে দুঃখ হবে জানি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ-দুঃখ আমার বুকে বাজবে আপনাদের দুঃখের চতুর্গুণ হয়ে!"

কাবেরী কোন কথা বলিল না...নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

এ-নিঃশব্দতার মধ্যে নর্মদা আসিয়া দেখা দিল। নর্মদা বলিল "একটু মাংস খাবে ভাই? রেঁধেছি ছেলেদের জন্যে।"

শরৎ কহিল "খেলে আপনার খুব আনন্দ হবে?"

নর্মদা বলিল "তা আর হবে না? নিজের হাতে খাবার তৈরি করে যাদের ভালোবাসি, তাদের খাওয়াতে পারলে কত-খুশী হই, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে বুঝতে পারতে!"

শরৎ হাসিল। মৃদু হাসি। বলিল "মেয়েমানুষ না হয়েও তা বুঝতে পারছি। মাংস আমি খাবো।"

নর্মদা কাবেরীর পানে চাহিল, বলিল "তুই তা হলে যা একবার ভাই, এক বাটি মাংস আর ঠাকুরকে দিয়ে খানকতক লুচি ভাজিয়ে এইখানে আন। এইখানেই বসে খাবে। চাঁদের আলো আছে, হাওয়া আছে।"

দিদির কথায় কাবেরী উঠিয়া গেল।

কাবেরী চলিয়া গেলে নর্মদা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর ডাকিল "শরৎ..."

শরতের মনে কিসের তরঙ্গ বহিতেছিল, এ আহ্বানে সে নর্মদার পানে চাহিল। নর্মদা বলিল "একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। সত্যি জবাব দেবে?"

শরতের বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

নর্মদা বলিল "কাবেরীকে তুমি ভালোবাসো?"

মাথার উপর হঠাৎ যেন রাজ্যের অন্ধকার...সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চাঁদখানা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল! চারিদিকে কালো অন্ধকার! জমাট-কালো! সে অন্ধকারে শরৎ যেন অবলম্বন হারাইয়া পড়িয়া যাইবে।

নর্মদা কহিল "আমাকে বলো।"

শরৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আপনাদের স্নেহের আমি অযোগ্য, আপনাদের এখানে আসবার যোগ্যতা আমি হারিয়েছি। আমি নরাধম!"

উচ্ছ্বসিত ভাষা চকিতে থামিয়া গেল। শরৎ চুপ করিল। একসময় মনে হইল, এ সে কি বলিতেছে? এ তো তার কথা নয়...এ-ভাষা নভেল হইতে চুরি করিয়া অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতেছে!

নর্মদা কহিল "এ বয়সের মেলামেশায় পরস্পরকে ভালো লাগলে ভালোবাসা হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ভাই। কিন্তু শুধু এই ভালোবাসা নিয়েই তো সংসার নয়। এখানে অনেককেই আমাদের ভালো লাগে। তাই বলে সেই ভালোলাগার সঙ্গে-সঙ্গে এরকম সর্বগ্রাসী ইচ্ছা মনে জাগলে সংসারে বাস করা সম্ভব হবে না তো। বুঝছি তোমাদের দুজনের দুজনকে ভালো লাগে। আর তুমি বুঝেছো, এ ভালোলাগাকে আরও বেশী প্রশ্রয় দিলে মনে দুঃখের পরিমাণ বাড়বে শুধু···অশান্তি সীমাহীন হয়ে উঠবে, তাই দূরে যেতে চাইছো! তোমাকে বাধা দেবো না। কিন্তু বিয়ের পরে গেলেই ভালো হত। মনকে এত কেন দুর্বল ভাবছো? বিয়ের দিন উপস্থিত থাকলে মন ভেঙে যাবে, সেজন্যে থাকতে পারবো না···এ সব হল নভেলী কথা·· নিছক আজগুবি কল্পনা! মানুষ হও। কাবেরী যদি বুঝতে পারে, ওর জীবনে হয়তো নানা বিরোধ জাগবে। মেয়েমানুষের মন বড় নরম···অনুকম্পা প্রবল হলে ভালোবাসা জাগে!···এ ক'টা দিন থেকে তারপর তুমি বোম্বাই যেয়ো। হাসিমুখে এ-বিয়ে ত্যাখো। এ-বিয়েতে করাও কর্মাও···তা হলে দেখবে, নিজের মন পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর কাবেবীর মনে যদি এক বিন্দু ছায়া পড়েও থাকে, সে-ছায়া মিলিয়ে যাবে···তার জীবনে কোথাও এতটুকু চাড় পড়বে না!"

একান্ত মনোযোগে শরৎ কথাগুলি শুনিল।

নর্মদা বলিল "তোমাকে বলেই বলছি। জানি খাঁটি সোনায় তৈরী তোমার মন··· তাই বলছি। আমারও মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো কাবেরী তোমায় ভালোবাসে। কিন্তু সে-ভালোবাসাকে এখন সার্থক করা চলে না তো। অবনীর সঙ্গে বিয়ের কথা যদি না হতো, আর' সেকথা যদি এমন পাকা হয়ে না উঠতো, কোন বাধা ছিল না! কিন্তু এখন তা হবার নয়। এবং তা যখন হবার নয়, তখন তুমি পুরুষ-মানুষ, তোমার মনের জোর কাবেরীব মনের জোরের চেয়ে অনেক বেশী। তোমার উচিত, কাবেরীর মনে যদি কোন স্বপ্ন জেগে থাকে তো সে-স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে সত্য-জীবনকে বরণ করে নিতে তাকে সাহায্য করা! নাহলে এ সব triangle-এর সৃষ্টি···ঘর-সংসারে তা হয় না ভাই। ও-সৃষ্টি চলে নাটকে-নভেলে। যা হয় না, নাটক-নভেলের কারবার তাই নিয়ে। আমাদের সত্যকার জীবনে যা হয়, যা হওয়া উচিত, যা হলে কারও মনের কোণে চাড় পড়বে না, এমনি ভাবে চলা উচিত।···"

শরৎ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না।···

কথা শেষ করিয়া শরতের মুখের পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া নর্মদা প্রশ্ন করিল "থাকবে তাহলে? তারপর বিয়ে হয়ে গেলে···"

শরৎ বলিল "থাকবো।"

নর্মদা বলিল "তোমার এ-কথা শুনে ভারী খুশী হলুম ভাই। যদি বলতে—না, থাকবো না···তোমার উপর আমার ধারণা বদলে যেতো!···মনে বড্ড আঘাত পেতুম। ···এই তো মানুষের মত কথা···মানুষের মত আচরণ!"

উচ্ছ্বসিত আবেগে শরৎ নর্মদার পায়ে হাত দিল, দিয়া বলিল "আপনি আমার

দিদি…সত্যিকারের দিদি! আমার যে-উপকার করলেন…জীবনকে এবার থেকে জীবন বলেই আমি মানবো।"

নর্মদা নিশ্বাস ফেলিল।

কাবেরীর পৃথিবী কিন্তু দুলিয়া উঠিল! শরৎ বোম্বাই চলিয়াছে…বিবাহে থাকিবে না… থাকা তার চলে না! তাহার কারণ…

যে-কথা কাঁটার মত মনে বিঁধিতেছে…

অবনীর কতটুকু কাবেরী জানে? একদিন না চিনিয়া তার উদ্দেশে তীব্র দুটা মন্তব্য করিয়াছিল…একটু অভিযোগ! সে-অভিযোগ কাবেরী করিয়াছিল বয়সের উগ্রতায়, নিমেষের উত্তেজনায়! সে-কথা অবনী এমনভাবে মানিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব!…এ ভালোবাসা?…অবনীর দিক্ হইতে ভালোবাসা হইলেও কাবেরী…?

অবনীকে ভালোবাসিয়া এ-বিবাহের কথায় খুশী-মনে সে সায় দিয়াছে, এমন কথা বলা চলে না! মানুষ মানুষকে ভালোবাসে কখন? তাকে ভালোরকম জানিলে… তার মনের অনেকখানি পরিচয় পাইলে, তবে! অবনীর সে কি জানে? কতটুকু জানে!

আর শরৎ…কিভাবে কাবেরীর মনকে অধিকার করিয়াছে!

শরতের টাকা-কড়ি নাই। না থাক, শরৎ একজন মানুষ!…তার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে। সকলের চেয়ে বড় কথা, তার মন আছে। সে মনটাকে কাবেরীর ভালো লাগে। জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে মানুষের কত পয়সা-কড়ির প্রয়োজন? কুবেরের ঐশ্বর্য পাইয়া ঐ তো মহালক্ষ্মী দেবী বসিয়া আছেন! স্বামী, পুত্র, সংসার… কোনটাকেই পান নাই! যে-মানুষ পাথরের বিগ্রহকে সার করিয়া লয়…কত দুঃখে মানুষের কাছে ব্যর্থতার কতখানি আঘাত পাইয়া পাথরের পায়ে সে মাথা রাখে, কাবেরী বোঝে।

সারা রাত্রি নানা চিন্তায় মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সকালে মলিন মুখে আসিয়া কাবেরী বসিল নর্মদার কাছে।

কাবেরীর মুখের পানে চাহিবামাত্র নর্মদা শিহরিয়া উঠিল! কাবেরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুখে কথা নাই!

নর্মদাকেই কথা কহিতে হইল। এ নিঃশব্দতা তার বুকে পাথরের মত ভারী বোধ হইতেছিল!

নর্মদা বলিল "মুখ-চোখ ভারী হয়ে রয়েছে! ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?"

কাবেরী একটা নিশ্বাস ফেলিল…কোন কথা বলিল না।

নর্মদার মনে দুশ্চিন্তার কাঁটা…

নর্মদা বলিল "শরৎ একটু পরে আসবে বলে গেছে। তুই নেয়ে নে…"

এ-কথা কাবেরী শুনিয়াছে বলিয়া মনে হইল না! শেষে দায়ে পড়িয়া নর্মদা বলিল "কি হয়েছে বল তো? মনের মধ্যে অন্ধকার পুষে রাখিসনে…"

এতটুকু বিবেচনা না করিয়া কাবেরী একেবারে বলিয়া বসিল "তোমরা এ-সব উদ্যোগ বন্ধ করে দাও দিদি।"

—"কিসের উদ্যোগ? বিয়ের?"

নর্মদার দু'চোখ কপালে উঠিয়াছে!

কাবেরী বলিল "হু…"

—"তার মানে?"

কাবেরী বলিল "বিয়ে নাই বা করলুম! আমি অনেক ভেবেছি। বড়লোকের বাড়ির বৌ হলেই ভাবো আমার জন্ম সার্থক হবে?"

নর্মদার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এ-সব কি কথা!

নর্মদা বলিল "বুঝেছি…তোমার মনে নাটক-নভেল জমেছে।"

কাবেরী বলিল "নাটক-নভেল নয়…"

নর্মদা বলিল "নয় তো কি? মনে হচ্ছে, শরৎকে ভালোবাসো…সে-বিহনে জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে!"

নর্মদার কথাগুলা বুকে পাথরের মত কঠিন হইয়া বাজিল! কাবেরী কোন কথা কহিল না!

নর্মদা বলিল "একজনকে বুঝিয়ে যদিবা তার মাথা ঠাণ্ডা করলুম…এখন নাও, আর-একজন!"

কথাটা বলিয়া নর্মদা থামিল, তারপর কাবেরীর মুখে দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল "শরৎকে ভালোবাসো, তাই, অবনীর সঙ্গে বিয়ে হবে না, এই কথা বলতে চাও?"

কাবেরী কোন জবাব দিল না, মাথা নত করিয়া রহিল।

নর্মদা কাছে সরিয়া আসিল, চারিদিকে চাহিয়া শান্ত মৃদু স্বরে বলিল "একটা সংসার …জীবন্ত সংসার কাবেরী, এ-কথা মনে রেখো। যে-love কথাটাকে বড় করে ধরছো, শুধু সেই loveটুকু নিয়েই সংসার চলে না। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমাজ—পাঁচ-জনকে নিয়ে সংসারে বাস করতে হয়। এ বিয়ের কথা অনেক দিন থেকে চলে আসছে, অ্যাদ্দিন তাহলে এ-কথা কেন বলোনি? ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন…তাছাড়া অবনীর অপরাধ? তার সঙ্গে কোনদিন কথা কওনি, মেলামেশা করোনি…শরৎকে ভালোলেগেছে…তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছো বলে।…যার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে, তাকেই এমন ভালোবাসতে হবে, এ কি কথা! এমন মনে হলে লোকালয়ে বাস করা চলবে না…বনে গিয়ে বাস করতে হবে।"

কাবেরী চুপ করিয়া রহিল—যেন কাঠের পুতুল!

নিশ্বাস ফেলিয়া নর্মদা বলিল "যেটাকে ভালোবাসো ভেবে মনকে আকুল করে তুলেছো—সে ঠিক ভালোবাসা নয়! আমাদের দেশে কোন স্বামী-স্ত্রীই পরস্পরকে

আগে থেকে ভালোবেসে বিয়ে করে না···বিয়ের পর পরস্পরে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। গরিব দুঃখীর সংসারে এ বিয়ে হচ্ছে—বড়লোকের সংসারেও এই বিয়ে। যাকে ভালোবাসো, বুঝছো তো, তাকে বিয়ে করতে পারবে না···তাকে বিয়ে করা চলে না। তাই যখন, তখন মন থেকে তাকে বার করে দাও। না দিলে শুধু তোমার জীবনই নষ্ট হবে না—যে বেচারার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা, তার জীবনকেও নষ্ট করে দেবে। অথচ তার কোন দোষ নেই! তুমি ভাবছ, মন তা পারবে না···আমি বলছি, পারবে। এ শুধু মনের একটা খেয়াল···মোহ···ব্যাধি! এ ব্যাধি পুষে রাখলে চলবে না···জোর করে এ ব্যাধি তাড়াতে হবে। এই যে আমরা নভেল-নাটক পড়ি, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাস করছে···হয়তো স্বামী তেমন ভালো নয়, স্ত্রীর মুখের পানে চায় না···এ-অবস্থায় স্বামীর এক বন্ধু স্ত্রীকে দরদে মুগ্ধ করে ফেলেছে! তাই বলে স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রী সেই বন্ধুর কাছে ছুটে যাবে? নভেলে এ-কথা পড়ি বলে সংসারেও তাই করতে হবে? তারপর দুদিন বাদে সে-বন্ধুর দরদে যদি ভাঁটা পড়ে, তখন সে বন্ধুকে ছেড়ে আবার একজন দরদীর আশ্রয় নিতে যাবে! এমন ভঙ্গুর মন নিয়ে সংসারে কোন লোক বাস করতে পারে না। এমন যার দুর্বল মন—দাঁড়াতে গিয়ে আরেকজনকে প্রতিপদে অবলম্বন চায়,—আর সে-অবলম্বন না পেলে ভেঙে মচকে যায়, তার মত দুঃখী জগতে আর কে আছে?···শোন্ আমার কথা···মনের এ-ব্যাধি ঝেড়ে ফ্যাল। শরৎকে ভালোবাসিস্, খুব ভালো কথা। সে অবনীর ভাই···স্বামীর ছোট ভাই···দ্যাওর··· ভালোবাসার পাত্র। নিশ্চয় তাকে ভালোবাসবি! তা বলে···”

নর্মদা চুপ করিল। কাবেরীর দু'চোখে জলধারা।

নর্মদা বলিল “কি বলো? বিয়ে ভাঙার কথা যদি বলি···অবনীর মন ভেঙে যাবে ···অবনীর মার মন ভেঙে যাবে। তাছাড়া চারদিকে একটা টিটি পড়ে যাবে।···মন যা চায়, অনেক সময় আমরা তা করতে পারি না···তার কারণ, আর-পাঁচজনে লজ্জা দেবে, নিন্দা করবে, ব্যথা পাবে এই ভেবে! এ-সব উপেক্ষা করলেই যে মনের শক্তির পরিচয় দেওয়া হয় সব সময়, এ-কথা আমি মানি না! অনেক কাজে পাঁচজনের মুখ চেয়ে মনকে চালাতে হয়···না হলে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি···সেই কথাটাই মনে জাগে···“সংসার সংসার থাকে না, অরণ্য হয়।”

কাবেরী তেমনি চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। দু'চোখে তেমনি ধারা!

নর্মদা বলিল “তুমি বলবে, ভালোবাসার নৈরাশ্য! সে-কথাও না হয় মানলুম···কিন্তু এর চেয়ে কত বড় বড় নৈরাশ্য সয়ে মানুষকে সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়···বলো তো! কেন দাঁড়ায়? সংসারে কর্তব্য শুধু আমাদের নিজেদের উপরই নয়, আর পাঁচজনের ওপরেও পাঁচটা কর্তব্য আছে! নিজে নৈরাশ্যের বেদনা পেয়েছি বলে সব বন্ধন কেটে, কর্তব্য ছেঁটে দেবো। এ-কথা আর যে বলে বলুক তোমার মুখে এ-কথা শুনবো বলে মনে করিনি। তুমি লেখাপড়া শিখেছো, তোমার বুদ্ধি আছে, জাগ্রত জীবন্ত মন তোমার···সব দিক্ দিয়ে বিচার করো কাবেরী। একটা ক্ষণিক মোহ পুষে রেখো না।···তা ছাড়া আমি বলছি, মনকে শক্ত করো···বিয়ে হয়ে গেলে দেখবে,

অবনীকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবেসেছো। আজকের কথা মনে হলে নিজেই তখন হাসবে। ভাববে, সত্যি, তিলকে তাল করে কী পাগলামিই করছিলুম! মন-গড়া দুশ্চিন্তা আর নৈরাশ্যকে এত বড় করে তুলেছিলুম!···আমার কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখো। আমাদের অন্যায়, ডাগর বয়সের ছেলেমেয়েদের মিশতে ছেড়ে দিয়েছি অথচ এদিকটা একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের মনে এ চেতনা জাগাইনি!"

কাবেরী নিশ্বাস ফেলিল···বড় নিশ্বাস।

নর্মদা বলিল "আর যদি ভেবে থাকো, না, এ ভালোবাসা জলের দাগ নয়, পাথরের উপর দাগ টেনেছো···সে দাগ মোছবার নয়, মিলিয়ে যাবার নয়···তাহলে"

নর্মদা চুপ করিল···তাহার বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

সে আবার বলিল "তাহলে বলো, আমি যাই ও-বাড়িতে মহালক্ষ্মী দেবীর কাছে। গিয়ে তাঁকে সব কথা বলে শরতের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করি! তোমার বিয়ে আমরা দেবোই, এ-কথা মনে নিশ্চিত জেনো। কি বলো, তাই করি?"

কাবেরী বলিল "না।"

স্বর কম্পিত, বাষ্পে জড়িত।

নর্মদা বলিল "না কেন? মন তাই যদি চায়?"

কাবেরী বলিল "না।"

নর্মদা বলিল "কাল অনেক রাত পর্যন্ত শরতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে বুঝেছে! সে বললে, সত্যি কথা দিদি···ছেলেবয়সের মোহ···আনাড়ি মনের প্রচণ্ড দুর্বলতা···এর প্রশ্রয় দেবো না···দেওয়া উচিত নয়?"

কাবেরী শুনিল, শুনিয়া আর একটা নিশ্বাস ফেলিল···

নর্মদা বলিল "কাল তোমার পাকা দেখা। কেলেঙ্কারি না হয়···মন স্থির করে আজকের মধ্যে আমায় বলো। তোমার মানইজ্জত, আমাদের সকলের মান-ইজ্জত··· তোমার ঐ একটি জবাবের উপর নির্ভর করছে, জেনো।"

সে-দিনটা নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

পরের দিন সন্ধ্যায় পাকা-দেখার ঘটা। ও-বাড়িতে সমারোহ চলিয়াছে···সে-সমারোহে শরৎ কর্মকর্তা।

বেলা বারোটার পর স্নান সারিয়া শরৎ আসিল নিজের ঘরে, আসিয়া দেখে, জুবি কাঠ হইয়া বসিয়া আছে।

তার পানে চাহিবামাত্র শরতের বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। শরৎ বলিল "আর ভয় নেই জুবি···সে-রাসকেলটাকে দেশ-ছাড়া করেছি। অবুদাকে তার পরিচয় বলেছি সবিস্তারে···"

জুবি একাগ্র মনোযোগে এ-কথা শুনিল। তার দু'চোখ ঝকঝক করিতেছে···পিছনে স্তম্ভিত অশ্রু! ঝরিবার জন্য সে-অশ্রু যেন মৃদু আঘাতের প্রতীক্ষায় আছে!

চোখের সে-দীপ্তি শরৎ লক্ষ্য করিল···দীপ্তির হেতু নির্ধারণ করিতে পারিল না।

শরৎ থামিল, তারপর বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় চিরুণী চালাইতে চালাইতে বলিল "আর কোন কথা আছে ?"

জুবি বলিল "তুমি খেয়ে-দেয়ে নাও···তারপর পাঁচ মিনিট তোমার সময় হবে ? মানে, আমার কথা শোনবার ?"

শরৎ বলিল "বেশ···"

জুবি বলিল "তাহলে তোমার ঘরেই আমি বসি। তোমার আপত্তি আছে ?"

কথার ভাষায় এবং স্বরের মিনতি-করুণতায় শরৎ মনে ব্যথা পাইল।

বেচারী জুবি···জীবন্ত-মনের তরুণী নারী···মনের ব্যথা লইয়া তার পাশে আসিয়াছে! এই বয়সেই জীবনের সব সাধ-আশা আকাঙ্ক্ষা-বাসনায় নিঃশেষ নির্বাণ-ধূপ জ্বালাইয়া দিয়াছে!

শরৎ বলিল "না না, আপত্তি কিসের ? তবে আজ যে রকম ছুটোছুটি···"

জুবি বলিল "তা দেখছি।"

আরও অনেক কথা মনে আসিয়াছিল, সে-কথাগুলাকে জুবি সবলে কণ্ঠমধ্যে চাপিয়া রাখিল, বাহির হইতে দিল না।

চটপট আহারাদি সারিয়া শরৎ ফিরিয়া আসিল। জুবি ঠিক সেই জায়গাটিতেই বসিয়া আছে···কে যেন সে-জায়গায় স্ক্রুপ আঁটিয়া তাকে একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত করিয়াছে!

শরৎ কহিল "এবার বলো তোমার কথা···"

জুবি বলিল "বসো···"

শরৎকে বসিতে হইল।

জুবি বলিল "হয়তো আমাকে খুব নির্লজ্জ ভাববে! কিন্তু আমি নিরুপায়!"

শরতের বুকখানা আর একবার ধক্ করিয়া উঠিল।

জুবি বলিল "আমার ভার নেবে বলেছিলে···মনে আছে ?"

শরৎ বলিল "হ্যাঁ। তার একটা দায় থেকে তোমাকে মুক্ত করেছি···তপন আর আসবে না। আবার এসে যদি জুলুমের সৃষ্টি করে, জেনো, আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন অনিষ্ট সে করতে পারবে না।'

জুবি চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল "কিন্তু তুমি এই বিয়ের পরেই তো বোম্বাই যাচ্ছো···"

শরৎ বলিল "যেতে হবে জুবি···চাকরি নিয়েছি।"

জুবি বলিল "তখন ?"

শরৎ বলিল "আমি যদি ব্যবস্থা করে যাই। চিঠিপত্রগুলো তার কাছ থেকে আদায় করে···"

জুবি বলিল "তা হলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে ?"

শরৎ কাঠ! ইহার পরেও জুবি আর কি বলতে চায় ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জুবি বলিল "কিন্তু আমি বাঁচতে চাই···মানুষের মত বাঁচতে চাই! পৃথিবী আমার কাছে এই যে অরণ্য হয়ে আছে, এই অরণ্যেই আমি বাস করবো চিরদিন ?···লোকালয়ে আমার স্থান হবে না শরৎদা ?"

বুঝিয়াও যেন শরৎ কথাটা ঠিক বুঝিল না। বলিল "অরণ্য !"

—"নয় ? আমার কি আছে ?···"

শরৎ বলিল "তোমাব সব আছে! নেই শুধু···"

জুবি বলিল "তাই।···তাই নেই বলেই আমার কিছু নেই।···তুমি বলবে দাদুর বিষয়-সম্পত্তি···ও-সম্পত্তি আমি দু'পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে পারি শরৎদা···যদি মনের মত একটু আশ্রয় পাই। বেশী নয়···শুধু তোমার পাশে একটু আশ্রয় ঠাঁই···"

বলিতে বলিতে আবেগ উচ্ছ্বাসে জুবি উঠিয়া শরতের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

শশব্যস্তে তার দু'হাত ধরিয়া তাকে সরাইবার প্রয়াস করিতে করিতে শরৎ বলিল "ছি! কি করো জুবি···লোকে দেখলে কি বলবে ?"

জুবি বলিল "দেখুক লোকে। লোকের ভয় আমি করি না!···আমাকে তোমার পাশে স্থান দাও। তোমাকেই আমি জানি চিরদিন···আমার সব বলে···আত্মীয়, বন্ধু, স্বামী···সব···সব!"

আহতের মত জুবির হাত ছাড়িয়া শরৎ দু'পা সরিয়া গেল।

জুবি বলিল "তোমরা যার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছিলে···কোনদিন তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারিনি। বিধাতার বিধান বলে কখনও যদি মনকে তার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছি, কঠিন আঘাত দিয়ে সে আমার সে-গতি রুদ্ধ করেছে! আজও আমি তা ভুলতে পারিনি। তখন ব্যথা বোধ করেছি।···আজ মনে হচ্ছে, ফিরিয়ে দিয়ে সে আমার এইটুকু উপকার করেছে, এ-মনের উপর একটা দাগও বসাতে পারেনি সে!"

জুবির স্বর কম্পিত, স্খলিত দেহ কাঁপিতেছে! শরৎ বিমূঢ়বৎ নিস্পন্দ!

জুবি বলিল "তোমাকে এ-সব কথা বলতে আমার বুকে কতখানি কাঁপন জাগছে এ-সব কথা নিজের কানে এতখানি বিশ্রী নির্লজ্জ ঠেকছে, কিন্তু আর আমি চুপ করে থাকতে পারছি না শরৎদা। হয় আমাকে গ্রহণ করো—আমার সংসারের সাধ মিটুতে দাও, না হয় লাথি মেরে আমাকে বিদায় করে দাও···আর কখনও আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো না।"

শরৎ কি বলিবে ? তার দেহ-মন কশাঘাতে পাণ্ডুর জর্জরিত হইয়া উঠিল।

জুবির দুচোখে জল···সে কাঁপিতেছে।

শরৎ বলিল "এসব কথা নিমেষে চোকে না জুবি···নিমেষে এ-কথার জবাব দেওয়াও চলে না। তুমি যা বলছো—এ-সব কথার পিছনে কত বিরুদ্ধ শক্তি, আত্মীয়-স্বজন, সংসার সমাজ···"

জুবি বলিল "মানুষকে নিয়েই সংসার। সংসার নিয়েই সমাজ। সেই মানুষ যদি তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়···স্নেহের ভিখারী হয়ে হাত পেতে দাঁড়ায় ?"

শরৎ নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল "দুদিন আমায় সময় দাও জুবি তাছাড়া তোমার দাদু আছেন!"

জুবি বলিল "দাদু! কতকগুলো মোটা বই ছাড়া জগতের কোন কিছুতে তার মায়া নেই, মমতা নেই! দাদুই আমাকে আজ এতখানি নির্লজ্জ-ভিখারিণী করে তুলেছে···নাহলে আমাকে তুমি জানো···কতখানি দর্প-তেজ-অহংকার নিয়ে···"

জুবির পানে চাহিয়া শরৎ দেখিল···এখনও সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! একদিক দিয়া ভাঙিয়া পড়িলেও ওদিকে সেই তেজ, সেই দর্প···

শরৎ বলিল "বাড়িতে কাজ জুবি···এ কথা নিয়ে এখন···"

বাধা দিয়া জুবি বলিল "কিন্তু এ কথার শেষ করতে চাই আমি।···বলো, আমাকে স্থান দেবে? তোমার সংসার আমি গড়ে তুলবো···সে-সংসারে কোনদিন যদি তুমি এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো···মুখের কথায় শুধু বলো···নিঃশব্দে তখনি আমি তোমার পথ থেকে সরে যাবো।···আমাকে বাঁচতে দাও শরৎদা··· তোমার হাতে আমার প্রাণ! কি নিয়ে আমি বাঁচবো? এমনি করে বাঁচতে আমি পারবো না···বাঁচতে চাই না।"

শরৎ বলিল "কাল যদি জবাব দিই?"

জুবি চাহিল শরতের পানে···দৃষ্টি ভ্রূকুটি-কুটিল। সে-দৃষ্টিতে অসাধারণ দীপ্তি··· যেন ঐ দীপ্তি দিয়া শরতের মনের গোপন-তল পর্যন্ত জুবি সন্ধান করিয়া দেখিতে চায়!

শরৎ নিরুত্তর···

জুবি বলিল "আমি আজ জবাব চাই। তোমাদের এই আমোদের হাট বসেছে বলে আমার জীবন-মরণের ব্যাপারে এতখানি উপেক্ষা করবে? এ-আমোদে আমার কোন অধিকার থাকবে না? তোমাদের এত হাসি-গানের মাঝখানে আমিই শুধু চোখের জলে ভাসবো? না শরৎদা, আজই জবাব দাও···বিরুদ্ধ হোক, কঠিন হোক···সে জবাব আমি শুনবো। সাগরের জলে যে ভাসছে···দুফোঁটা বৃষ্টির জলে তার ব্যথা এমন-কিছু বাড়তে পারে না।"

শরৎ বলিল "এখন যা মনে হচ্ছে···তাতে আমার জবাব···"

শরৎ থামিল···

জুবি বলিল "বলো···বলো···চুপ করে থেকো না! বলবে না? ভিক্ষা আমাকে দেবে না তুমি? আমার প্রাণ···"

জুবির দুচোখে একরাশ জল ঠেলিয়া আসিল। শরতের মনে ছায়ার মূর্তি ধরিয়া কতকগুলা চিন্তা···মায়া, মমতা, দরদ, প্রীতি, সহানুভূতি, করুণা, অনুকম্পা···

কিন্তু নর্মদা সত্য কথা বলিয়াছে, একটা বৃত্তিকে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া চলে না··· সে প্রশ্রয়ে আর কোথায় আর কাহারও মন যদি ব্যথায়-লাঞ্ছনায় আর্ত-আতুর হইয়া ওঠে···

জুবি বলিল "বলো শরৎদা···আমি আজ তৈরী হয়ে এসেছি। খুব-কঠিন আঘাত যদি পেতে হয়···তোমার দেওয়া সে-আঘাত আমি আজ গ্রহণ করবো। বলো···আজ

শেষ করে দাও আমার এ-দুশ্চিন্তা! সংশয় নিয়ে মানুষের দিন কাটে না, কাটতে পারে না!"

কথাগুলা শরতের মনে বাজিতেছিল···যেন আর এক জগৎ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে! সে-জগতে যেন গৃহ নাই, সংসার নাই···আছে অসংখ্য নর-নারীর ভিড়। শরৎ এখন যে-লোকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাসিয়া-কাঁদিয়া সবার পানে চাহিতেছে··· চকিতে সে-লোক সরিয়া কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতেছে···সে-জগৎ যেন খুব স্পষ্ট নয়···তার অনেকখানি যেন অস্পষ্ট আবছায়ায় ভরা!

জুবি বলিল "বলবে না? না-বলা জবাব নিয়েই চলে যাবো? হয়তো আর আসবো না···কিন্তু সেদিন অতখানি সদয় হয়ে বললে আমার ভার নেবে···আমার সব দায় তোমার···"

এ-কথা শরৎ বলিয়াছিল, সত্য! কিন্তু সে-কথার অর্থ···

জুবি বলিল "তুমি ভেবেছিলে, আমাকে চৌকি দেবে···এইটুকু মাত্র আমি চেয়েছিলুম? আমার ভার নেবে, তার অর্থ তুমি বুঝেছিলে···ঐ তপন! ভুল বুঝেছো। তপনের চিঠির আস্ফালনকে আমার ভয় কেন, জানো? পাছে তোমার ঘৃণা হয় আমার উপর···তুমি পাছে আমাকে ভুল বোঝো! না হলে আমার নামে তপন শত অপবাদ প্রচার করে বেড়ায় যদি, সে-অপবাদ সত্য মনে করে সারা পৃথিবী যদি আমার দেহে-মনে কলঙ্কের নামাবলী এঁটে দেয়, তাতেও আমার কিছু এসে যাবে না! তার কারণ আমি জানি আমি কী! আমার কোথায় কি আছে! শুধু তোমার জন্যেই তাকে আমার অত ভয়···"

এক-নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া জুবি হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল···উত্তেজনায় তার বুক সঘন স্পন্দনে দুলিতেছিল···

শরৎ স্থিরভাবে সব কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল "তুমি যে সব কথা বলছো, এ সব কথা বাস্তব জগতের কথা নয় জুবি! এ কথা নাটকে নভেলে চমৎকার লাগে···কিন্তু সত্যকার জীবনে অপরকে একেবারে না মেনে চলবার উপায় আমাদের নেই। কারও নেই! মানে···"

তীব্র-স্বরে জুবি বলিল "মানে আর আমাকে বোঝাতে হবে না। তোমার কথার মানে আমি জানি। নাটক করছি বলে আমার মুখে থাবড়া দিচ্ছ, কিন্তু নিজে কতখানি নাটক করে বেড়াচ্ছো, নিজের দিকে তাকিয়ে তার হিসেব নিয়েছো?···মুখ ফিরিয়ো না। আমি বলছি তোমায় এ-কথার মানে! মানে, তুমি ভালোবাসো ঐ কাবেরীকে। যে-কাবেরী তোমাদের বাড়িতে তোমার দাদার বৌ হয়ে আসছে!···তোমার বৌঠান! বৌঠানকে ভালোবেসে নায়ক সেজে নিজেকে তুমি মনে-মনে খুব বাহবা দিচ্ছ! এ ভালোবাসা এ বাহবা দেওয়া—এও তোমার সত্যকার পৃথিবীর ভালোবাসা নয়, সত্যকার জীবনের বাহবা-দেওয়া নয়! নাটক-নভেল থেকে এ-ভালোবাসা আর বাহবা আগাগোড়া তুমি ধার করেছো!···বেশ, তোমার ভালোবাসা নিয়ে পরম সুখে তুমি বাস করো—লজ্জার মাথা খেয়ে আমি আজ এমনভাবে ভিক্ষাপাত্র হাতে তোমার

পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, এর লজ্জা, অপমান…আমি কোনদিন ভুলবো না শরৎদা…"

কথাটা বলিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে জুবি সেখান হইতে চলিয়া গেল। শরৎ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল…তার পায়ের নীচে মাটি দুলিতেছে। ঘর-দালান…জানলা… খাট-বিছানা…সব দুলিতেছে!…

আজ এবাড়িতে পাকা দেখা। সকালেই লগ্ন। পুরোহিত আসিলেন, শরৎ আসিল, আর তাদের সঙ্গে আসিলেন জ্ঞাতি-সম্পর্কে অবনীর এক জ্যাঠামশাই আর খুড়া। শুভকাজে দরিদ্র জ্ঞাতিদের দাঁড়াইতে ডাক পড়ে চিরদিন…আজও পড়িয়াছে।

সকালের অভ্যর্থনায় যতখানি আয়োজন করা চলে যোগীন্দ্র ঘোষাল তাহাতে ত্রুটি রাখেন নাই।

আসরে আসিয়া বসিল কাবেরী…সজ্জাভূষণা। কপালে চন্দনের টিপ…অর্ধবৃত্তাকারে কপোল পর্যন্ত নামিয়াছে। গলায় গন্ধফুলের মালা…মুখ কিন্তু মলিন।

জ্যাঠা খুড়া পুরোহিতরা মাথায় ধানদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। জ্যাঠা দিলেন কন্যার হাতে বনেদী বংশের প্রথা মানিয়া আকব্বরী মোহর এবং এযুগের আদর্শে ভেলভেটের কেসে ভরা একটি ডায়মণ্ড ব্রুচ। ব্রুচটি তীরের প্যাটার্নে গড়া।

হাসিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "অনঙ্গের তীর! এমন তীর এ বয়সেও বুকে নেবার জন্যে আমি বুক পেতে দাঁড়াতে পারি! এর কাছে কোথায় লাগে অশোক-চাঁপা-করবীর গুচ্ছে গাঁথা ফুলশর!

কথাটা বলিয়া তিনি চাহিলেন কাবেরীর পানে…কাবেরী যেন পাথরের পুতুল! মুখে হাসির অতি ক্ষীণ একটি রেখাও ফুটিল না! তার মুখে কে যেন কাজলের কালি মাখাইয়া দিয়াছে!

যোগীন্দ্র ঘোষালের বুকখানা ধক্‌ করিয়া উঠিল। তিনি চাহিলেন শরতের পানে। যে-শরতের মুখে ভাষার উচ্ছ্বাস লহরের মত উৎসারিত হয়, সে শরৎও মৌন মূক…কোন অজানা ঘর হইতে কোনমতে যেন নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখিতে আসিয়া বসিয়াছে।

তারপর কোনমতে নিয়ম-কর্ম চুকিলে অতিথিদের বিদায় দিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল আসিলেন অন্দরে। নর্মদা দালানে বসিয়া ছেলেদের হাতে দিতেছে পেস্তার বরফী, মনোহরা, আঙুর, কাটা আপেল, বেদানার দানা—বলিতেছিল "এখন একটু-একটু মুখে দাও…তারপর সব তোলা রইল—ওবেলা খেয়ো…এই নাও সরের নাড়ু, মিহিদানা, ক্ষীরের চপ।" ছেলেমেয়েদের মনে সন্তোষ নাই! বায়না তুলিয়াছে।

যোগীন্দ্র ঘোষাল এক-নিমেষ দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিলেন; তারপর নিঃশব্দে দালান পার হইয়া এ-ঘরে ও-ঘরে উঁকি মারিয়া দোতলায় উঠিলেন।

আসিলেন কাবেরীর ঘরে। খাটের উপর কাবেরী বসিয়া আছে—দু'চোখে উদাস

দৃষ্টি,···খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে নিবদ্ধ। কাপড়চোপড় যেমন পরিয়াছিল, তেমনি পরিয়া আছে···ছাড়ে নাই।

যোগীন্দ্র ঘোষাল কাছে আসিলেন, খাটের প্রান্তে বসিলেন; বসিয়া বলিলেন "একটা কথা ছিল···"

কাবেরী যেন চমকিয়া উঠিল! নিশ্বাস ফেলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষালের পানে চাহিল।

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন, "দেহ সুস্থ তো?"

কাবেরীর মুখে মৃদু রেখায় মলিন হাসি ফুটিল। ধীর কণ্ঠে কাবেরী কহিল "তার মানে?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আজকের দিনটি তোমার জীবনে যাকে বলে, Red-letter day। এমন দিনে তোমার মুখে হাসির লহর বইবে। তা না হয়ে···"

বাধা দিয়ে কাবেরী বলিল "নেচে গেয়ে মনের আনন্দ দেখাতে হবে বুঝি?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "তা নয়। মানে, আমার চোখে এত বিসদৃশ লাগছে যে তথ্য নির্ণয়ের জন্যে মন আমার আকুল।"

কাবেরী বলিল "কিসের তথ্য জানতে চান?"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "উদাস-করুণ আঁখি—ছায়ামলিন চন্দ্রানন···"

কাবেরী বলিল "যান···বাজে কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না!"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন—"তোমাকে যদি ধ্যান-তন্ময় দেখতুম, তাহলে তোমার ধ্যান ভঙ্গ করতে আসতুম না দেবী···হরকোপানলে ভস্ম হবার ভয় না থাকলেও! নিজের জীবনেও এমনি শুভদিন একদা এসেছিল, সেদিনের কথা সোনার রেখায় বুকে লেখা আছে আজও···কাজেই এদিনের গুরুত্ব বুঝি। কিন্তু তোমাকে অন্য রকম দেখছি বলেই···"

কাবেরী বলিল "কী আবার রকম করে আপনার সামনে দাঁড়াবো বলুন তো! আমার সে অভিজ্ঞতা নেই!"

কৃত্রিম বেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এ অভিজ্ঞতা জীবনে এই একটি দিনই লাভ করা যায়, যাদের সৌভাগ্য আছে! কিন্তু না, ঝোপ ঠেঙিয়ে লাভ নেই no beating about the bush···আমার মনে যে-সংশয় কালো বাষ্পের মত উদয় হচ্ছে, শুধু বলো, সে-বাষ্প জমার কোন হেতু নেই? ব্যাস্—তাহলেই তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাবো।"

কাবেরীর বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! কোনমতে কাবেরী বলিল "আমার সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ ঘটেনি···ঘটতে দেবো না···বুঝলেন।"

কথাগুলো বেদনার নিশ্বাসের মত যোগীন্দ্র ঘোষালের মনকে স্পর্শ করিল!

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "এ বিয়েতে মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আছে তো দিদি?"

কাবেরী বলিল "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তিন সত্যি করলুম। হলো? বাপরে, তবু উকিল

নন···প্রোফেসর মানুষ···উকিল হলে জেরায় আমায় একেবারে উদ্‌বাস্ত করতেন দেখছি···"

যোগীন্দ্র ঘোষাল নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিলেন···ত্ব'চোখের দৃষ্টি স্থির অবিচল···কাবেরীর মুখে নিবদ্ধ !

কাবেরীর কেমন অস্বস্তি লাগিতেছিল···সে উঠিয়া দাঁড়াইল···বলিল "যান দিকিনি এ ঘর থেকে···আমি কাপড় ছেড়ে মানুষের মত হই।"

যোগীন্দ্র ঘোষাল বলিলেন "আমি বন্ধু···কোন কথা যদি মনে থাকে কাঁটার মত··· দেরি হলে যে-কথার দাম থাকবে না···এমন কথা যদি থাকে দিদি···"

যোগীন্দ্র ঘোষালকে মৃদু ঠেলা দিয়া কাবেরী বলিল "আপনি বন্ধু···তা আমি জানি। আমার কল্যাণই চিরদিন করবেন···কামনায় এবং আচরণে। বলবার মত কোন কথা আমার মনে নেই···জীবনের এক অধ্যায় শেষ করেছি···সে অধ্যায়ের সব কথা বলা হয়ে গেছে। নতুন অধ্যায় শুরু হোক···তখন যদি বলবার মত কথা পাই, নিশ্চয় আপনাকে বলবো দাদা। দূরে গেলেও আমাকে পর করে দেবেন না আপনি—তা আমি জানি !"

মাঝের কটা দিন নিরাপদে কাটিল ! মনের দিক্ দিয়া কোন কলরব নাই। তারপর বিবাহের দিন সকালবেলা···

ঠাকুরঘরে মা নিয়ম-কৃত্য করিতেছিলেন···অবনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবনী আসিয়া কহিল "মা···"

মা বলিলেন "হ্যাঁ, ডাকছিলুম। এর পরে যদি সময় না পাই···মায়ের একটা কথা মনে রেখো শুধু···কোনদিন তোমাকে কোন কথা বলিনি···"

অবনী বলিল "বলো মা···তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার এমন কেউ নেই যে আমার মন বুঝবে !"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "বিয়ে করছো···নিজের মন নিজের খেয়াল নিয়েই মত্ত থেকো না। যাকে বিয়ে করছো···তার মনও জীবন্ত মন···নিজের মনের সঙ্গে সে-মনের উপরেও সমান-দৃষ্টি রাখবে। সে-মনকেও ঠিক নিজের মনের মত বুঝে চলবে···সে মনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্রুটি-দোষ-গুণ-দুর্বলতা···সব। না হলে সংসার অরণ্য বলে মনে হবে—সংসারে সুখ পাবে না। মায়ের এ-কথা মেনে যদি চলতে পারো, কোনদিন দুঃখ পাবে না।"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "তোমার কথার উপর আমার নির্ভর আছে। তোমার কাছ থেকে চিরদিন দূরে-দূরে সরে-সরে থাকলেও, আমি মা, তোমার মনকে জানি, চিনি···তাই এ কথা বলতে পারলুম।"

অবনী বলিল "তোমার এ-কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে মা···তুমি নীরবে কত ব্যথা সয়েছো···উপেক্ষা-অবহেলা তোমার মনকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। ধরিত্রীর মত তুমি সব সয়েছো···হাসিমুখেই সয়েছো। বাইরের লোক তোমার মনের

ও-ব্যথার আভাসও পায়নি কোনদিন। তোমার পেটে আমি জন্মেছি মা···তোমার ছেলে আমি···তোমার এ-কথা চিরদিন আমি মনে রাখবো···তোমার এ-কথা মেনে চলবার চেষ্টা আমি করবো চিরদিন···"

মহালক্ষ্মী দেবী বলিলেন "মায়ের আশীর্বাদে তোমার ভালই হবে, জেনো।"

বেলা দুটো বাজিয়াছে—আভ্যুদয়িকাদি সারিয়া অবনী আসিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছে, ডাকে চিঠি আসিল। খামে ভরা চিঠি। নাম-ঠিকানা লেখা মেয়েলী হাতে।

খাম ছিঁড়িয়া অবনী চিঠি পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে :—

"যাহাকে বিবাহ করিতেছ, সে তোমায় ভালোবাসে না—সে ভালোবাসে তোমার ভাই শরৎকে। বৌঠানের সঙ্গে প্রেম—

চমৎকার! বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাস না হয়, তোমার লক্ষ্মণভাই শরৎকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়ো।"

চিঠি পড়িয়া অবনী স্তম্ভিত!

এ চিঠি কে লিখিল?···কাবেরী? হয়তো তাই! শরতের সঙ্গে পরিচয়···দুজনে কত কথা···হয়তো শেষপর্যন্ত নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। হয়তো ভাবিয়াছিল মনকে বুঝাইয়া ঠিক করিবে,—পারে নাই। তাই শেষমুহূর্তে এ কথা লিখিয়া জানাইয়াছে।

চিঠিখানা আবার পড়িল···দুবার পড়িল···তিনবার পড়িল।

মন বলিল, না, কাবেরী নয়। কাবেরী হইলে চিঠির লেখায় শ্লেষ থাকিত না। ঐ যে লিখিয়াছে, লক্ষ্মণ-ভাই শরৎ! বৌঠানের সঙ্গে প্রেম!

না না না,···এ লেখা কাবেরীর নয়!···তবে?···

চোখের সামনে অসংখ্য সাবানের ফেনা···

শরৎ আসিয়া ডাকিল "অবুদা···"

অবনী চাহিল শরতের পানে···দু'চোখে কেমন যেন দৃষ্টি!

শরৎ তাহা লক্ষ্য করিল···অবনীর হাতে চিঠিও দেখিল। কহিল "কার চিঠি?"

অবনী বলিল "জানি না এখন পেলুম। ডাকে এসেছে ছাখো···"

শরতের হাতে অবনী চিঠি দিল। হাতের অক্ষর দেখিয়া শরতের বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল!

শরৎ চিঠি পড়িল। মাথায় কে যেন তরল আগুন ঢালিয়া দিয়াছে···কান-মাথা উত্তাপে জ্বলিয়া ঝাঁঝাঁ করিতেছে!

অবনী কহিল "এ চিঠি···মানে···"

শরৎ যেন গর্জন তুলিল! তপ্ত কণ্ঠে কহিল "False···মিথ্যা কথা! এ জুবির কাজ···"

জুবি! অবনী যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে!

শরৎ বলিল "হ্যাঁ জুবি। তুমি জানো না অবুদা···তার মন কতখানি নোংরা হয়ে

উঠেছে···she is jealous of everybody···এ চিঠির একটি বর্ণ বিশ্বাস কোরো না··· আমি বলছি, এ মিথ্যা !"

বিবাহ হইল। অবনী মন্ত্র পড়িল। কাবেরীর হাত অবনীর হাতে—অবনীর মনে হইল, যেন বরফের মত ঠাণ্ডা ! কোথায় নব-জীবনের সে উত্তাপ ?···

শুভদৃষ্টি। ভালো করিয়াই অবনী চাহিল কাবেরীর পানে। কাবেরীর দু'-চোখের দৃষ্টি করুণ···সজল···তবু কাবেরী চাহিয়া রহিল অবনীর পানে। চোখে পলক নাই···স্পন্দন নাই···স্থির অবিচল দৃষ্টি !

কুশণ্ডিকা মন্ত্র পড়িল···সপ্তনদীর মন্ত্র···

যেন মেশিন চলিয়াছে।

কুশণ্ডিকার পর মায়ের পানে চাহিল—আনন্দ-বাষ্পে মহালক্ষ্মী দেবীর দুই চোখ আর্দ্র।

মায়ের পায়ের কাছে আনত হইয়া বর ও বধূ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল—দুজনকে একসঙ্গে বাহুর বন্ধনে বুকে টানিয়া মা দুজনের শিরশ্চুম্বন করিলেন···বলিলেন "সুখী হও···সকলকে সুখী করো ! আমার এ অরণ্যে তোমরা দুটিতে নূতন করে সংসার গড়ে তোলো···এর চেয়ে বড় কামনা আর আমার নেই !"

ফুলশয্যার রাত্রি। ফুলের মালায়, আলোর লহরে আনন্দ যেন শতধারে উৎসারিত !

পুষ্প-ভূষণা কাবেরী···

আলোর আলো-করা ঘর···ফুলের ভূষণে ঘর যেন নন্দনের শ্রী ধারণ করিয়াছে ! ঘর সাজাইয়াছে শরৎ।

অবনী ঘরে আসিল।

শরৎ তখনও ফুলের মালাগুলা টানিয়া-টুনিয়া সেগুলার ফাঁকে-ফাঁকে রঙীন বাল্‌ব গুঁজিয়া দিতেছিল···

কাবেরী চুপ করিয়া খাটের বিছানায় বসিয়া আছে···

অবনী আসিয়া দেখিল, দুজনে নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

শরৎ কহিল "একটু দেরি হয়ে গেছে অবুদা···মানে, পাঁচ-সাতটা বাল্‌ব হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেল কিনা···ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়ো।"

অবনী দেখিল। বলিল "নে'না তুই·· ব্যস্ত হবার কি দরকার ?"

বাসর ঠিক করিয়া শরৎ চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "My best wishes for the newly-married couple...All joy and happiness and peace and good will to you both..."

বাহিরে সানাইয়ে মিষ্ট-মধুর রাগিণীর আলাপ···

অনেকক্ষণ কাটিল।

অবনী ডাকিল "কাবেরী···"

কাবেরী মুখ তুলিয়া অবনীর পানে চাহিল।

অবনী কাছে আসিল।

কাবেরী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অবনী বলিল "আমি জানি, আমাকে তুমি বিবাহ করেছো সেই একদিনের বাক্য-দানের মর্যাদা রাখতে শুধু! আমাকে তুমি ভালোবাসো না!"

কাবেরীর বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল···

অবনী বলিল "ভালোবাসা মানুষকে সাধনায় অর্জন করতে হয়। আমি তো সেজন্যে সাধনা করিনি।···তবু···"

অবনী চুপ করিল।

কাবেরী নতমুখী···

অবনী বলিল "যতদিন আমাকে ভালোবাসতে না পারবে, ততদিন আমি তোমার কাছে স্বামীর দাবি নিয়ে দাঁড়াবো না! তবে বিবাহ হয়েছে···পরস্পরকে ভালোবাসার চেষ্টা করতেই হবে আমাদের···নয়?"

একটা উদ্যত নিশ্বাস অবনী কষ্টে রোধ করিল।

কাবেরী নিশ্বাস ফেলিল···নিশ্বাসটাকে রোধ করিতে পারিল না! তারপর মুখ তুলিয়া চাহিল···তার দু'ঠোঁট কাঁপিতেছিল!

অবনীর মুখে দৃষ্টি পড়িতে কাবেরী দেখিল, অবনীর মুখে মলিন হাস্যরেখা!···

অবনী বলিল "বাইরের লোক এতটুকু জানবে না···আমাদের দু'জনের মধ্যে শর্ত রইলো,···যতদিন না তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে···কেমন?"

অবনীর স্বর কেমন যেন স্খলিত···তার দৃষ্টিতে কেমন কাতরতা···

কাবেরীর মন ভাঙিয়া দুমড়াইয়া গেল। প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতেছে দিদির কথা মানিয়া মনকে পরিষ্কার করিয়া লইতে। স্বামী···এই স্বামীকে নারী চিরদিন ভালোবাসিয়াছে···ভালোবাসিয়া বিবাহ···কটা হয়? বিবাহের পরে ভালোবাসা আপনা হইতেই আসে।

অবনী কহিল "আমাকে তুমি জানো না···যেটুকু জানো, দেখেছো, বাজে খেয়াল নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াই! সম্প্রতি এতে শ্রান্তি বোধ করছিলুম···কোথায় বিশ্রাম মিলবে, জানতুম না! সেদিন তোমার সেই ভর্ৎসনা···সত্য কথা যে অমন মিষ্টি করে বলা যায়···তার আগে জানতুম না। তাই তোমার ঐ তেজ আর দীপ্তি দেখে তোমার মনকে আমি চিনেছিলুম। মনে হয়েছিল, এমন একটি মনের স্পর্শ যদি পাই, জীবনকে তাহলে হয়তো সার্থক করতে পারবো···চির-জীবন অরণ্যে বাস করতে হবে না।"

কাবেরীর মনে ছবির পর ছবি ফুটিতেছিল···কোনটা মলিন, কোনটা সুস্পষ্ট!···সে-ছবি দেখিয়া মন যেন···

অবনী কহিল "তুমি যদি বলো তাহলে আমি না হয় এখানে থাকবো না··· তুমি মায়ের কাছে থাকবে···আমি মাঝে-মাঝে আসবো। তুমি আমার কথা ভেবো··· যদি কোনদিন ভেবে মনে করো, আমাকে ভালোবাসতে পারবে···জানিয়ো। তখন···"

এই পর্যন্ত বলিয়া অবনী থামিল…তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল "স্বামী বলে জোর করে তোমার দেহ-মন অধিকার করবো…মন্ত্র পড়ে বিবাহ করেছি বলে চিরদিনের প্রচলিত অধিকারে…তেমন দুরাত্মা আমি নই, কাবেরী।"

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় অবনী চাহিয়া রহিল কাবেরীর পানে। কাবেরী কোন কথা বলিল না।

অবনী কহিল "আজ যদি জবাব দিতে না পারো, পরে দিয়ো! রাত হয়েছে… শুয়ে পড়ো। তুমি শোও বিছানায়…আমি ঐ সোফায়…দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি… বাইরের লোক আমাদের এ-ব্যবস্থার আভাসও জানবে না…কোনদিন নয়।"

কথাটা বলিয়া অবনী ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ডাকে-পাওয়া চিঠিখানা পকেটে ছিল…বাহির করিয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িল…ছিঁড়িয়া খড়খড়ি দিয়া নীচেকার বাগানে ফেলিয়া দিল…ফেলিয়া আবার কাবেরীর পানে চাহিল।

কাবেরী তাহারই পানে চাহিয়া ছিল…এবার কথা কহিল, বলিল "ও কি?"

হাসিয়া অবনী কহিল "একখানা বাজে চিঠি পকেটে ছিল…"

আর্দ্র স্বরে কাবেরী কহিল "না…না…আমিও অমনি চিঠি পেয়েছি…আমাদের বাড়িতে এসেছিল। দিদি এসে দিয়ে গেছে। এই সে চিঠি…"

কাবেরী চিঠি বাহির করিল…অবনী কহিল "আমাকে দেখতে হবে?"

—"হ্যাঁ।"

অবনীর হাতে কাবেরী সে চিঠি দিল। অবনী চিঠি পড়িল। যে-হাতে লেখা চিঠি সে নিজে পাইয়াছে, সেই হাতেরই লেখা।

এ-চিঠিতে লেখা আছে—

"মনে-মনে একজনকে ভালোবাসিয়া বাহিরে আর-একজনকে বিবাহ করিতেছ—তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রণয়-লীলায় সংসারে স্বর্গ রচিবে বলিয়া? আমি তাহাকে বলিয়াছি, তোমাদের এই বৌঠান-দ্যাওরের প্রণয়-কাহিনী। কেন বলিয়াছি? তোমাদের সংসার সংসার হইবে—আর আমার সংসার হইবে অরণ্য? না! আমি আজ দেওয়ানা। ভালো-মন্দ-বোধ আজ আমার নাই। তোমার জন্য আমার জীবনের স্বপ্ন ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়াছে, তার শাস্তি তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে।"

চিঠি পড়িয়া অবনী কহিল "এ-চিঠি ছিঁড়ে ফেলি…কেমন?"

কাবেরী কহিল "ফেলুন…" কথা কহিল যেন আর কোন কাবেরী…এ কাবেরী নয়!

অবনী কহিল "এ-চিঠি কে লিখেছে জানো?"

কাবেরী কহিল "জুবিলি দিদি…"

অবনী কহিল "হুঁ।"

কাবেরীর মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ! সে-বিরোধে মন বুঝি ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে! কোনমতে সে-বিরোধের মধ্যে নিজেকে সংবৃত করিয়া কাবেরী বলিল "সেই চিঠি পড়ে আমাকে ও-কথা বলেছেন?"

অবনী কি ভাবিতেছিল, বলিল "তাই।"

কাবেরী কহিল "আমাকে সময় দিন···আমি নিজের মনকে ঠিক করবো।"

অবনী কোন জবাব দিল না।

কাবেরী বলিল "বিশ্বাস যদি করেন বলি···"

অবনী চাহিল কাবেরীর পানে···

কাবেরী কহিল "এ ছিল আমার মনে মনে···কাকেও বলিনি। আমার দিক্ থেকে অবিশ্বাসের কারণ নেই। কথায় নয়···আচরণেও নয়।···আপনার আশ্রয়ে আমি সুস্থ হতে চাই! অরণ্যে কে বাস করতে চায়?···"

বলিতে বলিতে কাবেরী অবনীর পায়ে হাত দিল।

তার হাত ধরিয়া অবনী তাকে তুলিল। আবেগে তার মুখ বুকে চাপিয়া অবনী কহিল "আমি স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী···আর আজ আমাদের ফুলশয্যা···কেমন?"

কাবেরীর মুখ অবনী তুলিয়া ধরিল···তার মুখে-চোখে কি যে আবেশ মাখানো···

অবনীর চোখেও স্নিগ্ধ আবেশ···দৃষ্টিতে কত আশ্বাস···আশা!

কাবেরী দু'চোখ মুদ্রিত করিল।

বাহিরে সানাই বাজিতেছে···

অর্থমনর্থম্

জলার ধারে

পাতিপুকুর ছাড়িয়া দমদমার মধ্য দিয়া যশোর-রোড সোজা গিয়াছে সেই বারাশত-হাবড়ার দিকে।

দমদমা-এরোড্রোমের উত্তরে গলি ধরিয়া এ-পথের একটা শাখা পূর্ব্বদিকে বাদার অভিমুখে গিয়াছে। একদিন সকালে বেলা নটার সময় টু-শীটার মোটরে চড়িয়া ডিটেক্‌টিভ সমর মিত্র আসিয়া নামিলেন এই গলির পূর্ব্ব-প্রান্তে একেবারে পানপুর বাজারের সামনে। গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে ছিল একটি তরুণ ভদ্রলোক। তরুণ ভদ্রলোকের নাম বিভাস। বিভাসের বয়স সাতাশ-আটাশ বৎসর।

গাড়ী হইতে নামিয়া বিভাসের নির্দ্দিষ্ট-পথে চলিয়া সমর মিত্র জলার ঢালু-তীরে এক জীর্ণ কুটীরের সামনে আসিলেন। কুটীরের চতুর্দ্দিকে দীর্ঘ তৃণ-শস্য ও আগাছা রীতিমত জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। জলার বুকে কোথাও পরিষ্কার জল, কোথাও বা পঙ্ক-কর্দ্দমের স্তূপ। সকালের রৌদ্র-বাতাসে সেই পঙ্ক-কর্দ্দম হইতে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ উঠিয়া জায়গাটাকে কেমন দুঃসহ-ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কুটীরের সামনে আসিয়া বিভাস কহিল—থার্ড-ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীতে করে' ওঁকে নিয়ে আমি এইখানে এসেছিলুম। সে-সব জিনিস তিনি ছোট-ছোট বাক্সে ভরে' এইখানে আনেন। বলেছিলেন, তুমি জানো না বিভাস, দিন-কতক ঠাঁই-নাড়া করে রাখি···তারপর নিয়ে গেলেই চলবে। কে-বা জানবে? পোড়ো-ভাঙ্গা ঘর! তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আকাশে মেঘের ঘন-ঘটা। সঙ্গে টর্চ্চ-ল্যাম্প এনেছিলুম। তারপর ঐ ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের কাজ চললো, ওদিকে মাথার ওপর আকাশও ভেঙ্গে পড়লো! গাড়ীখানা অনেক দূরে রাখা হয়েছিল। উনিই বলেছিলেন, গাড়োয়ানকে এ ব্যাপারের এতটুকু ইঙ্গিত দিয়ে কাজ নেই!···ওঁর কাজ চুকলে সেই বৃষ্টিতে আমি বেরুলুম গাড়োয়ানকে দিয়ে গাড়ীখানাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য। গাড়ী এনে ওঁকে খপর দিতে এসে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে! দেহে ওঁর প্রাণের চিহ্ন নেই!···কি যে আমার মনে হলো···তখনি কাছে একটা খেজুর-গাছের মাথায় হুহুঙ্কার-শব্দে বাজ পড়লো। আমার মনে হলো, ও-বাজ আমার মাথায় পড়লো না কেন?

বিভাসের দুই চোখ অশ্রু-বাষ্পে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন। সাগ্রহে বিভাসের কাঁধে হাত রাখিয়া তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—তোমার মনের তখনকার সে-অবস্থা আমি বুঝতে পারছি বিভাস! কিন্তু মন ভেঙ্গে এমন বসে পড়লে চলবে না···মনকে সবল করো।···আমি জানি, তুমি নিরপরাধ। তোমার বন্ধুদের মধ্যেও সকলের বিশ্বাস, এ-হত্যার ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!

বিভাস বলিল—আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা খুব অল্প, স্যর।···ফণীবাবু ছিলেন আমার মামা-বাবু। আমার মামীমা বহু দিন মারা গেছেন। মামা-বাবুর একটিমাত্র ছেলে। ছেলের নাম কান্তিভূষণ। কান্তি আমার সমবয়সী। আমাদের দুজনে খুব ভাব ছিল···বরাবর। মামীমা মারা যাবার আগে আমার মা আর বাবা মারা যান। মামীমা আর মামাবাবু তখন আমাকে তাঁদের আশ্রয়ে এনে মানুষ করেন। আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকতুম—কান্তির ছিল শিকারের সখ! সেবারে শিকার করতে গেল,—দুজন বন্ধুকে নিয়ে···সুন্দরবনের ওদিকে। পিয়ালী-নদী দিয়ে ছোট নৌকোয় করে চলেছিল। পথে না কি খুব ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ে নৌকো ডুবে যায়, তারপর কান্তির কোনো খপর পাওয়া যায়নি। বহু সন্ধান করা হয়েছিল···মামাবাবু বহু টাকা খরচ করেছিলেন!

বিভাস একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর বলিল,—কান্তি মারা যাবার পর থেকে মামাবাবু এমন হলেন যে এক-মুহূর্ত্ত আমাকে কাছ-ছাড়া করতেন না! কোথাও যেতে চাইলে মামাবাবু যেন শিউরে উঠতেন! বলতেন, না, না, আমি একা থাকতে পারবো না,—ভয়েই হার্টফেল করে' হয়তো মারা যাবো বিভাস, ফিরে এসে মামাবাবুকে আর দেখতে পাবি না!

সমর মিত্র একাগ্র মনোযোগে বিভাসের কথা শুনিলেন, বলিলেন—ফণীবাবুর ছেলে কান্তি তাহলে জলে ডুবে মারা গেছে?

বিভাস বলিল,—হ্যাঁ।

—সে কত দিনের কথা?

—প্রায় ছ'মাস হলো। প্রায় কেন···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিভাস মনে-মনে সময়ের হিসাব কষিল; কষিয়া বলিল—ছ'মাসই ঠিক!

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

বিভাস বলিল,—কান্তি না থাকলে আইন-মতে আমিই মামাবাবুর একমাত্র উত্তরাধিকারী! তিনি মারা গেলে আমিই যখন মামাবাবুর বিষয়-সম্পত্তি পাবো, তখন আমি মামাবাবুকে খুন করতে যাবো কেন,—বলতে পারেন স্যর?···তা ছাড়া যে মামাবাবু আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন···কান্তিকে আর আমাকে কোনো দিন কোনো ব্যাপারে যিনি এক-চুল তফাৎ দেখতেন না, তাঁকে মারবো কি-দুঃখে? কিসের লোভে?

সমর মিত্র বলিলেন—সে-কথা নিয়ে মিথ্যা আর দুঃখ করো কেন বিভাস?···সে-মামলায় তোমার নিরপরাধিতা প্রমাণ হয়ে তুমি সে চার্জ্জে আদালত থেকে খালাশ পেয়েছো তো!

বিভাস বলিল—এ্যাডভোকেট মিষ্টার চৈতন বড়ালের গুণে! সব কাজ-কর্ম্ম ত্যাগ করে' তিনি আমার মামলা নিয়ে যে-ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন···I owe my liberty to my advocate Mr. Boral. (আমার এ মুক্তির জন্য আমি এ্যাডভোকেট মিষ্টার

বড়ালের কাছে চির-কৃতজ্ঞ !) নাহলে আসামীর ডকে দাঁড়িয়ে কোর্টে আমি যখন সেই লোকারণ্যের পানে তাকিয়ে থাকতুম···মনে হতো, সকলের মনে ধারণা, আমার এ জীবনটা ফাঁশির দড়িতে লটকেই শেষ হয়ে যাবে !

সমর মিত্র বলিলেন—মিষ্টার বড়াল এ-কেসটি চমৎকার হ্যাণ্ডল্ করেছিলেন, সত্যি ! তাছাড়া লোকারণ্য ? তারা চিরদিন আসামীর সাজা হবে জেনে কোর্টে মকর্দ্দমা দেখতে যায়···অলস কৌতুকের তাদের সীমা থাকে না ! মানুষের ধন-প্রাণ নিয়ে ওদিকে চলে মহাযুদ্ধ, আর এ সব লোক তাতে পায় শুধু তামাসা !

বিভাস উদাস-নয়নে জলার দিকে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—যাক, সে-কলঙ্ক-লেখা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছো বিভাস ! এখন আমাকে তুমি সাহায্য করো, তোমার মামাবাবুর হত্যা-রহস্য নির্ণয় করতে আমি তোমার সাহায্য চাই !

বিভাস বলিল—কিন্তু আমি বুঝছি না, এ বিষয়ে আমি আপনাকে কি সাহায্য করবো !···ডাক্তাররা এগজামিন করে' বলেছেন, মামাবাবুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। He was poisoned···এ বিষ তাঁকে কে আর দেবে, বলুন···আমি ছাড়া ? তিনি যখন মারা যান, তার পরে এবং আগে···বারো ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমি ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না।

সমর মিত্র বলিলেন,—বারো ঘণ্টা !

বিভাস বলিল,—সকালে মামাবাবুর সঙ্গে আমি বেরিয়েছিলুম। কলকাতায় দু'চার জায়গায় ঘুরে উনি গিয়েছিলেন ওঁর ব্যাঙ্কে। তারপর দুজনে একবার বাড়ী আসি। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে সন্ধ্যার আগে এইখানে আসি···বেলগেছে-ট্রাম-ডিপোর কাছে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে একখানা থার্ড-ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করি। মামাবাবু বললেন, একখানা থার্ড-ক্লাশ গাড়ী নাও বিভাস ! তারপর এই ব্যাপার···

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার মামাবাবুর বয়স হয়েছিল কত ?

—সত্তর বৎসর। গেল চৈত্র মাসে উনসত্তর পার হয়ে তিনি সত্তরে পড়েন।

—স্বাস্থ্য কেমন ছিল ?

বিভাস কহিল,—বাইরে কোনো অসুখ না থাকলেও আমি দেখতুম, ভিতরে-ভিতরে উনি জীর্ণ হয়ে পড়ছেন !···ঝড় আসছে দেখে আমি বলেছিলুম, এ সময় এ-জায়গা নিরাপদ নয় মামাবাবু !···আমি বলি, এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ি, চলুন !···বাড়ী না ফিরতে পারি, এদিকে ওঁর একটা বাগান আছে···'পান্থ-নিবাস'···সেইখানে চলুন।

সমর মিত্র বলিলেন—পান্থ-নিবাস এখান থেকে কত দূরে ?

বিভাস বলিল—প্রায় তিন মাইল হবে !···মামাবাবু বললেন, গাড়ীটা তাহলে নিয়ে এসো। আমি তখন গাড়ী ডাকতে বেরিয়ে আসি। এসে দেখি, ঘোড়া খুলে গাড়োয়ান একটা গাছতলায় ঘোড়া দুটোকে বেঁধেছে। কিছুতে সে গাড়ী জুততে চায় না ! বলে, এ ঝড়ে-জলে তার ঘোড়া মরে যাবে। শেষে জুলুম করে তাকে দিয়ে গাড়ী জুতিয়ে আমি গাড়ী আনি। গাড়ী আনতে আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল !

সমর মিত্র বলিলেন,—তারপর ?

বিভাস বলিল—এসে দূরে ঐখানে গাড়ী রেখে আমি এলুম এই কুঁড়ে ঘরে। ঘরের মধ্যে এসে দেখি, ঘর অন্ধকার! ডাকলুম—মামাবাবু! কোনো জবাব পেলুম না! কাছে ছিল বড় টর্চ্চ। টর্চ্চের আলোয় দেখি, মেঝের উপর মুখ গুঁজড়ে মামাবাবু পড়ে আছেন। প্রথমে মনে হলো, বোধ হয়, অজ্ঞান হয়ে গেছেন! কিন্তু শেষে দেখি, দুটি ঠোঁট নীল···কালি-মাড়া! ভাবলুম, ফিট হলো নাকি ? কি যে করি···মহা-ভাবনায় পড়লুম! অনেক ডাকাডাকি করলুম···নাড়াচাড়া করলুম···কিন্তু সব মিথ্যা হলো!··· শেষে বুঝলুম, প্রাণ নেই···মৃত্যু! দেহ অসাড়···বরফের মতো ঠাণ্ডা।

সমর মিত্র বলিলেন,—আচ্ছা, ঘরের মধ্যে কোনো রকম গন্ধ পেয়েছিলে ? সুগন্ধ ? বা দুর্গন্ধ ?

বিভাস বলিল—না। মনে পড়ে না! তাছাড়া তখন ও-সবের দিকে আমার খেয়াল বা মন ছিল না। কি করে ওঁর সেবা-পরিচর্য্যা করবো, কি করে সারাবো, বাঁচাবো, এই চিন্তাই আমার মনে প্রবল!

সমর মিত্র চাহিলেন কুটীরের দিকে। কুটীরের ওদিকে দুটো জানলা।

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—ঘরের জানলা বন্ধ ছিল ? না, খোলা ছিল ?

বিভাস বলিল—বন্ধ ছিল। ঝড় আসছে দেখে আমিই জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।

—বাইরে আর-কেউ ছিল ? চোখে না দেখলেও বাইরে অন্য মানুষ-জন আছে, এমন তোমার মনে হয়েছিল ?

বিভাস কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল,—না। তাছাড়া সে-খপর তখন নিইনি। আমার মনের তখন এমন অবস্থা যে আর কোনো কথা আমার মনে জাগেনি!

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—বৃষ্টি হয়েছিল··· কাদাতে-মাটিতে কারো পায়ের দাগ আছে কিনা যদি লক্ষ্য করতে, বিভাস!

বিভাস বলিল,—আমার মনের তখন কি যে অবস্থা, সমরবাবু···বললুম তো, পৃথিবীর কথা তখন সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম! তবু আমি মামাবাবুর দেহ যেমন তেমনি রেখে সেই থার্ড-ক্লাশ গাড়ীতে চড়ে সোজা বেলগেছেয় চলে গেলুম। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে' একেবারে আমাদের বাড়ীর ডাক্তার হরেনবাবুর কাছে যাই। হরেনবাবুকে বাড়ীতে পেয়েছিলুম···তাঁকে নিয়ে তখনি তাঁর গাড়ীতে চড়ে আবার এখানে এই পানপুরে আসি। সে-সব কথা তো আপনি শুনেছেন, জানেন আপনি।

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···আচ্ছা, এবারে চলো, ঘরের মধ্যে একবার ঢুকি···ঘরটা একবার ভালো করে দেখি।

ঘরের দ্বারে তালা আঁটা। বিভাসের পকেটে ছিল চাবির রিং। বিভাস তালায় চাবি লাগাইল। চাবি খুলিল না! বিভাস বলিল—আশ্চর্য তো···চাবি লাগছে না!

সমর মিত্র বলিলেন,—সে কি···

তিনি তালা খুলিবার চেষ্টা করিলেন। তালা খুলিল না। চাবি ঘোরে না।

সমর মিত্র বলিলেন—কেউ ট্যাম্পার করেছে···

বিভাস বলিল—কিন্তু এ-ঘরে কে আসবে? কার কি প্রয়োজন হবে?

সমর মিত্র তালা ধরিয়া টানাটানি করিলেন, তালা খুলিল না। শেষে কড়া দুটো ধরিয়া সবলে আকর্ষণ। কড়া খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে দ্বার উন্মোচিত হইল।

দুজনে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গোল-পাতার ছাউনির রন্ধ্র দিয়া, খোলা দ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে আলো আসিতেছে···সে-আলোয় মেঝের পানে চাহিয়া সমর মিত্র শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—দেখেছো বিভাস······

সমর মিত্রের কথায় বিভাস চাহিল···চাহিবামাত্র দেখে, ঘরের মেঝেয় একটা লোক চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তার দু' চোখ মুদ্রিত···ঠোঁট পাণ্ডাশ-নীল!

সমর মিত্র নতজানু হইয়া লোকটার সামনে বসিলেন, লোকটার কপালে হাত রাখিলেন। পর-মুহূর্ত্তে বলিলেন—প্রাণ নেই···মারা গেছে। ইঃ, পাথরের মতো ঠাণ্ডা!···তুমি এক কাজ করো বিভাস······

বিভাসের ভয়-বিস্ময়ের সীমা নাই! বিমূঢ়ের মতো সে চাহিল, সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন,—তুমি একবার বাইরে যাও···গিয়ে চারিদিক দ্যাখো···কোনো লোকজনকে কোনো দিকে দেখতে পাও কি না!···মানে, এ ঘরের উপর কেউ নজর রাখছে, এমন কাকেও যদি পাও······

এ-কথা শিরোধার্য্য করিয়া বিভাস নিঃশব্দে বাহিরে আসিল।

বিভাস বাহিরে গেলে সমর মিত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা শুরু করিলেন। লোকটার বিশাল-পাণ্ডুর ওষ্ঠের ঘ্রাণ লইলেন···তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে-মনে বলিলেন, গন্ধ নাই···কিন্তু বিষ! নিশ্চয় বিষের ক্রিয়া!

লোকটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া আরো বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলেন। লোকটি একটু খর্ব্বাকৃতি···বয়স হইবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। ভদ্র বেশ··· তবে জীর্ণ মলিন! দারিদ্র্যের ছাপ সে-বেশে সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে! ভদ্রলোকের ডান হাতের একটা আঙুল নাই।

ভদ্রলোকের গায়ে একটা মলিন কোট। সমর মিত্র কোটের পকেটে হাত পুরিয়া বাহির করিলেন দুটি বিড়ি, সাড়ে বারো আনা পয়সা, একখানা ময়লা রুমাল, পাঁচখানা ক্যাশ-মেমো এবং একটা দেশলাই! রুমালখানা পরখ করিয়া দেখেন, রুমালের কোণে ইংরেজী অক্ষর লেখা। অক্ষর B।

সমর মিত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন···এ 'B' অক্ষর বিভাসের নামের আদ্যক্ষর নয় তো?

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং তাঁর সে-চিন্তা-সমুদ্রের বুকে তরণীর মতো আসিয়া উদয় হইল বিভাস!

সমর মিত্র বিভাসের দিকে চাহিলেন।

বিভাস বলিল—একজন লোক আছে···ওধারে একটা উঁচু ঢিপি···সেই ঢিপির ওপরে বসে আছে···আমাকে সে দ্যাখেনি। তাকে দেখেই ছুটে আমি আপনাকে খপর দিতে এসেছি।

—হুঁ!···সমর মিত্র বলিলেন,—ঘরের দরজা বন্ধ করো···করে' এসো দেখিগে কোথায় তোমার সে উঁচু ঢিপি···

দুজনে বাহিরে আসিল···

দূরে উঁচু ঢিপি। সমর মিত্র বলিলেন,—প্রায় মাইল-খানেক হবে। যেতে-যেতে ও সরে পড়বে। চারিদিকে ঝোপ-ঝাপ!···তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক! এতখানি দিগন্তর জায়গায় ঐ একটিমাত্র লোক! বোধ হয়, আমাদের বাসনা পূর্ণ হবে! ···কিন্তু একটু চটপট যেতে হবে···অথচ হুঁশিয়ার হয়ে···

দুজনে সতর্ক পায়ে চলিলেন···উঁচু ঢিপির অভিমুখে।

বিভাস বলিল—কি করে আপনি জানলেন স্যর যে কাছাকাছি কেউ থাকবে?

সমর মিত্র বলিলেন,—এ ব্যাপার খুব স্বাভাবিক। খুন করে' যারা লাশ ফেলে যায়, তারা নজর রাখে, কে প্রথমে সে-লাশ দেখে হৈ-চৈ গোলমাল তুলে এ-সংবাদ প্রচার করে।···এ-লাশের সঙ্গে কার সম্পর্ক, তা যদি জানতে পারি, তাহলে ফণীবাবুর হত্যা-রহস্য-আবিষ্কারে এক মুহূর্ত্ত দেরী হবে না বিভাস। তিনিও যেভাবে মারা গিয়েছিলেন, এ-লোকটিও ঠিক সেইভাবে মারা গেছে, আমার বিশ্বাস। নাও, মাথা নীচু করো···সামনে গাছপালার আড়াল নেই! ও যদি আমাদের দেখতে পায়, এখনি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে···

দুজনে কাদা ভাঙ্গিয়া, কাঁটায় গা ছড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন···সামনে ছোট একটা নালা···বেশ চওড়া···নালা বহিয়া জলস্রোত চলিয়াছে···পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না! এ-নালা পার হইতে হইলে একটু ঘুরিয়া···দূরে যেখানে নালার পরিসর খুব অল্প···ওখানে নালার বুকে একরাশ নুড়ি-পাথর।

সমর মিত্র বুঝিলেন, এ নালা পার হইবার জন্য এদিককার লোকজন নুড়ি-পাথর রাখিয়া জলের স্পর্শ হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ঘুরিয়া সেই নুড়ি-পাথরের উপর দিয়া দুজনে নালা পার হইলেন। সমর মিত্রের মনে আশার রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে···প্রভাতের এ অভিযান তবে সফল-সার্থক হইবে। ফণীবাবুর হত্যা-রহস্যের আজ এখনি সমাধান! ভগবান সহায়···

হঠাৎ সামনে বন্দুকের শব্দ···এবং খানিকটা ধোঁয়া!

বিভাস চমকিয়া থামিল, কহিল—সঙ্গে বন্দুক আছে···

সমর মিত্র বলিলেন—তাই বটে!···আমাদের লক্ষ্য করেছে না কি?

দু'চার পা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আর-একটা শব্দ···এবং খানিকটা ঘন-ধোঁয়ার ফুৎকার!

ও পাশে নিবিড় ঝোপ···কিছু দেখা যায় না!

মাথার উপর দিয়া এক-ঝাঁক স্নাইপ উড়িয়া গেল···

দুজনে আসিলেন সেই উঁচু ঢিপির সামনে। চাহিয়া দেখেন, কেহ নাই! যে-লোক বসিয়াছিল, অদৃশ্য হইয়াছে!

দুজনে ঢিপির উপরে উঠিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

সহসা একটা আর্ত্ত ভীত চীৎকার-ধ্বনি…

সে চীৎকার-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সমর মিত্র চাহিয়া দেখেন, অদূরে, ঢিপির নিচে একরাশ শুষ্ক পত্র আগুনে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে…এবং সেই শুষ্ক পত্র-পল্লবের পিছনে ছোট একটা পাতার ছাউনি; সেই ছাউনির সামনে একটা লোক চীৎকার করিতেছে।

সমর মিত্র এক-নিমেষ বিলম্ব করিলেন না…সেইদিকে ছুটিলেন। বিভাসও তাঁর পিছনে ছুটিল।

ছাউনির সামনে আসিয়া দেখেন, লোকটার হাত-পা পুড়িয়া গিয়াছে…যাতনায় সে চীৎকার করিতেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—তেল পাবো? নারকেল-তেল? কিম্বা কতকগুলো আলু?

লোকটা তখন মাটির উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে…সমর মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—একটু জল খাবো।

জল! বিভাস চারিদিকে চাহিল…

জল ঐ জলায়! বিভাস জলার দিকে ছুটিল…

অজস্র কচু গাছ! কচুর বড় পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে জল ভরিয়া বিভাস ফিরিয়া আসিল। লোকটির মুখে সে জল ঢালিয়া দিল।

জল খাইয়া আরাম পাইয়া সে বলিল,—আঃ!…তারপর আবার চক্ষু মুদিল।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু ও আগুন…নিবুনো দরকার।

বিভাস কহিল—কি করে নিবুবেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—বোধ হয়, আপনি নিবে যাবে!…তারপর তিনি চাহিলেন বিভাসের দিকে; কহিলেন—একে পেয়ে বিশেষ ফল হবে, মনে হয় না!

লোকটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ চাহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার নাম কি?

সে বলিল—আজ্ঞে, আমার নাম নারাণ।

—কোথায় থাকো?

সে বলিল—এই ঘরে।

—হাত-পা পুড়লো কি করে?

নারাণ বলিল—আমি ঐ ঝোপে বসে কতকগুলো শাক-পাতা বাচছিলুম…এমন সময় দেখি, ধূ-ধূ আগুন!…পালাবার জন্য যেমন ছোটা, হাতে-পায়ে আঁচ্ লাগলো!

সমর মিত্র বলিলেন—আগুন দিলে কে?

নারাণ বলিল—তা তো জানি না, হুজুর!

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি কি কাজ করো?

নারাণ বলিল—আজ্ঞে, মাছ ধরি। মাছ ধরেই দিন চলে।

সমর মিত্র কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন,—দূরে যে কুঁড়ে-ঘর আছে…ও-ঘরে একজন বাঙালী বাবু খুন হয়েছিলেন, তুমি জানো?

নারাণ বলিল—শুনেছি হুজুর।···ফণীবাবু। তিনি এখানকার খানিকটা আবাদের মালিক।

সমর মিত্র বলিলেন—আজ সকালেও ও-ঘরে একজন মানুষ মারা গেছে। ঘরে লাশ পড়ে আছে দেখে আসছি।

দু'চোখ কপালে তুলিয়া নারাণ বলিল—বলেন কি, বাবু! সত্যি?

সমর মিত্র বলিলেন—বিষ দিয়ে খুন করেছে।

—বিষ!

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ···যে-রকম করে ফণীবাবুকে মেরেছিল···ঠিক তেমনি ভাবে!

নারাণ বলিল—আমার হাত-পা বড্ড জ্বালা করছে···

সমর মিত্র বলিলেন—হাসপাতালে যেতে পারবে?

নারাণ বলিল—হাসপাতালে!···সেই বেলগেছে?

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ···

তারপর তিনি চাহিলেন বিভাসের দিকে; বলিলেন,—আমরা ফিরি চলো বিভাস। লাশ্‌টার গতি করতে হবে। এখানকার থানা বোধ হয় কৃষ্ণপুর। থানায় খপর দি। থানা থেকে লোকজন আসুক······

এই কথা বলিয়া তিনি নারাণকে প্রশ্ন করিলেন,—এখানে কোনো লোককে ডাকাও তো নারাণ···থানায় যেতে হবে।

নারাণ কোনো উত্তর না দিয়া উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—লোক চাই···বুঝলে! আমি পুলিশের লোক···যেখান থেকে পারো, একজন লোককে ডাকাও···নাহলে চলবে না!

নারাণ বলিল—কিন্তু হুজুর,···আমার পা যা হয়ে আছে···কোথায় কাকে ডাকতে যাবো!

একটা কথা বিভাসের মাথায় জাগিল! সে বলিল—ধরণী মণ্ডলকে জানো? এখানকার ধরণী মণ্ডল? মাছের কারবার করে···ধরণী?

নারাণ বলিল,—জানি, বাবু।

বিভাস বলিল—তাকে কোথায় পাবো, বলতে পারো?

দূরে একটা ছোট পল্লীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া নারাণ বলিল—ঐ যে কতকগুলো চালা-ঘর দেখছেন, ধরণী থাকে ঐ পাড়ায়।···

বিভাস দেখিল। দেখিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি দেখছি···ধরণীকে পেলে সুবিধা হবে, স্যর···

এ-কথা বলিয়া বিভাস চলিল ধরণী মণ্ডলের গৃহাভিমুখে। সমর মিত্র বলিলেন,—চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই···মিথ্যা এখানে দাঁড়িয়ে কোনো ফল হবে না!

সমর মিত্রও বিভাসের সঙ্গে চলিলেন।

ধরণী মণ্ডল

প্রায় আধ ক্রোশ পথ,—ঢিপি-ঢাপা-নালা ভাঙ্গিয়া এই আধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে সময় লাগিল প্রায় দেড়-ঘণ্টা।

ধরণীর সন্ধান করিতে তাকে পাওয়া গেল। তেল মাখিয়া ধরণী স্নানের উদ্যোগ করিতেছিল। ধরণী ফণীবাবুর প্রজা। যে-জমিতে চালা বাঁধিয়া বাস করে, সে-জমির মালিক ফণীবাবু।

বিভাসকে দেখিয়া ধরণী বলিল—বিভাস বাবু!

বিভাস বলিল—হ্যাঁ। তোমাকে দরকার ধরণী…

—আমাকে দরকার? বলুন…

বিভাস বলিল—ইনি হলেন সমর বাবু…মস্ত বড় ডিটেকটিভ অফিসার। মকর্দ্দমায় আমি খালাশ পেলেও মামাবাবুর খুনের ইনি কিনারা করতে চান্। তাই আজ এঁকে নিয়ে এখানে এসেছিলুম…সেই ঘরে! এসে দেখি, আমাদের যে-তালা ও-ঘরের দোরে লাগানো ছিল, সে-তালাটা কে খারাপ করেছে—চাবি লাগলো না! কড়া হিঁচড়ে উপ্‌ড়ে দরজা খুলতে হলো!

ধরণী বলিল,—বলেন কি বাবু! কর্ত্তাবাবু মারা যাবার পর থেকে সন্ধ্যা হলে ও-দিককার পথে কেউ চলে না…ও চালার মধ্যে ঢোকা তো দুরের কথা!

বিভাস বলিল—শুধু তালা বিগড়ে দেওয়া নয়, ধরণী! দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আমরা দেখি, ঘরের মধ্যে একটা লাশ পড়ে আছে। নিরীহ একজন ভদ্রলোকের লাশ। গায়ে জখম নেই…কিছু না।…বোধ হয়, বিষ দিয়ে তাকে মেরেছে!

বিস্ময়ে ধরণীর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। ধরণী বলিল—বলেন কি বাবু! মানুষ খুন! বিষ!

বিভাস বলিল,—হ্যাঁ…একজন লোক দিতে হবে তোমাকে। তাকে আমরা এখানকার থানায় পাঠাতে চাই। সে গিয়ে খপর দেবে। থানা থেকে লোক এলে তার মারফৎ লাশ চালান দেওয়া হবে!……

ধরণী চুপ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল,—দিচ্ছি লোক… কিন্তু আমিও একবার আপনার সঙ্গে যেতে চাই…কে লোক খুন হলো!…শুধু দু' মিনিট…তেলটা মেখেছি…চট্ করে মাথায় একটু জল দিয়ে চান্‌টা সেরে নেবো…

বিভাস বলিল,—বেশ, আমরা অপেক্ষা করছি…তুমি চট্ করেঁ নেয়ে নাও…

ধরণী দু'খানা মোড়া বাহির করিয়া আনিল, বলিল,—বসুন বাবু।…তারপর সে ডাকিল,—বাদল…বাদল…

সে ডাকে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের এক তরুণ বাহির হইয়া আসিল।

সে আসিলে ধরণী বিভাসের দিকে চাহিল; চাহিয়া বলিল—বাদল থানায় যাবে'খন। আর কি খপর দিতে হবে, আপনারা শুধু একটু লিখে দিন্…

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ, আমি একটা চিঠি লিখে দেবো…

তিনি পকেট হইতে একটুকরা সাদা কাগজ বাহির করিলেন এবং ফাউণ্টেন-পেন লইয়া কাগজে লিখিলেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিলেন। লেখার মর্ম্ম,—

কৃষ্ণপুর থানা

ইন্‌সপেক্টর বাবু

এই লোকের সঙ্গে এখনি পানপুরে আসিবেন। একজন মানুষ খুন হইয়াছে। লাশ পড়িয়া আছে। সে-লাশ চালান দিতে হইবে।

আমি কলিকাতা পুলিশের ডিটেক্‌টিভ অফিসার। এ কাজের ভার বিশেষভাবে আমার উপর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইয়াছে। ইতি

সমর মিত্র

ইন্‌সপেক্টর, ডি-ডি, সি-পি, ক্যালকাটা

লেখা হইলে এ চিঠি ভাঁজ করিয়া তিনি দিলেন বাদলের হাতে; দিয়া বলিলেন,—থানার বাবুকে নিয়ে তুমি যাবে পানপুরের সেই চালা-ঘরে। আমরা সেইখানে থাকবো। লাশ আছে সেই ঘরে, যে-ঘরে ফণীবাবুর লাশ পাওয়া গিয়েছিল…বুঝলে?

মাথা নাড়িয়া বাদল জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

চিঠি লইয়া বাদল তখনি কৃষ্ণপুর থানার দিকে ছুটিল।

ধরণী বলিল—ছুটো ডাব দিতে বলি…একটু জল খান্। এত বেলা হলো…কেমন?

সমর মিত্র বলিলেন,—বলো। কিন্তু তুমি দেরী করো না ধরণী…বুঝলে…বড্ড তাড়াতাড়ির কাজ। দেখতে-দেখতে বেলা বেড়ে চলেছে।

ধরণী কহিল—না বাবু, আমার একটুও দেরী হবে না। আমি গিয়ে মাথায় শুধু একটু জল দেবো…আর আসবো।

ধরণী তার লোককে ছুটো ডাব পাড়িয়া দিতে বলিল, বলিয়া স্নান করিতে গেল।

সে চলিয়া গেলে সমর মিত্র চাহিলেন বিভাসের দিকে; বলিলেন—এই ধরণীকে কত দিন জানো?

বিভাস বলিল—অনেক দিন। মানে, মামাবাবুর জমিতে ও আছে আজ প্রায় আট-দশ বছর। আমাদের ওখানে ফী-মাসে ছু' একবার করে যেতো…মাছ নিয়ে যেতো… শাক-সব্জী নিয়ে যেতো…ভেট্!

—লোকটি ভালো?

—তার মানে?

—মানে, মাথায় ফন্দী-অভিসন্ধি খেলে? না, সাদাসিধে মানুষ?

বিভাস বলিল—ফন্দী-অভিসন্ধি…কৈ, না, দেখিনি কখনো।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করছি, নিজের কাজ-কর্ম্ম নিয়েই থাকতো? না, পাচ-জনের নামে লাগানি-ভাঙ্গানি, চুকলি-কাটা? কিম্বা নতুন রেয়ৎ-প্রজা আমদানি করা—এ-সবে ঝোঁক ছিল?

বিভাস অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল, তারপর বলিল,—না···কারো কথায় ওকে আমি কখনো থাকতে দেখিনি···

সমর মিত্র শুধু বলিলেন,—হুঁ

ডাব আসিল···বেশ বড় ডাব। দুজনে ডাবের জল খাইয়া আরাম বোধ করিলেন।

ধরণীও স্নান সারিয়া আসিল। বলিল—চলুন বাবু···

ক'জনে আসিলেন জলার-ধারে সেই চালা-ঘরের দিকে।

আসিতে আসিতে ধরণী বলিল—দাদাবাবুর খপর পেয়েছেন বাবু?

বিভাস বলিল,—কান্তির কথা বলছো?

—হ্যাঁ···

বিভাস বলিল—না। তার কি খপর আর পাবো ধরণী!

ধরণী বলিল—সেদিন কেষ্টপুরের গঞ্জে বসেছিলুম···খুব বৃষ্টি এলো। গঞ্জে একজন লোক বলছিল যে ফণীবাবু মারা গেলেন···ছেলের জন্য এত শোক! সেই ছেলে বেঁচে ফিরে এসেছে···জলে ডুবে মারা যায়নি।

চমকিয়া বিভাস তার পানে চাহিল। কহিল,—কান্তি ফিরে এসেছে?

ধরণী বলিল,—আমি জানি না···দেখিনি তো। কর্ত্তাবাবু যাওয়া ইস্তক আপনাদের ওদিকে আর যাইনি। আপনার নামে ঐ মকর্দ্দমা···কিন্তু কার কাছে যাবো?···গঞ্জের সেই লোকটা বলছিল, দাদাবাবু বেঁচে আছেন···এবং তিনি ফিরে এসেছেন!

বিভাস বলিল,—বাজে কথা, ধরণী!···আচ্ছা, কতদিন আগে এ-কথা তুমি শুনেছো?

ধরণী বলিল—তা প্রায় পনেরো-ষোল দিন হবে···

বিভাস বলিল—পাগল! তার সঙ্গে আমার অত অন্তরঙ্গতা···তাছাড়া এখানে এত বড় বিপদ! এ-কথা সে শোনেনি, ভাবো? এলে কোথায় সে যাবে? কোথায় বা থাকবে? বাড়ীতে আসবে নিশ্চয়।

ধরণী বলিল—আপনি এ সম্বন্ধে কোনো কথা শোনেন নি? কোনো কাণাঘুষো? গুজব?

বিভাস বলিল,—না···

ধরণী বলিল,—সে লোককে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কান্তি বাবু কোথায় আছেন? সে বললে, এখানকার সব খপর শুনে তিনি বাড়ী না গিয়ে বর্দ্ধমানে চলে গেছেন। তাঁর কে মামাতো ভাই আছেন না কি বর্দ্ধমানে···সেখানকার উকিল···তাঁর বাড়ীতে।

বিভাস বলিল,—বর্দ্ধমানের উকিল···মামাতো ভাই!···বীরেনবাবু তাহলে!···কিন্তু বীরেন বাবুর সঙ্গে মেলামেশা তার কোনোকালে ছিল না।···এ হতে পারে না ধরণী··· বেঁচে ফিরে এলে সে বাড়ীতেই আসবে! আর কোথাও কেন যাবে?

ধরণী বলিল,—সে-কথা আমি তাকে বলেছিলুম বাবু···তাতে সে লোকটি বললে,— বর্দ্ধমানে যাবার মানে, তাঁর মনে নাকি খুব ভয় ঢুকেছে। আর অবিশ্বাস! বলেছেন, বিভাস বাবুই এ কাজ করেছে বিষয়ের লোভে। কান্তি বাবু বাড়ী ফিরলে তাঁকেও যদি অমনি ঘায়েল করে···

রাগে দুঃখে বিভাসের বুকখানা দুলিয়া উঠিল। সে বলিল—কান্তি আমাকে এমন নীচ ভাববে? অসম্ভব!···

নিঃশব্দে সমর মিত্র এতক্ষণ এ কথা শুনিতেছিলেন···কোনো কথা বলেন নাই। এবার তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন—কে সে লোক, ধরণী?

ধরণী বলিল,—আজ্ঞে, তার নাম জানি না।

—ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক।

—তাকে আর কখনো দেখেছো? না, ঐ একদিনই দেখেছিলে?

ধরণী বলিল—না বাবু, মাঝে-মাঝে দেখি বৈ কি। একটা দোকানে দেখি। মুদির দোকানে। সে দোকানের সে মালিক কি অন্য কাজে সেখানে আসে, তা ঠিক জানি না।

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···এক সময় সে লোকটিকে চুপি-চুপি দেখিয়ে দিয়ো তো আমায়।

ধরণী বলিল,—যদি দেখা পাই, দেবো···

সমর মিত্র বলিলেন—আর-একটি কথা, ধরণী···

—বলুন···

—এ কথা আর কারো কাছে তুমি প্রকাশ করো না···কোনো দিন না!

—না···

কথায়-কথায় ক'জনে আসিল সেই পাতার ঘরের সামনে। দ্বার যেমন ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি ভেজানো আছে।

ধরণী বলিল—এ ঘরটার পানে চোখ পড়লে বুক কেমন করে ওঠে!

সমর মিত্রের কি মনে হইল···সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এ ঘরটি কার? কি জন্যই বা তৈরী হয়েছে? ঘরের মধ্যে কোনো আসবাবপত্র তো দেখিনি!

ধরণী বলিল—এ ঘর কর্তাবাবুর খাশে ছিল বরাবর। এককালে কর্তাবাবু হপ্তায় দু-তিনদিন করে এখানে আসতেন। তখন সে দুদিন কাছাকাছি ঐ জলার ধারে মাছের হাট বসতো, বাবু। হাটে নানা দিক থেকে মাছ এনে জেলেরা এখানে জড়ো করতো। এই জন্য কাছারি-বাড়ীর মতো এ ঘরটি তৈরী করা হয়। কর্তাবাবু নিজে আসতেন এই কারণে যে, তাঁর সরকার-গোমস্তারা কোনো জেলের কাছ থেকে পয়সা-কড়ি না আদায় করতে পারে, বা কারো ওপরে জুলুম না হয়! তাঁর ইচ্ছা ছিল, এ সব মাছ নিয়ে নিজে চালানী কারবার খুলবেন।···কিছু দিন কাজ বেশ চলেছিল। তারপর ওঁর আর ভালো লাগলো না। বললেন, ছেলেরা ডাগর হচ্ছে, ধরণী···আমি আর কদ্দিন! ···ওরা এ-সব ব্যবসা কোনো কালে করবে না···কেন মিথ্যা ভূতের ব্যাগার খেটে মরি, বলো? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এখানে আসা-যাওয়া বন্ধ হলো। সেই ইস্তক দেড় বছর দু বছর এ-ঘর এমনি পড়ে আছে!

সমর মিত্র শুনিলেন। শুনিয়া বিভাসের পানে চাহিলেন; বলিলেন,—যেদিন

সন্ধ্যা বেলায় ফণীবাবু মারা যান, সেদিন সন্ধ্যার সময় ফণীবাবুর এখানে আসা...এবং আসবার সময় ঐ সব জিনিষ আনার কি মানে থাকতে পারে, বিভাস ?

বিভাস বলিল,—ইদানীং ওঁর মনে কেমন একটা আতঙ্ক হয়েছিল। থেকে থেকে মামাবাবু বলতেন, সেকেলে কতকগুলো হীরে-জহরৎ আছে। ভয় হয় বিভাস, বাড়ীতে রাখলে যদি চুরি যায়...এগুলোকে যখের ধনের মতো যদি কোথাও নিঃশব্দে পুঁতে রাখতে পারি, তাহলেই এগুলো রক্ষা পাবে।...

সমর মিত্র বলিলেন—জিনিষ রাখতে এসে...তিনি তো মারা গেলেন। তারপর সে-সব জিনিসপত্র কি হলো ?

বিভাস বলিল,—সে সব জিনিস আমি ফেরত নিয়ে যাই। ফেরত নিয়ে গিয়ে সিন্দুকের মধ্যে চিরকালের মতো সেগুলো রেখে দিছি...

সমর মিত্র বলিলেন,—ঠিক! এ কথা মকর্দ্দমার সময় উঠেছিল বটে!...আচ্ছা, তুমি যদি বিয়ে-থা না করে' মারা যাও, তাহলে তোমার মামাবাবুর নেক্সট্ ওয়ারীশন্ কে হবে ?

বিভাস বলিল—ওঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে আছে...অক্ষয়,—সেই অক্ষয়।

সমর মিত্র বলিলেন—কোথায় সে অক্ষয় ?

বিভাস বলিল—অক্ষয় তার বাপের সঙ্গে আছে বর্ম্মায়। বরাবর। অক্ষয়ের বয়স হবে...তা প্রায় ত্রিশ বৎসর। বিশ বছরের মধ্যে তারা কেউ দেশে আসেনি...

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ...কিন্তু আমরা এসে গেছি...থানা থেকে ওরা কখন্ আসবে ? তার আগে ভালো কথা, ধরণী, একবার এসে ছাখো তো কার লাশ,...তুমি চিনতে পারো কি না...

ধরণী বলিল,—আমারো তাই মনে হচ্ছিল, বাবু।

ক'জনে তখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

তেপান্তরের মাঠ

প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন,...সমর মিত্র চমকিয়া উঠিলেন! বিভাসের সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চ-রেখা ফুটিল! অর্থাৎ লাশ নাই!

সমর মিত্র বলিলেন—ভেল্‌কি দেখছি না কি!

বিভাস বলিল—সত্যি, লাশ গেল কোথায় ?

ধরণী বলিল—লাশ নেই ?

বিভাস বলিল,—না...কিন্তু নিয়ে গেল কে ?

ধরণী বলিল,—সত্যি লাশ ? না, জ্যান্ত ছিল ?

সমর মিত্র কহিলেন—আমি শুধু চোখে দেখিনি তো...তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখেছি। দেখে তবে এখান থেকে বেরিয়েছি!

বিভাস বলিল—তার উপর এর ত্রিসীমানায় জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখিনি তখন !

ধরণী বলিল—তাইতো !···ভূত-প্রেত মানি না···মানলে বলতুম, ভূত হয়ে উবে গেছে !

তিনজনে একেবারে হতভম্ব !···এমন ব্যাপার কেহ কল্পনা করিতে পারে না !

বাহিরে লোক-জনের কলরব শুনা গেল। তিনজনে বাহিরে আসিলেন।

ধরণী বলিল—পুলিশ আসছে···ঐ যে বাদল···

পুলিশ-ইন্‌সপেক্টর আসিল। কৃষ্ণপুর থানার ইন্‌সপেক্টর। সঙ্গে আছে বাদল, আর চারজন পাহারাওয়ালা।

সমর মিত্র বলিলেন,—আসুন। আমার নাম সমর মিত্র···

ইন্‌সপেক্টর অভিবাদন করিল, অভিবাদনান্তে বলিল—আমার নাম মনমোহন।··· লাশ কোথায়, স্যর ?

সমর মিত্র কহিলেন—লাশ উড়ে গেছে !

মনমোহন এ-কথার অর্থ বুঝিল না···সমর মিত্রের মতো একজন সিনিয়র অফিসার তার সঙ্গে কৌতুক করিবেন, অসম্ভব ! কিন্তু এ-কথা···

সমর মিত্র বলিলেন—আশ্চর্য্য হচ্ছেন ! আশ্চর্য্য হবার কথা, নিশ্চয় ! একটু আগে লাশ দেখে আমরা লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেছি, ফিরে এসে দেখি, লাশ নেই !

—বলেন কি স্যর ? এই দিনের বেলায় লাশ-চুরি !

সমর মিত্র বলিলেন,—দেখবেন আসুন···

মনমোহনকে লইয়া সকলে ঘরে আসিলেন,···সমর মিত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐখানে ছিল লাশ। পুরুষ-মানুষ···বয়স প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর হবে। বাঙালী ভদ্রলোক···কাপড়-চোপড় দেখে বেকার বলে মনে হয়।···এখান থেকে আমরা গেছি একঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা—ফিরে এসে দেখি, নেই !···গেল কোথায় ? কে নিয়ে গেল ? কোন্ পথে নিয়ে গেল ?···এই তিন সমস্যার মীমাংসা কি করে হয়, বলুন তো মনমোহনবাবু ?

মনমোহন কোনো জবাব দিল না···উৎসাহ-ভরে আসিয়া সে যেন এক হেঁয়ালির আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়াছে !···তার বুদ্ধি-বৃত্তি কিছুক্ষণ স্তম্ভিতবৎ রহিল।

সমর মিত্র নির্ব্বাক ! বিভাসের মনে হইতেছিল, সে যেন বাস্তব লোক হইতে কোন্ স্বপ্নলোকে গিয়া দাঁড়াইয়াছে !

মনমোহনের বুদ্ধি-বৃত্তির স্তম্ভিত ভাব কাটিলে সে বলিল,—এখন কি করবেন ?

সমর মিত্র বলিলেন,—দেখতে হবে, লাশ কোথায় গেল, কি করে গেল···

মনমোহন বলিল—কিসে করে নিয়ে গেল মোদ্দা ?

সমর মিত্র বলিলেন—মোটরে করে নিয়ে যায়নি···এরোপ্লেনে তুলেও নিয়ে যায়নি, নিশ্চয় !···ঘাড়ে-পিঠে করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কি করে' আর নিয়ে যাবে ?

মনমোহন বলিল—কিন্তু এই খোলা জায়গা···

সমর মিত্র বলিলেন—'হরিবোল' বলে নিয়ে গেছে…যেন রোগে ভুগে মারা গেছে! কারো মনে সন্দেহ হবে না!

বিভাস বলিল—কিন্তু এখানে মানুষ কোথায় যে সন্দেহ করবে? তা ছাড়া আমরা দেখতে পাবো, সে ভয় নিশ্চয় ছিল!…আমরা কাকেও দেখিনি, সত্যি…কিন্তু এ ঘরে তারা আমাদের নিশ্চয় আসতে-বেরুতে দেখেছে!…না দেখলে একটু ফাঁক পাবামাত্র লাশ সরাবে কেন?

সমর মিত্র বলিলেন—সে কথা ঠিক!…কিন্তু এ-সব জল্পনায় লাভ নেই। এখনি আমাদের সন্ধানে বেরুনো প্রয়োজন!

মনমোহন বলিল—কোন্ দিকে যাবেন?

সমর মিত্র বলিলেন—দুজন পাহারওলা এখানে থাকুক ঘর চৌকি দিতে! আমরা বেরুই, চলুন…ধরণী আছে…এখানকার পথ-ঘাট জানে…এখানকার লোক…ও হবে আমাদের গাইড।

দুজন চৌকিদারকে ঘরের পাহারাদারীতে রাখিয়া ধরণীকে গাইড করিয়া সকলে বাহির হইলেন।…

যাইতে যাইতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল…

বিভাস কহিল—আচ্ছা, এ-লোকটিকে যে খুন করেছে, আপনার বিশ্বাস সমরবাবু, সেই লোকই মামাবাবুকে খুন করেছে?

সমর মিত্র বলিলেন—আমার মনে সেই সন্দেহ কতকটা হচ্ছে।…কিন্তু এ-লোকটি কে, যতক্ষণ না তা জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সঠিক কিছু বলা শক্ত!

মনমোহন বলিল—কিন্তু স্যর, আমাদের ঘোরা মিথ্যা হবে, মনে হচ্ছে। তারা চালাক লোক! একটা লাশ ঘাড়ে করে দিনের বেলায় কখ্‌খনো ঘুরবে না। আমার মনে হয়, এখানে এত ঝোপ-ঝাপ, পাঁক-কাদা, জলা-বিল,—সেখানে কোথাও লাশটিকে নিশ্চয় পাচার করে ভালো মানুষ সেজে সরে পড়েছে!

সমর মিত্র বলিলেন—সরে না পড়লেও আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে।… আমার মোদ্দা সব-চেয়ে আশ্চর্য্য লেগেছে কি…জানেন মনমোহনবাবু?

মনমোহন বলিল—কি?

সমর মিত্র বলিলেন,—কলকাতা-শহর ছেড়ে এখানে এই মরুভূমির মধ্যে এরা এমন লীলা-খেলা শুরু করলে কেন, সেইটেই আমার কাছে সব-চেয়ে বড় হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে! এ-খুনের অর্থ…

বিভাস বলিল—আমিও আশ্চর্য্য হচ্ছি, স্যর। মামাবাবু ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ, নির্বিরোধী ভদ্রলোক। কখনো তেজারতী করেন নি যে তাঁর শত্রু থাকবে! আগে মেজাজ কিছু রুক্ষ ছিল…আমরা তখন খুব ছোট…কিন্তু মামীমা মারা যাবার পর থেকে সে-মেজাজ এমন শান্ত হয়েছিল…

সমর মিত্র সে কথার জবাব না দিয়া ধরণীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ জায়গার কোনো নাম আছে তোমাদের মুল্লুকে, ধরণী?

ধরণী কহিল,—আছে বাবু। এ জায়গাটাকে আমরা বলি, মা-মনসার দঁক! এক কালে এখানে নাকি খুব সাপ ছিল। মাসে দু'একজন লোক সাপে কাটা পড়তো… তারপর মা-মনসা স্বপ্নাদেশ দেন! ধুমধাম করে মনসা পূজা হলো…সে আজ প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা!

মনমোহন বলিল—এ জায়গায় দু'শো পাঁচশো মানুষ খুন করে ঐ পাঁকে যদি কেউ তাদের পুঁতে রাখে, তাহলে পাঁচ-সাত বছরেও বোধ হয় সে-সব লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিভাস বলিল,—যা বলেছেন!

সমর মিত্র বলিলেন—পথে কিন্তু পায়ের দাগ দেখছি না তো!…এ-পথে কেউ চললে কাদায় পায়ের দাগ থাকতো! আমরা ভুল-পথে যাচ্ছি না তো?

মনমোহন বলিল—ঘরের কাছে কিন্তু পায়ের দাগ দেখা যায়নি…

সমর মিত্র বলিলেন—কাছাকাছি একবার খোঁজ করা যাক! পায়ের দাগ লুকোবে, এত-বড় ধুরন্ধর শয়তান বাঙলার মাটিতে আজ পর্য্যন্ত জন্মায় নি!…অনেক কেস্ করলুম মনমোহনবাবু…কিন্তু বিলিতি কাগজে-কেতাবে যে-সব শয়তানীর কথা পড়ি, এখানকার সবচেয়ে সেরা শয়তানের শয়তানীও বিলিতি-শয়তানীর কাছে…যেন সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ!

মনমোহন বলিল—যা বলেছেন, স্যর! ওদের চোর-ডাকাতদের তুলনায় এখানকার চোর-ডাকাতদের নেহাৎ গোবেচারা বলে' মনে হয়।

হাসিয়া বিভাস বলিল—লিলিপুটিয়ান্!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু এ কথা থাক…আগে পায়ের দাগ দেখা যাক…

নজর করিতে পায়ের দাগ মিলিল। তিনজন লোকের তিন-জোড়া করিয়া পায়ের দাগ…চালা-ঘরের একই দূর হইতে নরম-মাটির উপর এ-দাগের আরম্ভ…তারপর তিন-জোড়া দাগ বরাবর গিয়াছে:…

সেই পায়ের দাগ ধরিয়া সকলে প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন… পায়ের দাগের তবু বিরাম নাই!…

ঘাসের উপরে কখনো এ দাগ আসিয়া অদৃশ্য হইয়াছে…আবার খানিক পরে নরম-মাটি ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে…

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিবার পর মনমোহন বলিল,—কোথায় চলেছি…এদিকে লোকালয়ের চিহ্ন নেই…পথও তো নেই!

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ…

মনমোহন বলিল—এইখানে এই পাঁকে-কাদায় তারা লাশ পুঁতে গেছে নিশ্চয়!

সহসা উৎসাহ-ভরে বিভাস বলিয়া উঠিল,—এই যে স্যর…দেখুন…পায়ের দাগ এখানে ঐ জলের কোলে গেছে…ঐ পাঁকে…

মাথার উপর জ্বলন্ত তপ্ত সূর্য্য! উৎসাহের ঘোরে তবু কাহারো এক-তিল ক্লান্তি নাই!

সমর মিত্র বলিলেন,—বিভাসের খাসা আবিষ্কার তো!

দরবিগলিত ঘর্ম্ম-ধারায় সকলে তখন ভিজিয়া গিয়াছেন...

মনমোহন বলিল—এইখানে পুঁতেছে...এখানকার পাঁকে দেখছেন এই সব বুড়্ বুড়ি (বুদ্বুদ) কাটছে।

সমর মিত্র বলিলেন—এ পাঁক থেকে লাশ উদ্ধার সহজ হবে না!

মনমোহন বলিল—এ বিষয়ে আমার এই বাঙালী চৌকিদার পীরু খুব ওস্তাদ আছে, স্যর...

মনমোহন চাহিল পীরুর পানে, বলিল—পীরু তোমার সাহায্য দরকার...

পীরু তখনি উর্দ্দি খুলিয়া পা টিপিয়া সন্তর্পণে সেই পাঁকে অগ্রসর হইয়া গেল...কাছে ছিল একটা শুষ্কপ্রায় পেয়ারা-গাছ। তার ডাল ভাঙ্গিয়া মনমোহন বলিল—এই নাও শুক্নো ডাল...সুবিধা হবে'খন...

তারপর মনমোহন চাহিল সমর মিত্রের দিকে; বলিল—পীরু এখানে লাশ উদ্ধার করুক...আমরা স্যর, পায়ের দাগ ধরে এগুই, চলুন...না হলে তাদের আর কোনো সন্ধান পাবো না বোধ হয়!

সমর মিত্র বলিলেন—That's a good idea (ভালো কথা বলিয়াছ)!

পীরু এদিকে পাঁক ঘাঁটিতে লাগিল...ক'জনে ওদিকে আর একটু অগ্রসর হইলেন।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া সকলে দেখেন, অদূরে একটা ইটের পাঁজা...বহু কালের জীর্ণ পরিত্যক্ত পাঁজা। পাঁজার গায়ে রাশীকৃত আগাছা জন্মিয়া জঙ্গল রচিয়া তুলিয়াছে...

বিভাস বলিল—এই যে পায়ের দাগ পাঁজার দিকে গেছে...আসুন......

উৎসাহ-ভরে বিভাস সকলের আগে পাঁজার দিকে ছুটিল...খানিকটা যাইবামাত্র তার পায়ের তলায় ইট সরিয়া গেল...সঙ্গে সঙ্গে সে একটা গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছিল...সমর মিত্র ক্ষিপ্র চরণে আসিয়া তার দুই হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

বিভাস বলিল—পগার...ওঃ, খুব বেঁচে গেছি!

সমর মিত্র বলিলেন—ওস্তাদির পরিচয় রেখে গেছে এখানে...

বিভাস কহিল—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, তারা আমাদের উপর নজর রেখেছে। বুঝেছে, তাদের পায়ের দাগ ধরে আমরা তাদের পাছু-পাছু ঠিক হানা দেবো। তাই এখানে এই পায়ের চিহ্ন রেখে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইট আর পাতা সাজিয়ে এমনভাবে এ-গর্ত ঢেকে দেছে যে, আমরা এখানে পা দেবামাত্র গর্ত্তের মধ্যে পড়ে জখম হবো! দেখছো, কি গভীর গর্ত্ত!

কণ্টকিত দেহে সকলে চাহিয়া দেখে, সত্যই তাই! মনে হয়, এখানে একটা কূয়া ছিল...কূয়ায় পড়িলে তাদের পিছনে ছোটা তো দূরের কথা,...প্রাণ লইয়া উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব!

মনমোহন কহিল,—এ যা কূয়া…যেভাবে আমরা চলেছিলুম, আর একটু হলে ঐ কূয়ার মধ্যে সটান্ সকলের জ্যান্তে কবর হতো!

ধরণী তখনো শিহরিয়া রহিয়াছে, তার শিহরণের ভাব তখনো কাটে নাই!

সে বলিল,—ভয়ানক বদমায়েস তো!…কিন্তু এ-সবের মানে বুঝতে পারছি না বাবু! এতখানি আয়োজন…

বিভাস কহিল—জানে না যে আমরা আজ এখানে আসবো! এ যেন বোধ হচ্ছে, গোড়া থেকে ফন্দী-ফিকির সব ঠিক করা ছিল!

সমর মিত্র বলিলেন,—যাক, ওরা আমাদের নিরস্ত করতে পারবে না। আমাদের এ chase (অনুসরণ) আমরা ছাড়বো না!

সতর্ক-পায়ে সকলে আবার চলিতে লাগিলেন।

ধরণী কহিল—এই ঠিক-দুক্কুর-বেলা…আপনারা যদি একটু-কিছু মুখে দিতেন!… আমার ওখান থেকে আর কিছু না হোক, একটু দুধ অন্ততঃ!

সমর মিত্র বলিলেন—কিছু চিন্তা করো না ধরণী…মনে যে-রকম উৎসাহ নিয়ে বেরিয়েছি, খিদে-তেষ্টার কথা কারো মনে নেই! তবে বেচারী তুমি…স্নান করে খাবার বন্দোবস্ত করছিলে…পাত্ থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে এসেছি…

মৃদু হাস্যে ধরণী বলিল—আপনাদের আশীর্ব্বাদে তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না, বাবু। আমার এ-মাথার উপর দিয়ে কত ঝড়-জল, কত রৌদ্র যে চলে গেছে…এক-বিন্দু জল না খেয়ে কতদিন আমার কাজে-কর্ম্মে কেটেছে…

বিভাস বলিল—কষ্ট সয়েছো বলেই দেহখানি লোহার ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিতে পেরেছো…ননীর পুতুল তৈরী হওনি যে রোদে-জলে গলে যাবে!

সমর মিত্র চারিদিকে চাহিলেন। চারিদিকে ঝোপ-ঝাপ জলা আর জঙ্গল…ঝোপ-ঝাপের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে মাঝে দু-চার-দশখানা চালা-ঘর…লোকের বসতির চিহ্ন দেখা যায়!

মনমোহন বলিল—কোথায় চলেছি, বুঝছি না! মনে হয়, পৃথিবীর শেষ-সীমায় গিয়ে যেন পৌছুবো!…পায়ের কোনো দাগ আর দেখছি না স্যর…

সমর মিত্র বলিলেন—শক্ত মাটি বলে…কিম্বা তারা হুঁশিয়ার হয়ে চলেছে!… আমাদের যদি লক্ষ্য করে থাকে, তাহলে এটুকু বুঝেছে যে পায়ের দাগ ধরে তাদের পাছু নেবো!

আরো খানিকদূর আসিবার পর পায়ে-চলা একটা দাগ মিলিল…

ধরণী বলিল—এ পথ এদিকে গেছে মীর-গঞ্জে—আর ওদিকে ওখানে গেছে ঐ বড় বিলে। ও বিলে ডিঙ্গি মেলে…জেলে-ডিঙ্গি…সালতি! তাতে চড়ে সকলে মাছ ধরে কি না!

সমর মিত্র বলিলেন—এ বিল পার হয়ে ওপারে ওটা কি জায়গা?

ধরণী বলিল—ওপারে একখানা গাঁ আছে। সে গাঁয়ের নাম চালতা-গাঁ।

বিভাস কি দেখিতেছিল—সহসা ছুটিয়া পগারের পাশ হইতে সিগারেটের একটা খালি

প্যাক কুড়াইয়া লইল এবং সেই সঙ্গে একটা দেশলাইয়ের বাক্স। সেগুলা সমর মিত্রের সামনে ধরিয়া সে বলিল—এই দেখুন স্যর···তাজা···টাটকা···ওরা ফেলে গেছে, নিশ্চয়।

সমর মিত্র সেগুলো নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন,—"ওল্ড বয়" সিগারেট। ঠিক কথা বলেছো বিভাস···এগুলো ওদের জিনিস বলেই মনে হচ্ছে!

ধরণীর অতিথি-সেবা

সমর মিত্র বলিলেন—ডিঙ্গিতে চড়ে বিল পার হয়ে ওরা চালতা-গাঁয়ে যাবে না··· ডিঙ্গিতে চড়লে ধরা পড়বার ভয়! আমার মনে হয়, এই মীরগঞ্জের দিকে গেলে ভালো হয়।

মাথার উপর সূর্য্য তখন আরো প্রখর রশ্মি বর্ষণ করিতেছে···সকলে মীরগঞ্জের অভিমুখে চলিলেন।

ধরণী বলিল—মীরগঞ্জে একজন ধনী ব্যাপারী আছে,—ওয়াজির সাহেব। তাঁর ওখানে যদি কোনো সন্ধান মেলে···

সমর মিত্র বলিলেন—কি সন্ধান সে দেবে?

ধরণী বলিল—নতুন কোনো লোককে দেখলে তার লোকজন বলতে পারবে অন্ততঃ···

সমর মিত্র বলিলেন—চলো, দেখা যাক! মানে, we would leave no stone unturned (আমরা একখানি প্রস্তরও না তুলিয়া ছাড়িব না)!

ক'জনে যখন মীরগঞ্জের হাটে আসিয়া পৌছিলেন, বেলা তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘামিয়া সকলে একশা···এ রৌদ্রে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া কাণ-মাথা তাতিয়া ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে!

হাটে রাশীকৃত ডাব। ধরণী বলিল,—ডাব খান্ বাবুরা। তারপর যা করবার, করবেন···

ডাব কাটিয়া ধরণী পরিবেশন করিল···ডাবের জল, ডাবের শাঁস।

অদূরে অশথ-তলায় দুখানা পাল্কী আর একখানা ছ্যাকড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তেপান্তরের মাঠে গাড়ী-পাল্কী! ওদের জন্য নয় তো?

ধরণী বলিল—আমি দেখছি···

ধরণী গেল তত্ত্ব লইতে···সমর মিত্র ডাবের দোকানের সামনে একটা লোহার চেয়ারে বসিলেন। মনমোহন বিড়ি ধরাইল; বিড়ি ধরাইয়া কহিল—এ পর্ব্ব কোথায় যে শেষ হবে, আর কখন···মস্ত সমস্যা!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে টেনে এনে ঘুরছি···তাইতো···থানায় কোনো জরুরি কাজ নেই তো?

মনমোহন কহিল—এও তো মস্ত কাজ স্যর। তাছাড়া এমন suspense (কৌতূহল) জেগেছে যে আপনাদের ছেড়ে থানায় ফিরতে মন সরছে না!

ডাবওয়ালার পানে চাহিয়া সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—এদিকে নতুন কোনো লোককে আজ দেখেছো, বাপু? দু' তিন দিনের মধ্যে?

ডাবওয়ালা বলিল,—আজ্ঞে না, বাবু। আজ এখানে হাট বসেছে···দু'চারজন খদ্দের আসছে, তাদের নিয়েই ব্যস্ত আছি···

ডাবওয়ালার বালক-পুত্র তামাক সাজিয়া আনিল। সমর মিত্র বলিলেন,—আমরা কেউ তামাক খাই না···মনমোহন বাবু তামাক খাবেন?

মনমোহন বলিল—না স্যর। থানায় কাজ করি, তোয়াজ করে হুঁকোয় তামাক খাওয়া অভ্যাস করবো কখন, বলুন? ঐ বিড়ির উপর দিয়েই ধোঁয়া খাবার আশ মিটুতে হয়!

ডাবওয়ালাকে সমর মিত্র বলিলেন,—দু' পয়সার বিড়ি দাও তো···

ডাবওয়ালা বিড়ি দিল। সমর মিত্র দাম দিতে গেলেন, সে লইবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—না বাপু, তাহলে বিড়ি নেবো না। একে তো পুলিশের দুর্নাম আছে, তদারকে এসে ডাব-বিড়ি-পাণ খেয়ে দাম দ্যায় না···সে দুর্নাম আর বাড়াই কেন?

ডাব ও বিড়ির পয়সা তিনি দিলেন। বিভাস বলিল—আপনি কেন দেবেন স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন—কটাই বা পয়সা!···তোমার এ মামলার তদারকে যদি সফল হই, তখন না হয় তুমি কালিয়া-পোলাও খাওয়াবার ব্যবস্থা করে ডাবের-বিড়ির এ-ঋণ শোধ করো!

ধরণী ফিরিল। ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল—ও গাড়ী আর পালকী একটি বাবু ভোর থেকে মোতায়েন রেখে গেছে। বললে, ওদের আগাম ভাড়া দিয়ে গেছে দেড় টাকা···সারাদিনের জন্য ভাড়া দেবে বলেছে তিন টাকা···সেই বাবুর জন্য ওরা অপেক্ষা করছে।

সমর মিত্রের বুকখানা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি বলিলেন,—আমরা বাবুর পাছু নিয়েছি, তাই হয়তো বাবু এ ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের পক্ষে তাহলে এখন আসর সাজিয়ে বসে থাকলে চলবে না তো···একটু লুকোচুরি খেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনমোহন বলিল—নিশ্চয়!

সমর মিত্র বলিলেন,—এবং সে-লুকোচুরি···

চারিদিকে চাহিলেন। চাহিয়া আবার বলিলেন,—এই ডাবের দোকানের পিছনে ঐ যে ছোট চালাখানা খালি দেখছি, ঐখানে···

মনমোহন বলিল—বেশ বলেছেন···

ডাবওয়ালার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া ক'জনে গিয়া সেই ছোট চালায় প্রবেশ করিলেন। ডাবওয়ালা একখানা মাদুর আনিয়া ঘরের মেঝেয় বিছাইয়া দিল।

সমর মিত্র তাকে বলিয়া দিলেন,—হুঁশিয়ার !···কেউ এসে গাড়ী-পালকীতে চড়তে গেলে নিঃশব্দে আমাদের খপর-দেবে···বুঝলে ! তোমাকে বখসিশ দেবো···

হাসি-মুখে ডাবওয়ালা বলিল—বেশ, বাবু···আপনারা নিশ্চিন্তি মনে এখানে বসুন···

সকলে বসিলেন। ধরণী বলিল—আমি একটু ঘুরে আসি···

বিভাস বলিল—কোথায় যাবে ধরণী ? বাড়ী ?

ধরণী বলিল—আপনাদের ফেলে বাড়ী যাবো কি ? বাড়ী যাবো না। এইখান থেকেই একটু ঘুরে আসছি···

ধরণী বাহির হইয়া গেল।

মনমোহন বলিল—ওয়াজির সাহেবের কাছে গেল বোধ হয় !

সমর মিত্র বলিলেন—তা যদি যায়, তাহলে সব আয়োজন পণ্ড করবে ! সে ভদ্রলোক যদি সাজ-সাজ রব তোলেন, এরা তাহলে হুঁশিয়ার হবে !

বিভাস কহিল—বারণ করে দিয়ে আসি···

সমর মিত্র বলিলেন,—তাই এসো। যোদ্ধা সাবধান বিভাস, এরা যদি ফণীবাবুকে মেরে থাকে, তাহলে তোমাকে চেনে ! মকর্দ্দমার সময় আদালতে নিশ্চয় এরা যেতো ওয়াচ্ করতে !

বিভাস কহিল,—সাবধানে যাবো আমি।

বিভাস গেল ধরণীর পিছনে ; এবং তাকে হুঁশিয়ার করিয়া তখনি সে ফিরিয়া আসিল।···

বিভাস ফিরিয়া আসিলে সমর মিত্র বলিলেন—কাকেও দেখলে ?

বিভাস কহিল—না।

সমর মিত্র বলিলেন,—গাড়ী-পালকী ?

বিভাস বলিল—ওখানে ঠিক আছে।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

তারপর সকলে চুপচাপ। কাহারো মুখে কথা নাই।

বাহিরে কেনা-বেচার কলরব চলিয়াছে···কাছে একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া ডাহুক ডাকিতেছিল।

বিভাস একাগ্র মনে সেই ডাক শুনিতেছিল। এ ডাকে তার বহুদিনকার পুরানো স্মৃতি মনে জাগিতেছিল ! কান্তির সঙ্গে মাঝে মাঝে এই বাদায় আসিত পাখী শিকার করিতে। কি আনন্দেই দিন কাটিত ! রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িতেছিল··· রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন লিখিয়াছেন, পৃথিবীর বুকে সহসা কোথায় রন্ধ্র রচিয়া উঠিল এবং সে রন্ধ্র-মুখে হিংসার মূর্ত্তি ধরিয়া লক্ষ লক্ষ সাপ একেবারে ফণা তুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে !···

সহসা সমর মিত্র ডাকিলেন—মনমোহন বাবু···

মনমোহন বিড়ি টানিতেছিল···সমর মিত্রের আহ্বানে বলিল—বলুন স্যর···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার লোককে পাঁক থেকে লাশ তুলতে বলে এলুম… সেখানে কি হচ্ছে, তা তো জানতে পারছি না!

মনমোহন বলিল—আমার মনেও সে কথা জাগছে মশাই!…আমি একবার যাবো না কি? আর কিছু না হোক, কার লাশ সেটা জানতে পারলে যদি কিছু কিনারা হয়।

সমর মিত্র বলিলেন—যাওয়া সহজ কথা নয়! আপনার চৌকিদার বেশ পাকা লোক তো?

মনমোহন বলিল,—পীরু খুব ওস্তাদ লোক! বদমায়েসের যম!

সমর মিত্র বলিলেন,—লাশ তুলে থানায় নিয়ে যেতে পারবে? আমরা তাকে সে কথা বলে আসিনি…বুদ্ধি করে' যদি নিয়ে যায়!

মনমোহন বলিল—খানিকক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে,—আমাদের ফিরতে যদি খুব দেরী দেখে, তাহলে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়!

সমর মিত্র বলিলেন—এমন জায়গা যে খপর পাঠাবো, সে উপায় নেই!

বিভাস বলিল,—কেন, ঐ পাল্কী রয়েছে…ওর একখানার চড়ে' যদি কেউ যায়?

সমর মিত্র বলিলেন—দেখা যাক! আমরা যেজন্য ওৎ পেতে বসে আছি, তার কি হয় তারপর লাশের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি!…

বিভাস কহিল—কার মুখ দেখে উঠেছিলেন আজ, কি করতে এলেন, আর কি হলো!…আপনার টু-শীটার গাড়ীর জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে…চৌকিদারী করতে কেউ নেই,…শেষে এই বদমায়েসদের মধ্যে কেউ যদি সে-গাড়ী নিয়ে সরে পড়ে?

এ-কথায় সমর মিত্র যেন চমকিয়া উঠিলেন! বলিলেন—ঠিক কথা বলেছো বিভাস। এ-কথা আমার মনে বাষ্পাকারে উদয় হয়নি!

মনমোহন বলিল—আসবার সময় যদি গাঁয়ের কোনো লোককে ডেকে নজর রাখতে বলে আসতুম!

সমর মিত্র বলিলেন—তখন কে জানে, এমন ভাবে পৃথিবী-প্রদক্ষিণে বেরুতে হবে…

বিভাস বলিল—ধরণী এলে ওকে বলি, এখান থেকে কাকেও বরং পাঠিয়ে দিক। যে লোক যাবে, গাড়ী পাহারা দেবার জন্য তাকে পয়সা দেবো…

মনমোহন বলিল—Good suggestion (ভালো প্রস্তাব) স্যর!

এমনি কথা-বার্ত্তার মধ্যে ধরণী ফিরিল; তার সঙ্গে একজন লোক। সেই লোকের হাতে বড় ঘটীতে এক ঘটী দুধ, আর এক হাতে পাকা কলার ছড়া, ধরণীর হাতে কাগজের দুটো বগলি। একটা বগলিতে চিঁড়ে, আর একটা বগলিতে বাতাসা।

ধরণী বলিল—যতক্ষণ বসে থাকবেন, ততক্ষণ কিছুক্ষণ খেয়ে নিন দিকিনি! ভালো চিঁড়ে এনেছি…গাছের ভালো কলা আছে, আর এই বাতাসা। তাছাড়া দুধও দেড়সেরটাক পেয়েছি…খাঁটী দুধ! ফলার করুন…

সমর মিত্র বলিলেন—এইজন্য বুঝি তুমি বেরিয়েছিলে?

ধরণী বলিল—বেরুবো না? কখন্ বেরিয়েছেন…এই রোদে যে ছুটোছুটি করছেন

তার উপর এ ছুটোছুটির বিরাম কখন্ হবে, ঠিক নেই। না খেয়ে পিত্তি পড়িয়ে শেষে অসুখ করবেন কি!···কিছু খেয়ে নিন্···ভালো জিনিষ···খেলে অসুখ-বিসুখ করবে না!

এই কথা বলিয়া ধরণী সে-লোকটির পানে চাহিল, বলিল—শোনো···দুধের ঘটি-টটি তুমি রেখে যাও···গিয়ে ঐ ওয়াজির সাহেবের বাড়ী থেকে ওঁরা দেবেন কূয়োর পরিষ্কার জল···সেই জল তুমি ঘটিতে ভরে নিয়ে এসো। ওঁরা ভালো ঘটি দেবেন···'

লোকটা চলিয়া গেল।

ধরণী বলিল—ওয়াজির সাহেবকে আমি কোনো কথা বলিনি। বলেছি, কলকাতা থেকে ক'জন বাবু শিকারে এসেছিলেন···কিছু খান্নি, এত বেলা হয়ে গেছে···তাই তাঁদের সেবার জন্য···

বিভাস খুশী হইয়া বলিল—খাওয়া-দাওয়া তো হবে, তারপর ওদিককার?

ধরণী কহিল—যখন বললেন, তখন শুনবেন, আমার যা মনে হয়?

বিভাস বলিল,—শুনি।

ধরণী বলিল—তারা টের পেয়েছে নিশ্চয়! না হলে আমরা এসে এখানে পৌঁছে গেছি, আর তারা এখনো পর্য্যন্ত পৌঁছুলো না!···আমাদের আগে-আগে তারা আসছিল···আমরা ছিলুম তাদের অনেকখানি পিছনে!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার মনে হয়, আমাদের সাড়া পেয়ে তারা তাদেব প্ল্যান্ বদলেছে।

মনমোহন বলিল—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

বিভাস কহিল—তাহলে কি করতে চান?

সমর মিত্র বলিলেন—আপাততঃ ধরণীর আতিথ্য গ্রহণ করা যাক। তারপর একটা উপায় করতেই হবে। এখানে বসে বসে প্রহর গুণলে কোনো ফল হবে না তো!

মনমোহন বলিল—এর দু'রশিটাক পরেই আমার থানার হুদ্দো···তারপর যে জায়গা, সে জায়গা হলো ময়ূরদাঁড়ি থানার হুদ্দো!

সমর মিত্র বলিলেন—এ গাঁয়ে পাকা রাস্তা আছে, মনে হয়। পাকা রাস্তা না থাকলে ঘোড়ার ভাড়া-গাড়ী মিলতো না!

বিভাস কহিল—এ-গাঁয়ে এমন লোকজনের বাস যে ভাড়া-গাড়ীর দরকাব আছে··· হ্যাঁ, ধরণী?

ধরণী কহিল—আজ্ঞে, ক'জন মুসলমান গেরস্তর বাড়ী-ঘর আছে এখানে। তারপর বাবু যা বললেন, এখানে পাকা রাস্তা আছে···পাকা মানে কি আর যশোর রোডের মতন? তা নয়! গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী যেতে পারে। লরি-চলার মতো পথ নেই!

সমর মিত্র বলিলেন,—ভাবনার কথা হলো। শিকাব ছেড়ে মন যেতে চাইছে না··· অথচ থেকে কিছুই হচ্ছে না! শিকারকে একবার যদি এখান ছেড়ে দি, তাহলে লোকারণ্যে মিশে সে-শিকার জন্মের মতো হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!···

নিশ্বাস ফেলিয়া মনমোহন বলিল—নিশানা পেলে অন্য দিক দিয়ে হয়তো শিকারের সন্ধান মিলতে পারে স্যর !

সমর মিত্র বলিলেন—অসম্ভব নয় ! কিন্তু এই তেপান্তরের মাঠের ধারে কার কাছ থেকে কি খপব যে মিলবে···তাছাড়া আমার মনে হয়, ও-লাশ যার, সে-লোক এদিককার বাসিন্দে নয়···ও এদের দলের লোক কিম্বা এ-লোকটাকে মেরে বদমায়েসগুলো অন্য কাজ হাসিল করেছে !

ইতিমধ্যে ধরণীর সে-লোক জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ধরণী বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে সকলে খেয়ে নিন দিকিনি···আমি খানকতক কলাপাতা নিয়ে আসি !

ঐ বুঝি !

সকলে আহার করিতেছে, ডাবওয়ালা আসিয়া সংবাদ দিল, ভাড়াটে-গাড়ী চলিয়া যাইতেছে।

সমর মিত্র বলিলেন,—পাল্কী দুটো ?

ডাবওয়ালা বলিল—তারাও পাল্কী তুলছে।

সমর মিত্র বলিলেন,—খালি-গাড়ী, খালি-পাল্কী নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে ?

ডাবওয়ালা বলিল—তাই, বাবু !

সমর মিত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তারপর বলিলেন—ভালো কথা নয়।···আমি একবার সন্ধান নি···তোমরা সকলে বসে খাও···কেউ উঠো না। আমি নিঃশব্দে সন্ধান নিতে চাই।

এই কথা বলিয়া সমর মিত্র তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া বাহিরে আসিলেন।

আসিয়া দেখেন, ডাবওয়ালার কথা সত্য। গাড়োয়ান তার কৃশকায় ঘোড়া দুটার দড়ি ধরিয়া গাড়ীতে তাদের জুতিয়া দিতেছে।

সমর মিত্র আসিলেন গাড়োয়ানের কাছে, বলিলেন—ভাড়া যাবি ?

গাড়োয়ান বলিল—কোথায় ?

সমর মিত্র সদ্য শুনিয়াছেন, পাশের গ্রামের নাম ময়ূর-দাঁড়ি। সেই নাম স্মরণ করিয়া তিনি বলিলেন—ময়ূর-দাঁড়ি।

গাড়োয়ান কি ভাবিল, তারপর বলিল,—ময়ূর-দাঁড়ির কোথায় ? কোন্ পাড়ায় ?

সমর মিত্র প্রমাদ গণিলেন। তাইতো···তিনি তো কোনো পাড়ার নাম জানেন না! কিন্তু তাহাতে হঠিবার পাত্র তিনি নন্! গাড়োয়ানের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—পাড়ার নাম জানি না। ওখানে আছেন মফিজুদ্দিন সাহেব। তাঁর বাড়ী।

গাড়োয়ান জাতে মুসলমান। মফিজুদ্দিন—নাম শুনিয়া সে তার পরিচিত-গণ্ডীটুকুর

মধ্যে সন্ধান-কামী হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর বলিল—মফিজুদ্দিন-সাহেব!… চিনি না বাবু…

সমর মিত্র বলিলেন—কি করে চিনবে বাপু? তিনি থাকেন বর্দ্ধমানে। সম্প্রতি ময়ূর-দাঁড়িতে এসেছেন তাঁর শ্বশুরের ওখানে।

গাড়োয়ান কহিল—তেনার নাম? সাহেবের শ্বশুরের নাম জানেন?

—না। তবে গাঁয়ে গেলেই সেখানে সকলে বলে দেবে'খন, মফিজুদ্দিনের শ্বশুরের নাম।

গাড়োয়ান বলিল—আমার বাড়ী ময়ূর-দাঁড়িতে, বাবু। আমি যাকে জানি না…তার কথা সেখানে বলবে অন্য জন!…বেশ, আসুন…কিন্তু আমি আর এখানে ফিরবো না।

সমর মিত্র বলিলেন—ভাড়া দেবো, ফিরবো না কেন?

গাড়োয়ান বলিল,—আমাকে সওয়ারি নিয়ে যেতে হবে সেই বেগুনবেড়ে।

সমর মিত্র বলিলেন—চালাকি করছো বাবু! এই তো এখানে ঠায় বসে আছো! অমনি সওয়ারি পেয়ে গেলে বেগুনবেড়ে যেতে!…

গাড়োয়ান বলিল—না বাবু, এখান থেকে সওয়ারি নিয়ে যাবার কথা ছিল—তাই এখানে বসেছিলুম। এখন লোক এসে বলে গেল, এখান থেকে যাঁদের যাবার কথা ছিল, তাঁরা গাড়ী নেবেন ময়ূর-দাঁড়িতে। সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে বেগুনবেড়ে যেতে হবে!…মিথ্যা কথা কেন বলবো মশাই? বিশ্বাস না হয়, এই পাল্কীওলাদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরাও পাল্কী নিয়ে ময়ূর-দাঁড়ি যাচ্ছে…ওরাও যাবে হেথা থেকে সেথাকে সেই বেগুনবেড়েয়!

আশার আলোয় সমর মিত্রের মন একেবারে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—ও…পাল্কী দুটোও ময়ূর-দাঁড়ি চলেছে? বাঃ! তাহলে এমনি খালি যাবে কেন, আরো সওয়ারি আছে আমার সঙ্গে। ভালো হলো! কত করে তোমরা ভাড়া নেবে?

গাড়োয়ান বলিল—আমি নেবো দশ আনা…পাল্কীর ভাড়া ওদের সঙ্গে দর করুন।

সমর মিত্র কহিলেন—তুমি দাম করে দাও…আমি এদিকে নতুন এসেছি…দর-দাম জানিনা তো।

গাড়োয়ান কহিল—আমায় দশ আনা দেবেন তো?

সমর মিত্র বলিলেন—দেবো।

গাড়োয়ান খুশী হইল। এক কথায় বাবুটা দশ আনা দিতে রাজী! ভাবিয়াছিল এতখানি বেলা পর্য্যন্ত চুপচাপ বসিয়া রহিলাম, তার উপর এতখানি পথ খালি গাড়ী লইয়া যাইব! সে জায়গায় একেবারে দশ-দশ আনা লাভ!

সমর মিত্রের উপর আত্তিশো দেখাইয়া পাল্কীওয়ালাদের ভাড়া সে ঠিক করিয়া দিল চার আনা করিয়া…দুজনের আট আনা।

ভাড়া ঠিক হইলে সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে আমার লোকজনদের আমি ডেকে আনি?

গাড়োয়ান বলিল—আসুন।

সমর মিত্র তখন মনমোহন প্রভৃতিকে লইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। পাল্কী দুখানায় দুজন চৌকিদার চড়িয়া বসিল। গাড়ীতে বসিলেন সমর মিত্র, মনমোহন, বিভাস এবং ধরণী।

মনমোহনের পুলিশ-বেশ এবং সঙ্গে চৌকিদার দেখিয়া গাড়োয়ান একটু বিচলিত হইল! সে শুধু বলিল,—পুলিশ!

তার ভয় হইল! পুলিশ কি গাড়ী চড়িয়া ভাড়া দিবে? শুধু তাই নয়! পুলিশ একবার যখন গাড়ী ধরিয়াছে, তখন কাঁঠালের আঠার মতো লাগিয়া থাকিবে! গাড়ী ছাড়িয়া দিবার নাম করিবে না!

কিন্তু মুখের কথায় মনের এ ভয় প্রকাশ করিতে পারে না! কাজেই আলাপ জমাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—গাঁয়ে চুরি হয়েছে না কি বাবু?

গাড়োয়ানের মুখ দেখিয়া সমর মিত্র বুঝিয়াছিলেন, গাড়োয়ানের মনে ভয় ও কৌতূহল বেশ জমিয়া উঠিয়াছে! সে-ভাব মোচনের জন্য হাসিয়া তিনি বলিলেন···চুরি নয় রে বাপু! এসেছিলুম এখানকার আবাদে একটা আবগারী মকর্দ্দমার তদন্ত করতে! তারপর বেলা হলো···ভাবলুম, মফিজুদ্দিন সাহেবের শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারপর রোদ পড়লে ফিরবো।

গাড়োয়ান বলিল—কোথায় ফিরতে হবে?

সমর মিত্র বলিলেন,—এইখানেই ফিরবো। আজ রাত্রে আমরা এইখানেই থাকবো ওয়াজির সাহেবের বাড়ীতে। তিনি নেমন্তন্ন করেছেন কি না···

গাড়োয়ান যেন একটু আশ্বস্ত হইল! সে শুধু বলিল,—ও···

তারপর গাড়ী-পাল্কীতে তাঁরা সওয়ার হইলে গাড়ী-পাল্কী যাত্রারম্ভ করিল।

মেটে পথ। দুধারে নালা। নালার দুই তীর বহিয়া মাঝে মাঝে ঝোপ, জলা, বাগান, কুটীর! কোথাও বা দুদিকে দিগন্তব্যাপী শুষ্ক প্রান্তর! রৌদ্রতাপে প্রান্তরের বুক ফাটিয়া খাঁ-খাঁ করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে যতদূর দৃষ্টি চলে, মনে হয়, ওখানে যেন কোনো লোকের চিহ্ন নাই!

গাড়ীর মধ্যে সকলে চুপচাপ বসিয়া আছেন। সমর মিত্রের বুকে চিন্তার সূত্রগুলা টানাপোড়েনে যেন সমস্যা-সমাধানের বিপুল সম্ভাবনা রচিয়া তুলিতেছে! মনমোহন ভাবিতেছিল, তার এ অভিযানের সমাপ্তি কখন কি ভাবে যে ঘটিবে···বিভাস ভাবিতেছে, সমর মিত্র নিশ্চয় এমন-কিছু লক্ষণ দেখিয়াছেন, যে-লক্ষণ নিমেষ-পরে সার্থকতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে!

ধরণী ভাবিতেছে···

সমর মিত্র বলিলেন,—দূরে ঐ একখানা গাঁ না?

ধরণী বলিল—ঐ তো ময়ূরদাঁড়ি। ওই যে সাদা এক-তলা বাড়ী দেখছেন, ওটা হলো হানিফ সাহেবের বাড়ী। হানিফ সাহেবের জুতোর দোকান আছে কলকাতার চাঁদনীতে। তিনি থাকেন কলকাতায়; তাঁর ভায়েরা এখানে থাকেন। তেনাদের আছে গুড়ের কারবার। খেজুর আর আখের যা ফলন হয়, ওঃ···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ময়ূরদাঁড়ি তো বেশী দূরে নয় ধরণী···

ধরণী কহিল—আজ্ঞে না···

সমর মিত্র বলিলেন,—গাড়োয়ান বললে দশ আনা ভাড়া নেবে। তাতে আমার মনে হয়েছিল, অনেক দূরে ময়ূরদাঁড়ি।

ধরণী বলিল—আপনি দশ আনা দেবেন, বলেছেন?

—বলেছি।

ধরণী বলিল,—সহুরে ভদ্রলোক দেখে ঠকিয়েছে। চার আনা পেলে বাবা বলে গাড়ীতে তুলে নিতো। চার আনার জায়গায় দশ আনা!

সমর মিত্র বলিলেন,—তা দেবো···ছ পয়সা বেশী পেলে আমাদের উপর যেমন খুশী থাকবে, তেমনি ভবিষ্যতের আশাও রাখবে! আমি যা ভাবছি, যদি তা হয়···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র চুপ করিলেন। বিভাস বলিল—কিন্তু আমরা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেখানে চলেছি, তারপর ফেরা···মানে, রাত্রের আগে আপনার সে টু-শীটারের পাশে পৌঁছুনো সম্ভব নয়···

সমর মিত্র বলিলেন,—কিন্তু পথ এদিকে ভালো দেখছি!

ধরণী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এদিককার পথ ভালো···

সমর মিত্র বলিলেন,—এ পথে আমরা গাড়ী করে ফিরতে পারবো না?

ধরণী বলিল,—কেন পারবেন না? কিন্তু গাড়ী কোথায় পাবেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—এই গাড়ীকে যদি না ছাড়ি? না হয় ছ'টাকা ভাড়া দেবো। কোথায় ওরা ছ' টাকা ভাড়া এখানে পাবে, বলো?

ধরণী বলিল—বরাতের জোরে গাড়ী পাওয়া গেছে···এ যদি রাজী হয়, তাহলে ভাবনা নেই! কিন্তু···

সমর মিত্র বলিলেন,—ছ' টাকা ভাড়া দিলে কেন ও থাকবে না, ধরণী? আমি বলে রাখছি, তুমি দেখে নিয়ো।···

গাড়ী চলিয়াছে···পিছনে ছ' খানা পাল্কী। পাল্কীওয়ালারা গাড়ীর সঙ্গে সমানে পাল্কী বহিয়া ছুটিয়াছে! গাড়ীর ঘোড়া ছুটির যা চেহারা···বিভাস বলিল—ঘোড়া দেখে মনে হয়, ওদের গাড়ীতে চড়িয়ে আমরা যদি গাড়ী টানি, তাহলে ঘোড়াছুটো আশীর্বাদ না করুক, গাড়ী এর চেয়ে আরো জোরে যাবে!

ধরণী বলিল—মাঠের ঘাস-পাতা খেয়ে ঘোড়ার জান্ থাকবে কেন বাবু? জন্মে এ-সব ঘোড়া কখনো দানা-ছোলার মুখ দেখেছে কি!

আরো খানিক অগ্রসর হইলে দূরে পাকা রাস্তা দেখা গেল—সামনে। এবং সে রাস্তার উপরে ছ'খানা রঙ-চটা মোটর-গাড়ী।

সমর মিত্র গাড়ী দেখিলেন, দেখিয়া সবিস্ময়ে ডাকিলেন,—ধরণী···

ধরণী বলিল—বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন,—পাকা রাস্তা দেখছি···রাস্তায় আবার ছখানা মোটর-গাড়ী!

ধরণী বলিল—এখানে তিনখানা গাড়ী মাঝে-মাঝে থাকে। ভাড়া যায়। এদিক দিয়ে বারাশত-বসিরহাট যাওয়া যায় কি না···

সমর মিত্র বলিলেন,—বটে···

তারপর তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন।

চিন্তামগ্ন হইলেও দু' চোখের দৃষ্টি ঐ পথের দিকে।

হঠাৎ দেখিলেন, তিনজন লোক ঝোপঝাপের আড়াল দিয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া দ্রুত-পায়ে সামনের ঐ পথের পানে চলিয়াছে! চলিতে চলিতে সতর্কভাবে এই গাড়ীর পানে চাহিয়া দেখিতেছে।

দ্বিধামাত্র না করিয়া সমর মিত্র গাড়োয়ানকে কহিলেন,—গাড়ী থামাও···

আদেশ শুনিয়া গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল।

গাড়ীর মধ্যে মনমোহন, বিভাস, ধরণী সকলে বিস্ময়ে অবাক!

সমর মিত্র টক্ করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, নামিয়া চলন্ত সেই তিনজন লোকের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—তিনজন লোক দেখছো? ঐ চলেছে! ···Very suspicious (দেখিয়া খুব সন্দেহ হইতেছে)!···আমি ওদের ধরতে চাই।

মনমোহন বলিল,—যা বলেছেন! এ জায়গায় অমন ভদ্রবেশী বাঙালীর আবির্ভাব ···সত্যি খুব suspicious (সন্দেহজনক)।

সমর মিত্র কহিলেন,—ওদের পেছু নিলে ওরা জানতে পারবে! আমাদের বেশ জোর-পায়ে যেতে হবে! দরকার হলে খানিকটা দৌড়ুতে হবে হয়তো···

মনমোহন বলিল—আমি রাজী···

বিভাস বলিল—আমিও···

সমর মিত্র একবার চাহিলেন ধরণীর পানে, বলিলেন,—তুমি বরং এই গাড়ীর কাছে থাকো! আর একজন চৌকিদার এখানে থাকুক···একজন চৌকিদার আসুক আমাদের সঙ্গে!

ইতিমধ্যে পাল্কী-বেহারারা পাল্কী নামাইয়াছিল এবং চৌকিদার দু'জন পাল্কি হইতে নামিয়াছিল···

মনমোহন, বিভাস ও একজন চৌকিদারকে লইয়া সমর মিত্র সেই তিনজন বাঙালী ভদ্রলোকের পাছু লইলেন···কাঁচা পথ ছাড়িয়া ক'জনে মাঠের মধ্যে নামিলেন।

লোক তিনজন তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া তারা গতির বেগ বাড়াইয়া দিল।

মনমোহন বলিল—দৌড়ুবো না কি?

সমর মিত্র বলিলেন,—না···ওরা কোথায় পালাবে?···

কিন্তু দৌড়িতে হইল! ওদিকে উহারা ছুটিতে সুরু করিয়াছে···সমর মিত্র কহিলেন, —দৌড় করালে দেখছি!

শীকার ও শীকারীর দৌড়! কথামালার গল্পে আছে, শশকের পিছনে এক শিকারী কুকুর একদিন ছুটিয়াছিল। শশককে কুকুর কিন্তু ধরিতে পারে নাই! কুকুরকে আর-কোন্ জানোয়ার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল,—একটা শশকের সঙ্গে ছুটিয়া তাকে

ধরিতে পারিলে না? তাহাতে কুকুর জবাব দিয়াছিল,—দু'জনের দৌড়ে তফাৎ আছে। একজন ছুটিয়াছে প্রাণের দায়ে, আর একজন ক্ষুধার দায়ে! অতএব···

এক্ষেত্রেও বুঝি তাই হয়! উহারা ছুটিয়াছে মুক্তির দায়ে! আর সমর মিত্র সদলে ছুটিয়াছেন আসামী-সন্দেহে উহাদের ধরিতে···

উহাদেরই জয় হইল! তিনজনে একটা মোটরে চড়িয়া বসিল। বসিবামাত্র ড্রাইভার দিল গাড়ীতে ষ্টার্ট। গাড়ী ছুটিল দক্ষিণ-দিকে···অর্থাৎ কলিকাতার অভিমুখে। সমর মিত্র সদলে আসিয়া দ্বিতীয় মোটর অধিকার করিলেন। ড্রাইভার নাই। খালি গাড়ী! সমর মিত্র ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করিলেন না—তখনি গাড়ী ষ্টার্ট করিয়া প্রথম-গাড়ীর পিছনে গাড়ী ছুটাইলেন। প্রথম গাড়ী রাশীকৃত ধূলা উড়াইয়া পিছনের লোকের চোখে সে-ধূলি ছিটাইয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে!

উদ্যোগ

নিষ্ফল অনুসরণ!

আগেকার গাড়ী পলকে দৃষ্টি-সীমা ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সমর মিত্র আসিলেন যশোর রোডে সেই সন্ধি-মুখে—যেখান হইতে একটা মাত্র পথ গিয়াছে সেই কুটীরের দিকে।

সমর মিত্র বলিলেন,—ওদের পিছনে ছুটে ফল নেই। তার চেয়ে গাড়ীটাকে সহায় করে' আমরা আমাদের আপন-জায়গায় যখন ফিরতে পেরেছি, তখন এ লাশের সন্ধান নিই. চলো! তারপর এ গাড়ী যখন আমাদের কাছে আছে, তখন ও-গাড়ীর সন্ধান মিলবেই। মিললে তিনজন লোকের খপর পাওয়া শক্ত হবে না!

কথাটা ঠিক! এবং এ-কথা মানিয়া সকলে আসিল পঙ্ক-কর্দ্দমে প্রোথিত লাশের তত্ত্ব লইতে!

সে-জলা পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। যে-ঘর হইতে লাশ অন্তর্হিত হইয়াছিল, সকলে আসিয়া দেখে, সে-ঘরের সামনে গ্রামের কজন লোক আসিয়া জমিয়াছে এবং পাশে চৌকিদার পীরু বসিয়া আছে।

পীরু বলিল—থানায় লাশ নিয়ে যাবার জন্য চারজন লোক আনতে পাঠিয়েছি বাবু! ···ভাবলুম, কোথাও গেলেও আপনারা কখন্ সেই অবেলায় ফিরবেন···এখানে বসে মিথ্যা লাশ চৌকি দেবো!

সমর মিত্র বলিলেন,—লোকটা কে, খপর পেলে?

পীরু বলিল—না বাবু, কোনো খপর মিললো না। এখানকার লোক নয়।

সমর মিত্র বলিলেন,—চেহারা দেখে, সাজপোষাক দেখে তাই মনে হয়।

মনমোহন বলিল—হয়তো ওদের দলের সঙ্গী। কোনো কারণে বনিবনা হয় নি, ঝগড়া হয়েছিল! তাই এখানে এমনিভাবে সাবাড় করে দেছে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—তা যেন হলো! কিন্তু ভাবছি, মনান্তর হলেও এখানে এনে সাবাড় করবার কি কারণ থাকবে? এখানে এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় যখের ধন পোঁতা নেই যে সে-ধন বখরা করতে ঝগড়া হয়েছে এবং সেই ঝগড়ার মূলে শত্রু-নিপাত করে গেছে!

বিভাস কহিল—আমরা আজ এ ঘরে এসেছি দেখে ঐ ঘরের মধ্যে খুন···এ'ও তো খুব mysterious (রহস্যজনক)···নয়?

সমর মিত্র বলিলেন,—নিশ্চয়···

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যাও পীরু, লাশ নিয়ে তুমি থানায় যাও। মনমোহন বাবু, আপনি এ-গাড়ী নিয়ে যান। গাড়ী চালাতে জানেন?

মনমোহন বলিল—না।

সমর মিত্র বলিলেন,—বিভাস আপনাকে আমার গাড়ীতে তুলে ড্রাইভ করে থানায় পৌছে দিক! আমি ওদের গাড়ী চালিয়ে ধরণীর কাছে যাই। সে-বেচারী না খেয়ে না দেয়ে আমাদের পাল্লায় পড়ে যে দুর্গ্রহ ভোগ করেছে, তাকে মুক্তি না দিলে অধর্ম্ম হবে! তাকে তুলে তার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আমি আপনার থানাতেই ফিরবো। বুঝলেন···এ প্ল্যান ভালো হবে না?

মনমোহন বলিলেন—খুব ভালো হবে!

ভিড়ের দিকে তাকাইয়া সকলের নাম-ধাম সমর মিত্র পকেট-বুকে নোট করিয়া লইলেন; তারপর ধরণীকে নামাইয়া দিয়া সমর মিত্র আসিলেন মনমোহনের থানায়।

মনমোহন বলিল—একটা নিবেদন আছে, স্যর।···একটু কিছু মুখে···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আপনি না বললেও আমি যেচে নিমন্ত্রণ নিতুম!··· লাশ এখানে না আসা পর্য্যন্ত এখান থেকে আমার নড়বার উপায় নেই! ওখানে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে লাশ নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না!···কিন্তু কোনো আয়োজন করবেন না।. মাছের ঝোল আর দুটি ভাত···সেই সঙ্গে কাগজী লেবু বা পাতি লেবু পেলে সে ভাত আর মাছের ঝোল হবে অমৃত-সমান!

মনমোহন বলিল,—তাই হবে স্যর। বেশী আয়োজনের অবসর নেই! খিদেয় পেটের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সুরু হয়েছে!

সমর মিত্র বলিলেন,—আর এক কথা! এই গাড়ীখানাকে আপনার থানায় রাখবার ব্যবস্থা করে দিন। যার গাড়ী, নিশ্চয় সে গাড়ীর খোঁজে আসবে। তাকে পেলে পালানো গাড়ীর সম্বন্ধে খপর পাওয়া অসম্ভব হবে না।···

মনমোহন বলিল,—তাহলে স্নানের ব্যবস্থা করতে বলি?

সমর মিত্র বলিলেন,—ব্যস্ত হবেন না। আপনাকেও তো কম ধকল্ সইতে হয় নি। আপনি হুকুম জারি করুন—করে একটু জিরুন্ দিকিনি!

একটা বেঞ্চে বসিয়া বিভাস আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা চিন্তা করিতেছিল।

সে বলিল,—ওরা নিশ্চয় কলকাতার দিকে গেছে···

সমর মিত্র বলিলেন,—মাথা যা হয়ে আছে···এখন আর ও-সব কথা নয়, বিভাস!··· এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম। যাকে বলে, দেহ এবং মনের বিশ্রাম!

মনমোহন স্নানের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দিল। সমর মিত্র জামা-জুতা খুলিয়া বসিলেন। বিভাস হতভম্বের মতো চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পনেরো মিনিট পরে তেল-গামছা তোয়ালে-সাবান আসিল।

মনমোহন বলিল,—উঠে পড়ুন স্যর। শান-বাঁধানো কূয়োতে চান্ করতে হবে।

সমর মিত্র বলিলেন,—আপনারা আগে নিন্,—আমি পরে অর্থাৎ আমি যাবো সকলের শেষে।

সকলের স্নানাহার শেষ করিতে আরো প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটিল। আহারাদির পর সকলে থানায় অফিস-ঘরে আসিয়াছেন, আসিয়া দেখেন, বাঁশে-বাঁধা বাদার লাশ লইয়া পীরু চৌকিদার আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

লাশ আসিয়াছে দেখিবামাত্র সমর মিত্র ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।

আসিয়া বলিলেন,—এই যে পীরু মিয়া এসে গেছ!···মনমোহন বাবু, আঙুলের ছাপ নেবার কালি আর ফর্ম্মের কাগজ বার করে আনুন মশায়!

মনমোহন দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—বুঝচেন না? ওদের দলে ছিল বলে' সন্দেহ হচ্ছে। সন্দেহটি নিঃসন্দেহ-সত্য হয় যদি এর আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখি, মহাপুরুষের ছাপ! সে ছাপ মিললে মহাপুরুষের কুলুজীর পরিচয় জানতে দেরী হবে না! কোন্ gang-এর লোক জানলে আমাদের পক্ষে তদন্তের ব্যাপার অনেকখানি হালকা হবে।

মনমোহন বলিল,—সাধে আপনি বড় হয়েছেন স্যর! এতখানি অভিনিবেশ!

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—The more experience you have occasions in handling crimes and criminals, more swiftly your mind would act (আসামী এবং তাদের কার্য্যাদির সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা লাভ হইবে, এ-সবের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে মন ঠিক সেই পরিমাণে সক্রিয় হইবে)।

মনমোহন বলিলেন,—শুধু অভিজ্ঞতায় মনের এ শক্তি হয় না···এ শক্তির জন্য মনের বিকাশ হওয়া চাই···অর্থাৎ ভাবতে পারা চাই···আর যাকে বলে, keen sense···

সমর মিত্র বলিলেন,—যদি তর্ক করি, তাহলে আমার প্রশ্ন উঠবে, sense কথাটার অর্থ কি, বলতে পারেন?

মনমোহন বলিল,—সহজ বুদ্ধি! অর্থাৎ কোনো লোক অজ্ঞান হয়েছে দেখে আমি যদি দুশ্চিন্তায় ছুটোছুটি করি, তা হলে সে-কাজে প্রমাণ হবে আমার বুদ্ধির অভাব। আর যদি দেখি কোথায় লাগলো এবং দু গ্লাশ জল দরকার···তাহলে সে কাজে আমার sense বা সহজ বুদ্ধির পরিচয় মিলবে।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—এত সহজ অর্থ নয় মনমোহনবাবু···কিন্তু এখন

অর্থ বোঝাবার সময় হবে না···পীরু মিয়া তার লগেজ নামিয়েছে! টিপ্ নেবার কালি-কাগজ আমার চাই। তারপর সে টিপ-সই নিয়ে আমি বিভাসকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়বো···

মনমোহন নিজের হাতে কালি-কাগজ আনিয়া দিল···সমর মিত্র নিজের হাতে ক'খানা কাগজে লাশের দু'হাতের দশ আঙুলের ছাপ লইলেন সুস্পষ্টভাবে। তারপর বলিলেন,—এবার লাশ রাখবার ব্যবস্থা আপনারা করুন। আজকের মত আমরা বিদায় নিচ্ছি···কাল আসবো। এ ব্যাপার খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে···এ তদারকীর ভার আমি যেচে নিজের হাতে নেবো।

এ কথা বলিয়া বিভাসকে সঙ্গে লইয়া সমর মিত্র গাড়ীর সামনে আসিলেন, পথে টু-শীটার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

মনমোহন বলিল—আপনার নাম শুনে আসছি চিরদিন। আপনার দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা···তার উপর আপনার সঙ্গে কাজ করতে পাওয়া···আজকের এত কষ্টকে কষ্ট বলে' মনে হচ্ছে না!···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আমাকে জানতেন না কখনো, তাই আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা! কিন্তু বেশী মেলামেশার ফলে আমার মধ্যে কেবল খ্যাড় দেখবেন হয়তো Familiarity breeds contempt···বেশী জানাশোনায় শ্রদ্ধা চলে যায়···মানুষের ভিতরটা তখন দেখা যায়, how poor!

মনমোহন কহিল—কি যে বলেন স্যর! আপনাকে তেমন দেখবে, আমরা! আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করি—কিন্তু চলতে গিয়ে পদে-পদে নিজেদের অক্ষমতায় দিশাহারা হই!···

সমর মিত্র বলিলেন,—যাক, এখন মিউচুয়াল এ্যাড্‌মিরেশন্ সভা করে লাভ নেই! ভালো কথা, আমাদের আগে যে মোটর-গাড়ী চম্পট দিলে, তার নম্বর কেউ বলতে পারেন?

মনমোহন, বিভাস—দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—পারলেন না বলতে!

মনমোহন বলিল,—তখন কি হচ্ছে, কি হবে—আপনার কি বা অভিপ্রায়, তা বোঝবার জন্য সব আকুল···গাড়ী বা গাড়ীর নম্বরের কথা মনে ছিল না স্যর!

বিভাস বলিল,—তারা এমন বোঁ করে ষ্টার্ট দিয়ে চকিতে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।···

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি দেখেছি নম্বর। নম্বর দেখা কিছু নয়। বাজে নম্বর ছিল গাড়ীতে অর্থাৎ ওটা রেজিষ্টার্ড নম্বর নয়। অন্য গাড়ীর নম্বর বসিয়েছে!

মনমোহন বলিল,—কি করে জানলেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—তাই। ওতে ছিল ৪১৩১ নম্বর। কিন্তু আসল ৪১৩১ নম্বরের গাড়ী আমি চিনি! সে নম্বরের গাড়ীখানা কোল্। এ গাড়ীখানা ছিল হুইপেট।

বিভাস বলিল—সে নম্বর জানেন আপনি? কি wonderful memory আপনার! আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি! বাজে ৪১৭১ নম্বর···তাহলে ও গাড়ী ধরা শক্ত হবে তো।

সমর মিত্র বলিলেন,—ও নম্বর কি আর দেখতে পাবে? পথেই কোনো নিরাপদ জায়গায় ও-গাড়ীর নম্বর বদল হয়ে গেছে। যাক, আমার কিন্তু ভালো লাগছে। মামলা যত জটিল হয়, আমার তত ঝোঁক চাপে সে মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। কিন্তু আর নয়···এবার আসি মনমোহনবাবু···

বিভাসকে লইয়া সমর মিত্র গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

মনমোহন বলিল—নমস্কার···হ্যাঁ, কাল কখন আসবেন স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন,—কাল সকালে টেলিফোন্ করে বলবো। এখন ঠিক বলতে পারছি না···

হাসিয়া বিভাস কহিল—রাত্রে বাড়ীতে ধ্যানে বসবেন!

সমর মিত্র বলিলেন,—সত্যি বিভাস। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—সব কাজেই সাফল্য পেতে হলে তপস্যা চাই। আমাদেরো তেমনি এ ধ্যান, তপস্যা! কথাটা তুমি মিথ্যা বলোনি!

কান্তির চিঠি

বিভাসকে তার বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সমর মিত্র গৃহে ফিরিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া লাশের আঙুলের ছাপ-মার্কা কাগজগুলা বাহির করিয়া লেন্সের কাঁচ দিয়া ভালো করিয়া পরখ করিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফিঙ্গার-ইন্‌প্রেশন-বুরোর সুদক্ষ অফিসার সুরেশ মুখার্জীকে ফোন করিলেন। সুরেশবাবু গৃহে ছিলেন। রিসিভার ধরিয়া তিনি বলিলেন,—কে?

—আমি সমর মিত্তির।

—ও···কি খপর?

—কতক্ষণ তুমি বাড়ী আছো? তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

সুরেশ মুখার্জী বলিলেন—আপনি আসবেন আমার এখানে! তার চেয়ে আমি যদি যাই?

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি যেতে চাই। তোমার ওখানে ফিঙ্গার-ইমপ্রেশনের দু চারখানা বই পাবো?

সুরেশ মুখার্জী বলিলেন,—পাবেন। কি বই চান, বলুন···আমি নিয়ে যেতে পারি।

সমর মিত্র বলিলেন,—না সুরেশ, তোমাকে আসতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। খুব জরুরী কাজ আছে। আমার নিজের মনে কতকগুলো ধারণা হয়েছে···সেগুলো কতটা সত্য, তোমার ওখানে দু-একখানা বই দেখে একবার বুঝতে চাই! It is rather interesting study (অনুশীলনের জন্য আমি বইগুলো দেখতে চাই)।

সুরেশ মুখার্জী বলিলেন—তাহলে আসুন···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমাদের সঙ্গে এই ছাপ নিয়ে মাঝে মাঝে যেটুকু আলোচনা করেছি, তাতে দেখছি ক্রিমিনালের আঙুলের ছাপে একটু বিশেষত্ব আছে। সম্প্রতি একজনের আঙুলের ছাপ পেয়েছি···নিজে খেটে সে-ছাপ ষ্টাডি করে দেখছি, তার আঁকড়ি-মাকড়িগুলোয় মহাপুরুষত্বের লক্ষণ আছে, মনে হচ্ছে!

হাসিয়া সুরেশ মুখার্জী বলিলেন—বেশ, আসুন। আমি বাড়ীতেই আছি···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ক্ষতি করে আটকে রাখবো না তো?

সুরেশ মুখার্জী বলিলেন,—না। আমার এখন কোনো কাজ নেই। কাল সেশন্সে আমার সেই বীড্-গ্যাম্‌ব্লিং-কেশের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে···এতদিনের পর একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় পেয়েছি।

সমর মিত্র বলিলেন,—বেশ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি তোমার ওখানে পৌছুচ্ছি।

কথার পর বেশ পরিবর্তন করিয়া সমর মিত্র টু-শীটারে চড়িয়া ভবানীপুরে সুরেশ মুখার্জীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফিরিলেন রাত তখন দশটা বাজিয়াছে।

ফিরিয়া দেখেন, বাহিরের ঘরে বিভাস বসিয়া আছে। তার মুখে-চোখে উদ্বেগের ভাব পরিস্ফুট।

সমর মিত্র বলিলেন,···ব্যাপার কি বিভাস? এখানে হঠাৎ এমন সময়?

বিভাস বলিল—এসেছি নটার সময়।

—কারণ?

পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া বিভাস কহিল—এটা পড়ুন স্যর।

খামে চিঠি। খামখানা দেখিয়া সমর মিত্র কহিলেন,—ডাকে এ চিঠি এসেছে!

বিভাস বলিল,—হ্যাঁ। বাড়ী এসে মুখ-হাত ধুয়ে একটু বসেছি, জগা এই চিঠি দিয়ে বললে, ডাকে এসেছে।

কোনো জবাব না দিয়া সমর মিত্র খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন। বাঙলা অক্ষরে লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে—

ভাই বিভাস

তোমরা বোধ হয় আমার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ভাবিয়াছ, আমি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছি। কিন্তু আমি মরি নাই! কোনোমতে প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়াছি।

আমি এখন অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমি আছি ডায়ামণ্ড হার্বারে। মহেশ্বরবাবুর বাড়ীতে। যাঁদের কৃপায় প্রাণ পাইয়াছি, তাঁদের কাছে কলিকাতার ঠিকানা বলিয়াছিলাম। তাঁরা আমাকে অতদূরে লইয়া যাইতে পারিবেন না বলায় আমি ডায়ামণ্ড হার্বারে মহেশ্বরবাবুর বাড়ীর কথা বলি। নৌকায় তুলিয়া তাঁরা আমাকে সেখানে রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখনো আমি খুব দুর্ব্বল। তবে

কোনমতে পত্র লিখিবার সামর্থ্য হইয়াছে। বাবাকে বলিয়ো, সারিয়া উঠিতে এখনো বোধ হয় এক-মাস সময় লাগিবে। তাঁকে লইয়া তুমি এখানে আসিবে। তোমাদের দেখিবার জন্য মন আকুল হইয়া আছে।

প্রতিমা বলিতেছে, তুমি আসিলে ভালো হয়। বাবা যদি না আসিতে পারেন, তুমি নিশ্চয় আসিয়ো।

আশা করি তোমাদের খপর ভালো। বাবা বোধ হয় আমার শোকে পাগল হইয়া গেছেন! তাঁকে এ চিঠি দেখাইয়ো এবং আমার প্রণাম জানাইয়ো। তুমি আমার ভালোবাসা লইয়ো। ইতি— তোমাদের

কান্তি

চিঠি পড়িয়া সমর মিত্র বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল বিভাসের পানে···বিভাসের দু' চোখের দৃষ্টি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন!

সমর মিত্র বলিলেন,—হাতের লেখা চিনতে পারছো?

বিভাস কহিল—প্রত্যেকটি অক্ষর কান্তির হাতের অক্ষর!

—কান্তি তাহলে বেঁচে আছে?

বিভাস বলিল—সন্দেহ হয়!

সমর মিত্র বলিলেন,—তাহলে তুমি এমন চিন্তাকুল কেন?

বিভাস কহিল—আমি ভাবছি, তার এই শরীর—কোন্ মুখে মামাবাবুর খপর নিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো!

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—তাঁর খপর কান্তিকে দিয়ো না! বলো, শরীর খুব খারাপ···তাই তিনি আসতে পারলেন না!

বিভাস কহিল,—তারপর?

সমর মিত্র বলিলেন,—তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!···তুমি ভাবছো কান্তির অশৌচ—তোমার মামাবাবুর শ্রাদ্ধ-শান্তি?···আতুরে নিয়মো নাস্তি, বিভাস। কান্তি এখন এ-সব যদি না মানে, তাতে তার কোনো অনর্থ ঘটবে না।···যা হয়ে গেছে, তার চারা নেই। কিন্তু ফণীবাবু খুন হয়েছেন, এ কথা যদি কান্তি এখন শোনে, তাহলে কে জানে, সে shock কান্তি কি করে' সহ্য করবে!

নিরুত্তরে বিভাস সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বলি, কাল সকালের ট্রেণে তুমি ডায়মণ্ড হার্বার চলে যাও!···আমাকে যেতে হবে কেষ্টপুর—তাছাড়া আরো নানা কাজ আছে, নাহলে আমি তোমার সঙ্গে যেতুম···

বিভাস এ-কথারও কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন,—ভালো কথা, এই মহেশ্বর বাবুটি কে এবং প্রতিমাই বা কে, সংক্ষেপে আমাকে বুঝিয়ে দাও দিকিনি···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিভাস বলিল,—মহেশ্বরবাবু মারা গেছেন। তিনি ছিলেন মামাবাবুর বন্ধু। জমিদার। দক্ষিণে তাঁর বহু জমি-জমা আছে, সুন্দরবনে বহু আবাদ

আছে। তা থেকে আয় হয় বেশ মোটা-রকম। প্রতিমা এই মহেশ্বরবাবুর মেয়ে। প্রতিমার সঙ্গে কান্তির বিয়ের কথা হচ্ছিল। দুজনে ছেলেবেলা থেকেই বেশ ভাব। অবশ্য এ ভাব···যাকে নভেলে love বলে, তা নয়। মানে, ভাই-বোনে যেমন ভালোবাসা হয়, তেমনি ভালোবাসা। বিয়ের কথা যা হয়েছে, তাও এই সম্প্রতি। তিন-চার মাস আগে কান্তির বিয়ের জন্য নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসে। মামাবাবু তখন বলেছিলেন, কান্তির বিয়ের সব ঠিক করে রেখেছি···জানা মেয়ে প্রতিমা ; মেয়ের বাপ মারা গেছে সাত-আট মাস ; কালাশৌচ এক বছর—সে কালাশৌচ কাটলে বিয়ে দেবো।

সমর মিত্র বলিলেন,—মহেশ্বরবাবুর ক'টি ছেলেমেয়ে ?

বিভাস বলিল—প্রতিমাই তাঁর একটি মাত্র সন্তান···মহেশ্বরবাবুর আর ছেলেমেয়ে নেই।

সমর মিত্র বলিলেন,—মেয়ের বয়স কত ?

বিভাস বলিল—পনেরো-ষোল বছর।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

তারপর নিঃশব্দে চিন্তামগ্ন হইলেন।

বহুক্ষণ তাঁর মুখে কথা নাই !

বিভাস কহিল—কাল তাহলে আমি যাবো। কান্তি বেঁচে আছে জেনে আহ্লাদ যেমন হচ্ছে, দুঃখও তেমনি ! মামাবাবু থাকলে আজ কি আনন্দই হতো !

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—হাতের লেখা তুমি বলছো, কান্তির ?

—নিশ্চয়।

—কোনো সন্দেহ হচ্ছে না তোমার, এ লেখা অপরের বলে ?

বিভাস বলিল,—দুজনে একসঙ্গে এতকাল বাস করছি। লেখা-পড়ায় খেলাধুলায় চিরদিন আমরা সাথের সাথী—আর আমি ভুল করবো ? তার লেখা চিনতে পারবো না ? এ লেখা কান্তির···তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই ! টান্-টোনে কোনো তফাৎ নেই !

সমর মিত্র কোনো জবাব দিলেন না। নিরুত্তরে চাহিয়া রহিলেন খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া বাহিরের পানে···

বিভাস কহিল—আপনি কি এত ভাবছেন সমরবাবু ?

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য্য বোধ করছো না ? ফণীবাবু খুন হয়েছেন, সে খুনের পর মামলা-মকর্দ্দমায় এতকাল কাটলো···কাগজে-কাগজে এ খুনের কথা রাষ্ট্র হতে বাকী নেই···অথচ কান্তি না জানুক, মহেশ্বরবাবুর বাড়ীর লোকও ফণীবাবুর কোনো খপর এতকাল জানলেন না··· এ কখনো সম্ভব, ভাবো ?

বিভাস বলিল—মহেশ্বরবাবুর বিধবা স্ত্রী আর মেয়ে প্রতিমা···এঁরা বোধ হয়

জানেন। হয়তো কান্তির অসুস্থ শরীর···সেজন্য তাকে এখন এ-কথার বিন্দুবাষ্প তাঁরা জানতে দেন নি···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার তাই মনে হচ্ছে ?

বিভাস বলিল—মনে হলে আপনি তাতে আশ্চর্য বোধ করবেন ?

সমর মিত্র বলিলেন,—It is mysterious (আগাগোড়া রহস্যজনক) !···কিসে আশ্চর্য বোধ করবো, আর-কিসে করবো না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিভাস।···যাক্, কাল তুমি বেরিয়ে পড়ো···সেখানে গিয়ে যা দেখবে, আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ো বরং। আমি এখানে খুব anxiously (চিন্তাকুলভাবে) তোমার খপরের জন্য wait (প্রতীক্ষা) করবো, জেনো।

বিভাস বলিল—বেশ, টেলিগ্রামই করবো আপনাকে।

—করো।

শ্যামাসুন্দরী

ডায়ামণ্ডহারবারে মহেশ্বরবাবুর গৃহে আসিয়া বিভাস দেখে, সেখানে বিপর্য্যয় ব্যাপার !

মহেশ্বরবাবুর বিধবা স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী কাঁদিয়া আকুল। বিভাসকে তিনি বলিলেন —সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা ! চারদিন আগে সন্ধ্যার সময় আমি তখন ঠাকুর-ঘরে আহ্নিক করছি, একজন লোক এসে খপর দিলে, কান্তিবাবু জলে ডুবে গেছলেন বলে' যে-কথা রটেছিল, সে কথা সত্য নয় ; তিনি রক্ষা পেয়েছেন। একেবারে মরণাপন্ন হয়ে এতকাল হাসপাতালে ছিলেন। আজ থেকে সুস্থ হয়েছেন। ডাক্তার বলেছে, আপনার লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তাই তিনি আমার কাছে বললেন, হাসপাতালে গিয়ে আপনারা যদি হাসপাতাল থেকে তাঁকে এখানে আনেন, তাহলে ভালো হয়।···

কথার শেষে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

বিভাসের সর্ব দেহে রোমাঞ্চ-রেখা ! বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিতপ্রায় কণ্ঠে কোনমতে বিভাস প্রশ্ন করিল—তার পর ?

কাশিয়া কণ্ঠ সাফ করিয়া শ্যামাসুন্দরী দেবী বলিলেন,—সে বললে, আর আধ ঘণ্টা সময় আছে। তারপর গেলে হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। আপনারা এখনি আসুন !···আমি তখন আহ্নিক করছি, আমার দেরী হবে, তাই প্রতিমা আমায় বললে, আমি এখনি যাই মা···আহ্নিক সারা হলে তুমি হাসপাতালে এসো···দাশুকে সঙ্গে নিয়ে।

দাশু পুরাতন ভৃত্য।

বিভাস নিরুত্তরে শ্যামাসুন্দরীর পানে চাহিয়া রহিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সেই লোকের সঙ্গে প্রতিমা তখনি ছুটে হাসপাতালে চলে গেল। তারপর আমার আহ্নিক সারা হলে দাশুকে নিয়ে আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি, কোথায় কে! কান্তি নেই, কোনোদিন হাসপাতালে সে ছিল না! প্রতিমাও নেই! সকলে বললে, কোনো কান্তির জন্য কোনো লোককে হাসপাতাল থেকে কোথাও কাকেও ডাকতে পাঠানো হয়নি। মানে, কান্তি বলে' হাসপাতালে এক-বছরের মধ্যে কোনো রোগী আসেনি।

বিভাসের পায়ের তলায় মাটী যেন দুলিতে লাগিল—বুকের মধ্যে হাজার-হাজার কামান দাগিতে লাগিল! সে কামান-দাগার তিলেক বিরাম নাই!

শ্যামাসুন্দরীর বুকের গহন-তল হইতে অশ্রু-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত-উৎসারিত হইয়া তাঁর কপোল বহিয়া যেন ঝর্ণা-ধারা ঝরিতে লাগিল! ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত স্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—হাসপাতালে এ-কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! আমার আর চেতনা রইলো না, বাবা! তারপর সব কথা শুনে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু পুলিশে খপর দিলেন। পুলিশ সেদিন থেকে একেবারে মাঠ-বাট চষে ফেলছে··· প্রতিমার কোনো খপর মেলেনি আজ পর্য্যন্ত!

কথা শুনিয়া বিভাস যেন কাঠ!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—কারো সঙ্গে শত্রুতা করিনি···কারো মন্দ করিনি কখনো বাবা···জ্ঞানে-অজ্ঞানে লোকের ভালো ছাড়া মন্দ করিনি! আমার উপর এ নিগ্রহ কে যে করলে, তাই ভাবি!

ক্রন্দনের বিরাম নাই! অসহায় বিধবা কদিন কাঁদিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মিনতি ঢালিয়া দিতেছেন···আশে-পাশে যে-লোককে দেখিতেছেন, তার দুহাত ধরিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন, তোমরা আমার মেয়েকে আনিয়া দাও গো—আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়া তোমাদের পায়ে চিরদিন বাঁদী হইয়া থাকিব!

কিন্তু তাঁর সব ক্রন্দন, সব মিনতি, সব প্রার্থনা ব্যর্থ নিষ্ফল!

বিভাস চুপ করিয়া সব কথা শুনিল···

তারপর সে বলিল তার কাহিনী···ফণীবাবুর শোচনীয় মৃত্যু এবং তাহা লইয়া তাকে সে কি লাঞ্ছনা, নিগ্রহ সহিতে হইয়াছে! তারপর ডিটেকটিভ সমর মিত্রের সঙ্গে···

সব-শেষে বলিল সে চিঠির কথা! এ চিঠির অক্ষর হুবহু কান্তির হাতের অক্ষরের মতো। তেমনি টান্, ছাঁদ,—লেখার তেমনি ভঙ্গী! এবং সেই চিঠি দেখাইয়া শ্যামাসুন্দরীকে বিভাস বলিল,—আমি এই চিঠি পেয়ে মস্ত আশা নিয়ে আজ এখানে এসেছি মাসিমা!

চিঠি দেখিয়া শ্যামাসুন্দরীর চোখের জল শুকাইয়া গেল···দারুণ বিভীষিকায় বুকের অশ্রুর উৎস যেন স্তম্ভিত, রুদ্ধ হইয়া গেল! তাঁর দু'চোখের সামনে শুধু রাশি-রাশি অন্ধকার!

বিভাস বলিল,—এখানকার পুলিশ কিছু করতে পারলে না?

সনিশ্বাসে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—না···

বিভাস বলিল—পাড়ার লোক কেউ প্রতিমাকে ছাখে নি? যে লোকের সঙ্গে গেছে, সে-লোক কে···

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—না বাবা···কেউ ছাখেনি···মেয়ে যেন উবে গেল!

বিভাস কহিল—হুঁ···

চিন্তার অকূল পাথার! এ পাথারের কোথাও এতটুকু তীরের চিহ্ন নাই···

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—পুলিনবাবু···এখানকার ডেপুটি···তিনি এসে মেয়ের ফটোগ্রাফ নিয়ে সে-ছবি কাগজে-কাগজে ছাপিয়ে দেছেন,—তাতে লিখে দেছেন, মেয়েকে যে এনে দেবে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।···আজকের কাগজে সে ছবি বেরিয়েছে, বললেন। কিন্তু···

বিভাস চাহিল শ্যামাসুন্দরীর পানে···

মস্ত নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—আমার যা বরাত··· আমি জানি, মেয়েকে আমি জন্মের মতো হারিয়েছি! আমার প্রাণটা যে কি করছে, বুঝতে পারবে না···পাথর দিয়ে ভগবান আমার এ প্রাণ বাঁধিয়ে দেছেন! আর কার জন্য বেঁচে থাকা? কিসের আশায়? কার আশায়? কে আমার আছে?

শ্যামাসুন্দরীর হতাশ নেত্রে বিগলিত ধারে অশ্রু বহিল···

বিভাস নীরব নিরুত্তর···

বাহিরে জীবনের কলকোলাহল। বাড়ীর বাহিরে বাগান। বাগানে গাছ-পালার সবুজ শ্যামল-শ্রী! পাখীর কল-ঝঙ্কারে আকাশ ভরিয়া আছে···দূরে কার বাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্রে গান হইতেছে···

যে চায়, চলে যায়—
যারা থাকে, তাদের মতো
সে কি ব্যথা পায়!···

বিভাসের মনে এ-গানের প্রত্যেকটি কথা যেন ভারী মুগুরের আঘাতের মতো বাজিতেছিল! মনে হইতেছিল এ কথা কি সত্য? প্রতিমা গিয়াছে···আমরা এখানে তার জন্য চিন্তায় আকুল···আমাদের ব্যথা কি প্রতিমার ব্যথার চেয়ে বেশী?···

কোথায় প্রতিমা?···কোথায়? এই আকাশের নীচে এখনো আছে তো?

কে তাকে লইয়া গেল? প্রতিমাকে লইয়া গিয়া···?

কান্তির সঙ্গে এই লোকটার কোনো সম্পর্ক আছে? ফণীবাবুর হত্যা···বাদার ধারে কাল যাহা ঘটিয়া গিয়াছে···সেই লাশ···মোটরে চড়িয়া তিন অজানা লোকের ছুটিয়া নিরুদ্দেশ হওয়া···

এ সবগুলা কি একই দীর্ঘ শৃঙ্খলের টুকরা-টুকরা অংশ? পরস্পরে লিঙ্ক গাঁথা আছে? না···

সমর মিত্রের কথা মনে পড়িল। সমর মিত্রকে যদি এখানে এখন পাওয়া যাইত!

পাইয়া কি হইত? সমর মিত্র মানুষ! ঘটনা লইয়া তিনি কারবার করেন। এমন অসম্ভব ব্যাপার লইয়া তিনি কি সন্ধান করিবেন? তিনি মায়া-বিদ্যা জানেন না···যে বিদ্যার বলে অন্তরীক্ষে অন্তর্দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবেন!

উপায় নাই···উপায় নাই! চারিদিকে নিরুপায়তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর!

মনে হইল, একবার আকাশ-ফাটা চীৎকার তুলিয়া ডাকে, প্রতিমা···প্রতিমা! সে চীৎকারে আকাশ চিরিয়া যাইবে! বাতাস ফাঁশিয়া চূর্ণ হইবে! এবং তার সে-ডাকে আকাশ-পাতাল ফুঁড়িয়া, মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া প্রতিমা যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া এ-ডাক প্রতিমার প্রাণে বাজিবে! সে-ডাকে প্রতিমা দুনিয়ার প্রান্তসীমা হইতে সাড়া দিবে···বলিবে,···এই যে আমি এখানে!

তা হয় না? কেন তা হইবে না, ভগবান? মানুষের মনের এ-আকুলতা···তার কোনো শক্তি নাই?

হায় রে, মানুষের কল্পনাকে লোকে বলে ত্রিভুবনচারী! কিন্তু এ-কল্পনা তারি মতো অতি-ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে! ত্রিভুবনচারী কি, চোখের দৃষ্টি যেটুকু যায়, ততটুকু মাত্র এ কল্পনার গতি! তার বাহিরে কল্পনার গতি-শক্তি স্তম্ভিত রুদ্ধ!

বিভাস অনেক ভাবিল, ভাবিয়া স্থির করিল—টেলিগ্রাম নয়···এখনি তার কলিকাতায় যাওয়া কর্তব্য। গিয়া সমর মিত্রকে সব কথা বলিয়া তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করিবে। তিনি কি বলেন···

সমর মিত্রের কৃতিত্বের অনেক কথা সে শুনিয়াছে! এ-দায়ে তিনি যদি কিছু করিতে পারেন, তবেই আশা আছে! নচেৎ···

বিভাস ডাকিল—মাসিমা···

চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া শ্যামাসুন্দরী কোথায় চলিয়া ছিলেন···এ আহ্বানে বিভাসের পানে ফিরিয়া চাহিলেন।

বিভাস কহিল—আমি ভাবছি, এখনি কলকাতায় যাই···সেখানে আছেন সমর বাবু···পুলিস অফিসার। মামাবাবুর খুনের তিনি ফিরে-ফির্‌তি তদারক করছেন। তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। আমি গিয়ে তাঁকে সব কথা বলি। যদি সম্ভব হয়, তাঁকে নিয়ে এসে প্রতিমার সন্ধান করি! তিনি প্রতিমাকে এনে দেবেন নিশ্চয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—বলচো, তাই করো। আমার মনে এতটুকু আশা নেই, বাবা। আমি প্রতিমার জন্য ভাবছি না আর···বুকে চেপে রেখেই তাকে হারিয়েছি।···আমি এখন শুধু যমকে ডাকছি যে আমায় নাও ঠাকুর—শুধু এইটুকু দয়া করো!

এ-কথার উপর সান্ত্বনা বা আশার কথা বলিয়া বিভাস দুঃখভার আর বাড়াইতে চাহিল না···সে শুধু বলিল,—আমি তাহলে আর দেরী করবো না···

বলিয়া সে হাতের কবজী-ঘড়ির পানে চাহিল, চাহিয়া বলিল,—পনেরো মিনিট পরে ট্রেণ ছাড়বে···দৌড়ে গেলে এ-ট্রেণটা পাবো মাসিমা! আমি চেষ্টা করবো, সমর বাবুকে সঙ্গে করে এখানে আসবোই।···

এ কথা বলিয়া বিভাস তখনি ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

ওদিকে সমর মিত্র তখন আঙুলের ছাপা মিলাইয়া খুশী-মনে কৃষ্ণপুরে চলিয়াছেন। ···বেলা তখন একটা।

কৃষ্ণপুর থানায় আসিয়া শুনিলেন, হীরু নামে এক ব্যক্তি গ্রেফ্‌তার হইয়াছে।

মনমোহন বলিল, বেলা দশটায় হীরু আসিয়াছিল মোটরের সন্ধানে। যে মোটর থানায় আছে, হীরু সেই মোটরের মালিক। হীরুকে প্রশ্ন করিয়া এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে, আগের মোটর তার গাঁয়ের গাড়ী নয়, বাহিরের গাড়ী। সে গাড়ী ওখানে আসিয়াছিল ভোরে। ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করিয়া হীরু শুধু জানিয়াছিল, তার নাম দেবু। দেবু বলিয়াছিল, তার বাবুরা আসিয়াছে বাদা দেখিতে। বাদার ভেড়ি জমা লইবে, কথা চলিতেছে—তাহারি জন্য পরিদর্শন। এটুকু ছাড়া হীরু সে-মোটর সম্বন্ধে আর কোনো কথা জানে না!

সমর মিত্র বলিল,—সে কোথায় ছিল, আমরা যখন গাড়ী নিয়ে আসি, সে-সম্বন্ধে কিছু বলেছে?

মনমোহন বলিল,—সে বলে, তার একটি ছেলের খুব অসুখ। ওখানে গাড়ী রেখে সে তার বাড়ীতে গিয়েছিল—ছেলেকে দেখতে। বিকেলে ফিরে এসে দেখে, গাড়ী নেই। কিন্তু তখন ছেলের ব্যামোর জন্য সে খুব চিন্তিত, তাই গাড়ীর জন্য কিছু করেনি। আজ সকাল থেকে ছেলে ভালো আছে···তাই সে···

সমর মিত্র বলিলেন,—তার বাড়ীতে অসুখ, সত্যি?

মনমোহন বলিলেন—ভুলু চৌকিদারকে পাঠিয়েছিলুম খপর নিতে। সে এসে বলছে, ছেলের অসুখ সত্যি।

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···

মনমোহন বলিল,—আপনি কোনো খপর পেলেন?

—পেয়েছি মনমোহন বাবু···

—কি খপর, স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন,—লাশের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা গেছে দাগী জালিয়াৎ। ওর নাম হরকুমার। ওরফে আবদুল, ওরফে ভোঁদা, সতীশ, ওরফে দিগম্বর, ওরফে গফুর।···

মনমোহনের দুই চোখ উল্লাসে প্রদীপ্ত হইল।

সমর মিত্র বলিলেন,—এ জালিয়াতির সঙ্গে ভাবছি বিভাস আজ যে-চিঠি দেখালো তার কোনো যোগ আছে কি না! সে এক বিচিত্র চিঠি···ভাবছি, আমাদের সহস্র-নামা হরকুমার সে-চিঠির লেখক কি না! যদি তাই হয়, তাহলে এরা ডায়মণ্ড-

হার্বারে আর একখানি রহস্যময় মহা-নাটকের অভিনয়-আয়োজন পাকা করে তুলছে বলে' বুঝছি···

এ কথার অর্থ না বুঝিয়া মনমোহন বিস্মিত নেত্রে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

ডায়মহারবার

বিভাসের মুখে সংবাদ শুনিয়া সমর মিত্র তাঁর টু-শীটারে বিভাসকে তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—এক-মিনিট বিলম্ব করিলেন না।

গাড়ীতে বসিয়া তিনি ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির সংবাদ গ্রহণ করিলেন··· এতদিন সে সংবাদ লইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই!

সংবাদ লইয়া তিনি বলিলেন—একটা বড় gang এ-চক্রান্ত করেছে। এ-সব তাদের কীর্তি!

বিভাস কহিল—কিন্তু হঠাৎ এতকাল পরে gang আমাদের উপর চার-দিক দিয়ে এভাবে ফন্দী-ফাঁদ কেন পাতবে, বুঝতে পারছি না!

সমর মিত্র বলিলেন,—বুঝছো না? ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছেলে কান্তি। আবার এদিকে মহেশ্বর বাবুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক তাঁর ঐ একমাত্র মেয়ে প্রতিমা। জলে জল বাঁধবার ব্যবস্থা হচ্ছে! ফণীবাবুর ছেলের সঙ্গে মহেশ্বর বাবুর মেয়ের বিয়ে! অর্থাৎ দুটো বড় সম্পত্তি মিলে-মিশে আরো বড় হচ্ছিল এবং এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হচ্ছিল কান্তি এবং প্রতিমা!···এ পর্য্যন্ত বুঝলে তো?

বিভাস কহিল—বুঝলুম।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ!···বহু দুরদর্শী লোক বহুদিন থেকে এ-ব্যাপারে হাত দেছে। তারা আগে হতে ব্যবস্থা করে কান্তিকে ইহ-জগৎ থেকে সরিয়ে দেছে!

বাধা দিয়া বিভাস বলিল—কিন্তু কান্তির ঐ চিঠি?

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ও চিঠি সম্পূর্ণ জাল। তোমাকেও একটু সতর্ক-বাণী দেছে। সেই সঙ্গে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ—এটুকু তুমি এখনো বোঝোনি, বিভাস?

বিমূঢ়ের মতো বিভাস চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে; কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—এ চিঠিতে তোমাকে ঠাট্টা করে ইঙ্গিত দেছে, পুলিশ নিয়ে তদারক সুরু করেছো,—ভেবেছো, ফণীবাবু এবং তাঁর ছেলে কান্তিবাবুর অবর্তমানে তুমি ফণীবাবুর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হবে···সেটি হচ্ছে না! ওদিকে জাল-কান্তি নেপথ্যে প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!

বিভাস বলিল—কিন্তু সম্পত্তির উপর আমার কোন কালে যে লোভ নেই, এ-কথা কান্তি জানে···মহেশ্বর বাবুরাও জানেন। মামাবাবু আমার জন্য ত্রিশ হাজার টাকার

গবর্ণমেণ্ট-পেপার এবং কলকাতা-ভবানীপুরে একখানি বাড়ী দানপত্র করে দেছেন··· তাতে আমার মতো লোকের জীবন রাজার হালে কেটে যাবে! তাছাড়া আমার বরাবর ইচ্ছা, দেশে-দেশে ঘুরে জীবন কাটিয়ে দেবো···বিয়ে করে সংসার পাতবার কল্পনা আমার নেই···

সমর মিত্র বলিলেন—ফণীবাবুদের বিষয়-সম্পত্তিতে তোমার লোভ না থাকলেও অন্য লোকের লোভ জেগেছে এবং তার জন্যই এ নাটকের অভিনয় সুরু হয়েছে, বিভাস! আমি অবশ্য অকাট্য প্রমাণ এখনো পাইনি। তবে কাল রাত্রে আগাগোড়া ব্যাপারটি বিশেষ করে ভেবে দেখেছি। তোমার হাতে ঐ ডাকে-আসা চিঠি, সেই সঙ্গে প্রতিমা মেয়েটির আশ্চর্য-রকম নিরুদ্দেশ হবার কথা শুনে আমার মনে এ-সন্দেহ খুব প্রবলভাবে জেগে উঠেছে!···যাই হোক্, তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে···তোমায় যদি এবার ওরা চুরি করে নিয়ে যায়···মানে, if you are kidnapped, তাহলে তাতে আমি মোটে আশ্চর্য্য হবো না।

এ কথা শুনিরা বিভাসের গায়ে কাঁটা দিল! আর কেহ এ কথা বলিলে সে ভ্রূক্ষেপ করিত না···কিন্তু সমর মিত্রের মতো বহুদর্শী অভিজ্ঞ ডিটেক্‌টিভ অফিসার··· তিনি বাজে কথা বলিবার লোক নন্! তাছাড়া তাঁর চিন্তা-ধারা কোনোদিন অসঙ্গত প্রণালী ধরিয়া বহিতে জানে না···there is more logic in his logic···ক'দিনে বিভাসের মনে এ-বিশ্বাস অভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে!

বিভাস বলিল—আপনার কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দেছে···দেখছেন!

এ কথা বলিয়া বিভাস তার দুই হাত সমর মিত্রের চোখের সামনে ষ্টীয়ারিংয়ের উপর প্রসারিত করিয়া ধরিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার অবর্তমানে হিন্দু আইনে তোমাদের কোন্ আত্মীয় এ সম্পত্তি পাবে, বলতে পারো?

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিভাস বলিল—দীনুবাবুর ছেলে সুষিদা। দীনুবাবু হলেন মামাবাবুর খুড়তুতো ভাই। তিনি রেঙ্গুনে থাকতেন। মারা গেছেন। তাঁর ঐ এক ছেলে সুষিদা। সুষিদা কলকাতার এক মার্চেণ্ট-অফিসে চাকরি করেন।

—তাঁর বয়স কত?

বিভাস বলিল—চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে।

—কেমন লোক?

—মন্দ নয়।

—তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা আছে?

—মেলামেশা তেমন না থাকলেও অসদ্ভাব নেই। কাজে-কর্মে সুষিদা মামাবাবুর কাছে আসা-যাওয়া করতেন।

সমর মিত্র বলিলেন—কান্তি মারা যাবার পর এসে দুঃখ-শোক জানিয়েছেন?

—জানিয়েছিল বৈ কি। বৌদি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে দু' তিনদিন এসেছিল।

—তোমার মামলা-মকর্দমার সময় তোমার সুষিদা খোঁজ-খবর নিতেন?

বিভাস কহিল—দুদিন এসেছিল। সেশন্স-মকর্দমা হবার দু'তিন দিন আগে। এসে ভালো কৌঁশুলী দেবার পরামর্শ দিয়েছিল। বললে, পুলিশের তালকাণা কাণ্ড! যে-মামা ছাড়া তোর মুরুব্বি নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, তাকে খুন করবি তুই? তাও সে খুন বাড়ীতে নয়—কোথায় সেই বাদার মাঠে! খুন করবার যদি ফন্দী থাকবে, বাড়ীতে কোনো রাত্রে গলা টিপে ধরা কি এমন শক্ত, না, অসম্ভব ব্যাপার ছিল?

সমর মিত্র একাগ্র-মনে শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন—হুঁ!

গাড়ী চলিতেছে···

পথের এক ধারে ফল্‌তা লাইনের রেল। অন্য ধারে জলা মাঠ-ঘাট; দূরে গ্রামের আভাস। আকাশে অস্ত-রবির রক্ত-আভা!

মোটর উদয়রামপুর ষ্টেশন ছাড়িয়া তীরবেগে ছুটিতেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—প্রতিমা মেয়েটি কেমন?

বিভাস বলিল—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—দেখতে ভালো?

বিভাস বলিল—পরীর মতো মেয়ে!

—এ-কালের মতো নাচ-গান করে বেড়ায়?

বিভাস বলিল—ঠিক তার উল্টো···প্রতিমা almost selfless. বিলাসিতা জানে না! গান-বাজনা জানে—কিন্তু এমন dignity আছে যে বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হলেও প্রতিমাকে দেখলে মনে বেশ সম্ভ্রম জাগে!

সমর মিত্র বলিলেন—প্রতিমার আত্মীয়দের মধ্যে তার অবর্তমানে মহেশ্বর বাবুর সম্পত্তি কে পাবে, তুমি জানো?

বিভাস বলিল—না। ওঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা থাকলেও অত খপর নেবার চেষ্টা আমি কোনোদিন করিনি। আপনার কি মনে হয়? প্রতিমার কোনো নিকট-আত্মীয় তাকে সরিয়েছে?

সমর মিত্র বলিলেন—না।

—তবে?

সমর মিত্র বলিলেন—এদিকে ফণীবাবু আর ফণীবাবুর ছেলে কান্তি গেল মরে—ওদিকে প্রতিমা নিরুদ্দেশ! এ থেকে মনে হয়, দুটি পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির উপর নজর রেখে এ-কাজ হয়েছে!

বিভাস বলিল—কিন্তু এমন লোক কে থাকবে যে একদিকে মামাবাবু আর কান্তিকে সরিয়ে অন্যদিকে প্রতিমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে দুজনের সম্পত্তির উপর দাবী খাড়া করবে! হিন্দু আইনের কোনো দিক দিয়ে দুটি সম্পত্তিতে একজনের স্বত্ব বা দাবী কোনো মতে দাঁড় করানো সম্ভব হবে না তো!

সমর মিত্র এ-কথার জবাব দিলেন না···একাগ্র মনে ষ্টীয়ারিং হুইল ধরিয়া খড়-বোঝাই এক-রাশ গরুর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

তারপর গাড়ী চলিল সজোরে···বাতাসের তীব্র ঝলক···মাথার উপর আকাশ স্নিগ্ধতায় ভরিয়া আছে! পথের দুধারে দিগন্ত-প্রসারী জলা আর ক্ষেত। বহুদূরে দিগন্ত-রেখায় সবুজ বনানী···যেন আকাশ ও পৃথিবীর সীমান্তে বিশাল রেখায় পাড় বুনিয়া রাখিয়াছে! ক্ষেতে বক উড়িয়া বসিতেছে, কটা গাং-চিল···পুচ্ছ তুলিয়া উড়িতেছে, আবার বসিতেছে···দু একজন পশারী ও শ্রমিক কচিৎ শ্রম-কাতর দেহে পথে চলিয়াছে···কাহারো হাতে একটা লাউ, কাহারো হাতে একগোছা শাক-পাতা··· সারাদিনের কাজ-কর্মের পর গৃহের কথা মনে করিয়া সামর্থ্যমতো দুচারিটা সামগ্রী সম্বল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

গাড়ী আসিয়া ক্রমে কেনালের পুল পার হইল।

বিভাস বলিল—এবার বাঁ দিকে যেতে হবে।

সমর মিত্র বাঁ দিকে গাড়ী ফিরাইলেন।

পল্লী-বসতি। সন্ধ্যা নামিয়াছে। ঘরে ঘরে শঙ্খ-রব। চারিদিকে স্নিগ্ধ প্রশান্ত!

বিভাসের নির্দেশে গাড়ী চালাইয়া সমর মিত্র আসিয়া গাড়ী থামাইলেন একখানি বড় বাড়ীর সামনে। মস্ত ফটক···ফটকের ভিতরে লাল কাঁকর-ফেলা পথ চক্রাকারে ঘুরিয়া গাড়ী-বারান্দায় গিয়া ঢুকিয়াছে। সামনে খানিকটা বাগান। ফুলের বাগান। লাল নীল সাদা—নানা মশুমী ফুলে বাগান যেন আলো হইয়া আছে! নিস্তব্ধ পুরী। দেখিলে মনে হয়, বেদনাময় করুণ কাহিনী বুকে লইয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে!

কোথায় দু-চারিটা মৃদু গুঞ্জন-রব।

বিভাসের সঙ্গে সমর মিত্র গাড়ী হইতে নামিলেন।

বিভাস বলিল,—আপনি এখানে বসুন। আমি মাসিমাকে খবর দি···

সমর মিত্রকে বসাইয়া বিভাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

দাসী-চাকর···যেন মাটির পুতুলের মতো নির্বাক্!

বিভাস আসিল অন্দরের উঠানে। সিমেণ্ট-বাঁধানো রোয়াকের উপরে শ্যামাসুন্দরী দেহ বিছাইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁর মাথার কাছে বসিয়া পুরাতন দাসী বিন্দু ···তার হাতে হাত-পাখা। বিন্দু নিঃশব্দে বসিয়া শ্যামাসুন্দরীর মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে!

বিভাস আসিয়া শ্যামাসুন্দরীর কাছে বসিল, মৃদু স্বরে ডাকিল,—মাসিমা···

শ্যামাসুন্দরী চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলেন। মুখে অশ্রুর কালিমা-রেখা! বিভাসের আহ্বানে তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন; তারপর উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—বিভাস···বসো বাবা!

বিভাস বলিল—হ্যাঁ মাসিমা, আমি ওঁকে এনেছি। মানে, সমর বাবু।

শ্যামাসুন্দরী কোনো জবাব দিলেন না···অবিচল নেত্রে বিভাসের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিভাস চাহিল বিন্দুর পানে, বলিল—হয়তো রাত্রে আমরা আজ এখানে থাকবো, বিন্দু। তুমি ঠাকুরকে বলো। ওঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো···ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে এলুম···ওঁর যেন অসুবিধা না হয়! আমাদের জন্য কাল ওঁর যে দুর্ভোগ গেছে···ওঃ!

শ্যামাসুন্দরী চাহিলেন বিন্দুর পানে, কহিলেন—তুই যা বিন্দু···ভোলাকে বাজারে পাঠা। ভালো দেখে মাছ নিয়ে আসুক···সত্যি, ভদ্দর লোক কষ্ট করে এসেছেন।

বিন্দু উঠিল।

বিভাস কহিল—রাজভোগের দরকার নেই। কোনো মতে পেটে কিছু দেওয়া। উনি খুব ভালো লোক। অহঙ্কার কাকে বলে, জানেন না। বিলাসিতা নেই, চাল নেই! আর মনটি দরদে-মমতায় ভরা!···

বিন্দু চলিয়া গেল।

বিভাস কহিল—তোমাকে কিন্তু একটু শক্ত হতে হবে মাসিমা। এ-রকম ভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না। নির্জীব হয়ে দুঃখ নিয়ে পড়ে থাকলে আমরা কোনো উপায় করতে পারবো না।···মাথা তুলে খাড়া না থাকলে কোনো আশা থাকবে না যে!

শ্যামাসুন্দরী কোনো জবাব দিলেন না···একটা বড় নিশ্বাস তাঁর বুক চিরিয়া বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

বিভাস বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে তুমি বসো মাসিমা! অনেক কথা উনি জিজ্ঞাসা করবেন। সে সব কথার উত্তর ধরে উনি সন্ধান সুরু করবেন।···তুমি চেনো না মাসিমা, ওঁকে আমি অনেক অসাধ্য-সাধন করতে দেখেছি। প্রতিমাকে খুঁজে বার করা ওঁর পক্ষে কিছুই নয়!

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—সে কি বেঁচে আছে, বাবা···যারা নিয়ে গেছে, তারা কি তাকে রেখেছে?

বিভাসের গায়ে কাঁটা দিল···

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তাছাড়া তাদের যদি তেমন বদমায়েসী-মতলব থাকে···মেয়ে তাহলে অপমানে-লজ্জায় আত্মঘাতী হয়েছে···

কথার সঙ্গে শ্যামাসুন্দরীর দু'চোখ ঠেলিয়া হু-হু-ধারে অশ্রু ঝরিল।

বিভাসের বুকের মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ লোক কলরব তুলিল! সে কলরব অগ্রাহ্য করিয়া বিভাস বলিল—তুমি যে-ভয় করছো, তা নয় মাসিমা। আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি নেবার মস্ত ফন্দী-অভিসন্ধি আছে। সমর বাবুরও সেই ধারণা। আর সেজন্য তোমাকে অনেক কথা উনি জিজ্ঞাসা করতে চান! তুমি ওঠো। মনকে শক্ত করো। সকলে মিলে একবার প্রাণপণ শক্তি নিয়ে চেষ্টা করবো···এখান থেকে তারা প্রতিমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? সজাগ পুলিশ···পুলিশে খবর দেওয়া আছে··· তার উপর এখানকার ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিনবাবু নিজে সন্ধান করছেন···

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—একটা মেয়েকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া কি এমন শক্ত

কথা! নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। না হলে এই ছোট গ্রামে কোথায় তাকে রাখবে? চারিদিকে একটা হৈ-হৈ রব উঠেছে···

বিভাস বুঝিল, সে কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া আশা-ভরসা ছাড়িয়া হাত-পা এলাইয়া দিলে চলিবে না তো···বিভাস কহিল—যেখানেই নিয়ে যাক, এ-রকম মেয়ে-চোর চিরদিন ধরা পড়েছে···এবং মেয়েরও উদ্ধার হয়েছে। আমরা চেষ্টা করলে প্রতিমাকে কেন ফিরে পাবো না? তাছাড়া প্রতিমার মতো মেয়ে···বুদ্ধিমতী···তাকে আটকে রাখা কারো সাধ্যে কুলোবে না! সে নিজে ফাঁক খুঁজবে না? ফাঁক পেয়ে একবার যদি তাদের কবল থেকে একটু মুক্তি পায়···তাহলে ঠিক জেনো, নিজেই সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে!

অবিচল দৃষ্টিতে শ্যামাসুন্দরী বিভাসের পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল, বিভাসের প্রত্যেকটি কথায় যেন আশার আলোক-রশ্মি উদ্ভাসিত হইতেছে!

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—তুমি যাও বিভাস···ভদ্রলোক একা বসে আছেন। কাকেও বলো, তোমাদের চা দিক, কিম্বা সরবৎ কি ডাবের জল···যা চাও। আমি মুখ-হাত ধুয়ে তোমাদের সঙ্গে এখনি দেখা করবো!

বিভাস কহিল—বেশ, ওঁর খাতিরের ভার আমি নিচ্ছি···আমি দেখছি!···তোমাকে সেজন্য ভাবতে হবে না।

শান্তর আস্তানা

শ্যামাসুন্দরীর কাছ হইতে পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ডেপুটি পুলিনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তারপর···

পুলিনবাবুর কাছে বিশেষ সংবাদ মিলিল না। তিনি বলিলেন, পুলিশের সাহায্যে এখানকার দাগী বদমায়েসদের ধরিয়া সন্ধান চলিতেছে,—কিন্তু কোনো দিক হইতে সমস্যা-সমাধানের এতটুকু ইঙ্গিত এযাবৎ মিলে নাই!

এ-কথা সমর মিত্র মনোযোগ দিয়া শুনিলেন; তারপর তিনি গিয়া পুলিশের সঙ্গে কথা কহিলেন। কথাবার্তা শেষ করিয়া তিনি ফিরিলেন শ্যামাসুন্দরীর গৃহে।

ফিরিয়া দেখেন, একখানি চিঠি আসিয়াছে। ছোট চিঠি। তিনি বাহির হইয়া যাইবার পরে একটা লোক আসিয়া এ চিঠি দিয়া গেছে। তাঁর নামে চিঠি। তাই বিভাস খাম ছিঁড়িয়া চিঠি খোলে নাই! তিনি আসিতে না আসিতে তাঁর নামে চিঠি। এ ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়ের সীমা নাই!

খামে আঁটা চিঠি সমর মিত্রের হাতে দিয়া বিভাস বলিল—কে লিখলে এ চিঠি?··· আমার মনে হয়, এ চিঠিতে খুব খানিকটা লেকচার আর ওয়ার্ণিং আছে হয়তো!

সমর মিত্র বলিলেন—তার মানে?

বিভাস বলিল—ডিটেক্‌টিভ নভেলে বা ক্রাইম্ গল্পে পড়ি তো, পুলিশ এমন চিঠি পায়।

নিরুত্তরে খাম ছিঁড়িয়া সমর মিত্র বাহির করিয়া পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে;—

পুলিশ-সাহেব সমরবাবু আমাদের প্রণাম জানিবেন। ওদিককার কাজ শেষ করিতে পারেন নাই; আবার দুশ্চিন্তার বোঝা! এবং এদিককার বোঝা ঘাড়ে লইলেন! একটা ঘাড়ে কত ভার বহিবেন বলিতে পারেন? আমরা আপনার গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছি! কোনো দিক দিয়া সাকসেশফুল্ হইবেন, আশা দেখিতেছি না!

ভালো, দেখা যাক! কোথাকার জল কোথায় যায়!

আমাদের বহুৎ বহুৎ সেলাম জানিবেন। ইতি

চিঠি পড়িয়া ভ্রূকুটি করিয়া সে-চিঠি বিভাসের হাতে দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—পড়ো এ চিঠি···

বিভাস চিঠি পড়িল, পড়িয়া বিভাস বলিল—যা বলেছিলুম···

সমর মিত্র কি চিন্তা করিতেছিলেন! শুধু বলিলেন—হুঁ···

বিভাস কোনো জবাব না দিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—এখানে তাদের চর আছে। আমাদের উপর সব-সময় নজর রাখছে।

বিভাসের সর্বশরীর আতঙ্কে ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি আজ কলকাতায় ফিরবো বিভাস। তুমি এখানে থাকতে চাও, থাকো। যাবার সময় থানায় গিয়ে আমি অফিসার-ইন-চার্জকে বলে যাই, এ-বাড়ীর দোরে একজন চৌকিদার যেন সব সময়ে মোতায়েন থাকে, তার ব্যবস্থা করতে। খরচ পড়বে···কিন্তু সে-খরচ mind করা চলে না!···এ চৌকিদারের কাজ হবে, এ-বাড়ীতে যে আসবে, তার কুলুজী নেওয়া!···এ চিঠি কে দিয়ে গেল, কেউ জানে না?

বিভাস বলিল—চাকর ভোলার হাতে চিঠি দিয়ে গেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—ডাকো তোমাদের ভোলাকে।

ভোলা আসিল। সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—যে-লোক চিঠি দিয়ে গেছে, সে ভদ্রলোক?

ভোলা বলিল—না। একটা মেয়ে-মানুষ চিঠি দিয়ে গেছে।

—মেয়ে-মানুষ!

—হ্যাঁ, বাবু।

—কি রকম দেখতে?

ভোলা বলিল—ঝীয়ের মতো।

—কিছু বললে?

ভোলা বলিল—বললে, ডেপুটিবাবু এই চিঠি দিয়েছেন। বাড়ীতে দিয়ো।

সমর মিত্র বলিলেন,—ডেপুটিবাবুর নাম করেছে? বটে!···তাকে দেখলে তুমি চিনতে পারো?

ভোলা বলিল—বোধ হয়, পারি!

উৎসাহ-ভরে বিভাস কহিল—নিয়ে যাবেন ভোলাকে···পুলিনবাবুর বাড়ী? ওঁর বাড়ীর কোনো দাসী যদি···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—তুমি ক্ষেপেছো বিভাস! পুলিনবাবুর বাড়ীর সঙ্গে এ চিঠির কোনো সম্পর্ক নেই! ওরা শুধু ওঁর নাম নেছে—চট করে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে অপ্রতিভ না হয়, এইজন্য···

তারপর তিনি কি ভাবিতেছিলেন, ভাবিয়া বলিলেন,—আমি থানা ঘুরে কলকাতায় ফিরছি, বিভাস। তুমি এখানে থাকবে। সাবধানে থেকো।

বিভাস বলিল—কাল আবার আপনি এখানে আসছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—আসবো। আমার আসতে যার নাম সেই বেলা তিনটে-চারটে! তার আগে আসা হবে না।

বিভাস স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—এ ব্যাপার আমার মাথায় রইলো···এক মিনিট মাথা থেকে নড়বে না!···এবং এর মধ্যে এ ব্যাপার সম্বন্ধে যতটুকু যা করতে পারি, দেখি।···

এ-কথা বলিয়া সমর মিত্র তাঁর টু-সীটারে চড়িয়া বাহির হইলেন।

প্রথমে থানায় আসিয়া যথা-কর্তব্য শেষ করিলেন, তারপর সোজা কলিকাতার অভিমুখে গাড়ী ছুটাইয়া দিলেন।

পরের দিন ভোরে উঠিয়া সমর মিত্র ছুটিলেন কৃষ্ণপুর থানায়।

মনমোহন বলিল—গাড়ীওলা কান্নাকাটি করে চলে গেছলো···তারপর রাত্রে এসে বললে, ওখানকার এক দোকানদার সেই বাবুদের মধ্যে একজনকে চেনে। তার নাম লালগোপাল···দাগী আসামী। ওখানে তার বাড়ী ছিল···কিন্তু বাড়ীতে তার বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাছাড়া লালগোপাল কোনোকালে বাড়ী আসে না! শুধু সেদিন মাত্র এসেছিল···আধ ঘণ্টার জন্য!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—লালগোপাল! দাগী-আসামী! অল্-রাইট···

মনমোহন বলিল—ওকে গাড়ীর জন্য বললুম সার্কেল-অফিসারের কাছে দরখাস্ত দিতে! তারপর যেমন হুকুম হয়···

সমর মিত্র বলিলেন—লালগোপালের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

মনমোহন বলিল—ড্রাইভারকে নিয়ে কাল রাত্রেই আমি গিয়েছিলুম···তার মার ষ্টেটমেণ্ট নিয়েছি। মা বললে, ছেলে তার কোনো খোঁজ-খপর নেয় না।···পাঁচজনের দয়ায় মার দিন চলে···

সমর মিত্র বলিলেন—বটে!

তারপর তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না; বীডন ষ্ট্রীটে ফণীবাবুর বাড়ী আসিলেন। সেখানে আসিয়া কোনো সংবাদ মিলিল না।

তারপর গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া পুরানো এক-গাদা ডায়েরি খুলিয়া সেই ডায়েরির পাতায় চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

বেলা এগারোটার পর স্নানাহার সারিয়া সমর মিত্র আসিলেন লাল-বাজারে ফিঙ্গার-ইম্প্রেশন বুরোয়। আসিয়া বলিলেন—লালগোপাল বলে কোনো দাগীর খপর দিতে পারো রবি?

রবি সেন এখানকার অফিসার।

সমর মিত্রের কথায় রবি সেন মোটা খাতার পাতায় মনোনিবেশ করিল। পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে পাতা বন্ধ করিয়া রবি সেন বলিল—এই যে স্যর···লালগোপাল নস্কর, ওরফে দয়ারাম ওরফে ইসাক, ওরফে ফজল, ওরফে দীননাথ! শেষবারে জেল হয়েছিল আলিপুর সেশন্স থেকে। জেল থেকে বেরিয়েছে এই ছ'মাস আগে।

সমর মিত্র বলিলেন—কি কি চার্জ্জে জেল হয়েছিল?

রবি সেন বলিল—সেক্সন্ ৩৮০, ৪৫৭, ৪২০, ৪১১ আর ৩৯২।

ছ' চোখ বিস্ফারিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ওরে বাবা, এ যে সর্ব-বিদ্যায় পারদর্শী দেখছি! চুরি, জুচ্চুরি থেকে ডাকাতি পর্যন্ত! এমন চৌখোস্ লোক ক্রাইম্-হিষ্ট্রীতে বোধ হয় এই একটি···একমেবাদ্বিতীয়ম্!

রবি সেন বলিল—নিশ্চয়!

সমর মিত্র বলিলেন—শেষ ঠিকানা কোথায় ছিল, বলো তো?

রবি সেন বলিল—ব্রজরাজ লেন, ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর।

সমর মিত্র নোট করিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—আমি আর দাঁড়াবো না রবি···অনেক কাজ! আমাকে বহুদূর যেতে হবে।

রবি সেনের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র গেলেন ডি-ডির এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার রায়-সাহেবের খাশ-কামরায়।

রায় সাহেব কহিলেন—কি খপর সমর বাবু?

সমর মিত্র বলিলেন,—ফণীবাবুর খুনের কিনারা করতে গিয়ে এক নতুন খুনের ব্যাপার হাতে পড়েছে। সেই সঙ্গে সেই ডায়মণ্ডহারবার থেকে মেয়ে-চুরির ব্যাপার! এর প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নতুন-নতুন ক্রাইম্ unfold হচ্ছে! আর প্রত্যেকটি একেবারে বড়-চেনের লিঙ্কের মতো!

রায় সাহেব বলিলেন—আমাকে কি-সাহায্য করতে বলেন?

সমর মিত্র বলিলেন—আপাততঃ কিছু নয়···শুধু টেলিফোন্ করলে আমি যেন এখান থেকে পুলিশ-ফোর্শ পাই···আপনাকে চুপি-চুপি জানিয়ে গেলুম। কেন না, আমার উপর ইতিমধ্যে আসামী-পক্ষ বেশ নজর রেখেছে···কাল সে-পরিচয় পেয়েছি তাদের হস্তাক্ষরে!

সমর মিত্র সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া রায় সাহেব বলিলেন—আইনের এক কড়াক্কড়ির মধ্যেও সত্যকার জীবনে এমন ঘটনা ঘটে···সত্যি সমর বাবু, আমি দেখছি, কলকাতার বাইরে পৃথিবী এখনো সেই আরব্য-উপন্যাসের রঙ্গক্ষেত্র রয়ে গেছে!

সমর মিত্র হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—অর্থমনর্থম্! মানুষের greed···মানুষের lust···এই দুটি জিনিষ মানুষের মনে যেমন সুদৃঢ় রয়ে গেছে, তেমনি এ দুটির প্ররোচনায় জ্ঞানবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে মানুষের বর্বর নৃশংস অভিযানও চলেছে সমান তেজে, সমান উৎসাহে!

রায় সাহেব বলিলেন—দেখছি, মানুষের দুঃসাহস আর বেপরোয়া ভাব এতটুকু কমে নি!···আমার মনে হয়, বিলিতি থ্রিলার-ফিল্ম দেখে এখানকার ক্রিমিনালের দল বহু ইন্‌স্পিরেশন পাচ্ছে!

সমর মিত্র বলিলেন—অভাবের মতো ক্রিয়া-শক্তি আর কোনো কিছুতে জন্মায় না। Necessity is the mother of inventions (প্রয়োজন-উপলব্ধি হইতেই আবিষ্ক্রিয়ার কাজ চলিয়াছে)! অভাবে পড়ে মানুষ সে অভাব-মোচনের ধ্যানে যখন নিরুপায় নিরাশ হয়, তখন এই সব বদমায়েসির আশ্রয় নিয়ে নিজের অভাব মোচন করে ঐশ্বর্য-সম্পদ-সংগ্রহে ক্ষেপে ওঠে।···শিক্ষায় মানুষের বুদ্ধি খুলছে, তার মনের উর্বরা-শক্তি বাড়ছে···তাই ক্রাইমের নব-নব ধারাও নিত্য নূতন তেজে উদয় হচ্ছে, দেখি! শিক্ষিত ক্রিমিনালরা পুরোনো ধরণগুলোকে নূতন ছাঁদে গড়ে নিত্য নব-নব শয়তানীর সৃষ্টি করছে—The old order has not changed, Rai Saheb...it unfolds in new styles. (পুরোনো অপরাধ-প্রবণতার ভাব-ধারা বদলায় নাই রায় সাহেব, নব রূপে তাদের পুনরাবর্তন চলিয়াছে)

রায় সাহেব বলিলেন—I wish you all luck and success (আমি আপনার সৌভাগ্য এবং সাফল্য কামনা করি)।

রায় সাহেবের কাছ হইতে বিদায় লইয়া সমর মিত্র তাঁর টু-শীটারে চড়িয়া বসিলেন এবং সোজা আসিলেন ওয়াটগঞ্জ থানায়।

আসিয়া ওয়াটগঞ্জ থানার অফিসার সুনীলের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন—ব্রজরাজ লেনটা কোথায় হে সুনীল?

সুনীল নক্সা আঁকিয়া লেনের নির্দেশ দিল।

সমর মিত্রের কাছে ছিল ছোট সুটকেশ। সুটকেস খুলিয়া ছদ্ম বেশভূষা বাহির করিয়া সমর মিত্র সাজিলেন এক আড়তের সরকার। সাজগোজ শেষ করিয়া সুনীলকে প্রশ্ন করিলেন—থানায় তুমি আছো? না বেরুতে হবে?

সুনীল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, থানাতেই আছি।

—বেশ। তাহলে পাকা একজন সেপাই দাও আমার সঙ্গে···নিঃশব্দে সে আমার পিছনে-পিছনে আসবে। তার পর যেমন ইশারা পাবে···অর্থাৎ এমন একজন পাকা লোক দাও যে ইশারা বুঝে চলতে পারে

সুনীল বলিল—তেমন ওস্তাদ লোক আছে ঐ হেড কন্‌ষ্টেবল ইমদাদ। ইমদাদ বহুদিন এস-বিতে ছিল। তাকে দি আপনার সঙ্গে···

ইমদাদ জমাদার সত্যই ওস্তাদ। সে চট্ করিয়া বিড়িওয়ালা সাজিল। এবং তাকে লইয়া আড়তের সরকার-বেশে সমর মিত্র থানা হইতে বাহির হইলেন···

পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন···

ট্রাম-রাস্তা ছাড়িয়া পাঁচ-সাতটা মোড় বাঁকিয়া সরু একটা গলি। এ গলিতে গাড়ী ঢোকে না। গলির দুধারে খোলার বস্তী। এই বস্তীকে আসিয়া একটা চায়ের দোকানে ঢুকিয়া সরকার-বেশী সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—আমাদের লালগোপাল কোথায় থাকে, জানো? মানে, তার অনেক নাম···কখনো সে নাম নেয় ফজল··· কখনো হয় দয়ারাম···কখনো দীননাথ।

চায়ের দোকানের মালিক গেঁদু। গেঁদু মুসলমান। গেঁদু ছাড়া দোকানের খরিদ্দার ছিল পাঁচজন; দুজন মুসলমান, দুজন বাঙালী হিন্দু এবং একজন চীনা।

লালগোপালের নাম শুনিয়া তারা সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

খরিদ্দারদের মধ্যে একজন বলিল,—আসল-জাত হিঁদু? না, মুসলমান?

সমর মিত্র বলিলেন—হিঁদু···

গেঁদু বলিল—এ পাড়ায় হিঁদু আবার কে আছে?

একজন খরিদ্দার বলিল—কি কাজ করে?

সমর মিত্র বলিলেন—কাজ তেমন কিছু করে না···

গেঁদু বলিল—অত নাম শুনছো, বুঝছো না? খলিফা আদমী!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার আড়তে একখানা খাতা লিখে দিতে হবে···ইনকাম-ট্যাক্সের জন্য দোসরা খাতা চাই কি না···তাই পাঁচজনে বললে, ব্রজরাজ লেনে থাকে লালগোপাল। কখনো নাম বলে, ইশাক, কখনো দীননাথ, কখনো দয়ারাম···

গেঁদু বলিল—কি রকম দেখতে?

একজন খরিদ্দার বলিল—বয়স কত হবে?

সমর মিত্র বলিলেন—আমি তো তাকে চিনি না···কি করে বলবো? নাম শুনে এসেছি।

গেঁদু ডাকিল—রহিম···

খরিদ্দারদের মধ্য হইতে নেড়া-মাথা গুণ্ডার মতো চেহারা একটা লোক মুখ ফিরাইয়া বলিল—কেন?

—জানিস্? এখানে খলিফা আদমী কে আছে?

রহিম বলিল—সোনার বাড়ীতে ছাখো। সেখানে দু'চারজন হিঁদু আদমী থাকে ···ক'টা ঔরৎও আছে। কশ্‌বী!

সমর মিত্র বলিল—সোনার বাড়ী কোথায়?

গেঁদু বলিল—আগে গিয়ে একটা নিম গাছ দেখবেন···সেই বাড়ী···

ঠিকানা লইয়া সমর মিত্র আসিলেন পথে···

নিম-গাছওয়ালা বাড়ী মিলিল। ডাকিলেন—মোনা বাড়ী আছো ?

ভিতর হইতে সাড়া উঠিল,—কে ?

সমর মিত্র বলিল—একবার বাইরে এসো দাদা।

খর্বাকৃতি একটি লোক বাহিরে আসিল। সমর মিত্রকে ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল—কি চাই ?

সমর মিত্র বলিলেন···লালগোপাল এখানে থাকে ?

—লালগোপাল! মোনার দু' চোখে প্রচুর বিস্ময়!

সমর মিত্র বলিলেন—তার আরো নাম আছে···মানে, চৌখোশ লোক! তার অন্য নাম হলো দয়ারাম···দীননাথ···ইশাক···

মোনা বলিল—ও-সব নামের কেউ এখানে থাকে না।

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে তোমাদের এখানে অন্য নাম নেছে!···আচ্ছা, তোমার এখানে কে-কে ভাড়া আছে, বলতে পারো ?

মোনা গোটা-আষ্টেক নাম বলিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তারা কে কি কাজ করে, যদি বলো, তাহলে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারবো।

মোনা বলিল, কেহ স্যাকরার দোকানে কাজ করে; কেহ কাজ করে ডকে; কেহ পেট্রোলের দোকানে; কেহ কন্ট্রাক্টরের অফিসে···একজনের সম্বন্ধে শুধু বলিল, দালালী করে।

লাগে তুক, না লাগে তাক! সমর মিত্র বলিলেন—তার নাম বলো দিকিনি···

সন্দিগ্ধ স্বরে সমর মিত্র বলিলেন—তার নাম বিশু।

—সে এখন এখানে আছে ?

মোনা বলিল—না। আজ পাঁচদিন হলো সে বর্ধমান গেছে। কি দালালী কাজে।

সমর মিত্র ভ্রূকুটি করিলেন। বাদার ধারে দালালী নয় তো ?

সমর মিত্র বলিলেন—তার আর-কেউ আছে ? না, একলা থাকে ?

মোনা বলিল—তার মেয়েমানুষ আছে···শান্ত।

—শান্তর সঙ্গে দেখা হবে ?

মোনা বলিল,—দাঁড়ান, আমি ডেকে দিচ্ছি···

মোনা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সমর মিত্র দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলেন। পিছনে ইমদাদ তখন এক বিড়ির দোকানে দাঁড়াইয়া তামাকের পাঁতা চাহিতেছে···

মোনা ফিরিয়া আসিল, আসিয়া প্রশ্ন করিল,—শান্ত বললে, তাকে কি দরকার ?

সমর মিত্রের মনে আশার ক্ষীণ রশ্মি! এত সন্ধান লইয়া তবে তিনি বাহির হইবেন···ওঃ, রাজেশ্বরী!

সমর মিত্র বলিলেন দরকার আছে। মানে, আমাদের আড়তে একখানা খাতা তৈরী করে দেবে বলেছিল আমি আগাম টাকা নিয়ে হাজির। কবে তার সুবিধা হবে, তাই···

শান্ত দাঁড়াইয়াছিল দ্বারের ওদিকে···নেপথ্যান্তরালে। সমর মিত্রের কথা তার কর্ণগোচর হইল। সে মোনার অপেক্ষা করিল না; মাথায় গামছা টানিয়া দ্বারের সামনে আসিয়া উদয় হইল, কহিল,—কে গা?

সমর মিত্র চকিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া লইলেন, লইয়া বলিলেন—আমি গো, বাছা। চেতলা থেকে আসছি।

—চেতলা!

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ···

মোনা বলিল—এই আপনার শান্ত···আমি তাহলে যেতে পারি?

সমর মিত্র বলিলেন,—যাবে? তা বেশ, তোমাকে আমি আটকে রাখবো না···

মোনা চলিয়া গেল।

শান্ত বলিল—আপনি কি চান?

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বিশুকে খুঁজছিলুম···বিশু তোমারি লোক তো?

শান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিল; সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন। সে কুঞ্চিত ভ্রূযুগে বেশ খানিকটা অন্ধকারের রেখা!

শান্ত বলিল,—কি বলবে, বলো না···

সমর মিত্র বলিলেন,—চেতলায় আমাদের আড়ত আছে। ইনকাম-ট্যাক্সের জন্য খাতা পালটাতে হবে···আমাকে দু-চার জন লোক সন্ধান দেছে, ব্রজরাজ লেনের বিশু এ কাজে খুব পাকা, তাই অনেক খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি···

শান্ত বলিল—কিন্তু সে তো এখানে নেই বাবু···

—কোথায় গেছে?

শান্ত বলিল—কলকাতার বাইরে গেছে···একটু কাজে।

সমর মিত্র কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—কাছাকাছি যদি গিয়ে থাকে, আমায় বললে আমি যেতে পারি। আমাদের এ বড্ড জরুরি কাজ। এ কাজের জন্য তাকে আমরা একশো টাকা দেবো···আগাম কিছু নিয়েও এসেছিলুম।

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র পার্শ খুলিয়া পার্শের মধ্য হইতে দু'খানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিলেন।

মাছ দেখিলে বিড়ালের চোখে যেমন দীপ্তি জাগে, নোট দেখিয়া শান্তর দুই চোখে তেমনি দীপ্তি···সমর মিত্রের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না!

শান্ত চকিতের জন্য কি ভাবিল, তারপর বলিল—সে গেছে বারাসতের কাছে···

—কবে ফিরবে?

শান্ত বলিল—তা তো বলতে পারি না। তবে কাজ হয়ে গেলেই ফিরবে। বাইরে বেশীদিন সে থাকে না।

কথাটা বলিয়া শান্ত গর্ব-ভরে একবার নিজের অঙ্গ দুলাইল···যেন জাহির করিতে চায়, তার মোহ এতখানি যে শত লোভেও তাকে ছাড়িয়া বাহিরে দুদিন থাকিবে, সে সাধ্য বিশুর নাই!

কর্মক্ষেত্রে সমর মিত্র বহু লোকের সংসর্গে আসিয়াছেন! মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকখানি।

শান্তর কথায় সমর মিত্র হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—তোমায় দেখে বুঝছি, তোমাকে ছেড়ে তার বাহিরে থাকবার উপায় নেই।

এ কথায় শান্তর অধরে মৃদু হাসি এবং দু'চোখে কটাক্ষের বিদ্যুৎ বহিয়া গেল।

শান্ত বলিল—আপনি লিখে রেখে যান···সে এলে দেবো। এসেই সে গিয়ে চেৎলার আড়তে দেখা করবে।

সমর মিত্র বলিলেন—এ-সব সহজ লেখাপড়ার কাজ নয়, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে বুঝতে পারছো তো!

সমর মিত্রের কথা শুনিয়া শান্ত খুশী হইল।

শান্ত বলিল—তাইতো···আমি ঠিকানা জানি না যে···না হলে ঠিকানা দিতে পারতুম।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল সকালে আমি আর একবার আসবো'খন···তুমি বলে রেখো, সে যদি আসে, তাহলে সে যেন বাড়ীতে থাকে।···বায়নার দরুন তুমি বরং পাঁচটা টাকা রাখো শান্ত!

শান্ত খুশী-মনে পাঁচ টাকার নোট গ্রহণ করিল এবং এ-বয়সে আসিয়া যে ভব্যতা শিখিয়াছে, সে ভব্যতা রক্ষা করিয়া শান্ত বলিল—তামাক খাবেন না বাবু?

সমর মিত্র কহিলেন—কাজ হলো না শান্ত···কাজ হলে শুধু তামাক কেন তোমার এখানে দু'দণ্ড বসে আরো কিছু খেতে পারতুম!···আজ তাহলে আসি। কাল সকালে আবার আমি আসবো'খন। এলে তুমি বিরক্ত হবে না?

সদ্য পাঁচ টাকা লাভ করিয়াছে, বিগলিত চিত্তে শান্ত বলিল,—না, না বাবু, রাগ করবো কেন? আপনি আসবেন বৈ কি, কাল নিশ্চয় আসবেন।···সে আজ ফিরবে বলে' মনে হয়। আপনার জন্য সে বাড়ীতেই থাকবে···কোথাও যাবে না!

সমর মিত্র বলিলেন,—বেশ, কাল আমি নিশ্চয় আসবো···আর এ-কাজের জন্য এর মধ্যে অন্য কাকেও খুঁজবো না···

শান্ত বলিল—না···অন্য লোককে কি দুঃখে খুঁজবেন! আমি আছি, আপনার কাজ বিশু মাথায় করে' করে দেবে।

বৃকোদরের দূত

ব্রজরাজ লেন হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র ওয়াট্‌গঞ্জ থানায় ফিরিয়া আসিলেন। ইন্‌সপেক্টর সুনীল রায়কে বলিলেন—তোমার ইমদাদ জমাদার খাসা বিড়িওলা সেজেছিল! এ তল্লাটে জমাদারী করছে, অথচ কেউ ওকে চিনতে পারে নি!

সুনীল কহিল—ইমদাদ খুব চালাক। তাছাড়া এক-কালে ও এমেচার-ক্লাবে থিয়েটার করতো যে। আমাদের পুলিস-ক্লাবে সেবার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য যা সেজেছিল, রায়-সাহেব শান্তি চক্রবর্তী মশায় খুশী হয়ে ওকে সোনার মেডেল দিয়েছিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন,—বটে!

সুনীল কহিল—হ্যাঁ।

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ইমদাদকে নজর রাখতে বলো…লালগোপালের সন্ধান পাওয়া গেছে,—তার একটা স্ত্রীলোক আছে; নাম শান্ত। শান্ত বললে, লোকটা লেখাপড়ার কাজ করে এবং এখন সে গেছে বারাসতের কাছে। তা যদি সত্যি হয়, আমার আন্দাজ কতক মিলছে। কারণ, আমি যে-লোকটাকে খুঁজছি, সে এই দিকেই কীর্তি করে বেড়াচ্ছে!

বিস্ফারিত নেত্রে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া সুনীল কহিল—হুঁ…তা বেশ, ইমদাদকে আপনি বলুন। ওকে যা বলবেন, ও তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে, সে সম্বন্ধে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ। আমাকে কাল আবার আসতে হবে। লালগোপালকে যদি পাই, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আমি চলে এলে ইমদাদকে দিয়ে ওকে কোনো ছুতোয় পথে সেক্‌শন্ 54এ এ্যারেস্ট…অবশ্য, ওর সঙ্গে কথা কয়ে যদি আমি বুঝি, এ-ব্যাপারের সঙ্গে ও সংশ্লিষ্ট আছে, তাহলে আমি ইশারায় জানাবো। ইল্‌লিগ্যাল্ এ্যারেস্ট হবে না!

সুনীল বলিল—বেশ! কাল আপনি এলে তখন তাকে গ্রেফ্‌তার করা হবে।

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ! কিন্তু তার আগে ইমদাদকে ওর বাড়ীর উপর হুঁশিয়ার নজর রাখতে হবে। কারণ জানো তো, আমরা যদি বেড়াই ডালে-ডালে, ওদের মধ্যে ওস্তাদ যারা, তারা পাতায়-পাতায় বেড়ায়! কি জানি, শান্তর কাছে খপর পেয়ে যদি তার মনে সন্দেহ বা ভয় হয়, তাহলে গা-ঢাকা দেবে।

সুনীল বলিল—তা ঠিক…আপনি বুঝি আজ বাইরে যাচ্ছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—না গেলে নয়। তবে সেখানে যত কাজই থাকুক, কাল সকালে আমি তোমার এখানে আসছি।

এই কথা বলিয়া সমর মিত্র ছদ্মবেশ খুলিয়া স্ব-রূপে থানা হইতে বাহির হইয়া নিজের টু-সীটারে চড়িয়া বসিলেন এবং গাড়ী চালাইয়া দিলেন ডায়মণ্ডহারবারের দিকে।

ডায়মণ্ডহারবারে আসিলেন, বেলা তখন দুটো বাজিয়া গিয়াছে।

সামনে দাঁড়াইয়া বিভাস। দু' জনে ঘরে আসিয়া বসিলেন।

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—কোনো খপর আছে?

বিভাস বলিল,—না।

সমর মিত্র কহিলেন—আমার নামে আর কোনো চিঠি আসে নি?

বিভাস বলিল,—না। কেন বলুন তো ?

সমর মিত্র বলিলেন,—একখানা চ্যালেঞ্জ নোট্ এসেছিল···তাই।

বিভাস কহিল—এমন চিঠি আপনারা পান্, সত্যি ?

সমর মিত্র বলিলেন—ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ো নি ? তাতে ডিটেকটিভ্রা হর-ঘড়ি চিঠি পায়,—রীতিমত ভয়ালো-রকমের চিঠি !

বিভাস হাসিল, হাসিয়া বলিল,—সে তো উপন্যাসের ডিটেকটিভ···উপন্যাসের ডিটেকটিভ্রা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছায়া দেখে আসামী ধরে !

সমর মিত্র বলিলেন—সত্যিকার জগতে আসামী ধরা কি সহজ ব্যাপার ? প্রথমতঃ আমাদের এই বাঙলা দেশের মধ্যে কলকাতা এবং তার গায়ে-সাঁটা চব্বিশটা পরগণা ধরো ! লোক একেবারে গিস্গিস্ করছে···তারপর ঘর-বাড়ী গলি-ঘুঁজি, মন্দির-মসজিদ, জলা-মাঠ, ঝোপ-ঝাড়···এ-সবের মধ্যে কোথায় আসামী লুকিয়ে আছে···কি করে খপর পাবে ? কারো গায়ে দাগ দেওয়া নেই যে দেখে আসামী বলে পাকড়াও করবে ! তারপর ধরো, যার সন্ধানে আমি ডায়মণ্ডহারবারে এলুম, সে হয়তো আমার পাশ দিয়ে ট্রেনে উঠে বসলো ! যে-হেতু ডিটেকটিভিতে আমি নাম লিখিয়েছি, অতএব আমাকে সর্বজ্ঞ হতে হবে ! গায়ের গন্ধে মানুষকে আসামী বলে চিনবো এমন বিদ্যা বাস্তব জগতে শেখা সম্ভব নয় ! কাজেই ধরা অসম্ভব !

বিভাস বলিল—যাক···আপনার জন্য কি দিতে বলবো, বলুন ? ডাবের জল ? না, চা ?

সমর মিত্র বলিলেন,—ডাবের জল দিতে বলো।···যেখানে ডাবের জল মহার্ঘ্য, সেখানে চা চলে ! কিন্তু এখানে চায়ে হাঙ্গাম আছে···ডাবের জল সহজে মিলবে।

বিভাস ভিতর হইতে কাচের গ্লাসে করিয়া ডাবের জল লইয়া আসিল।

ডাবের জল পান করিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—এখন কি যে করবো, তাই ভাবছি···

বিভাস কোনো কথা না বলিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—কলকাতায় একটা লোকের সন্ধানে গিয়েছিলুম···সে বাসায় নেই।··তাকে যে-লোক বলে' ভাবছি, সে যদি আমাদের সেই লোক হয়, তাহলে কিছু সন্ধান মিলবে। কিন্তু যদি না হয়···

বিভাস বলিল—তার মানে ?

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, ও দলের একজনকে যদি গাঁথতে পারি, তাহলে তাকে ধরলে বাকীগুলোকে পেতে দেরি হবে না।

বিভাস বলিল—দেখুন···ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় ! তবে মুশকিল এই যে ওদিককার কোনো হদিশ পাবার আগে এদিকে এ নতুন উপসর্গ যদি না জুটতো···

সমর মিত্র বলিলেন—এদিককার সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দু'ব্যাপারে যোগ আছে ! শুধু তাই নয়···ঐ যে একটা রব উঠেছে, কান্তিবাবু বেঁচে আছেন এবং তিনি

জল থেকে ডাঙ্গায় উঠেছেন···এ-ব্যাপারটি বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে! জাল প্রতাপ-চাঁদের সেকেণ্ড-এডিশন না হয়!

—তার মানে?

—তার মানে, কোনো জালিয়াত-লোক কান্তিবাবুর ভূমিকা নিয়ে স্টেজে নামছেন, হয়তো! কেননা কান্তিবাবু বেঁচে ফিরলে তিনি ঝোপে-ঝাড়ে আপনাকে লুকিয়ে বাঁচিয়ে চলবেন না···সটান তোমাদের বীডন স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন। তাছাড়া ফণীবাবু মারা যাবার পর এতদিন কেটে গেল···মকর্দমা চুকে যখন ওদিককার খুনী-ব্যাপারে যবনিকাপাত হয়েছে···সকলে নিশ্চিন্ত···তখন হঠাৎ ফণীবাবুর ছেলে কান্তিবাবু বেঁচে ফিরলেন···এই কথাটাই কাল সারা রাত আমি ভেবেছি! আরো কি ভেবেছি, জানো বিভাস?

—কি?

—ভেবেছি, এ খুনের তদারকী না করে যদি কান্তিবাবুর সম্বন্ধে খোঁজ-খপর নিতে পারতুম! করতুমও তাই যদি এখানে মহেশ্বর বাবুর মেয়েটি না চুরি হতো!···এখন সব কাজ ফেলে মেয়েটির উদ্ধার সাধন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য!

বিভাস একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।···কোনো কথা বলিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু কোথা থেকে কোন্ পথে সন্ধান করবো, তার কোনো হদিশ পাচ্ছি না···It is so mysterious (এ ব্যাপার এমন রহস্যজনক)!

ভোলা ভৃত্য আসিয়া ডাকিল—দাদাবাবু···

বিভাস কহিল—কেন রে?

ভোলা কহিল—একজন বাবু···

বিভাস কহিল—এখানে নিয়ে আয়।

ভোলা চলিয়া গেল।

বিভাস চাহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র কহিলেন—এর মধ্যে এখানকার কোনো ভদ্রলোক এসেছিলেন?

বিভাস কহিল,—না।

ভোলা ফিরিল। তার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—বিভাসবাবু কার নাম?

বিভাস কহিল—আমার নাম বিভাস।···আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক বলিলেন,—কলকাতা থেকে।

—কি দরকার?

ভদ্রলোক বলিলেন—একটা গোপনীয় কথা ছিল। আপনাদের বীডন স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়েছিলুম···সেখান থেকে এখানকার খপর পেয়ে এখানে আসছি।

কথাটা বলিয়া ভদ্রলোক চাহিলেন সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র তাঁর পানে চাহিয়াছিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি উঠবো তাহলে?

ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বিভাস প্রশ্ন করিল—ওঁকে উঠতে হবে?

ভদ্রলোক বিনয়ের ভঙ্গীতে বলিলেন—উঠলে ভালো হয়। মানে, কথাটা গোপনীয়…

সমর মিত্র বিরক্তি বা বিলম্বমাত্র না করিয়া উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

সমর মিত্র বাহিরে গেলে বিভাস বলিল,—বলুন…

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি আসছি কলকাতার এটর্নির অফিস থেকে। বৃকোদর মল্লিক এটর্নিকে জানেন? হেস্টিংস-বিল্ডিংয়ে তাঁর অফিস। মল্লিক এণ্ড ব্লডহাউণ্ড কোম্পানির চীফ পার্টনার?

বিভাস কহিল—না, আমি তাঁকে জানি না।

ভদ্রলোক বলিলেন,—কিন্তু এবার তাঁকে জানতে হবে। মানে…

বিভাস বলিল—বলুন। মানে, আমার সময় বড় কম। আমাদের মাথার উপর মস্ত বিপদ চলেছে। আপনার কথা বসে-বসে অনেকক্ষণ ধরে শোনবার মতো অবসর নেই। মনের অবস্থাও তেমন নয়!…দয়া করে একটু চট্‌পট্‌ বলে ফেলুন…

ভদ্রলোক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটা ছোট হইয়া গেল!

তিনি কহিলেন—কারো অসুখ নাকি?

বিভাস কহিল—অসুখ নয়…অসুখের চেয়ে বেশী বিপদ।

—বৈষয়িক গোলযোগ?

বিভাসের রাগ হইল! সম্পূর্ণ বাহিরের লোক…তোমার এ কৌতুহল কেন বাপু? কিন্তু অপরিচিত লোক! রাগ করিয়া কি ফল! বিভাস বলিল—আপনি আপনার কথা শেষ করুন দয়া করে…

ভদ্রলোক বলিলেন—ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছেলে কান্তিবাবু…না?

বিভাস কহিল—হ্যাঁ…

ভদ্রলোক বলিলেন—কান্তিবাবু আমাদের অফিসে এসে instruction দেছেন, আপনার মামা ফণীবাবু উইল করে আপনাকে কিছু দিয়ে যান্ নি…কিন্তু তিনি অবিচার করবেন না। আপনার সঙ্গে বরাবর একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন…তিনি আপনাকে নিজে থেকে কিছু দিতে চান। তবে তিনি আর একত্র থাকবেন না…আপনাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই বৃকোদর বাবুকে তিনি বলেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বুঝিয়ে বলতে। ভালোয়-ভালোয় নিঃশব্দে যদি এ-ব্যবস্থায় আপনি রাজী থাকেন, তাহলে মানে…কোনো রকম অপ্রিয় কাজ তাঁকে করতে হয় না!

এ-কথা শুনিয়া বিভাসের মনে হইল, সে যেন আর নাই! হয় সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে…না হয়, ইহলোকের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে!

বিভাস চুপ করিয়া রহিল। কান্তি বাঁচিয়া আছে…তার সঙ্গে দেখা না করিয়া অজানা কোন্ এটর্নির কাছে গিয়া তাকে এখনি নোটিস দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে! আশ্চর্য ব্যাপার!

বিভাস বলিল,—আপনি অসম্ভব গল্প বলছেন!

ভদ্রলোক বিভাসকে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল—আপনি কি বলেন?

বিভাসের মনে একটা আইডিয়া! সে বলিল—জানেন, আড়াল থেকে পরের মুখে কান্তিবাবুর এ কথা পাঠাবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি নিজে বাড়ী এসে এ-কথা বলতে পারতেন তো!

ভদ্রলোক কহিলেন—অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপার! সেখানে চক্ষুলজ্জা বেশী হওয়া খুব স্বাভাবিক···আমরা এ-ব্যবসা এতদিন করছি···দেখছি তো! ভায়ে-ভায়ে পার্টিশান হচ্ছে যে···ভায়ের সঙ্গে ভাই যদি পরামর্শ করতো, তাহলে এটর্নির ব্যবসা চলতো না মশায়!

বিভাসের মনে হইল, তীব্র কণ্ঠে লোকটার মুখের উপর হাঁকিয়া বলে, জাল··· জুয়াচোর!···কান্তি জলে ডুবিয়া বাঁচিয়া ফিরিলে যদি তার মাথা খারাপ হয়,··· তবু তার মাথা এমন খারাপ হইবে না···যার জন্য কান্তি এমন অসম্ভব কথা বলিবে!

কিন্তু না,···যদি জালিয়াতি ব্যাপারই হয়···এ-লোকটাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই! সমর মিত্র এখানে আছেন···তাঁর কাছে এখনি সব কথা বলিলে হয়তো এ জালিয়াতির সব ফন্দী ধরা পড়িয়া ফাঁসিয়া চূর্ণ হইতে পারে!

ভদ্রলোক বলিলেন—তাহলে আপনি কি বলেন?

বিভাস বলিল—আপনার কান্তিবাবুকে বলবেন, তিনি যা চান্, এসে নিজের মুখে যেন তা বলেন আমাকে! পরের মুখ থেকে তাঁর কোনো কথা আমি শুনবো না···শুনলে তাঁর অপমান, আমার অপমান···এবং আমার স্বর্গীয় মামাবাবুর অপমান হবে! বুঝলেন!

এ উত্তরের জন্য ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না। এটর্নির অফিসে কাজ করেন... তিনি জানেন, টাকার লোভে মানুষ সব কাজে রাজী হয়! ফণীবাবুর মতো একজন নামজাদা ধনী···তাঁর সম্পত্তির ভাগ নিঃশব্দে হাত পাতিয়া গ্রহণ কর্, তা না, তার মধ্যে বায়নাক্কা তুলিতেছে! বাঁদরামি আর কাহাকে বলে!

বিভাস বলিল—আপনার কথা হয়েছে···আমার কথাও শুনলেন তো! আশা করি, এবার আপনি বিদায় নেবেন!

এ-কথায় ভদ্রলোকের মনের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল!···কিন্তু প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি···সে-ঝাঁজ চোখে-মুখে ব্যক্ত করিলেন না···শুধু বলিলেন,—এক গ্লাস জল দিতে বলেন যদি? এতখানি পথ···

বিভাস ডাকিল—ভোলা···

ভোলা আসিল।

বিভাস বলিল—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয়।

ভোলা জল আনিয়া দিল···

ভদ্রলোক জল পান করিয়া একবার বিভাসের পানে চাহিলেন···সে-দৃষ্টিতে বহ্নির মৃদু স্ফুলিঙ্গ! তারপর গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সমর মিত্র ঘরে আসিলেন, বলিলেন—গোপনীয় কথা এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল?

বিভাস কহিল—দেখুন, আপনি বোধ হয় clue পাবেন এবার···

সমর মিত্র বলিলেন—বটে! শুনি···

আগ্রহ-ভরে তিনি চেয়ারে বসিলেন।

ভদ্রলোকের বক্তব্যটুকু বিভাস তাঁকে আমুল বিবৃত করিল।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—Eureca. That's like a good boy (এই তো ভালো ছেলের কাজ)! বাঃ! তাহলে যা বলছিলুম, জাল প্রতাপচাঁদ···এ কান্তিবাবুটি জাল···তাতে সন্দেহ নেই! এবং এখন বুঝছি, জালিয়াত লালগোপাল এবং জালিয়াত-লাশ···এ-দুজনের মহামিলন কেন! এ-জালিয়াতির সঙ্গে এখানকার মেয়ে চুরির যোগ···আমি যেন চোখে সব দেখতে পাচ্ছি! এ সব ঘটনা ঐ এক চেইনের links! এটর্নির কি নাম বললে?

—বৃকোদর মল্লিক।

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁর উদর বিদীর্ণ করলে সব-ক'জনকে পাবো বলে আশা হচ্ছে, বিভাস!

অক্রুর-সংবাদ

সেই রাত্রেই বিভাসকে কতকগুলা উপদেশ দিয়া সমর মিত্র কলিকাতায় ফিরিলেন।

পরের দিন সকালে তিনি ছুটিলেন সেই ছদ্মবেশ ধরিয়া খিদিরপুরের ব্রজরাজ লেনে। যাইবার পূর্বে ওয়াটগঞ্জ থানায় ইনসপেক্টর সুনীল রায়কে টেলিফোন করিলেন,—ইমদাদ জমাদার কিছু করতে পেরেছে?

সুনীল বলিল,—না···

সমর মিত্র বলিলেন—তাকে বিড়িওয়ালা সেজে ব্রজরাজ লেনে ওয়াচ করতে বলে দাও! আজ আমি আর থানায় যাবো না। সাবধান হতে হবে! বাড়ী থেকে আড়তের গোমস্তা সেজে আমি সোজা গিয়ে উঠবো ব্রজরাজ লেনে লালগোপালের আস্তানায়!

সুনীল বলিল—বেশ। থানায় আমি 'রেডি' থাকবো স্যর, for any emergency···

সমর মিত্র বলিলেন,—আচ্ছা!

গোমস্তাবেশী সমর মিত্র যখন ব্রজরাজ লেনে আসিলেন, তখন সে-বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সমর মিত্র দ্বারের কড়া নাড়িলেন।

ভিতর হইতে সাড়া জাগিল—কে গা?

পুরুষের কণ্ঠ !

সমর মিত্র বলিলেন—শান্ত আছো ?

ভিতর হইতে সেই পুরুষেরই কণ্ঠে আহ্বান জাগিল—ওরে শান্ত···কে তোকে ডাকছে, গিয়ে ছাখ্···

ভিতরে নারী-কণ্ঠে উত্তর—যাই···

সে-স্বর সমর মিত্র চিনিলেন। স্বর শান্তর।

শান্ত আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সমর মিত্রকে দেখিয়া বলিলেন—আপনি !

সমর মিত্র বলিলেন—বিশু ফিরেছে ?

শান্ত বলিল—কাল রাত্রে ফিরেছে বাবু। তাকে ডাকি ?

—ডাকো।

শান্ত বলিল—কিন্তু দোরে দাঁড়িয়ে এ সব কথা কইবেন ? পাঁচ রকমের লোক আছে ···তার চেয়ে যদি ভিতরে আসেন···

সমর মিত্র বলিলেন,—চলো···

সমর মিত্রকে লইয়া শান্ত ভিতরে আসিল।

ছোট একটু উঠান···টালি-বাঁধানো। ধুইয়া মাজিয়া সাফ করা হইয়াছে। টালির লাল রঙ একেবারে ঝক্ঝক্ করিতেছে। উঠানের চার ধারে দাওয়া, দাওয়ার পর ঘর। এক কোণে কলতলা···একজন স্ত্রীলোক কলতলায় স্নান করিতেছে··কলতলার পর্দা নাই···স্ত্রীলোকটার তাহাতে স্নানে বাধা নাই। আর এক কোণে একটি তুলসী-মঞ্চ।

সমর মিত্র বুঝিলেন, এ সব জায়গায় যারা থাকে, তারা লজ্জা-সরমের ধার ধারে না ···মানুষ হইলেও আচারে-ব্যবহারে অনেকটা পশুর মতো হইয়া যায় !

ঘরের মধ্যে সমর মিত্রকে আনিয়া একখানা মোড়া টানিয়া শান্ত কহিল,—বসুন বাবু। ঐ যে বিশু শুয়ে আছে।

ঘরখানি ছোট নয়। একদিকে বাঘ-থাবা বড় পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর ছু'পুরু গদি···তার উপরে বালিশের পাহাড় সাজাইয়া বিছানা পাতা। সেই বিছানার একদিক অধিকার করিয়া দশাসুরের মতো বিরাট দেহে বিশু পড়িয়া ঘুমাইতেছে। নাসায় যে ধ্বনি উঠিতেছে···যেন দৈত্যের হুঙ্কার !

শান্ত তাকে ঠেলা দিল, বলিল—আ মর্, ওঠ্ না···বেলা ন'টা বাজে। পড়ে-পড়ে এখনো নাক ডাকাচ্ছে, ছাখো···

ঠ্যালা খাইয়া বিশুর ঘুম ভাঙ্গিল। সে চোখ চাহিল।

শান্ত বলিল—ওঠ্···বাবু এসে বসে আছেন। জরুরি কাজ আছে।

এ কথায় বিশু উঠিয়া বসিল। ছু'চোখ জবাফুলের মতো রাঙা !

শান্ত চাহিল সমর মিত্রের পানে, বলিল—আজ আপনাকে এক পেয়ালা চা খেতে হবে বাবু···আমি ছাড়বো না। ভালো চা···আমি ওই বাবুদের দোকান থেকে নিয়ে আসছি। ওদের পেয়ালা ভালো, চা ভালো···

সমর মিত্র বুঝিলেন, নগদ পাঁচ টাকার খাতির এখনো কমে নাই! হাসিয়া তিনি বলিলেন—চা খাবো না শান্ত···নেহাৎ কিছু খাওয়াতে চাও, বেশ, এক-প্যাকেট সিগারেট এনে দাও বরং। আমি সিগারেট ফেলে এসেছি।

শান্ত খুশী হইল, বলিল—তাই ভালো···

বলিয়া সে চাহিল বিশুর পানে, বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে বাবুর সঙ্গে কাজের কথা ক'···শুনচিস্? এসে যেন দেখি, বিছানা ছেড়ে উঠেছিস্!

শান্ত চলিয়া গেল। বিশু চাহিল সমর মিত্রের পানে, বলিল—আপনি কাল এসেছিলেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ···

বিশু বলিল—রাত্রেই শান্ত আমাকে বলেছে। বলেছে, আজ সকালে আবার আপনার আসবার কথা আছে! আপনার কি কাজ?

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি মুখ ধুয়ে এসো, চা খাও···বলছি। তাড়াতাড়ির কাজ নয় ভাই···বেশ করে বুঝতে হবে। মানে, কাজটা একটু ঘোরালো রকমের!

বিশু বলিল—আমি তাহলে আসছি···আপনি বসুন···

সমর মিত্র বলিলেন—আমি বসবো বৈ কি! এ কাজটি উদ্ধার করে দিতেই হবে। তোমার নাম শুনে অনেক আশা করে এসেছি, ভাই!···টাকার জন্য ভেবো না। আমাকে তুমি খুশী করো···আমিও তোমাকে খুশী করবো··· বুঝলে!

শিকারের সন্ধান পাইলে হিংস্র পশু যেমন নাচিয়া ওঠে, টাকার গন্ধ পাইয়া বিশুর মন তেমনি মাতিয়া উঠিল!

বিশু বাহিরে গেল···

সমর মিত্র ঘরের চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন···

বাহিরে এমন চিহ্ন নাই, যাহাতে বিশুর গুণপনার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়! তবে এই নোংরা বস্তিতে বাস করিলেও ঘরের ভিতরে যেদিকে চোখ পড়ে, মা-লক্ষ্মীর কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। বিছানার গদি···এমন নরম পুরু গদিতে শয়নের ভাগ্য সমর মিত্রের এ-জীবনে হইবে না! বিছানার চাদর ধপ্ধপ্ করিতেছে। বালিশে ফরসা ঝালরদার ওয়াড়···এমন ওয়াড় বহু শৌখিন-শয্যায় দেখা যায় না। ওধারে ঐ মোটা কাঠের আলমারি···বড় আর্শি···ও-আর্শির দাম আশি-নব্বই টাকার কম নয়। আনলায় যে-শাড়ী ঝুলিতেছে, দেশী-তাঁতের। শান্তর পরনে কাল দেখিয়াছেন কালা-পাড় দেশী শাড়ী। শান্তর দু' হাতে সোনার চুড়ি···সোনার তাগা-বালা···কানে মাকড়ি ···অবস্থা বেশ [illegible]ল।

বিশু ফিরিয়া [illegible]সিল। আসিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া টুল টানিয়া টুলে বসিল। বলিল,—বলুন এবার আপনি কি চান!

সমর মিত্র মনে মনে একটা জোরালো কাহিনী গড়িয়া রাখিয়াছিলেন। চারিদিকে চাহিয়া সতর্ক মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন,—আমি আসছি চেতলা থেকে। মস্ত চালের

আড়তে আমি কাজ করি। মৃত্যুঞ্জয় দাঁ, ধনঞ্জয় দাঁর আড়তের নাম শুনেছো? সেই আড়তের গোমস্তা আমি।

মৃত্যুঞ্জয় দাঁ ধনঞ্জয় দাঁর নাম বিশু শুনিয়াছে। চেতলায় অত বড় চালের আড়ত আর কাহারো নাই! বিশু বলিল—ও, বলুন···

সমর মিত্র দেখিলেন, টোপ্ ধরিয়াছে! তিনি বলিলেন—আমাদের বড় বাবু ধনঞ্জয়বাবু···তাঁর একটি বৈমাত্রের ভাই আছেন···তার নাম জীবঞ্জয়। বড় বাবুর বাপ মারা গেলে এই জীবঞ্জয়কে নিয়ে তাঁর মা অর্থাৎ বড় বাবুর বিমাতা তাঁকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যান। সেই জীবঞ্জয় এখন সাবালক হয়ে আড়তের ভাগ নিতে এসেছে। যার নাম, চোদ্দ বৎসর ধরে যা লাভ হয়েছে, তার বখরা চায়। তাই, মানে···

সমর মিত্র চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিলেন···

বিশু বলিল,—তবে যে শান্ত বলছিল, ইনকাম-ট্যাক্সের খাতা···

সমর মিত্র বলিলেন—মেয়েমানুষের কাছে আসল কথা বলতে পারি না তো ভাই, তাই ঐ কথা বলেছিলুম। আসল কথা, এখন এই চোদ্দ বছরের খাতা পাল্টে লিখতে হবে···লোকসান দেখিয়ে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, যে-সরকার খাতা লিখতো ···মধুসূদন দাস···গেল-বছর দেশে গিয়ে সে মারা গেছে। তার হাতের লেখা নকল করে এ-সব খাতা তৈরী করতে হবে। খাতা তো একটি-দুটি নয় ভাই···খাতার পাহাড় একেবারে! কাঁচা, রোকড়, পাকা···মানে, যেমন দস্তুর! তোমাকে এক হাজার টাকা দেবো ভাই···তা থেকে আমার কমিশন থাকবে দুশো···তুমি নেবে আটশো···"না" বললে চলবে না···এ কাজ তোমাকে করে দিতেই হবে। অনেকখানি আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি···

বিশু নীরবে সব কথা শুনিল।

কথা শেষ করিয়া সমর মিত্র দু'চোখে দারুণ অধীরতা ফুটাইয়া তার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিশুর মুখে কথা নাই!

সমর মিত্র বলিলেন—কত বড় হিসাবের কাজ, বুঝতেই তো পারছো!···তোমার কথা শুনেছি বলেই···

বিশু বলিল—আমার কথা কে বলেছে?

সমর মিত্র বলিলেন—নাম করতে বারণ করেছে···নামটা করবো?

বিশু কহিল—বারণ করেছে?

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ।···

বিশু চুপ করিয়া রহিল; অনেকক্ষণ।

সমর মিত্র বলিলেন—কিগো, আশা মিটবে?

বিশু ফোঁস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর বলিল—কত খাতা, কত লেখা—না দেখে কি করে বলবো?

সমর মিত্র বলিলেন—তা ধরো পঞ্চাশ-ষাটখানা খাতা!

বিশু বলিল—চোদ্দ বছর ধরে ঐ একজনই খাতা লিখেছে?

সমর মিত্র বলিলেন—তাই। মাঝে মাঝে দশ-বারো দিন সে যখন ছুটিতে যেতো, তখন অন্য লোকে কাঁচা খাতা লিখতো···পাকা খাতা কিন্তু সব ঐ মধুর লেখা···

বিশু বলিল—হুঁ···

বাহিরে শান্তর কণ্ঠ শুনা গেল···কাহাকে বলিতেছে,—নিয়ে আয় কেটলি-সুদ্ধ এই ঘরে···

এবং সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দোকানের এক ভৃত্যসহ শান্ত ঘরে প্রবেশ করিল।

লোকটাকে শান্ত বলিল—সিন্দুকের ওপর তোর কেটলি আর বারকোস্ রাখ্, ছিরু···বুঝলি?

ছিরু আদেশ পালন করিল।

পেয়ালা লইয়া সে পেয়ালা ধুইয়া আনিয়া শান্ত তাহাতে চা ঢালিল, তারপর সমর মিত্রের পানে চাহিয়া বলিল—ভালো চা, বাবু···পেয়ালা-কেটলি সব ধুইয়ে মাজিয়ে তবে আমি চা এনেছি···এক পেয়ালা আপনাকে মুখে দিতে হবে বাবু।···ভদ্দর নোক···দয়া করে পায়ের ধুলো দেছেন···আর হ্যাঁ, এই আপনার সিক্রেট···

কথাটা বলিয়া সে এক-প্যাকেট সিগারেট দিল সমর মিত্রের হাতে।

সমর মিত্র প্যাকেট লইলেন, তারপর মৃদু হাস্যে বলিলেন—চা এক-পেয়ালা খেতেই হবে, শান্ত?

কৃতাঞ্জলিপুটে শান্ত কহিল,—আমার বড্ড আহ্লাদ হবে, বাবু···

—বেশ, পেয়ালা দাও···

সমর মিত্র পেয়ালা লইলেন। শান্তকে বলিলেন,—বিশুকে এক পেয়ালা দাও··· ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি···

শান্ত বলিল—সত্যি বাবু। কাল এলো, রাত তখন প্রায় তিনটে হবে···তারপর চান করলে। চান করে কি-বা খাবে···অত রাত্রে মানুষ কি রেঁধে দেবে? বাসি রুটি ছিল···গুড় দিয়ে তাই খেয়ে শুয়ে পড়লো।

বিশুর হাতে শান্ত দিল চায়ের পেয়ালা। বিশু মুখে পেয়ালা তুলিল।

সমর মিত্র চাহিলেন বিশুর দিকে, বলিলেন—কোথায় গেছলে বিশু? অত রাত্রে ফিরলে?

শান্ত বলিল,—বারাসতের কাছে। তা অত রাত্রে ট্রেন নেই তো···

নিরুত্তরে বক্র দৃষ্টিতে বিশু একবার শান্তর পানে চাহিল। অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ সমর মিত্রের চোখে বিশুর সে বক্র দৃষ্টি এড়াইল না! বিশু ভাবিল, এত ভাব হইয়াছে···কোথায় বারাসতের কাছে গিয়াছি, তাও বাহিরের এ-লোকটিকে বলা হইয়াছে!

বিশু বলিল—দেশে গিয়েছিলুম।

সমর মিত্র বলিলেন—দেশ!···বারাসতের কাছে? কোথায় বলো তো? আমার

বাড়ীও যে ঐ বারাসতের কাছে। আমার গাঁয়ের নাম হলো কাসুন্দি। বারাসত থেকে আরো খানিক দূরে।...তোমার কোন্ গাঁয়ে বাড়ী?

বিশু বলিল—আমার গাঁয়ের নাম হলো হবিপুর। সেখানে কেউ নেই...জমি-জমা কিছু আছে...মাঝে মাঝে তাই যেতে হয়।

সমর মিত্র মনে মনে বলিলেন, হবিপুর!...কিন্তু হবিপুরের সঙ্গে আসল-নাম তো মেলে না! মিথ্যা কথা বলিতেছ বাপু!

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে আমাদের উপায় কি হবে বিশু? একবার আসবে আমার সঙ্গে? চেতলা আর কতদূর বা এখান থেকে?

বিশু কি ভাবিল, তারপর বলিল,—এখনি যেতে পারবো না।

—কাল যেতে পারো?

বিশু বলিল—পারি। তবে ওবেলায়...সন্ধ্যার আগে।

সমর মিত্র বলিলেন—সন্ধ্যা হয়ে গেলে কিন্তু...মানে, একটা দিন নষ্ট হবে। এখন গেলে আজই দেখে-শুনে কাজটা শুরু করতে পারতে। পুরোনো খাতা আমরা যোগাড় করেছি বৈঠকখানা রোড থেকে। এখন যদি যেতে পারো বিশু...লক্ষীটি...

বিশু বলিল—না মশাই, এখন হবে না। হাতে এখন কাজ আছে।

বিশুর অলক্ষ্যে সমর মিত্র একবার তার মুখ-চোখের ভাব ভালো রকম লক্ষ্য করিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—আবার সন্ধ্যার দিকে দৌড় করাবে?...আচ্ছা, যদি এক কাজ করো...

—কি কাজ?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার অন্য কাজ আছে বলছো, বেশ, সে-কাজে কোনো বাধা না হয়...তুমি একবার আমার সঙ্গে এসে খাতা দেখে পাকা কথা দাও যদি...দর-দস্তুর ঠিক করে আগাম বায়না দশ-বিশ টাকা বরং নিয়ে আসবে...তারপর কাল থেকে কাজটা ধরবে। কাল থেকে কাজটা নিতে পারবে তো?

বিশু কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল—তা নিতে পারবো। কিন্তু দিনের বেলায় হবে না বাবু। রাত্রে আমি কাজ করবো। রাত ন'টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার যখন সুবিধা হবে, করো। কিন্তু এখন একটিবার না এলে নয়! তোমার কথা না পাওয়া ইস্তক আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।... তারপর যখন আমরা প্রায় এক গাঁয়েরই লোক, তখন এ-দায়ে তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে...

এ কথা বলিয়া নিপুণ অভিনেতার মতো মিনতির ভঙ্গিমায় সমর মিত্র বিশুর দু'হাত চাপিয়া ধরিলেন।

শান্ত বলিল—যা না...সত্যি, বাবু এত করে বলছেন...চেতলা হয়ে তারপর অন্য কাজ যা আছে, করা যায় না?

বিশু বলিল—না রে, তা হয় না। মানে, লোক আসবার কথা আছে...

শান্ত বলিল—লোক আসে, আমি খাতির করে বসিয়ে রাখবো'খন। সত্যিই তো,

চেতলা কতদূর বা! বাবু না হয় ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবেন···আবার সেই ট্যাক্সিতেই ফিরে আসবি!···কাল থেকে বাবু একেবারে হন্তে হয়ে আছেন তোর জন্যে···

কথাটা বলিয়া সহানুভূতির দৃষ্টিতে শান্ত একবার সমর মিত্রের পানে চাহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার হয়ে তুমি একটু বলো শান্ত।

শান্ত কহিল—নে, যা···কতক্ষণ বা···ঘণ্টাখানেক লাগুক···

সমর মিত্র যেন অকূলে কূল পাইলেন, এমনি ভাবে বলিলেন—এই···এই বলো তো···

বিশু বলিল—তাহলেও এখন পারবো না, বাবু···আপনি ঠিকানা দিয়ে যান। বেলা দশটার সময় আমি ঠিক যাবো। দশটার এক মিনিট এদিক-ওদিক হবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—ঠিক তো? দেখো, না হলে মনিব ভারী রাগ করবে আমার উপর। তারা যা হয়ে আছে···নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেছে একেবারে।

বিশু বলিল—যাবো, ঠিক যাবো। আপনি গোটা কতক টাকা রেখে যান বরং গাড়ী-ভাড়ার জন্য···

ব্যাগ খুলিয়া পাঁচ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া সমর মিত্র নোটখানা বিশুর হাতে দিলেন, বলিলেন—বেশ, এই নোটখানা তুমি রাখো···এর বেশী গাড়ী-ভাড়া লাগে, আড়তে গেলে পাবে।

শান্তর দৃষ্টি নোটের দিকে···শান্ত বলিল—নোটখানা আমায় দে···তুই যা লক্ষ্মীছাড়া!

বিশুর হাত হইতে শান্ত নোটখানা এক-রকম কাড়িয়া লইল···

বিশু বলিল—আপনার নাম? সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে হবে তো···

সমর মিত্র বলিলেন—ও, দেখেচো···আমার নামটাই তোমাকে বলা হয় নি! আমার নাম অক্রুর গাঙ্গুলী। মনে থাকবে'খন···অক্রুর দূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আনতে গিয়েছিল বৃন্দাবন থেকে···আমিও তেমনি দূত হয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। মনে থাকবে তো···'অক্রুর-সংবাদ' যাত্রা আছে···যাত্রার সেই অক্রুর! কেমন?

শান্ত বলিল—খুব মনে থাকবে···অক্রুর···যাত্রায় দেখেছি। তবে সে অক্রুরের দাড়ি ছিল—সাদা পাটের বোঝা! আপনি দাড়ি-গোঁফ কামানো অক্রুর···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দাড়ি-গোঁফ কামানো অক্রুর···ঠিক বলেছো তুমি শান্ত! তোমার খুব বুদ্ধি!

বিজয়-গৌরবের হাসি শান্তর চোখে-মুখে বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো বহিয়া গেল।

সমর মিত্র কহিলেন—এখন তোমার ভরসা শান্ত···ওকে ঠিক পাঠিয়ো।

শান্ত বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অক্রুরবাবু···বেলা দশটায় আপনাদের চেতলার আড়তে ওকে ঠিক পাবেন।

—আঃ!···বলিয়া সমর মিত্র আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর বলিলেন—আমি আসি। দুর্গা···দুর্গা···দুর্গা···

হাসিয়া শান্ত বলিল—দুর্গা···দুর্গা···দুর্গা···

বলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া মা-দুর্গার উদ্দেশে সে ভক্তি নিবেদন করিল

পথে আসিয়া গলির মোড়ে সমর মিত্র দেখিলেন, ইমদাদ বিড়িওয়ালা এক জায়গায় বসিয়া গল্পে আসর জমাইয়া দিয়াছে। সকলের অলক্ষ্যে তাকে ইঙ্গিত করিয়া সমর মিত্র সোজা ট্রামরাস্তায় আসিয়া ট্রামে চড়িয়া বসিলেন। ইমদাদ তাঁর ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁর পিছনে আসিয়া সেই ট্রামে উঠিল।

খিদিরপুরের পুল পার হইয়া হেস্টিংসের মাঠের ধারে আসিলে সমর মিত্র ট্রাম হইতে নামিলেন। ইমদাদও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল।

মাঠে দুজনের সাক্ষাৎ।

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি এখনি যাও···যে-বাড়ীতে গিয়েছিলুম, সে বাড়ীর উপর নজর রাখবে। ও-বাড়ীতে অন্য লোক আসবার কথা আছে। কে আসে, তার উপর নজর রেখো। আমি এখনি সাজ বদ্‌লে ওখানে যাবো। তোমার সঙ্গে দেখা হবে···তারপর যা হয়···বুঝলে?

ইমদাদ হুঁশিয়ার জমাদার। ক' বছর এস-বিতে কাজ করিয়া তার কূটবুদ্ধি আরো দশ গুণ বাড়িয়াছে! সমর মিত্রের কথায় তখনি সে একখানা ফির্‌তি-বাসে উঠিয়া বসিল।

সমর মিত্র একখানা ট্যাক্সি লইয়া তাহাতে চড়িয়া গৃহে ফিরিলেন এবং নিমেষে সাজ-পোশাক বদলাইয়া পেশোয়ারী সাজিয়া সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া ব্রজরাজ লেনের মোড়ের কাছে আসিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

ইমদাদের সঙ্গে দেখা। ইমদাদ বলিল, একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও-বাড়ীতে বিশুর কাছে গিয়াছে···এখনো বাহির হয় নাই।

বেলা তখন ন'টা।

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, আমি গেঁদুর হোটেলে বসি। তুমি নজর রাখো।

সমর মিত্র গেঁদুর হোটেলে ঢুকিলেন। বলিলেন—এক গ্লাস শরবত দাও তো···

হোটেলওয়ালা গেঁদু খাতির করিয়া গ্লাস ভরিয়া শরবত দিল। স্ট্র দিয়া এক-ঢোক শরবত গলাধঃকরণ করিয়া সমর মিত্র পথের পানে চাহিয়া রহিলেন···শিকারী যেমন শিকারের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে, তেমনি ভাবে!

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···বিশ মিনিট···আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল···

সমর মিত্র কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কে লোক আসিয়াছে···কার জন্য বিশু বাহির হইতে চায় না!···

তিনি হোটেলের বাহিরে আসিলেন···ইমদাদের পানে নজর পড়িল। ইমদাদ এক নেপালী স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাসি-গল্প জমাইয়া দিয়াছে···এমন যে তাকে দেখিলে সে পুলিসের লোক···এখানে শিকারের জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, বুঝিবার জো নাই!

সমর মিত্র চুপ করিয়া হোটেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন···দৃষ্টি বিশুর বাড়ীর দিকে।

বাড়ী হইতে বিশু বাহির হইল, তার সঙ্গে হ্যাটকোট-পরা একজন বাঙালী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ। দেখিতে সুপুরুষ।

সমর মিত্র কাঠের মূর্তির মতো নিশ্চল নিস্পন্দ...তিনি ইমদাদের পানে চাহিলেন। ইমদাদ তাঁর পানেই চাহিয়া আছে। সমর মিত্র আঙুল নাড়িয়া কি সঙ্কেত করিলেন... ইমদাদ মাথা নাড়িল। এ ইঙ্গিত আর কেহ লক্ষ্য করিল না। লক্ষ্য করিবার হেতু কাহারো ছিল না!

বিশু এবং সেই ভদ্রলোক...কথা কহিতে কহিতে এইদিকেই অগ্রসর হইতেছিল...

তারা কাছে আসিল। বিশুর কথা কাণে গেল। বিশু বলিতেছে—বেলা ঠিক চারটেয়...কেমন?

ভদ্রলোকটি বলিল—হ্যাঁ, প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে লনে।...

বিশু বলিল—বেশ...

দুজনে আগাইয়া চলিল।

বাঘের মতো ইমদাদ যেন ঝাঁপ দিবে! সমর মিত্র অঙ্গুলিসঙ্কেতে নিষেধ জানাইলেন। নিমেষে ইমদাদ অমনি নিস্পন্দ ষ্ট্যাচু!

বিশু এবং ভদ্রলোক গলির মোড় বাঁকিয়া বড় রাস্তায় চলিয়া গেল।

সমর মিত্র আসিলেন ইমদাদের কাছে; মৃদু স্বরে বলিলেন—তুমি বিশুর পিছু নাও ইমদাদ...একা পেলে এ্যারেষ্ট করবে। কোনো কথা নয়। যদি চেঁচামেচি করে, বলো, সেক্সন ফিফ্‌টী ফোর...তারপর সোজা থানায় নিয়ে যাবে। থানায় এসে আমি যা হয় ব্যবস্থা করবো'খন! আমি ঐ সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোকের পিছু নিচ্ছি।

এ-কথা শিরোধার্য করিয়া ইমদাদ বড় রাস্তার দিকে চলিল...সমর মিত্র তার পিছনে চলিলেন।

ট্রাম-রাস্তায় আসিয়া বিশু ট্রামে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে...সে-লোকটি দক্ষিণ-দিকে চলিয়াছে...এমন সময় ইমদাদ গিয়া বিশুর হাত ধরিল।

বিশু বলিল—কে?

ইমদাদ বলিল—পুলিশ...

বিশু বলিল—পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো কালে দোস্তি নেই বাপু যে হাত ধরে টানাটানি করবে!

ইমদাদ বলিল—থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তোমার নামে গ্রেফতারী-পরোয়ানা আছে।

বিশু বলিল—দেখি পরোয়ানা...

ইমদাদ বলিল—থানায় গেলেই দেখতে পাবে।

বিশু বলিল—থানায় আমি যাবো না।

বিশু সবলে ইমদাদের বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াস করিল। ইমদাদ কাঁচা লোক নয়...সজোরে সে বিশুর হাত ধরিয়া টান দিল—এবং বাঁশী বাহির করিয়া সে-বাঁশীতে দিল ফুঁ...

চকিতে কোথা হইতে লাল-পাগড়ী একটা কনষ্টেবল আসিয়া দেখা দিল।

ইমদাদ বলিল—রামরূপ···ই আসামী···পাকড়ো···

রামরূপ-কনষ্টেবল বিশুকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল।

চকিতে ভিড় জমিয়া গেল।

বিশুকে পুলিশের হাতে বন্দী দেখিয়া সমর মিত্র দ্রুত-পায়ে অগ্রসর হইলেন··· সাহেবী-পোষাক ভদ্রলোক ঐ চলিয়াছে···

কে? হাঁটিয়া কোথায় যায়? এমন নির্বিকার ভাব যে পিছনপানে একটিবার ফিরিয়া তাকায় না! বিশু যদি ডাকিয়া সাড়া তোলে? সমর মিত্রের ভয় হইল, তাহা হইলে ও-লোকটি যদি ছুটিয়া পলায়?

কিন্তু বিশুর চারিদিকে তখন খুব ভিড় জমিয়াছে···এদিকে চাহিলেও ও-লোকটি বিশুর অবস্থা চোখে দেখিতে পাইবে না! তাছাড়া বিশুকে সে দেখিয়াছে ট্রামে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে···কাজেই বিশুর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ তার মনে জাগিতে পারে না!

খিদিরপুর ট্রাম-ডিপোর একটু আগে লোকটা মোটরে চড়িয়া বসিল। প্রাইভেট মোটর। জরাজীর্ণ দেহ! মোটরের নম্বর দেখিয়া সমর মিত্র নম্বর মুখস্থ করিয়া লইলেন। বুঝিলেন, লোকটা এইখানে মোটর রাখিয়া এতখানি পথ পায়ে হাঁটিয়া বিশুর ওখানে গিয়াছিল দরবার করিতে!

মোটরে সে একা···ড্রাইভার নাই।

লোকটা পিছনের শীটে বসিল; বসিয়া চারিদিকে চাহিল। সমর মিত্র বুঝিলেন, ড্রাইভার আছে এবং ও সেই ড্রাইভারের খোঁজ করিতেছে!

সমর মিত্র ভাবিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন! এই অবসরে একখানা ট্যাক্সি···

অদূরে খালি ট্যাক্সি মিলিল। ট্যাক্সিতে চড়িয়া সমর মিত্র ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন—ঐ মোটরের পিছনে-পিছনে যেতে হবে···খুব সাবধানে। ও যেন জানতে না পারে!

ইতিমধ্যে ও-গাড়ীর ড্রাইভার আসিয়া পড়িল। চায়ের দোকানে চা খাইতে গিয়াছিল। ড্রাইভার আসিলে ভদ্রলোক তাকে ভৎর্সনা করিল। সে ভৎর্সনা সমর মিত্রের কাণে গেল না। তিনি তখন ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিয়াছেন এবং তাঁর ট্যাক্সি এইদিকে মোড় ঘুরিয়া এ-মোটরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল···প্রায় বিশ-হাত পিছনে।

ড্রাইভার মোটর চালাইল···সমর মিত্রের ট্যাক্সি চলিল মোটরের পিছনে।

একবালপুর লেন দিয়া ডায়মণ্ড হার্বার রোড···এবং সে রোড ধরিয়া মাঝের-হাটের রেলের পুল। রেলের পুল পার হইয়া গাড়ী চলিল বেহালার দিকে। ডগ্‌রেশের গ্রাউণ্ড ছাড়িয়া বেহালা থানা পার হইয়া ব্লাইণ্ড স্কুলের কাছে ডানদিকে এক গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকিল।

গলির মোড়ে সমর মিত্রের ট্যাক্সি আসিয়া পৌঁছিল। সমর মিত্রের মনে চকিত-চিন্তা ···গলির মধ্যে ট্যাক্সি লইয়া প্রবেশ করিবেন? যদি ওর মনে সংশয় জাগে—হঠাৎ এ পথে ট্যাক্সি?

কিন্তু চিন্তা নয়! গলির মধ্যে মোটর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে···যদি চোখের আড়াল হইয়া যায়···কে জানে, হয়তো···তবু···না···

সমর মিত্রের কথায় গলির মধ্যে ট্যাক্সি প্রবেশ করিল···দুদিকে বাগান, মাঠ, পুকুর, দু-চারখানা বাড়ী···

প্রাইভেট-মোটর ঐ চলিয়াছে···ট্যাক্সিও প্রাইভেট-মোটরের চক্রাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিল।

দু-তিনটা মোড় বাঁকিয়া একটা ভাঙ্গা মন্দির। মন্দিরের পর পথ সরু···সে-পথের ডানদিকে শুষ্কপ্রায় পঙ্ক-কর্দ্দমাক্ত একটা পুকুর। পুকুরে দু-চারজন স্ত্রীলোক গা ডুবাইয়া স্নান করিতেছে। পথের অপর দিকে বাগান। বাগানের মধ্যে ঝোপঝাপের আড়ালে একখানি জীর্ণ গৃহ···

লোকটা মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারকে কি বলিল···তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু পরে গাড়ী রাখিয়া ড্রাইভার গাড়ী হইতে নামিল···নামিয়া সরু পথ ধরিয়া মোড় ঘুরিয়া নয়নান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্য-পথে ট্যাক্সি থামাইয়া ট্যাক্সিতে বসিয়া সমর মিত্র এ দৃশ্য দেখিলেন। তারপর নিজের পেশোয়ারী-বেশ খুলিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন—এগুলো গাড়ীতে থাকুক। আমি একজন আসামী ধরতে এসেছি। কথাটা যেন প্রকাশ না পায়! হুঁশিয়ার! কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহলে বলো পোর্ট-কমিশনারের বাবু এসেছে জমির নক্সা নিতে···পোর্ট-কমিশনার এখানে জমি নেবে। বুঝলে?

বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালা···অনুমানে বুঝিল, রহস্য আছে! মাথা নাড়িয়া সে বলিল—বুঝে নিয়েছি বাবু···আপনি ভাববেন না। আবগারী-কেশের অনেক বাবু আমার গাড়ী নিয়ে অনেক-বার···বুঝলেন কি না···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—ও···তুমি তাহলে আমাদের লোক···আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

বাঙালী ভদ্রলোকের বেশে সমর মিত্র আসিয়া সেই বাগানের সামনে দাঁড়াইলেন। চেহারার একটু পরিবর্তন করিলেন···কামানো গোঁফ ঢাকিয়া আধ-পাকা একজোড়া গোঁফ লাগাইয়া মাথার কেশের উপর একটু টাক চড়াইয়া দিলেন। চেহারার যে-পরিবর্তন ঘটিল, সমর মিত্র বলিয়া তাঁকে কেহ চিনিবে, সাধ্য কি!

এখানে লোকজনও কেহ নাই। পুকুরের দিকে চাহিলেন। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিলেন···

তিনি উপরে আসিলে সমর মিত্র তাঁকে প্রশ্ন করিলেন,—এখানে এই বাগান আর বাগানের মধ্যে বাড়ী···এ কার, জানেন?

বৃদ্ধা কহিলেন,—পেসন্ন চক্কত্তির।

সমর মিত্র বলিলেন—এ বাড়ী-বাগান কি ওঁরা বিক্রী করবেন?

বৃদ্ধা কহিলেন,—কে বিক্রী করবে? পেসন্ন চক্কত্তির থাকবার মধ্যে আছে এক

বিধবা মেয়ে। সে মেয়ে পশ্চিমে থাকে। মেয়ের ছেলে সেখানে চাকরি করছে। এখানে তারা আসেনি আজ দশ বচ্ছর!

সমর মিত্র ভাবিলেন, খালি বাড়ী পড়িয়া আছে না কি?

সমর মিত্র বলিলেন—এ বাড়ীতে কে আছে তবে?

বৃদ্ধা কহিলেন—চক্কত্তির দূর-সম্পর্কের এক ভাগনে…বওয়াটে ছোঁড়া। সে মাঝে-মাঝে থাকে। মাঝে মাঝে তার সব লোক-জনও কারা আসে!

আশার মৃদু রশ্মি! সমর মিত্র বলিলেন—মেয়ে-ছেলে কেউ থাকে না বুঝি?

বৃদ্ধা কহিলেন,—না। কিছুদিন আগে ভগীরথ একটা যাত্রার দল এনে ওর মধ্যে পুরেছিল। চক্কত্তির ভাগনের নাম ভগীরথ।

—বটে!…সমর মিত্র বলিলেন—আমি এদিকে একটু জায়গা-জমি খুঁজছি…কিনবো বলে। আমায় একজন দালাল বলেছিল, এই বাড়ী-বাগান বিক্রী আছে। তাই আমি এসেছিলুম।

বৃদ্ধা কহিলেন—জানি না বাবা…চক্কত্তির মেয়ে বামা যদি বেচবার কথা কাকেও বলে থাকে…

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

সমর মিত্র দু-মিনিট দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বাগানে প্রবেশ করিলেন।

খানিকটা ঢুকিয়া দেখেন, ডান-দিকে বিচুলির তাগাড় পড়িয়া আছে…দুটো অস্থি-সার গাভী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া…উর্দ্ধমুখী…দু'চোখ মুদিতপ্রায়…

তিনি আরো অগ্রসর হইলেন। প্লোরের উপর এক-তলা বাড়ী…জীর্ণপ্রায়। সদরে গুল্-বসানো কালো কপাট যেন কালি-ঝুল…সে-কপাটের দেহে ফাট।

কপাটে করাঘাত করিয়া সমর মিত্র ডাকিলেন,—শুনচেন…ও মশায়…বাড়ীতে কে আছেন?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল,—কে?

সমর মিত্র বলিলেন—বাইরে থেকে আসছি…নাম বললে চিনতে পারবেন না। দয়া করে' একবার যদি বাইরে আসেন!

—দাঁড়াও…

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মলিন পৈতা…আদুড় গা…শীর্ণ-দেহ এক ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিল। সমর মিত্রের মুখে দু'চোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কাকে চান?

সমর মিত্র বলিলেন—ভগীরথ বাবুকে।

সে বলিল—আমার নাম ভাগীরথ।

সমর মিত্র বলিলেন—ও…

ভগীরথ বলিল—আমার কাছে কি দরকার?

সমর মিত্র বলিলেন—এদিকে আমি একটু জায়গা-জমি খুঁজছিলুম। একজন দালাল বলেছিল, ভগীরথ বাবু আছেন…তাঁর বাড়ী-বাগান তিনি বিক্রী করবেন।

ভগীরথ বলিল—কে দালাল ?

সমর মিত্র বলিলেন—তার নাম দ্বিজেন। শ্যামবাজারে থাকে।

ভগীরথ ভ্রূকুঞ্চিত করিল। আত্মগতভাবে বলিল—দ্বিজেন! তারপর বলিল—না, চিনি না।

সমর মিত্র বলিলেন—না চিনুন, তাতে ভালো বৈ মন্দ হবে না। মানে, আপনার সঙ্গে direct transaction হলে দালালী-বাবদ আপনার কতকগুলো টাকা বরবাদ হবে না!…তা ভালো কথা, আপনি কি এ বাড়ী-বাগান সত্যি বেচবেন ?

একটা ঢোক গিলিয়া ভগীরথ বলিল—ন্যায্য দাম পেলে বেচবো ঠিক করেছি…

সমর মিত্র শিহরিয়া উঠিলেন! খুব তুখোড় লোক তো! কার সম্পত্তি তুই বেচিতে চলিয়াছিস্ রে!

সমর মিত্র বলিলেন—কেনা-বেচার ব্যাপার…অন্যায় দাম দিতে চাইলে আপনি নেবেন কেন ? মানে, ন্যায্য দাম কত ?

ভগীরথ বলিল—কত দাম আপনি দিতে পারেন ?

সমর মিত্র বলিলেন,—জায়গা-জমি বাড়ী-ঘর না দেখে কি করে বলবো, বলুন ?

ভগীরথ বলিল—তবু আপনার আঁচ…মানে, আপনার দৌড় কদ্দূর, জানলে আমার দাম আমি বলতে পারি।

সমর মিত্র বুঝিলেন, লোকটা শুধু তুখোড় নয়, রাম-তুখোড়!

তিনি বলিলেন—মানে, নেবু-বাগানে আমাদের মস্ত বাড়ী ছিল। আমি আর আমার ছোট ভাই দুজনে ছিলুম মালিক। সে-বাড়ী সম্প্রতি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের গর্ভে গেছে…নগদ টাকা পেয়েছি। আমার শেয়ারে বিশ হাজার টাকা। আমার ইচ্ছা, কলকাতার বুকে আর বাড়ী কিনবো না…এ-অঞ্চল দিনে-দিনে যা হচ্ছে, এখানে খানিকটা বাগান-টাগান-শুদ্ধ বাড়ী তৈরী করে বাস করবো, ভেবেছি। এইজন্যই বেহালার আনাচে-কানাচে আজ দু'মাস ধরে ঘুরে কি খোঁজ না করছি, মশায়! গাড়ী ভাড়াতেই তিন-চারশো টাকা বোধ হয় খরচ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার আঁচ…জায়গা পছন্দ হলে আমি বারো হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।

বারো হাজার! ভগীরথের বুকের মধ্যে যেন ট্যাক্‌শাল্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল।

ভগীরথ বলিল—আমার এ বাড়ী-বাগান…মানে, বিক্রী করবার দরকার কিছু নেই। তবে আমি ভাবছি, বাইরে গিয়ে থাকবো। বনের মধ্যে সঙ্গী-সাবুদ নেই…বন্ধু-বান্ধবরা এতদূরে কেউ আসতে চায় না—এ যেন বনবাসী হয়ে আছি! আপনি পারেন দিতে এ বাড়ীর জন্য পনেরো হাজার টাকা ?

সমর মিত্র বলিলেন—আজ্ঞে, না দেখলে কি করে বলবো ?

—হুঁ…

প্রায় দু মিনিট ধরিয়া ভগীরথ কি ভাবিল ; তারপর বলিল—বেশ, আসুন আমার সঙ্গে…দেখুন…

সমর মিত্র বলিলেন,—যাবো ?

—হ্যাঁ। বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ নেই!

সমর মিত্র কৃতার্থ হইলেন। মোটরে চড়িয়া এইমাত্র যিনি আসিয়াছিলেন, গৃহমধ্যে যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে সুবিধা করিয়া একটু আলাপ-পরিচয়···

সমর মিত্রকে লইয়া ভগীরথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বড় বড় ঘর, দালান, উঠান···এককালে মা-লক্ষ্মী এ গৃহে বাস করিয়াছেন···তাঁর পদচিহ্ন এখনো এ জীর্ণ গৃহে পংখের কাজ-করা দেওয়ালে, পাথরের মেঝেয় সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে!

ঘর-দালান দেখিতে দেখিতে সমর মিত্র আসিলেন মাঝখানের বড় ঘরে। ঘরের দুধারে দুখানা তক্তাপোষ। তক্তাপোষে মলিন শয্যা···দড়ির আনলা···আনলার গায়ে কোট আর টাই ঝুলিতেছে—পেরেকের গায়ে একটা সোলা হ্যাট···

বুঝিলেন, এ সেই সাহেবের! বলিলেন—এ সব কার?

ভগীরথ বলিল—ও আমার এক বন্ধু এসেছে একটু আগে···চুণী দত্ত···তার। সে নাইতে গেছে···

পুলিশের কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকিলেও সমর মিত্রের মনে কল্পনা এখনো নানা সুরে বাঁশী বাজায়! সমর মিত্র ভাবিতেছিলেন, অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হয়তো এ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন ডায়মণ্ড-হার্বারের মহেশ্বর বাবুর কন্যা প্রতিমা···সাশ্রুনয়নে ভূলুণ্ঠিতা রহিয়াছে!

কিন্তু সে লক্ষণ দেখা গেল না বলিয়া তাঁর মনে বেদনা জাগিল। ভাবিলেন, মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া এতখানি সময় নষ্ট না করিয়া যদি ওয়াটগঞ্জ থানায় যাইতাম! বিশুকে খোঁচা দিলে এতক্ষণে হয়তো অনেক কথা জানিতে পারিতাম!

কাপ্তেনী চাল্

কথা কহিতে কহিতে সে ভদ্রলোক স্নান সারিয়া ঘরে আসিলেন। পরণে লুঙ্গি, গায়ে সামার-কুল গেঞ্জির উপরে লম্বা তোয়ালে জড়ানো।

ভদ্রলোক আসিলে ভগীরথ বলিল—ইনি এই বাড়ী-বাগান কিনবেন বলে দেখতে এসেছেন, চুণী।

এ ভদ্রলোকের নাম চুণী! চুণী দত্ত?

চেহারা দেখিয়া সমর মিত্র চিনিলেন, ইনিই সেই বিশুর বাড়ী-ফেরত সাহাব!

তোয়ালের খুঁটে কাণের জল মুছিতে মুছিতে চুণী বলিল,—ও···বাড়ী পছন্দ হলো?

ভগীরথ চাহিল সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র বলিলেন—যতক্ষণ দামের হদিশ না পাচ্ছি, ততক্ষণ কি করে বলবো?

চুণী বলিল—তুমি কত দাম চাও, ভগীরথ?

ভগীরথ বলিল—কত হলে দেওয়া যায়? এ সব জায়গা একদিন বটে বাঁশবন ছিল! কিন্তু এখন কি ভিড় জমছে, দেখছো তো!

চুণী বলিল—কতখানি জমি আছে?

ভগীরথ বলিল—তা, দেড় বিঘেটাক হবে!

চুণী বলিল—কাঠা এখানে কত করে? সাত-আটশো?

ভগীরথ বলিল—গলির মধ্যে সেদিন একটা ছোট জমি বিক্রী হয়ে গেছে···পাঁচশো করে কাঠা!

চুণী বলিল—পাঁচশো করে ধরলে দেড়-বিঘের দাম হবে পাঁচশো ইন্‌টু ত্রিশ অর্থাৎ পনেরো-হাজার! তার উপর বাড়ীর দাম···

সমর মিত্র বলিলেন—বাড়ীতে কিছু নেই! ইট-কাঠ গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিনলে এ-সব ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে' নতুন বনেদ তুলে আমাকে গড়তে হবে!

চুণী বলিল—পনেরো হাজার হলে ছাড়া যায়...কি বলো ভগীরথ?

সমর মিত্র বলিলেন—মেরে-কেটে আমি বারো হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। বললুম তো ভগীরথ বাবু, আমার যা পুঁজি···

ভগীরথ বলিল—বারো হাজারে হয় না মশায়। দালাল-টালাল নেই···নেট পনেরো হাজার পেলে আমি ছাড়তে পারি।

সমর মিত্র বলিলেন—পনেরো হাজার দিতে পারবো না! বারো হাজারে যদি রাজী হন, কাল ভালো দিন আছে···আমি বায়না করতে প্রস্তুত।

ভগীরথ চাহিল চুণীর পানে···চুণী বলিল—বেশ, কাল আপনি আসবেন। আমরা ইতিমধ্যে পরামর্শ করে দেখি।

সমর মিত্র বলিলেন,—কাল কখন্ আসবো, বলুন?

ভগীরথ বলিল—এমনি সময়ে···

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা।

দড়ির আনলায় তোয়ালে রাখিয়া চুণী বলিল—অন্নের কি ব্যবস্থা করলে ভগীরথ? বেলা বারোটায় বেরুতে হবে···অনেক কাজ আছে।···বাড়ীতে বসে জিরুলে চলবে না···

ভগীরথ বলিল—হুঁ। ময়নাকে বলে এসেছি। সে ঠিক দশটায় ভাত নিয়ে আসবে···তোমার-আমার।

চুণী বলিল—ময়না এখনো তোমায় মেনে চলছে? কথার শেষে চুণীর অধরে বক্র হাসির রেখা।

ভগীরথ বলিল—হুঁ···

চুণী তক্তাপোষে বসিল; বসিয়া টিন হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইল।

সমর মিত্র দেখিলেন, এখানকার কাজ শেষ···কোনো ছলে অপেক্ষা করা চলে না! শুনিলেন, বারোটায় চুণীর কি কাজ আছে—সে বাহির হইবে। বারোটা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করা সহজ নয়! তার উপর তাঁকে যাইতে হইবে ওয়াটগঞ্জ থানায়···তারপর ডায়মণ্ড হার্বার! তাছাড়া ঠিক করিয়াছিলেন, বৃকোদর এটর্ণির অফিসে গিয়া একবার উদয় হইবেন! কান্তি সাজিয়া কে আসিয়া এ-অভিসন্ধির

মূলে দাঁড়াইয়াছে···মনে আশার বিদ্যুৎ-চমক! তারপর এখানকার কার্য-কলাপ যা দেখিতেছেন···পরের সম্পত্তি ভগীরথ নিজের বলিয়া পদ্মা-পারে চালান দিবার জন্য যেরূপ নির্ভীক চিত্তে প্রস্তুত···এ-কাজে এ দলটির নৈপুণ্য নিশ্চয় অসাধারণ-রকমের!

এখন কি করা যায়? তিনি যেন চিন্তার সমুদ্রে পড়িলেন···

চুণী বলিল—কাল সকালে আপনি তাহলে আসবেন।···হ্যাঁ, আপনার নাম?

সমর মিত্র বলিলেন—আমার নাম প্রবোধ রায়।

—কোথায় থাকেন?

সমর বলিলেন—চাঁপাতলা।

—ও···আচ্ছা, আপনি তাহলে আসুন।

এ কথার পর আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। চলিয়া আসা ভিন্ন উপায় নাই! সমর মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন।

মনে চিন্তার রাশি যেন মাকড়সার জাল বুনিতেছে! কোন্ দিকে যাইবেন? ওদিকে ডায়মণ্ড হার্বার···এখানে বেহালায় চুণী এবং ভগীরথ সমরায়োজন করিতেছে—তারপর ওয়াটগঞ্জ থানায় বন্দী বিশু···আবার এটর্ণি-পাড়ায় এটর্ণি বৃকোদর মল্লিক! মনে হইল, এক-মুহূর্তে পৃথিবী যেন ফাঁশিয়া গিয়াছে···এবং তার সে-ফাটল বহিয়া অজস্র ফন্দী-অভিসন্ধি একরাশ সাপের মতো ফণা তুলিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে!···কোন্ দিক তিনি সামলাইবেন?

দীপুর কথা মনে পড়িল। বেহালা-থানা হইতে দীপুকে ফোন্ করিবেন? দীপু তাঁর সাকরেদ···শিষ্য···অনুগত। ঠিক! দীপুকে ডাকা যাক!

সমর মিত্র গলির মোড়ে আসিয়া ট্যাক্সিতে চড়িলেন। সেখান হইতে আসিলেন বেহালা-থানায়।

পরিচয় দিয়া টেলিফোন-রিসিভার ধরিয়া তিনি ডাকিলেন দীপুকে।

দীপু গৃহে ছিল। রিসিভার ধরিল, কহিল—হ্যালো···

সমর মিত্র তাকে বলিলেন—আমি সমর মিত্তির। বেহালা-থানা থেকে তোমাকে ফোন্ করছি। এখনি একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে এসো। সোজা বেহালা থানায় এসো। আসবার সময় আমার বাড়ী থেকে কালো রঙের ব্যাগটা নিয়ে এসো, তার মধ্যে কতকগুলো মেক-আপের সরঞ্জাম পোরা আছে। চট্ করে এসো···

দীপু কহিল—পাঁচ-মিনিটের মধ্যে আমি ষ্টার্ট করছি···

রিসিভার রাখিয়া সমর মিত্র থানার বাহিরে আসিলেন। অফিসার নন্দিকেশ্বর বলিল—আমাকে দরকার আছে?

সমর মিত্র বলিলেন—আপাততঃ নয়। এখন সবে বইয়ের পাতা খুলছি···গোড়ার উপক্রমণিকা! আরো দু' তিন চ্যাপটার না এগুলে ঠিক বুঝতে পারছি না!

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র আবার আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিলেন, বলিলেন—চালাও ওয়াটগঞ্জ-থানা।

ওয়াটগঞ্জ-থানায় আসিয়া দেখেন বিশু থানার অফিস-ঘরে বসিয়া আছে···মুখে কথা নাই···স্তম্ভিত মূর্তি !

সমর মিত্রকে দেখিয়া বিশু বলিল—বড় বাবু ! থানায় কি মনে করে ?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার নাম ?

বিশু বলিল—কোন্ নাম চান ?

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমায় তো চিনতে পারছি না···

বিশু বলিল,—চেনবার কথা নয়। আপনি কারবার করেছিলেন আমার গুরুর সঙ্গে। ভোঁদা···মনে পড়ছে না ? গফুর ? হরকুমার ? তার অনেক নাম ! সেবারে আমি হাত ফসকে গিয়েছিলুম !

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে সমর মিত্র বলিলেন,—গফুর !···ভোঁদা !···না বাপু, মনে পড়ছে না।

বিশু বলিল—মনে না পড়ে, বহুৎ আচ্ছা !···মোদ্দা আমাকে এঁরা কেন এনেছেন, বুঝতে পারছি না। সুনীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, যেজন্য এনেছি, বুঝবে লালবাজার থেকে তোমার বিধাতা এলে ! কে সে বিধাতা, এতক্ষণ ভেবে ঠাওরাতে পারছিলুম না !

এ কথাগুলা সমর মিত্রের কাণে গেল না। তিনি ভোঁদার কথা ভাবিতেছিলেন ! ভোঁদা ? কৈ, না, মনে পড়িতেছে না। একটা অস্বস্তি বোধ করিলেন। বিশু বলিল, ভোঁদা তার গুরু ! কে ? কে ভোঁদা ?

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—তুমি যে বললে ভোঁদা···আরো কিছু বলো দিকিনি··· কোন্ কেশে কবে তার সঙ্গে আমার কারবার হয়েছিল ?

বিশু বলিল—না বাবু, আর নয় ! বেফাঁশে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে ! কে জানে, সে-নাম চিনলে তার খেই টেনে আমাকেও শেষে কি ফ্যাশাদে জড়াবেন ! আপনাদের সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি !

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি তো শেষ জেল থেকে বেরিয়েছো···বোধ হয় ছ'মাস ! না ? দাঁড়াও···কি নাম ছিল তোমার ? দীননাথ ! না, দয়ারাম !···হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই তো লালগোপাল ! এবারে বিশু-নাম নিয়েছো !

বিশুর মুখের উপর যেন চাবুক পড়িল···তার মুখ তেমনি বিবর্ণ ! বিশু কোনো কথা বলিল না ; অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সমর মিত্র ডাকিলেন—দরোয়াজা···

একজন কনষ্টেবল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

সমর মিত্র বলিলেন—সুনীল আছে ?

কনষ্টেবল বলিল—এনকোয়ারিতে বেরিয়েছেন···

বিশু বলিল—সত্যি বাবু, আমি কোনো কিছু করিনি···মিছিমিছি আমায় টানাটানি করেন কেন ?

সমর মিত্র বলিল—উপায় নেই বাবু ! তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক যা দাঁড়িয়েছে,

অহি-নকুলের !···আচ্ছা বিশু, একটা কথা বলবে? সত্যি কথা? তাহলে তোমার উপর যাতে উপদ্রব না হয়, আমি সে-চেষ্টা করবো।

বিশু বলিল—বলুন বাবু···যদি জানি, কেন বলবো না?

—হুঁ! এমন সুমতি হয়েছে! বেশ! বলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ভগীরথকে চেনো? বেহালার ভগীরথ?

বিশু চমকাইয়া উঠিল! সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন,—বলো···

বিশু বলিল—কেন বলুন তো?

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ, তাহলে আর একটু বলি, শোনো। তার নামে কেশ হয়েছে। বেহালায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে, বাগান আছে···সে-আত্মীয়রা থাকেন পশ্চিমে। ভগীরথ সেই বাড়ী-বাগানের মালিক বলে একজনকে তা বেচতে চলেছে···বায়নার জন্য টাকা নেছে পাঁচশো!···যাকে ঠকিয়েছে, লালবাজারে সে নালিশ করেছে। ভগীরথ একা শুধু আসামী নয়, তার দোশর আছে···দোশরের নাম চুণী দত্ত!

বিশু কোনো জবাব দিল না···কাঠের পুতুলের মতো স্তম্ভিত নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—বলো···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিশু বলিল—না হুজুর, আমি ওদের কাকেও চিনি না···

সমর মিত্র বলিলেন—চেনো না! অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলছো!···আর কেউ যদি সাক্ষী দিয়ে থাকে যে ঐ চুণী দত্ত আর ভগীরথ তোমার কাছে হামেশা যাওয়া-আসা করে?

বিশু চুপ করিয়া রহিল···দু'চোখের অবিচল দৃষ্টি সমর মিত্রের মুখে নিবদ্ধ! যেন সমর মিত্রের মুখে আর-কাহার মুখের প্রতিবিম্ব সে প্রতিফলিত দেখিতেছে!

থানার রাইটার আসিল···তার হাতে কালি এবং আঙুলের ছাপ লইবার কাগজ। বলিল—এনেছি স্যর···

সমর মিত্র বলিলেন,—ওর দশ আঙুলের ছাপ নাও, নিয়ে আমায় দাও···আমি এখনি লালবাজারে যাবো···হ্যাঁ, একে হাজতে রাখবে। সুনীল বাবু এলে তাঁকে বলো, এখন জামিন দেবেন না। তারপর তিনি চাহিলেন বিশুর পানে। চাহিয়া বলিলেন—তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া গেছে···ঐ ভগীরথ আর চুণীর সঙ্গে মিশে বেহালার বাড়ী-বাগান বেচার ব্যাপারে তোমারও যোগাযোগ আছে। তাই তুমি গ্রেফ্‌তার হয়েছো···বুঝলে?

বিশু কোনো কথা বলিল না।

তার দশ আঙুলের টিপ লইয়া সমর মিত্র থানা হইতে বাহির হইয়া বেহালার পথে ফিরিলেন। ফিরিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন,—ঐ গলির মোড়ে তুমি গাড়ী রাখো। ও গাড়ী আসছে দেখলে তখনি থানায় খপর দেবে—বুঝলে?

দীপু অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমর মিত্র দীপুর হাত হইতে ব্যাগ লইয়া নন্দিকেশ্বর বাবুর অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—ভোল বদলে নি···

দীপু বলিল—কি সাজে সাজবেন?

সমর মিত্র বলিলেন—আগে সাজি, তারপর দেখো!

পাঁচ মিনিট পরে মাড়োয়ারি সাজিয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন। হাসিয়া দীপুকে বলিলেন,—আমার নাম হাজারিমল্ আগরওলা···

দীপু বলিল—হাজারিমল বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

সমর মিত্র বলিলেন—আমি ফিল্ম-কোম্পানির মালিক। তুমি আমার প্রোডাকশন-ম্যানেজার।

দীপু বলিল—তারপর?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার ট্যাক্সি নিয়ে এসো তো আমার সঙ্গে···মাথায় একটা আইডিয়া জেগেছে।

দুজনে সোজা গলির মধ্যে আসিলেন। অদূরে তাঁর সেই ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে···

দীপুর ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া সমর মিত্র দীপুকে লইয়া ভগীরথের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

সেই ফটক···

সমর মিত্রের শিক্ষায় বাহির হইতে দীপু ডাকিল—ভগীরথ বাবু আছেন?

দ্বার খুলিয়া ভগীরথ বাহিরে আসিল। বলিল—কি চাই?

দীপু বলিল—ইনি হাজারিমল আগরওলা···জাইগান্টিক ফিল্ম-কোম্পানি করেছেন। নতুন ছবি তোলা হবে···আপনি একজন ভালো এ্যাক্টর···শুনেছি, মেক-আপে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা···তাই আপনার কাছে আসা···

ভগীরথ বলিল—এখন কথা কবার সময় হবে না···বেরুচ্ছি। এটর্নি-পাড়ায় যেতে হবে···

মাড়োয়ারি-ঢঙের বাঙলায় সমর মিত্র বলিলেন—এটার্নি-পাড়া! ও হামিও সেখানে যাচ্ছে বাবুসাব! এটার্নি বৃকোদরবাবু···উন্‌হার আপিস। আপুনি কোন্ এটার্নি-বাবুর আপিসে চলিয়েছেন?

ভগীরথ বলিল—বৃকোদর বাবু? আমি তাঁকে চিনি···

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে তেনার ওখানে যদি আপনার কাম সেরে আসেন। দিনটা আজ ভালো আছে বাবু-সাব···আপনার যা দাম, তা হামি ঠিক দেবে···হামার দিল্ আছে···দুশরা ফিল্মওলার মাফিক হামি কঞ্জুষ নহি···

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র হাসিলেন।

ভগীরথ সমস্যায় পড়িল। মাছ আসিয়া ঘাই দিতেছে···ছাড়িয়া দিবে?···কিন্তু ওদিকে···

ভগীরথ বলিল—বেশ, বেলা দুটোয় সময় আপনারা বৃকোদর বাবুর অফিসে আসবেন। আমিও কাজ সেরে বেলা দুটোয় সেখানে যাবো···

সমর মিত্র বলিলেন—ঠিক বাত?

ভগীরথ বলিল—ঠিক বাত···

সমর মিত্র বলিলেন,—রাম রাম বাবু···(দীপুকে বলিলেন),—আইয়ে ম্যানেজার বাবু·· এখোন্ তোমাকে ঐ বিল্লী বিবির কাছে যাতি হোবে···ও-আর্টিষ্টের উপর বজরঙ্গির ভারী ঝোঁক! বিল্লী বিবি তো পান্‌শো রুপি তলব মাংছে···একশো টাকার জন্য আর টানাটানি কোরে কি হোবে? বিল্লীকে ফিক্স করিয়ে লিন···

এ কথার পর সমর মিত্র আর এক-নিমেষ দাঁড়াইলেন না···দীপুকে লইয়া ফিরিলেন।

ফিরিলেম ট্যাক্সিতে। বেহালা থানায় ভোল বদলাইয়া বলিলেন,—ছুটি খেয়ে নিয়ে স্যুট পরে' বৃকোদর মল্লিকের অফিসে কোনো ছলে গিয়ে অধিষ্ঠিত থাকবো। বেলা ছটোয় তুমি বৃকোদরের অফিসে হাজির হবে। যা বলবে যা করবে, শিখিয়ে দেবো।

দীপু বলিল—মহাযুদ্ধের আয়োজন করছেন!

সমর মিত্র বলিলেন—সেই ফণীবাবুর খুনের তদারকীতে বেরিয়ে যে ঘটনা-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি—ওঃ, সত্যি দীপু, শুনলে তোমার তাক্ লাগবে! এর কাছে কেথায় লাগে তোমার ওল্ডম্যান্ বেদব্যাসের অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত!

স্যুট পরিয়া বিলাত-ফেরত-বেশে সমর মিত্র যখন বৃকোদর মল্লিকের অফিসে আসিলেন, বেলা তখন সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

একখানি কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। কার্ডে ইংরাজীতে লেখা ছিল,

এন, ডাট্ জেমিন্দার

কার্ড পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে হইল না। তখনি বৃকোদরের খাশ-কামরায় ডাক পড়িল।

খাশ-কামরায় বিরাট দেহে বৃকোদর মল্লিক বসিয়া আছেন—আশে-পাশে আরো পাঁচ সাতজন লোক। সমর মিত্র দেখেন, তাদের মধ্যে বেহালার সেই ছই বন্ধু চুণী দত্ত এবং ভগীরথ বিরাজ করিতেছে। বাকী লোকগুলার বিমলিন দীন-মূর্তি···দেখিলে রোঁয়া-ওঠা শালিক বলিয়া ভ্রম হয়! যেমন জীবকে এটর্ণি-পাড়ার ছ'চারিটা বিশেষ অফিসে কার্ণিশের পায়রার মতো সারাক্ষণ হাজির দেখা যায়, তেমনি ইহাদের মূর্তি! সমর মিত্র বুঝিলেন, এই লোকগুলাই এ-পাড়ার ঘুঘু!

কামরায় প্রবেশমাত্র একটা কথা সমর মিত্রের কাণে প্রবেশ করিল···চুণী দত্তর কথা। চুণী বলিতেছিল—বাড়ীখানার 'পজেশন' সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করুন—চট্‌পট্ ···গহনা-গাঁটিও আছে···অনেক টাকা দামের···তিন-চার পুরুষের গহনা···একেলে বাজে মাল নয়, মশায়!

সমর মিত্রের প্রবেশ-হেতু বৃকোদরের উত্তর দিবার অবকাশ মিলিল না।

সমর মিত্রকে খাতির করিয়া বসাইয়া বৃকোদর বলিলেন—কোথা থেকে আসছেন?

সময় মিত্র আড়-আড়-কণ্ঠে ইংরেজীতে বলিলেন—কলকাতা সহর থেকেই আসছি···

—কি কাজ ?

—একটু দরকারে আসতে হয়েছে।···মানে, কিছু টাকা চাই···পরশুর মধ্যে।

—কত টাকা ?

—পাঁচ হাজার। সুদ যা চান···

—সিকিউরিটি ?

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—আড়ালে বলতে চাই···

বৃকোদর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের পানে চাহিলেন, বলিলেন,—ভগীরথ, চুণী···তোমরা পাশের অফিস-কামরায় যাবে একটু ?

বিনা-বাক্যে সকলে চলিয়া গেল।

সমর মিত্র তখন বৃকোদরের গা ঘেঁষিয়া বলিলেন, বসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—মধুবাণীর নাম জানেন নিশ্চয় ? হুগলি জেলার মধুবাণী ? আমার বাবা নরসিং দত্ত হলেন সেখানকার জমিদার। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। বেজায় কঞ্জুস ! অথর্ব হয়ে পড়েছেন তবু একটি পয়সা তাঁর হাত দিয়ে গলে না···আমার নাম নেপেন দত্ত। কাজেই কার্ডে এন, ডাট ঠিক আছে···

এই পর্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র হাসিলেন।

বৃকোদর সাগ্রহে এ কাহিনী শুনিতেছিল ; শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—তার পর ?

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—তারপর বলতে ডেলিকেসি হচ্ছে···কিন্তু দেখুন, উকিল-এটর্ণির কাছে অকপটে সব কথা বলা উচিত। মনের মধ্যে আসল কথা পুষে রেখে লাভ নেই। মানে, বিশুকে জানেন তো ? খিদিরপুরের বিশু···লালগোপাল। তার অনেক নাম আছে মশায় ! তার মারফৎ দুচারবার এমন কাজ করেছি···আপনার নাম করে সে আমায় বলেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে। তাও আজ নয়, মাসখানেক আগে বলেছে। নিরুপায় হয়ে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়ে আজ আমি মশায়ের শরণ নিচ্ছি···

কথা শেষ করিয়া সমর মিত্র বিনয়ের ভারে একেবারে অবনত হইলেন।

বৃকোদর বলিল—বলুন···আমার কাছে মনের কপাট খুলে সব কথা বলুন দেখি, যদি আপনার উপকার করতে পারি !

সমর মিত্র বলিলেন—বাবার ব্লাডপ্রেশার—কখন কি হবে, কিছু ঠিক নেই ! তা ছাড়া আমার নাম-সই আর বাবার নাম-সই···হুবহু এক ! বাবার কত চেক আমি সই করে টাকা নিয়েছি, তার হিসেব নেই। মানে, কি জানেন, আমি চাই আপ-টু-ডেট হয়ে বাঁচতে। বাবা বলেন, টাকা খরচ করিস্ নে ! হুঁঃ, এ বয়সে যদি আমোদ-আহ্লাদ না করলুম, তাহলে বয়সটার অপমান···আর টাকা রয়েছে যখন ! জানেন বৃকোদর বাবু, বাবার সিন্দুক খুলুন, দেখবেন, নগদ বিশ

হাজার টাকার নোট সাজানো রয়েছে···থরে-থরে। তার উপর তিন-চারটে ব্যাঙ্ক!

ভূমিকায় এত টাকার বিবরণ···বৃকোদরের বুকের মধ্যে যেন কারেন্সির ঝন্‌ঝনি জাগিয়া উঠিল! বৃকোদর বলিল—কি বল্‌তে চান, বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, বাবার নাম সই করে এ টাকাটা আমি নিতে চাই··· ব্যাকডেট দিতে বলেন, তাতেও রজী। মানে, সই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করবেন না। বলেন, বাবা কলকাতাতেই আছেন···তাঁর শ্রীহস্তের সই দেখতে চান, সে বন্দোবস্তও আমি করতে পারি!

বৃকোদর একেবারে থ! অফিস খুলিয়া বহু কাপ্তেন লইয়া কাজ করিয়াছে। কিন্তু এমন দিল্‌দার বুদ্ধিমান কাপ্তেন কখনো দেখে নাই! বৃকোদরের দুই চক্ষু পদ্মপলাশের মতো বিস্ফারিত হইল; এবং সেই বিস্ফারিত নেত্রে সে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—অফিসের ফেরত আজ আসুন একবার আমাদের বাড়ী··· বাবার সঙ্গে এমন বিজনেশ-কথা লাগিয়ে দেবো। হুঁঃ! আপনি বলবেন, লিটল্‌ রাশেল ষ্ট্রীটে যে-বাড়ী আছে, তার জন্য ভালো ভাড়াটে ঠিক করেছেন—মস্ত বড় সাহেব-অফিসার। বলবেন, আপনাকে অথরিটি লিখে দিতে। তখনি তিনি নিজের হাতে লিখে অথরিটি সই করে দেবেন। আপনি পরে ডিক্‌টেশন দিয়ে আমায় দিয়ে তা লেখাবেন, লিখে সই করবে···দেখবেন, সইয়ের প্রত্যেকটি অক্ষর···টান্‌টোন বিলকুল এক! সাদা চোখে বিশ্বাস না হয়, ম্যাগনিফাইং-গ্লাশ চোখে দিয়ে লেখা মিলিয়ে নেবেন! অর্থাৎ কি জানেন মশায়, কঞ্জুষ পয়সাওলা বাপ যদি তোষাখানার চাবি বগল-দাবা করে রাখেন, তাহলে সে বাপের নিরুপায় সন্তানকে কশরৎ করে' এ বিদ্যা শিখতে হয়। আমিও শিখেছি। বিদ্যা যা শিখেছি, এর জন্য প্রেমচাঁদী-ব্যবস্থা থাকলে আমি পি-আর-এস হতুম!

ভারী অদ্ভুত লোক তো! রত্ন! বৃকোদরের বিস্ময় পৃথিবী ছাড়িয়া এরোপ্লেনের মতো ঘর্ঘর রবে যেন আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল,···সে বিস্ময়কে পৃথিবী যেন আপন-বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারে না!

সমর মিত্র বলিলেন—কি বলেন? পাঁচ হাজার লিখিয়ে আমায় দেবেন তিন হাজার! ব্যস, তাতেই আমার চলে যাবে। Word of honour, বুঝলেন মশায়··· এথেল ডেভিশ্‌···নার্শের কাজ করে···বেচারী দেখতে একেবারে এঞ্জেল! তার এক ছিটে হাসির দাম পাঁচশো টাকা! সে দু'মাসের ছুটী নিচ্ছে। তাকে কথা দিয়েছি, প্লেনে করে' তাকে নিয়ে বর্মা ঘুরে আসবো। এ-কথা না রাখতে পারলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আপনি যদি এথেলকে দেখেন, ইউ উইল সিম্পলি এ্যাডোর হার। কি বলেন? পারবেন আমায় সাহায্য করতে? একবার আপনার সঙ্গে যদি সম্পর্ক হয়, জানবেন, মধুবাণী-এষ্টেট আপনার। I shall be a slave to you··· life-long slave. (আমি সারা-জীবন আপনার দাসানুদাস হইয়া থাকিব)।

বৃকোদর যে কি জবাব দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। জানা নাই, চেনা নাই, লোকটা আসিয়া অদ্ভুত আবদার করিয়াছে! আশ্চর্য! যা-তা কাজ নয়··· টাকা দিতে হইবে···নগদ টাকা! টাকা দিবার আগে খোঁজ-খপর লইব না? ভূমি-শূন্য রাজা? না, কি?

মন বলিল, কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছ না বাপু, পাকা বনিয়াদী-ঘরের ছেলে। নহিলে টাকার কথা এমন অকুতোভয়ে এমন অকুণ্ঠিত চিত্তে কেহ বলিতে পারে? হতভাগা-ঘরের কাহারো এমন কথা বলিবার সাহস কখনো এ পাড়ায় হয়? এত কাল মানুষ চরাইয়া খাইতেছ···এখনো মানুষ দেখিলে হাঁ করিয়া থাকিবে? মানুষ দেখিয়া তার দাম বুঝিতে পারিবে না?

সমস্যা!

বৃকোদরকে নিরুত্তর দেখিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—হবে না? তাহলে উঠি মশায়···

সমর মিত্র উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

বৃকোদরের মনে হইল, তার প্রাণটাও বুঝি বুকের মধ্য হইতে এই নেপেন দত্তর সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবে! বৃকোদর বলিল—বসুন···ড্রিঙ্ক আনাবো?

সমর মিত্র বলিলেন—না মশায়, এথেলকে কথা দিয়েছি, দিনের বেলায় নো লিকর অফ এনি কাইণ্ড (কোনো রকম সুরাস্পর্শ করিব না)!

বৃকোদর মনে মনে বলিল, ইস, অসাধারণ নিষ্ঠা!···ভাগ্যে তোমরা আছো, নহিলে এই সব এথেলের মতো সুর-রঙ্গিণীরা কি যে করিত!

সমর মিত্র বলিলেন—ও সব আদর-অভ্যর্থনা পরে করবেন মশায়। এখন যা বললুম···আপনি বুঝছেন না, মাতৃদায় কন্যাদায়ের চেয়ে এথেলের দায় আমার কত বড়!

বৃকোদর বলিল—টাকা কেন দেবো না? টাকা দেবো, তবে satisfactionএর জন্য আপনি যা বলছেন, আপনার ওখানে গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে ঐ লীজের কথা তোলা···আজ হবে না। কাল বিকেলে···তারপর কালই সন্ধ্যার সময় টাকা নেবেন! মানে, কি জানেন, মক্কেলের এত বিশ্বাস আমার উপর···শুধু দেখে নেওয়া···মানে, আমার একটা professional duty আছে তো!

সমর মিত্র বলিলেন—নিশ্চয় আছে। সে-ডিউটি না করলে আমিই বা আপনাকে পরে আমার কাজের বেলায় বিশ্বাস করবো কেন? কথা তাহলে পাকা···কেমন? আমি আর কোথাও যাবো না?

সোৎসাহে বৃকোদর বলিল—নেভার!···কিন্তু এখনি যাবেন না মিষ্টার ডাট্···বসুন, লিকর নয়, কোল্ড-ড্রিঙ্ক খান্। না হয় চা? কফি?

সমর মিত্র বলিলেন,—নিশ্চয় খাবো। আপনার এ কথাটুকু যদি না রাখি, তাহলে যে খুব বেশী রকম ungratefulness (অকৃতজ্ঞতা) হবে। করুন আপনি ফরমাশ···চা-কফি নয়, কোল্ড-ড্রিঙ্ক। সত্যি বৃকোদর বাবু, গলা শুকিয়ে যেন

কাঠ হয়ে আছে! কত বড় দুর্ভাবনা···বলুন তো···my poor Ethel···আমার উপর কতখানি আশা করে আছে! কিন্তু নাঃ, ওঁদের আপনি এ-ঘর থেকে তাড়ালেন! ওঁদের ডাকুন···ওঁদের সঙ্গে দু-চারটে কথা কই···মনটা কতখানি হাল্কা হলো···ওঃ!

বৃকোদরের আহ্বানে চুণী দত্ত আসিল, ভগীরথ আসিল, বুড়ো-সালিকের দল আসিল। বৃকোদর পরিচয় করাইয়া দিল—মধুবাণীর জমিদার মিষ্টার নেপেন ডাট্—মস্ত বোনেদী বংশ···বুঝলে চুণী!

চুণীর দুচোখে শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস···

বেয়ারাকে বৃকোদর বলিল—কোল্ড-ড্রিঙ্ক···ঐ সলোমনের দোকান থেকে আনবি। আর কোথাও থেকে নয়, বুঝলি?

বেয়ারা মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল।···

কামরায় সকলে চুপ। কানাতের পার্টিশনের ওধারে অফিস-ঘরে চীৎকার ধমক কলরব—টাইপ-রাইটারে খট্‌খট্‌ শব্দ চলিয়াছে।

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—আমাকে বসালেন মিষ্টার মল্লিক, কিন্তু কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল যে আপনাদের!

বৃকোদর বলিল,—না। এঁদের একটা লেটার্স আর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ম্যাটার আছে···কাল কোর্টে পিটিশন দাখিল হবে। ওঁরা অপেক্ষা করছেন শুধু এফিডেভিট সই করবার জন্য···

চোখে হাসির রেখা টানিয়া সমর মিত্র বলিলেন—কত টাকার এষ্টেট?

বৃকোদর বলিল,—তা কম নয়! পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা হবে···

সমর মিত্র বলিলেন—How lucky (কি ভাগ্যবান)!···দেখুন আমার দুর্ভাগ্য! আমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, বাবা এখনো সিংহাসন চেপে বসে আছেন। যাট বছর বয়সে সম্পত্তি পেয়ে কবে তা ভোগ করবো বলুন দিকিনি?···তা এঁদের মধ্যে কার ভাগ্য প্রসন্ন হলো? কি নিচ্ছেন লেটার্স?

ভগীরথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বৃকোদর বলিল—ইনি!

সমর মিত্র কহিলেন—মশায়ের নাম?

এ প্রশ্ন-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি শোনেন··· সেই আকাঙ্ক্ষিত নাম···?

ভগীরথ কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ম্যানেজিং ক্লার্ক আসিল। তার খুব ব্যস্ত ভাব।

বৃকোদর বলিল,—ব্যাপার কি বলাই?

ম্যানেজিং ক্লার্কের নাম বলাই। বলাই বলিল—খ্যাংরাপটীর মক্কেলের কেশ উঠেছে। কৌশুলী সাধুখাঁ আপনাকে একবার ডাকছেন।

মুখ বাঁকাইয়া বৃকোদর বলিল—বয়ে গেছে আমার যেতে! ও মক্কেলের কি আছে?

পরিবারের গহনা বেচে কৌঁশুলীকে ফুরোন করে ফী দেছে তিনশো টাকা। মক্কেলের হাতে এখন ঐ ভগবানের লেখা রেখা ছাড়া আর কিছু নেই, বাবা!

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—আপনার হাত থেকে ফী গেল না? মক্কেলের হাত থেকে direct কৌঁশুলীর ফী গেল?

বৃকোদর বলিল,—তেমন-তেমন কৌঁশুলীরা কি না করছে, বলুন?

সমর মিত্র বলিলেন—বার-কৌন্সিলকে জানান্ না কেন?

বৃকোদর বলিল—ছেঁড়া-ভাঙ্গা দু-চারটে এমন কৌঁশুলীকে হাতে রাখা চাই। কত রকমের মক্কেল আছে। সবাই কি মধুব্রাণীর জমিদার নেপেন দত্ত!···এ্যাঁ?

যেন খুব সরস জবাব দিয়াছেন—কথার শেষে বৃকোদর নিজের রসিকতায় বিমুগ্ধ হইয়া চোখ দুটাকে বাঁকাইয়া অধরে হাসির মৃদু তরঙ্গ দুলাইয়া দিল।

বলাই বলিল—যাবেন না স্যর? মক্কেল পয়সা দ্যায়নি বলে বসে থাকা চলে না! তার এটর্ণি বলে যখন পাওয়ার সই করেছেন!

বিরক্ত হইয়া বৃকোদর বলিল—কত হাতিয়েছো থ্যাংরাপটীর মক্কেলের কাছে বলাই?

একপাক ঘুরিয়া বলাই বলিল—ঐ তো আপনার দোষ! কাজে একটু আঠা করলেই বলবেন, পয়সা হাতিয়েছি! হুঁঃ, দিন-কাল যা পড়েছে—যত সব পকেট-কাটা মক্কেল! আপনাকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, সে আবার আমাকে পয়সা দেবে! বলে, আমি হলুম ছুঁচোর গোলাম চামচিকে!

কথা শুনিয়া সমর মিত্র হাসিলেন···খাশা রঙ্গ-রহস্য চলে তো এ অফিসে!

বলাই কহিল—আসুন মশাই চট্ করে···যাবেন আর আসবেন। কৌশুলী আমাকে পাঠালে আপনাকে ডাকতে···আসুন···বুঝলেন?

বলাই দাঁড়াইল না। সমর মিত্র গুম্ হইয়া সব দেখিতেছিলেন, শুনিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, খাশা জায়গা এই এটর্ণি-পাড়ার অফিস। কত রকমের জীব কত তালে এখানে ফিরিতেছে···

বৃকোদর বলিল—বসুন মিষ্টার ডাট। আমি এখনি আসবো। এত করে ডাকছে ···শুনে আসি।

বৃকোদর উঠিয়া বাহিরে গেল।

সমর মিত্র চাহিলেন ঘড়ির পানে···একটা বাজিয়া গিয়াছে···দীপুর আসিবার কথা বেলা দুটায়। এখনো এক ঘণ্টা বাকী!

মনে পড়িল, এই ভগীরথ আসিয়াছে লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেশনের দরখাস্ত পেশ করিতে···কি নামে, জানা গেল না। ভগীরথ নামে নিশ্চয় নয়! যদি কান্তি সাজিয়া এ দরখাস্ত পেশ না করে, তাহা হইলেও জাল-মানুষ সাজিয়া এ আয়োজন চলিয়াছে, তাহাতে ভুল নাই!

ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিব?

যদি না বলে? কিম্বা যদি বলে, মশায়ের এত খোঁজ কেন? জালিয়াতী-ব্যাপারে তা ছাড়া অন্য উত্তর হইতে পারে না!

থাক্, প্রশ্ন করিয়া কাজ নাই! যদি সন্দেহ করে? যা ভাবিতেছেন, সত্য হইলেও এখনো ফন্দীর ফল পাকা দূরের কথা, ডাঁশে নাই! নেহাৎ কাঁচা! এতখানি কাঁচা ফলে আইনে কাজ হয় না···preparatary stage (উদ্যোগ-পর্ব মাত্র)! এখন চাই ধৈর্য্য···

সমর মিত্র বলিলেন—লেটার্স অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নিন···তারপর আপনার সঙ্গে ভাব করবো। আপনার বাতাস দু'দিন গায়ে লাগাবো···আমার এমন সুদিন কবে হবে!

হাসিয়া চুণী দত্ত বলিল—আপনি খাশা লোক মশায়···এমন frank! সত্যি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা হচ্ছে ভারী!

সমর মিত্র বলিলেন,—Kind of you (আপনার দয়া)!

চুণী বলিল—আপনার বাবার বয়স হলো কত?

সমর মিত্র বলিলেন—চুরাশি বছর!

—এখনো বেশ শক্ত আছেন?

—তা এদিকে আছেন বৈ কি! আশার মধ্যে ঐ ব্লাডপ্রেশার!···তবে পয়সা খরচ হবে বলে ডাক্তার-বদ্যি ডাকেন না!

হাসিয়া চুণী দত্ত বলিল—ডাক্তার-বদ্যি ডাকেন না? তাহলে ধরে রাখুন, আরো বিশ বছর বাঁচবেন। ব্লাডপ্রেশারের রোগীর সম্বন্ধে শুনেছি মজা ঐ···ডাক্তার দেখিয়ে ধরাকাট করেছো ওষুধ-পত্তর খেয়েছো, কি অমনি কোন্‌দিন না-বলে না-কয়ে হার্টটি ফেল! ডাক্তার না দেখালে ও-হার্ট খাশা চলে মশায়···দশ-বিশ বছর তো বটেই এবং নির্বিবাদে।

সমর মিত্র কহিলেন—আপনি তো খাশা কথা কন্! মশায়ের নাম?

চুণী দত্ত বলিল—আমার নাম শ্রীচুণীলাল দত্ত···

—ওঁর ফ্রেণ্ড?

—হ্যাঁ।

—কি বিষয়-কর্ম্ম করা হয়?

চুণী দত্ত বলিল,—ওকালতি করতুম। এখন বম্‌বাষ্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্সি নিয়েছি।

সমর মিত্র বলিলেন,—তাহলে বেশ two pice (দু পয়সা) রোজগার করছেন, বলুন!

মেঘের বুকে রৌদ্র

দুটার সময় দীপু আসিয়া দেখা দিল।

ভগীরথকে দেখিয়া বলিল,—এই যে ভগীরথ বাবু! কতক্ষণ আসছেন?

ভগীরথ বলিল—এইমাত্র এসেছি। বোধ হয়, পাঁচ মিনিট আগে।

কথাটা মুখ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথ চাহিল সমর মিত্রের পানে। দেখিল, সমর মিত্রের দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত এবং সে-দৃষ্টি তার মুখে নিবদ্ধ! বুঝিল, ভগীরথের এ মিথ্যা-কথায় সমর মিত্র বিস্মিত হইয়াছেন!

দীপু বলিল—মুস্কিল হলো। হাজারিমল বাবু আসতে পারলেন না। তাঁকে একবার দমদমায় যেতে হলো। সেখানে এক ফিল্ম কোম্পানি তাদের দুটো ক্যামেরা বেচতে চায়, তাই শুনে সেখানে গেছেন সেই ক্যামেরা দেখতে। ক্যামেরাম্যান্ ক্রীডকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ভগীরথ বলিল,—ও...

তার পর আর কি বলিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না...সমর মিত্র এখনো তেমনি অকম্পিত স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া আছেন! হাজার হোক, অচেনা ভদ্রলোক, তার উপর শাঁসালো-কাপ্তেন...একটু যা পরিচয় হইয়াছে...তাহাতে সমর মিত্র যাচিয়া তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে চাহিয়াছেন...মনে কত আশা, একদিন এই কাপ্তেন নেপেন দত্তর মারফৎ চরিতার্থ হইতে পারে! ভদ্রলোক যদি এ-সব কথায় ভড়কাইয়া যায়!

দীপু বলিল—তাহলেও ভয় নেই...বাবু আমাকে বলে দেছেন, এটর্ণি বাবুকে দিয়ে ডাফ্রট্-এগ্রিমেণ্ট আজ তৈরী করিয়ে নিতে।...কাজটা যত চটপট হয়! আপনাদের মতো আর্টিষ্টকে বাইরে রাখা নিরাপদ নয় মশায়, কে কখন এগ্রিমেণ্টের দড়ি-দড়ায় বেঁধে ফেলবে!

কথাটা বলিয়া দীপু হাসিল। তারপর বলিল,—বৃকোদর বাবু কোর্টে গেছেন, না?

ভগীরথ বলিল,—হুঁ...

সমর মিত্র বলিলেন—মাপ করবেন। যেটুকু শুনলুম, আপনার নাম ভগীরথ বাবু এবং আপনি একজন ফিল্ম-আর্টিষ্ট্ এবং ইনি এসেছেন আপনাকে বাঁধতে...

মুখে কাষ্ঠ-হাসি...ভগীরথ বলিল—পেশা নয়। সখ করে ফিল্মে নামি। তাছাড়া আমার পেশা নেবার দরকারও নেই, দত্ত সায়েব...

সমর মিত্র বলিলেন—তা তো বটেই!

বৃকোদর ফিরিল...তিক্ত মুখ। বলাই সঙ্গে আসিয়াছিল।

ভগীরথের দিকে নির্দেশ করিয়া বৃকোদর বলিল—এঁর সে লেটার্স অফ এ্যাড্-মিনিষ্ট্রেশন কতদূর হলো?

বলাই বলিল—এফিডেভিট এনগ্রোশ্ হচ্ছে...কাল সকালে উনি এসে এফিডেভিট্ সোয়্যার করবেন।

ভগীরথের দিকে চাহিয়া বৃকোদর বলিল—এই কথা রইলো...পাকা!

ভগীরথ বলিল,—হুঁ...

চুণী বলিল—আজ তাহলে উঠি...

ভগীরথ উঠিতেছিল, দীপু বলিল,—আমাদের কাজটা...

চুণী তাড়াতাড়ি জবাব দিল—হাজারিমল বাবু এলেন না?

দীপু বলিল—তিনি না এলেও আমি এসেছি···তাঁর রিপ্রেজেন্‌টেটিভ···

চুণী বলিল—আমরা আজ আর থাকতে পারবো না···একটু কাজ আছে। কাল আবার আসছি তো···তখন যদি হাজারিমল বাবু আসেন···

দীপু বলিল—বেশ। তিনি কটায় আসবেন, বলুন ?

চুণী বলিল—বেলা বারোটা···তারপর চুণী চাহিল বৃকোদরের পানে; চাহিয়া বলিল—বারোটার মধ্যে এফিডেভিট সোয়্যর করানো চুকবে না ?

বৃকোদর বলিল—বলাই বাবুর যদি অনুগ্রহ হয়, কেন হবে না ?

বলাই বলিল—আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন মশায়···ভালো মুস্কিল !

চুণী বলিল—ও-সব কথা কাণে তুলবেন না বলাই বাবু···আমাকে আপনি বলুন।

বলাই বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হবে···আপনারা কিন্তু বেলা সাড়ে দশটায় আসবেন মশায়। আমি সব ঠিকঠাক করে রাখবো···বুঝলেন ?

—বেশ···বলিয়া চুণী চাহিল দীপুর পানে, তারপর বলিল—তাহলে কাল বেলা বারোটা···কথা রইলো !

চুণী ও ভগীরথ বিদায় লইল।

সমর মিত্র অপলক নেত্রে চাহিয়াছিলেন ভগীরথের পানে। ভগীরথের মুখে সে বর্ণোচ্ছ্বাস নাই, হাসি নাই! এক অজানা আতঙ্কের ছায়া যেন তার মুখে···এটুকু তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এড়াইল না !

তারা চলিয়া গেলে সমর মিত্র সকলের অলক্ষ্যে দীপুর পানে ইঙ্গিত করিলেন। দীপু বুঝিল। বুঝিয়া সে বলিল—না···আজ আমার মিথ্যে আসা হলো !··· হাজারিমল বাবু রাগ করবেন !···দেখি, কাল বারোটায় তাঁকে নিয়ে আসবো···কথাটা বলিয়া দীপু চাহিল বৃকোদরের পানে, বলিল—নমস্কার !

বৃকোদর বলিল—নমস্কার ! কাল আসবেন কিন্তু। আমি করে দেবো···মানে, ওকে গাঁথা শক্ত হবে না···দলিলখানা মোদ্দা আমার অফিসে হওয়া চাই।

সোৎসাহে দীপু বলিল—নিশ্চয়।

কথা শেষ করিয়া হাস্য-মুখে দীপু প্রস্থান করিল।

দীপু চলিয়া গেলে সমর মিত্র বলিলেন—এবার আমার পালা ! আমায় আপনি উদ্ধার করবেন না বৃকোদর বাবু ?

বৃকোদর বলিল—কি যে বলেন মিষ্টার ডাট্ ! ভদ্রলোকের আপদে-বিপদে দুঃসময়ে আমরাই আছি একমাত্র বন্ধু ! জানেন তো সেই সংস্কৃত শ্লোক, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব ! শ্মশানে বাপকে পুড়িয়ে ছেলেকে রাজ-দ্বারে নিয়ে এসে আমরাই তার বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করে দি···ভায়ে-ভায়ে পার্টিশন্-সুট্ চালিয়ে।

সমর মিত্র বলিলেন—আজ তাহলে উঠি ?

—বসবেন না ?

—না। গিয়ে এথেলকে বলি। সে···জানেন না বৃকোদর বাবু, She is an angel (সে স্বর্গের অপ্সরী)।

বৃকোদর বলিল—বুঝতে পারছি বৈ কি! না হলে আপনার মতো লোক তার জন্য অসাধ্য-সাধন করবেন কেন?

সমর মিত্র উঠিলেন।

বাহির হইয়া কেরাণী-কামরায় আসিলেন। আসিয়া বলাইকে দেখিলেন। বলাই তখন টেবিলের উপর একরাশ টাকা আধুলি সিকি ঢালিয়া থাক্ দিয়া সাজাইতেছে। নিঃশব্দে তিনি আসিলেন বলাইয়ের কাছে; বলিলেন—একটা উপকার করতে পারেন?

উপকার! তার মানে টু-পাইস!

বলাই বলিয়া উঠিল,—সে কি স্যর! আমাকে আপনার ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট বলে জানবেন। বলুন, কি করতে হবে?

বলাইকে লইয়া সমর মিত্র অফিসের বাহিরে আসিলেন, আসিয়া পাঁচ টাকার একখানি নোট লইয়া বলাইয়ের হাতে দিলেন। বলাই একেবারে কৃত-কৃতার্থ হইয়া গেল।

সমর মিত্র বলিলেন,—ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করতে চাই বলাই বাবু··· যিনি ঐ লেটার্স অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন্ নিচ্ছেন! অনেক টাকার সম্পত্তি···ওঁর সঙ্গে ভাব থাকলে সময়ে-অসময়ে দু' পাঁচ হাজার ধার মিলবে'খন···তার জন্য কমিশন আপনাকে দিতে রাজী আছি···ওয়ার্ড অফ অনার!

বলাই ভাবিল, কার মুখ দেখিয়া সকালে আজ বিছানা ছাড়িয়া ছিল! অকস্মাৎ অপরিচিত ভদ্রলোক পাঁচ-পাঁচটা টাকা হাতে দিলেন! তার উপর কমিশনের এমন প্রত্যাশা! বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলাই বলিল—এ আর কি! হুঁঃ, দেবো আলাপ করিয়ে।

সমর মিত্র বলিলেন,—ওঁর নাম কি? কোথায় থাকেন?

বলাই বলিল—ওঁর নাম বুঝি কান্তি বাবু···নতুন মক্কেল। ঐ চুণী দত্ত—এ-পাড়ায় একজন ঘোড়েল দালাল। ও এনেছে কান্তিবাবুকে আমাদের অফিসে। কান্তিবাবু এখন বেহালায় থাকেন।

সমর মিত্রের মনে হইল, পৃথিবী যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এবং সেই ফাটের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গোলাপ-জলের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়াছে!

তিনি বলিলেন—কাল ওঁরা আসবেন তো বেলা সাড়ে দশটায়! সে সময়ে আমি থাকতে পারবো না। আমি আসবো বেলা বারোটায়—আপনি কোনো ছুতোর আটকে রাখবেন। তারপর আলাপ···বুঝলেন? আমার হয়ে দু'কথা বানিয়ে বলবেন···

সমর মিত্রের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলাই বলিল—সে আর বলতে হবে না··· আমাদের মুখই জানবেন সর্বস্ব···যার মানে, মূলধন! ঘটকের মুখের চেয়ে ঢের-বেশী ওস্তাদী মুখ! আপনি দেখে নেবেন স্যর, বলাইকে গোলাম বলে জানবেন···হেঁ-হেঁ···

সমর মিত্র আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিদায় লইলেন।

বিদায় লইয়া তিনি আসিলেন লালবাজার পুলিশ-অফিসে।

সেখানে সংবাদ মিলিল, আঙুলের টিপ মিলিয়াছে—বিশুই লালগোপাল···

এ সংবাদে সমর মিত্র খুশী হইলেন। অফিসার-ইন-চার্জ সুনীল ছিল কোয়ার্টার্সে। তাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—Wild goose chase নয় সুনীল···matters যা ডেভেলপ্ করেছে, কাল তোমাকে দেখিয়ে দেবো···আজ আর দাঁড়াবো না ভাই···কাজ আছে। প্রতি-মুহূর্ত এখন আমার কাছে অমূল্য!

কৌতূহলে বিস্ফারিত-নেত্র সুনীল সমর মিত্রের মুখের পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—খুব অস্পষ্ট লাগছে? মনে প্রচণ্ড কৌতূহল? কিন্তু জানো তো পুলিশের কাজ করছো···এ লাইনে মন্ত্র-গুপ্তি হলো পুলিশের মস্ত অস্ত্র···কাল তুমি শুনবে। তারপর এনকোয়ারি যা চলছে, যাকে বলে সমারোহ! আমি আসি···

সুনীলের কাছে বিদায় লইয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন···এবং সেখান হইতে একেবারে নিজের গৃহে।

খিদিরপুরের পুল পার হইয়া সমর মিত্র ঘড়ি দেখিলেন,—বেলা তিনটা বাজিয়া দশ মিনিট। ভাবিলেন, পনেরো মিনিট মাত্র···বাড়ী গিয়া স্নান করিয়া মুখে দুটি অন্ন দেওয়া···তারপর তাঁকে যাইতে হইবে সেই প্রিন্সেপ্স্···ঘাট! সেখানে কার সঙ্গে ঐ ভগীরথ এবং চুণী দত্তর এন্গেজ্মেণ্ট আছে।

বাড়ী আসিয়া দেখেন, বিভাস বসিয়া আছে।

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ওখানে যেতে পারিনি বিভাস! এধারে এক-মিনিট অবসর মেলেনি, ভাই। তবে পরিশ্রম সার্থক হবে, মনে হচ্ছে। বোধ হয়, তোমার মামাতো ভাই কান্তির দেখা কাল পাবে!

বিভাসের চোখ বহিয়া যেন পুলকের বিদ্যুৎ বহিয়া গেল! পুলক-উচ্ছ্বসিত স্বরে বিভাস কহিল—সত্যি?

সমর মিত্র বলিলেন—যাকে বলে নাইনটি-নাইন পার-সেণ্ট চান্স···

উচ্ছ্বসিত আনন্দের উন্মাদনায় বিভাসের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল! বিভাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু তুমি যে চুপচাপ বসে আছো, কোনো খপর আছে?

বিভাস বলিল—খপরের মধ্যে এই, পুলিন বাবু চুপিচুপি প্রতিমার খোঁজে লোক লাগিয়ে দিলেও ওখানকার পুলিশ দুজন লোক দিয়েছিল। আজ খানিক আগে পুলিনবাবু আমায় ডাকিয়ে পাঠিয়ে বললেন, খিদিরপুরে কে আছে বঙ্কিনাথ···সেই বঙ্কিনাথ মেয়ের খপর দিতে পারে।

সমর মিত্র বলিলেন,—কে বঙ্কিনাথ? কোথায় থাকে?

বিভাস বলিল—সে খপর পাওয়া যায়নি। আমি ভাবলুম, যদি ঐ নামে পুরোনো দাগী কেউ থাকে···ছুটে তাই আপনার এখানে এসেছি। এসে শুনলুম, আপনি বেরিয়ে গেছেন···

সমর মিত্রের কাণে এ কথা গেলনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন···বস্তিনাথের কথা! জানা নামের তালিকায় কৈ বস্তিনাথ নাম···না, মনে পড়ে না!···

পরক্ষণে মনে হইল, লালগোপাল ওরফে বিশু—সে হয়তো চেনে বস্তিনাথকে! একবার থানায় গিয়া বিশুর গায়ে হাত বুলাইয়া সন্ধান লইবেন না কি?

কিন্তু সময় নাই! এখনি যাইতে হইবে প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে। সেখানে ঐ চুণী দত্ত আর ভগীরথ যাইবে···দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

সমর মিত্র বলিলেন,—বস্তিনাথের সন্ধান এখনি করতে পারছি না। তবে আশা আছে, সে সন্ধান মিলবে। এখন খুব জরুরি কাজ আছে। ছিপে মাছ গেঁথেছি মনে হচ্ছে···এখন ভারী সাবধান! ডাঙ্গায় তোলবার আগে মাছ না পালায়! চারদিকে সাড়া জেগেছে। নাহলে মনের মধ্যে সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলের দিকে চাইতে পারছি না। সেখানে কেষ্টপুরে কি হলো···তারপর তোমার ডায়মণ্ড হার্বার··· এদিকে যা হয়েছে···ওঃ, শুনলে তুমি খুশী হবে!

বিভাস বলিল,—মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—মানে এখন খুলে বলতে পারছি না। আমার মনের মধ্যে কি-রকম ঢেউ ছুটেছে···currents and cross-currents···কিন্তু তুমি বসো ভাই বিভাস···মাথায় আমি দু'মগ জল ঢেলে মুখে কিছু দিয়ে এখনি আসছি! তুমি কি চাও ···এখন কি কর্তব্য, ইতিমধ্যে আমি ভেবে ঠিক করে ফেলবো!···

বিভাস বলিল—আপনি যান···নেয়েখেয়ে আসুন। আমি এ-ঘরে বসে থাকবো।

খুশী-মনে সমর মিত্র বলিলেন—তোমার জন্য চা পাঠিয়ে দিতে বলি। তোমার বৌদি তোমার নাম শুনেছেন···তোমার কথা আমি বলেছি। তোমার কথা শুনে আমাকে কত-রকমে যে inspire করেন, কত পরামর্শ দেন···

হাসিয়া বিভাস বলিল—মেয়েদের মন···মায়া-মমতায় আকুল হয় চিরদিন। যান্, আর এক মিনিট দাঁড়াবেন না।

সমর মিত্র চলিয়া গেলেন।

শিথিল গ্রন্থি

কোনমতে দশ মিনিটের মধ্যে স্নানাহার সারিয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন ···একেবারে সাহেব সাজিয়া। এমন সাহেব যে দেখিলে কে বলিবে, ইনি সেই বাঙালী সমর মিত্র!

আসিয়াই সমর মিত্র বলিলেন—তুমি ডায়মণ্ড হার্বারে যেয়ো না···এদিকে যেভাবে জল-নাড়া চলছে, ভয় হয়, পালাবার মুখে দু'চারটে সাপ যদি সেখানে তোমাকে ছোবল দিয়ে যায়! তোমার উপর এদের আক্রোশ স্বাভাবিক।

বিভাস বলিল—কোথায় যাবো? বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে?

সমর মিত্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন,—উঁহু···সেখানেও নয়।

কোনো বন্ধুর বাড়ীতে আজ রাত্তিরের মতো যদি আশ্রয় নাও ?. কাল সকালে বেলা সাতটা থেকে আটটা···এখানে এসো···বুঝলে ?

বিভাস বলিল,—বেশ···

তারপর সমর মিত্র বাহিরে আসিয়া নিজের টু-শীটারে বসিলেন।

বিভাস বলিল—এদিকে ছদ্মবেশ নিয়েছেন···গাড়ী তো মার্কা-মারা।

সমর মিত্র বলিলেন—গাড়ীখানা আর কারো গাড়ীর সঙ্গে বদল করে নেবো। ভাবছি, কোর্টে গিয়ে এ্যাড্‌ভোকেট চৈতন বড়ালের জন্য এ-গাড়ী রেখে তার গাড়ী নিয়ে বেরুবো···

বিভাস কহিল—সেই ভালো হবে। চৈতনবাবুকে বললেই রাজী হবেন।

সমর মিত্র আর সময়ক্ষেপ না করিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন···গাড়ী নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হইল।

কোর্ট হইতে বড়ালের গাড়ী লইয়া সমর মিত্র আর এক কাজ করিলেন। রিজার্ভ-সার্জেণ্ট ম্যাকরিডির গৃহে গিয়া ম্যাকরিডি ও তার মেমকে লইয়া গাড়ী চালাইয়া সোজা আসিলেন প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটের সামনে।

আসিয়া দেখেন···যা ভাবিয়াছিলেন···

ঘাটের সামনে লনে ভগীরথ এবং চুণী দত্ত···মুখে বিড়ি···যেন কার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে!

ম্যাকরিডির সহিত কথা কহিতে কহিতে যেন পায়চারি করিতেছেন, এমনিভাবে সমর মিত্র লনে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। মুখে ম্যাকরিডির সঙ্গে ক্যালকাটা পুলিশ-ক্লাবের গঠন-সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন—কাণ ছিল কিন্তু চুণী ও ভগীরথের কথার দিকে।

দু-চারিটা কথা কাণে যা গেল, তাহাতে বুঝিলেন, নালু টাইম্ দিয়া এমন দেরী করিতেছে···সে তো এমন আন্‌পাংচুয়াল কখনো নয়!

সমর মিত্র মনে মনে বলিলেন, ভয় নাই। আর একটা দিন সবুর করো···তোমাদের প্রিয় বন্ধু নালু ওরফে লালগোপালের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব। তবে সে এখানে মা-গঙ্গার আঁচলের স্নিগ্ধ বাতাসে নয়···হাজত-ঘরের বদ্ধ বাতাসে!

প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল···শ্রান্ত হইয়া চুণী দত্ত ও ভগীরথ ফিরিবার উদ্যোগ করিল। অলক্ষ্যে সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন, দূরে মাঠের ধারে বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া সেই ট্যাক্সি···যে-ট্যাক্সি সেদিন গিয়া ভগীরথের আস্তানায় উঠিয়াছিল···

ট্যাক্সিতে চড়িয়া ভগীরথ ও চুণী খিদিরপুরের দিকে যাত্রা করিল।

সমর মিত্র ভাবিলেন, যদি বিশু ওরফে লালগোপালের বাড়ী যায়, গিয়া যদি জানিতে পারে, পুলিশের হাতে তাদের বন্ধুবর গ্রেফ্‌তার?

এবং এ সংবাদে ভীত হইয়া যদি এ-পথে আর অগ্রসর না হয়? কাল যদি হাত-পা গুটাইয়া চুণী ও ভগীরথ চুপচাপ বসিয়া থাকে? কিম্বা কোথাও সরিয়া পড়ে? তাহা হইলেই তো মুস্কিল! আবার অকূল পাথারে পড়িতে হইবে!

তার চেয়ে···

ঐ যে উহারা···ঐ ট্যাক্সির কাছে···

সমর মিত্র ডাকিলেন—ম্যাকরিডি···

ম্যাকরিডি বলিল—ইয়েস···

সমর মিত্র বলিলেন—ঐ ট্যাক্সিখানাকে ফলো করতে হবে। আমার আসামী আছে ঐ ট্যাক্সিতে।

ম্যাকরিডি বলিল—অল রাইট···

তখনি ক'জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ভগীরথদের ট্যাক্সি চলিল; এবং তার পিছনে সতর্কভাবে সমর মিত্র তাঁর গাড়ী চালাইয়া দিলেন।

ময়দানের পর খিদিরপুরের পুল পার হইয়া ট্যাক্সি ঐ চলিয়াছে···

সমর মিত্র ভাবিলেন, ট্যাক্সি গিয়া ঢুকিবে বিশুর বাড়ীর গলিতে। কিন্তু ঢুকিল না। সোজা গিয়া ট্যাক্সি বাঁকিল একবালপুর রোডে।

সমর মিত্র বুঝিলেন, বিশুর ওখানে না গিয়া ট্যাক্সি চলিয়াছে বেহালায়···ভগীরথের গৃহে।

সমর মিত্রের এ-অনুমান সার্থক করিয়া ট্যাক্সি গিয়া বেহালায় সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। সমর মিত্র গলি-পথে গাড়ী না চালাইয়া থানায় আসিলেন।

অফিসারকে ডাকিয়া চুপি-চুপি অনেক কথা বলিলেন। সে কথা শুনিয়া অফিসার একজন জমাদারকে ডাকিয়া কি আদেশ দিল।—জী! বলিয়া জমাদার উর্দি আঁটিয়া থানা হইতে বাহির হইল।

আধ-ঘণ্টা পরে জমাদার ফিরিয়া ট্যাক্সিওয়ালার নাম দিল,—জনার্দন। তার লাইসেন্সের নম্বর দিল, ঠিকানা দিল। জনার্দন থাকে এই খিদিরপুরে। তার ট্যাক্সির মালিকের নাম পরেশ সান্যাল। পরেশ সান্যালের আরো দুখানা ট্যাক্সি আছে। পরেশ সান্যাল থাকে ভবানীপুরে গোয়ালটুলিতে।

সমর মিত্র তখন অফিসারকে বলিলেন—ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে পাঠান্—থানায় কাল সে যেন বেলা নটায় ট্যাক্সি-সমেত হাজির হয়। ভাড়া পাবে। জুলুম নয়। যদি ট্যাক্সি না আনে, তাহলে বিপদ হবে।

অফিসার বলিল—তার পর?

সমর মিত্র বলিলেন—তারপর যা করবেন, টেলিফোনে আমি আপনাকে জানাবো বেলা স'নটার মধ্যে। আগেও জানাতে পারি। আর এখন গলি থেকে ও বেরুবে, খালি-গাড়ী নিয়ে বেরোয়, কি প্যাসেঞ্জার নিয়ে বেরোয়, একটু নজর রাখবেন দয়া করে।

অফিসার বুঝিল কোনো রহস্যের গ্রন্থি-মোচন চলিয়াছে—তাই হাসিয়া সে বলিল, —দয়া কি! এ তো পুলিশ-অফিসারের ডিউটি!···ট্যাক্সিকে ফলো করবার দরকার হবে?

সমর মিত্র যেন চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন্—কি করে করবেন?

অফিসার বলিল—একটি ছোকরা আছে। গাঁটু···পুলিশকে নানা রকমে সাহায্য করে। পাড়ায় থাকে। তার একখানা মোটর-বাইকও আছে। যদি বলি হুঁশিয়ারভাবে গাঁটু ফলো করতে পারে···

নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে সমর মিত্র কি চিন্তা করিতে লাগিলেন···

অফিসার বলিল—গাঁটু খুব ওস্তাদ ছোকরা। ঘাবড়াবে না বা বেফাঁশ করবে না!

সমর মিত্র বলিলেন—মন্দ কি! কথায় বলে, অধিকন্তু ন দোষায়! আমি তাহলে আসি···কাল সকালে আবার আসবো।

এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া সমর মিত্র গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; এবং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন···গাড়ী চলিল উত্তর-দিকে কলিকাতার অভিমুখে।···

সন্ধ্যা হইতে এখনো বেশ খানিকটা সময় আছে। খানিক দূর আসিয়া সমর মিত্র ভাবিলেন, একবার ওয়াটগঞ্জ থানা ঘুরিয়া গেলে মন্দ হয় না। অনুমানে যতখানি তথ্য পাইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বিশুর কাছ হইতে যদি আরো কোনো খপর পান্!

ওয়াটগঞ্জ থানা···

তাঁকে দেখিয়া সুনীল বলিল—আপনি কি করছেন, স্যর?

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দশকর্ম্মান্বিত হয়েছি···সুনীল। এখন ব্যাপার যা হয়ে উঠেছে···simply fascinating!

সুনীল বলিল—আমাকে এখন কি করতে হবে?

সমর মিত্র বলিলেন—সেই বিশুকে একবার আনা চাই। তার সঙ্গে দুটো কথা কইবো।

বিশুকে তখনি আনা হইল।

বিশু বলিল—আমাকে নিয়ে মিথ্যে টানাটানি করছেন বড় বাবু!

সমর মিত্র বলিলেন—উপায় নেই লালগোপাল। যে-খপর এখন পেয়েছি, তাতে তোমাকে একদণ্ড চোখের আড় করতে ইচ্ছা হচ্ছে না! তুমি বসে এমন নাটক রচনা করেছো···লিখে যদি কেউ ষ্টেজে ছায়, তাহলে এ নাটকের অভিনয়ে গোল্ডেন জুবিলির উৎসব একেবারে অনিবার্য!

বিশু কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—বাদার ওধারে 'লাশ'কে সরালে কেন, বলতে পারো? যেমন-তেমন সরানো নয়···একেবারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে!

বিশু নতশিরে বসিয়া রহিল···নিরুত্তর।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমাদের কান্তিবাবুকে পেয়েছি। মানে, যাকে কান্তিবাবু সাজিয়ে ফণীবাবুর সম্পত্তি হাতাবার ব্যবস্থা করেছো! সেই কান্তিবাবুই তোমাদের কথা বলেছেন। বাপ, এ কাহিনীর কাছে কোথায় লাগে বেচারা বুড়ো ব্যাসদেবের অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত!

চমকিয়া বিশু চাহিল সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র তার পানে চাহিয়াছিলেন··· লক্ষ্য করিলেন, বিশুর চোখের দৃষ্টিতে রোষ, ক্ষোভ, নৈরাশ্য, হিংসা আর আক্রোশ যেন মশালের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে!

সমর মিত্র বলিলেন—বলো দিকিনি, এ মন্ত্র কে প্রচার করলে? এ মন্ত্রের ঋষি কে?

বিশু বলিল—আপনি এ সব কি বলছেন বড়বাবু! আমি এ-সবের কিছুই জানি না। কান্তি কে···ফণীবাবুই বা কে···

সমর মিত্র বলিলেন—'লাশ' কোথায় গেল, সে খপর জানো?

বিশু বলিল—সত্যি জানি না বাবু···

সমর মিত্র ক্ষণকাল বিশুর পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন: তারপর এক চাল চালিলেন···

সমর মিত্র বলিলেন—জানো না? তুমি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু হলে!···তিন চারজনে মিলে বাদার ওধারে সেদিন সকালে কি করতে গেছলে বাপু? হঠাৎ তারপর প্রাইভেট ট্যাক্সিতে চড়ে চম্পট! আমি নিজে তোমায় দেখেছি।

কম্পিত স্বরে বিশু বলিল—আপনি আমাকে দেখেছেন?

—নিশ্চয়! তোমার ও-মুখ কি ভোলবার, বিশু?···চিনে শান্তর ওখানে তোমার সন্ধানে নিয়ে ছিলুম! পুলিশের তরফে সাক্ষী করে নেবো, বলো। এ যা মকর্দমা··· এতে পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে আর লোকালয়ে ফিরতে হবে না! পাঁচ-সাত বছরের বেশী সাজাও হতে পারে!···

এ কথায় বিশু চুপ করিয়া রহিল···কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার সময়ের দাম আছে। তুমি না বলো, তোমার গরজ! আমার গরজ নেই, জেনো। যে-মাল আমি পেয়েছি, তাতেই আমার কাজ হাসিল হবে!···বেশ, তুমি এখন যাও···

সমর মিত্র ডাকিলেন—ইমদাদ···

ইমদাদ জমাদার বাহিরে ছিল; সমর মিত্রের আহ্বানে ঘরে আসিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আসামীকে হাজতে নিয়ে যাও। আমি বাড়ী চললুম···

সমর মিত্র গমনোদ্যত হইলেন···

বিশুর কি মনে হইল···বিশু বলিল—বড়বাবু···

সমর মিত্র ফিরিলেন, কহিলেন—কিছু বলবে?

বিশু বলিল—বলবো।

সমর মিত্র বলিলেন—বলো···

ইমদাদকে সমর মিত্র ইঙ্গিত করিলেন। ইমদাদ বাহিরে গেল।

বিশু বলিল—আমি কিছু করিনি, বাবু। বাদার ব্যাপারের মধ্যে আমি ছিলুম না···আমাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে গেছলো। বলেছিল, বাদার ওখানে হাটে ফণীবাবুর একটা ঘর আছে, ঘরের কোথায়, ফণীবাবু না কি কি-জুয়েলারি রেখেছেন, সেই জুয়েলারি খুঁজে বার করতে হবে!

সমর মিত্র হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—সে ঘর ফোর্ট উইলিয়াম নয় যে সেপাই-শান্ত্রী ঠেলে ঢুকতে হবে, আর তাই তোমাকে দরকার! যে-সে লোক ঘরে ঢুকে মাটী খুঁড়ে সে-জুয়েলারি বার করতে পারতো।···ছেঁদো কথা বলে আমায় ভুলোবার চেষ্টা করছো, বিশু···তোমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছে!

এ কথায় বিশুর মনে একটা ধাক্কা লাগিল···বিশু আর কোনো কথা বলিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—কষ্ট করে তোমাকে আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বলতে হবে না বিশু। গল্প আমার ভালো লাগে না!

এ কথা বলিয়া সমর মিত্র আবার গমনোদ্যত হইলেন।

এবার বিশু একেবারে সমর মিত্রের পায়ে পড়িল, বলিল—ঐ পাজীর পা-ঝাড়া··· হতভাগা! আমি ও-সব ফেরেব্‌বাজী ছেড়ে দিয়েছিলুম। শান্ত টাকা দেছে,—সে-টাকায় একটা মণিহারীর দোকান খুলেছি খিদিরপুরে। দিনে চার টাকা করে নেট্‌ লাভ হচ্ছে···এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল···সাধ্য-সাধনা করে। নাহলে আমি যেতুম না···

বাধা দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—মারলে কে, এই খপরটুকু শুধু দাও। তারপর একটু সরবামাত্র সে-লাশ পাচার! মন্তর-তন্তর শিখেছো, দেখছি!

বিশু বলিল—আপনি এসেছেন জানতে পেরে সরাবার জন্য সকলের কি দারুণ চেষ্টা···লাশ ফেলে এলে তার আঙুলের টিপ থেকে সব-শুদ্ধ দলটি ধরা পড়বো, এ-ভয় আমার মনে প্রথমেই হয়েছিল। তাই···

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু পারোনি তো বাপু লাশ গাপ্‌ করতে!

বিশু বলিল,—আজ্ঞে, চকিতে অত লোক জড়ো করে আপনারা আমাদের পিছনে লাগবেন, এ-কথা মনে হয় নি। তখন লাশ ফেলে সরে পড়ে ভেবেছিলুম, এক-সময়ে যদি সম্ভব হয়, ও-লাশ তুলে বহু দুরে পাচার করবো! কিন্তু যেভাবে আপনারা পাছু নিলেন···ভাগ্যে সেই প্রাইভেট ট্যাক্সিখানা ছিল···

সমর মিত্র বলিলেন—দলের গুরু কে, বিশু?

সে কথায় কর্ণপাত করিয়া দু'চোখে একরাশ জল ঝরাইয়া দিয়া বিশু বলিল—আমার পানে কেউ চায়নি বাবু···আমি কাকেও ছেড়ে দেবো না!···আপনাকে আমি সব কথা বলবো···আমাকে এই শেষবারের মতো মাপ করবেন। শান্ত আমাকে সত্যি খুব ভালোবাসে! সেও অনেক দাগা পেয়েছে। আমি জেলে গেলে শান্ত মরে যাবে। তার জন্য আমি সব কথা ফাঁশ্‌ করে দেবো। কিসের বেইমানী? ওঃ! দাগাবাজের দল ঘর থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গেল···একশো টাকা আমাকে দেবার কথা ছিল।···একটি পয়সা উপুড়-হাত করেনি···

সমর মিত্র গম্ভীরভাবে বলিলেন—কান্না রেখে এখন বলো দিকিনি, বদ্যিনাথ জীবটি কে? কোথায় সে থাকে?

দু'চোখ কপালে তুলিয়া বিশু বলিল—বদ্যিনাথ!

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ, বদ্যিনাথ। নাম শুনে চোখ কপালে উঠলো যে!

বিশু বলিল—বঙ্কিনাথকেও পেয়েছেন বাবু! আপনার অসাধ্য কাজ নেই···ঐ বঙ্কিনাথ হলো আমাদের শনি! কোথা থেকে সে এসে কাণে কি মন্তর যে দিলে···! বললে, লাখো টাকার সম্পত্তি···কোথায় তার এক ভাগ্নে এসে সে সম্পত্তি নিয়ে বসবে!···আমি অনেক মানা করেছিলুম। তাতে বঙ্কিনাথ বললে, খুনের মামলা চুকে গেছে—এখন আর কিসের ভয়!

সমর মিত্র একাগ্র মনোযোগে এ-কথা শুনিলেন, তারপর বলিলেন—বঙ্কিনাথের ঠিকানা জানো? সে কোথায় থাকে?

বিশু বলিল—ঠিকানা ঠিক জানি না। তবে শুনেছি বঙ্কিনাথ থাকে ঝামাপুকুরে। ···তাকে পান নি?

সমর মিত্র বলিলেন—তার নাম পেয়েছি। ঠিকানা পাইনি!···আচ্ছা, বঙ্কিনাথ ডায়মণ্ড হার্বার থেকে মেয়ে চুরি করতে গেল কেন?

বিশু বলিল—বলবেন না বাবু! বলে, পরীর মতো মেয়ে! ডাগর-মেয়ে—এদিককার ব্যাপার চুকিয়ে রাজা হয়ে তোমরা যে খুশী বসো গে, আমি শুধু চাই সেই পরীকে!···পরীকে বিয়ে করলে নাকি অনেক সম্পত্তি পাবে! পরী তার মা-বাপের একটিমাত্র মেয়ে···তার বাপের ঢের বিষয় আছে···

মানের বই খুলিয়া তার পাতায় চোখ বুলাইলে টেক্সট-বইয়ের দুরূহ ছত্র এবং তার আনুপূর্বিক রহস্য যেমন জলের মতো স্বচ্ছ সহজ মনে হয়, বিশুর মুখে বঙ্কিনাথের কথা শুনিয়া সমর মিত্রের কাছে ডায়মণ্ড হার্বারের মেয়ে চুরির ব্যাপারও তেমনি জলের মতো স্বচ্ছ সহজ হইয়া আসিল। সমর মিত্র বুঝিলেন, এ দলটি বহুদিন হইতে জাল পাতিয়া বসিয়া আছে···টানা জাল! একটি টানে এ জালে ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তি হইতে শ্যামাসুন্দরীর বিষয়-সম্পত্তি এবং কন্যাটিকে পর্যন্ত ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে চায়! চকিতের জন্য মনের সামনে জাগিল সেদিন প্রভাতে বাদার ধারে সেই অন্তহীন রহস্য! অনিশ্চিত সমাধানের উপায় বলিয়া যাহা ধরিতে যান, সেইটাই হাত ফশ্‌কাইয়া সরিয়া পড়ে!

আর আজ···

সমর মিত্র ভাবিলেন, বরাত বলিয়া অনেকে যে একটা কথা বলে, সে-কথা নিছক বানানো নয়! পুরুষকারের জয় যত সুনিশ্চিত হোক, তার সঙ্গে বরাতের সংযোগ না ঘটিলে কাজে কতখানি সাফল্য লাভ হইত বলা কঠিন!

সমর মিত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া বিশু নিজের কথা পাড়িল। আর্ত স্বরে বলিল,—আমায় আপনি এ যাত্রা বাঁচান বাবু···সত্যি, আমি নাকে-কাণে খৎ দিচ্ছি, কেউ এসে যদি কুবেরের ভাণ্ডার সামনে ধরে, তবু আমি টলবো না···এ পথে আর আসবো না। ···সত্যি বাবু, সারা জীবন ভয়ে-ভয়ে কাটাবো কি? যে কদিন কিছু করিনি, সে-কদিন মনে কি আরাম ভোগ করেছি, তা আমি জানি তো! দোহাই বাবু, আমায় বাঁচান।

বিশুর দিকে চাহিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আচ্ছা, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, বিশু···কিন্তু তুমি বেইমানী করো না···আসামীদের কথা অকপটে আমায় তুমি খুলে বলো। তোমায় আমরা এ মকর্দমায় সাক্ষী করে নেবো···তোমায় আসামী করবো না··· এ-কথা বিশ্বাস করো।

বিশু বলিল—আপনাকে খুব বিশ্বাস করি বাবু! আপনার যত দোর্দণ্ড প্রতাপ হোক, অহেতুক আপনি কোনোদিন কোনো আসামীকে কষ্ট দেন না! তাদের মানুষ বলে মনে-মনে একটু দরদ করতে দেখছি শুধু আপনাকে!

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—তোমার খোসামুদী বক্তৃতা রাখো বিশু। আমি এখন আসি···তোমার ঐ বত্তিনাথকে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। ঝামাপুকুরে সে থাকে, বললে না?

বিশু বলিল—হ্যাঁ···কোন্ গলি, তা জানি না। শুধু শুনেছি ঝামাপুকুর।

সমর মিত্র বলিলেন—দাগী?

—তা বলতে পারি না বাবু···

—হুঁ! আচ্ছা, একবার সন্ধান নিয়ে দেখি। তোমার সঙ্গে পরে এসে দেখা করবো। ঠিকঠাক সব ব্যাপার তুমি যদি খুলে বলো, সত্যি, এ যাত্রা তোমার যাতে মাপ হয়, তা আমি করবো!

সেদিনকার মতো গৃহে ফিরিয়া সমর মিত্র ধ্যানস্থ হইলেন। কাল অনেক কাজ··· কোন্ কাজ রাখিয়া কোন্ কাজ করিবেন, চিন্তায় তাহা নির্ণয় করা চাই! মনে পড়িল, সকালে বেহালায় ভগীরথের জমি-খরিদ সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিবার কথা আছে,—তারপর বেলা এগারোটার মধ্যে বৃকোদর এটর্ণির অফিস···

এ কথা মনে হইবামাত্র মন একেবারে উল্লাসে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল!···সঙ্গীন সময়···ভারী হুঁশিয়ার···মাথায় যে-প্ল্যান ঠিক করিয়াছেন, যদি সফল হয়, তাহা হইলে এ জটিল নাটকাভিনয়ের যবনিকাপাতে বিলম্ব ঘটিবে না।···তারপর বত্তিনাথ···ঝামাপুকুরের বত্তিনাথ···

বত্তিনাথের কথা মনে হইবামাত্র ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল! বত্তিনাথের হেফাজতে আছে ডায়ামণ্ড হার্বারের শ্যামাসুন্দরীর কিশোরী কন্যা প্রতিমা। এদিকে জাল গুটানোর খপর বত্তিনাথ যদি শোনে? সমর মিত্রের সর্বাঙ্গে শিহরণ···রোমাঞ্চ-রেখায় সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেল।

সমর মিত্র ভাবিলেন, একবার বত্তিনাথের সন্ধানে বাহির হইব না-কি?

মন বলিল, এ রাত্রে কোথায় সন্ধান করিবে? তার চেয়ে ভোরে···

সে-রাত্রে সমর মিত্র আর দেরী না করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। এখন বিশ্রাম!

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র চা খাইয়া বাহির হইলেন—ঝামাপুকুর লেনে।

· মজুমদারদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। মজুমদারদের বাড়ীর সুবোধকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ পাড়ায় কে বন্ধিনাথবাবু থাকেন, জানো হে সুবোধ?

সুবোধ পাবলিশিংয়ের কাজ লইয়া চব্বিশ ঘণ্টা মাতিয়া থাকে। দুনিয়ায় বইয়ের খরিদ্দার ছাড়া আর-কেহ বা আর কিছু-আছে, সে সংবাদ রাখিবার তার সময় নাই!

সুবোধ বলিল—আমি জানি না···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—ছাপাখানার টাইপ, কম্পোজিটর আর বাঙ্গালী লেখক ছাড়া দেশের আর কারো খপর তুমি রাখো না···না?

হাসিয়া সুবোধ বলিল—দিনগুলো কোথা দিয়ে যে কেটে যায়···

সমর মিত্র বলিলেন—দিন আমাদের নিয়েও কাটে, সুবোধ। তুমি ভাবো, তোমার ছাপাখানার ঘড়ি ধরে দিন চলে, তা নয়···

সুবোধের গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র আসিলেন···ঠনঠনিয়া কালীতলার মোড়ে। হঠাৎ চোখ পড়িল এক ভদ্রলোকের পানে। দেখেন, সেই চুণী দত্ত। চুণী দত্ত পূর্ব-দিককার ফুট-পাথে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে বেশ বুঝা যায়, বাস বা ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছে!

বেহালায় চলিয়াছে না কি?

অদূরে গাড়ী রাখিয়া চুণীর অলক্ষ্যে সমর মিত্র গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন—দৃষ্টি চুণী দত্তর পানে।

ভাবিলেন, এই চুণী দত্তই বন্ধিনাথ নয় তো?

বাস আসিল। 2A বাস। চুণী দত্ত বাসে চড়িল। বাসের নম্বর দেখিয়া সমর মিত্র টু-শীটার হাঁকাইয়া বাসের পিছনে চলিলেন।

এস্‌প্লানেডে বাস হইতে নামিয়া চুণী দত্ত 3A বাসে উঠিল। সমর মিত্র এই 3A বাসের পিছনে গাড়ী চালাইয়া দিলেন···

যা ভাবিয়াছিলেন···বেহালার সেই গলি। গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুণী দত্ত পশ্চিম-মুখে চাহিল।

সমর মিত্র তখনি থানায় আসিয়া ব্যাগ হইতে কালিকার সেই ছদ্মবেশ বাহির করিয়া খরিদ্‌দার সাজিয়া ভগীরথের উদ্দেশ্যে চলিলেন···বাড়ীর দাম ঠিক করিতে।···

সেখানে দুজনের সঙ্গে দেখা। ভগীরথ এবং চুণী···

ভগীরথ বলিল—আসুন···

চুণী দত্ত বলিল—কি ঠিক করলেন?

সমর মিত্র বলিলেন—দশ হাজার পর্যন্ত আমার সামর্থ্য···তার বেশী হলে জিভ্ বেরিয়ে যাবে···

চুণী দত্ত চাহিল ভগীরথের পানে। দুজনের চোখে চোখে ইঙ্গিত-রেখা বহিয়া গেল···

তারপর চুণী দত্ত কথা কহিল, বলিল—বায়না কত দিতে পারেন?

সমর মিত্র বলিলেন—বলুন···কি চান্?

ভগীরথ বলিল—পাঁচশো-এক···

সমর মিত্র বলিলেন—দুশো একান্ন নিন্। মানে, আমার হাতে এখন শ'তিনেক আছে। বায়না করে' আমি একবার দেশে যাবো। সেখান থেকে টাকা নিয়ে আসবো। অর্থাৎ ঐ তিনশোর মধ্যে আপনাদের বায়না দেবো দুশো-একান্ন—আর পঞ্চাশটা টাকা আমার উকিল রবীন বোসের হাতে দিয়ে যাবো সার্চের জন্য···

চুণী দত্ত বলিল—আড়াইশো বায়না নেবো না। বায়না চাই পাঁচশো-এক···

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে এক হপ্তা সময় দিতে হবে।

ভগীরথ বলিল—এক কাজ করতে পারেন! আড়াইশো টাকা আজ দিয়ে লেখা-পড়া করতে পারেন। এক হপ্তা পরে বায়নার বাকী টাকা দিয়ে পাঁচশো-এক পূরণ করে দেবেন।

সমর মিত্র আকাশের পানে চাহিয়া চিন্তার ভান করিলেন, তারপর বলিলেন,—লেখাপড়া কি রকম হবে?

চুণী দত্ত বলিল—আমাদের এটর্ণি বৃকোদর বাবুর কাছে চলুন। তিনি লেখাপড়া করে দেবেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আড়াইশো টাকা নিয়ে যাবো?

চুণী দত্ত বলিল—হ্যাঁ।

সমর মিত্র বলিলেন—কখন যাবো, বলুন?

চুণী চাহিল ভগীরথের দিকে···

ভগীরথ বলিল—আমাদের সে-কাজ চুকবে, ধরো, বেলা বারোটা। তাহলে যদি বলি, সাড়ে বারোটার মধ্যে যাবেন?

চুণী বলিল,—বেশ···আপনি সেখানে যাবেন বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে।

সমর মিত্র বলিলেন—যাবো···

এ কথার পর সমর মিত্র দাঁড়াইলেন না। উল্লাসে উচ্ছ্বাসে তাঁর সর্বাঙ্গে যেন দারুণ মত্ততা! সমর মিত্র চলিয়া আসিলেন···

বেহালা থানায় আসিয়া বেশভূষা বদল করিয়া টু-শীটারে চড়িয়া একেবারে নিজের গৃহে। গৃহে ফিরিয়া দেখেন, বিভাস বসিয়া আছে।

সমর মিত্র বলিলেন—এইখানে চান্টান্ করে রেডি থাকো বিভাস! বেলা এগারোটায় জাল টেনে রুই-কাতলা-চেতল নয়, তিমি তুলবো একটা নয়···তিমির ঝাঁক একেবারে!

সমর মিত্রকে বিভাস কখনো এমন উল্লসিত উচ্ছ্বসিত দেখে নাই···বিভাস যেন হতভম্ব!···

বেলা এগারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী···বিভাসকে দূরে রাখিয়া সমর মিত্র দাঁড়াইয়াছিলেন হাইকোর্টের পূব-দিককার ফটকের অন্তরালে···

পনেরো মিনিট পরে দেখেন, বলাই ক্লার্কের সঙ্গে ভগীরথ ও চুণী দত্ত আসিতেছে। তিনজনে হাইকোর্টের ফটক দিয়া ভিতরে আসিল···তারপর বাঁ-দিক দিয়া চলিল কমিশনার-অফিসের দিকে।

সমর মিত্র আসিয়া কমিশনারের অফিসের বাহিরে দাঁড়াইলেন···দশ মিনিট···

দশ মিনিট পরে বলাইয়ের সঙ্গে চুণী দত্ত এবং ভগীরথ বাহিরে আসিল। বলাইয়ের হাতে এফিডেভিট।

সমর মিত্রের বুকে আশার স্পন্দন···

সমর মিত্র বলিলেন,—এই যে বলাই বাবু···বৃকোদর বাবু এসেছেন ?

বলাই বলিল—হ্যাঁ স্যর।

সমর মিত্র বলিলেন—এফিডেভিট সই হলো ?

বলাই বলিল,—হ্যাঁ, স্যর···

বলাই চেনে না সমর মিত্রকে—তবু যেভাবে সহাস্য মুখে কথা কহিল, এটর্ণি অফিসের পাকা ক্লার্ক ভিন্ন তেমন সপ্রতিভ আর কেহ হইতে পারে না!

—কিসের এফিডেভিট ?

—লেটার্স অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নিচ্ছেন ইনি···

ভগীরথ এবং চুণী দত্ত দাঁড়াইল না, বলিল—আমরা অফিসে আছি বলাই বাবু।

—যান স্যর, আমার বকশিস্‌টা ভুলবেন না।

—না, না—বলিয়া চুণী দত্ত এবং ভগীরথ চলিয়া গেল।

তারা চলিয়া গেলে সমর মিত্র বলিলেন,—এফিডেভিটখানি দেখতে চাই বলাই বাবু ···আমি পুলিশ-অফিসার।

বলাইয়ের বুক ধক্‌ করিয়া উঠিল!

সমর মিত্রের হাতে এফিডেভিট দিল। সমর মিত্র দেখেন, বাঃ, এফিডেভিট সহি করিয়াছে কান্তিভূষণ রায়! ঐ দুরাত্মা ভগীরথ··· ?

সমর মিত্র বলিলেন—কান্তি কার নাম ?

বলাই বলিল—ঐ যে রোগা ভদ্রলোকটি···

সমর মিত্র হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন—হুঁ···ওর নাম না ভগীরথ? বেহালায় থাকে ?

বলাইয়ের মুখ চকিতে পাংশু বিবর্ণ!

সমর মিত্র বলিলেন—জালিয়াতী!

বলাই নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছিল, সমর মিত্র বলিলেন—না···যাবে না। You are under arrest···(তোমাকে গ্রেফতার করিলাম)···তোমাদের অফিস সার্চ করবো। হয়তো মনিব-শুদ্ধ গ্রেফতার!

বলাই বলিল,—আজ্ঞে, আমি কিছু জানি না স্যর···অফিসের মক্কেল···নাম বললেন কান্তি বাবু।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

সমর মিত্র তখনি ইঙ্গিত করিলেন। একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর, দুজন জমাদার চকিতে যেন মাটী ফুঁড়িয়া সামনে আসিয়া উদয় হইল। সাব-ইন্‌সপেক্টরের নাম হিমাংশু হেস্টার ষ্ট্রীটের সেকেণ্ড অফিসার। আগে হইতে সমর মিত্র তাদের এখানে মোতায়েন রাখিয়াছেন।

তারপর সকলকে লইয়া সমর মিত্র আসিলেন বৃকোদর মল্লিকের অফিসে। বৃকোদর, ভগীরথ, চুণী দত্ত সকলে গ্রেফতার হইল। অফিস সার্চ হইল। সার্চ করিয়া এ ব্যাপারের কাগজপত্র লইয়া সমর মিত্র বাহির হইলেন,—বেলা তখন দুটা বাজে।

তারপর লালবাজার-যাত্রা···

নিমেষে হুলস্থুল কাণ্ড···

বাহিরে আসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—চিনতে পারেন ভগীরথ বাবু? সকালে গিয়েছিলুম···বেহালার বাড়ী বেচবেন, আমাকে আড়াইশো টাকা নিয়ে যেতে বলেছিলেন!

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো চুণী দত্ত এবং ভগীরথ সমর মিত্রের পানে চাহিল···

এই লোকটাই?

নিষ্ফল আক্রোশে দু'জনে মনে-মনে গর্জাইতে লাগিল।

লালবাজারে আসিয়া ভগীরথের নামে চার্জ লেখানো হইল—কান্তিভূষণ সাজিয়া মিথ্যা এফিডেভিট সহি করিয়া প্রতারণার প্রয়াস্—এবং চুণী দত্ত, বৃকোদর ও বলাইয়ের নামে চার্জ হইল, সে-কাজে জানিয়া-শুনিয়া ভগীরথকে সাহায্য করা···

বিশুকে থানায় আনা হইল। বিশু ওয়াটগঞ্জ থানায় সুনীলের কাছে যে এজাহার দিয়াছিল, তাহা হইতে বহু চার্জের সন্ধান মিলিল। বিশুকে কোর্টে লইয়া গিয়া সুনীল দুপুর-বেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কনফেসন্ রেকর্ড করাইয়া লইয়াছিল!

চুণী দত্তকে বিশু সনাক্ত করিল। চুণী দত্তর আসল নাম বঙ্কিনাথ দত্ত। সে এই চক্রান্ত-নাটকের নাট্যকার এবং ভগীরথ এ-নাটকের প্রোডিউসার!

এই চুণী দত্তই ফণী বাবুর মৃত্যুর পর পরামর্শ দেয়, কান্তি মারা গিয়াছে, তার হাতে লোক আছে, বেহালা এমেচার নাট্য-সমিতির ড্রামাটিক-ডাইরেক্টর এবং রূপসজ্জায় ওস্তাদ ভগীরথ। তার অবস্থা অন্নভক্ষ্য ধনুর্গুণ···কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলে তাকে লইয়া চুণী দত্ত যে কি না করিতে পারে!

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—সে নাটকের রস পান করে আমরা কৃতার্থ হলুম!

তারপর সমর মিত্র চাহিলেন চুণী ওরফে বঙ্কিনাথ দত্তর দিকে···বলিলেন—তোমার বাড়ী সার্চ করবো। আমার সঙ্গে যেতে হবে।···তোমার ঠিকানা আমি জানি···সন্ধানে বেরিয়ে ছিলুম···তারপর তোমাকে দেখলুম ঠন্‌ঠনের মোড়ে···বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছো। কাজেই বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করা হয়নি!···এখন চলো···

চুণী ওরফে বঙ্কিনাথ দত্ত বলিল—আমি আর বাড়ীমুখো হবো না···

সমর মিত্র বুঝিলেন, সেখানে সেই মেয়েকে রাখিয়াছে…পাছে সে মেয়ের উদ্ধার সাধন হয়…

সমর মিত্র তখন চাহিলেন ভগীরথের পানে, কহিল—তুমি যাবে আমার সঙ্গে? যদি ভালো চাও, চলো। বুঝেছি, তোমার দিন চলে না…এই বঙ্কিনাথের পাল্লায় পড়ে তুমি নিজের গলায় নিজের হাতে দড়ি এঁটেছো! সব কথা যদি খুলে বলো, সাজা সম্বন্ধে সুবিধা হতে পারে!…

এই পর্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন…তারপর বলিলেন—কোথা থেকে কোন্ পর্যন্ত জাল ফেলেছো, আমার তা জানতে বাকী নেই। দুনিয়া ভুলে ক'দিন তোমাদের পাছু নিয়েছি! তোমায় একটা চান্স দিচ্ছি, ভগীরথ, লাষ্ট চান্স…এ চান্স যদি ত্যাগ করো, তোমার অনন্ত দুর্গতি হবে। বঙ্কিনাথ বাবু তোমার ভালো করতে পারবেন না…উনি যে রকম কৃতী পুরুষ, আমাদের বাঙলাদেশ ওঁকে আর বুকে ধরে রাখতে পারবেন না…হয় ফাঁশি-কাঠ, না হয় এ্যাণ্ডামান দ্বীপ…ওঁকে ডাক দেছে!

ভগীরথ লোকটা নিতান্ত নিরীহ! সে বলিল—আমি যাবো…

বন্দী বঙ্কিনাথ নাটকের দুরন্ত ভিলেনের মতো গর্জিয়া উঠিল,—কাওয়ার্ড…বেইমান…

ভগীরথ বলিল—বেইমান কিসে! আমি গেঁয়ো জংলী মানুষ! তুমিই তো আমার কানে মন্তর দিয়েছিলে! কে কান্তি, কে ফণীবাবু…তাদের বিন্দুবিসর্গ জানি না। হ্যাঁ, আমি যাবো ওঁর সঙ্গে। সেই যে ভদ্রলোকের মেয়েটিকে এনে ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছো…তোমাকে পই-পই করে বলেছিলুম…এ কাজ করো না! জানো, সেই অবধি তোমার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমি…

বঙ্কিনাথের দু' চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে! ভগীরথ দেখিল। কিন্তু ও-আগুন এখন আর তার কিছু করিতে পারিবে না! সে নিজে যে আগুনের হ্রদে পড়িয়াছে…বঙ্কিনাথের চোখের আগুন তার কাছে এখন বরফের মতো ঠাণ্ডা! ওর চোখের ও আগুনে আঁচ নাই, ঝাঁজ নাই!

ভগীরথ চাহিল সমর মিত্রের পানে, বলিল—চলুন স্যর…

বঙ্কিনাথের বাড়ী ঝামাপুকুরে ব্রজনাথ মিত্তিরের লেনে। সে বাড়ীতে মেয়েকে পাওয়া গেল…বিশীর্ণ মলিন মূর্তি…যেন চাঁদের জ্যোৎস্নার উপরে মেঘের কালো আবরণ!

মেয়েকে উদ্ধার করিয়া সমর মিত্র তাকে বিভাসের হাতে দিলেন। বলিলেন—এঁর ষ্টেটমেণ্ট পরে হবে। মেয়েকে তুমি এখনি ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও…

চার দিনের মধ্যে এদিককার এনকোয়ারি চুকিল। মেয়েকে চুণী দত্ত আনিয়াছিল…যার হাতে চিঠি পাঠাইয়া আনিয়াছিল, তাকে পাওয়া গেল না। না পাওয়া গেলেও প্রতিমা বলিল, একখানা নৌকায় তাকে তুলিয়া মাঝ-গঙ্গায় আসিয়া এই দুরাত্মা চুণী দত্ত তাকে বলে…এক কান্তি গিয়াছে, তার জায়গায় নূতন কান্তির রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করো ইত্যাদি…

নানা চার্জ লিখিয়া নানা চার্জে তিন-চারিটা কেশ্ করিয়া আদালতে আসামী চালান্ দেওয়া হইল।···

বিশুর কাছে সন্ধান মিলিয়াছিল—কি করিয়া সে-লাশের মৃত্যু হয়! ডায়মণ্ড হার্বারে মেয়ে-চুরির ব্যাপারে মস্ত প্রতিবাদ তুলিয়া লাশ সেখানে গিয়া বাঁকিয়া বসে! বলে,—না, এ কাজে যাবো না। মেয়ে ফিরাইয়া দাও···যত বদমায়েসী করি, মেয়ে-লোকের ওপর কখনো পীড়ন করি নাই! তাহাতে বদ্যিনাথ তাকে আক্রমণ করে···

মৃত্যু? বিশু বলিল, বদ্যিনাথ ছিল এক চীনা বদমায়েসের সাকরেদ।···বহু দুষ্কর্ম করলেও চিরদিন ফাঁকে থাকিত; কখনো ধরা পড়ে নাই। চীনা-গুরুর কাছে সে এক দাওয়াই শিখিয়াছিল—একটা গুঁড়া···তার নাম এ্যালংচিং। বিষ। একটুখানি জলে ঐ গুঁড়া মিশাইয়া যদি কারো দেহে মাখানো যায়, লোমকূপের আবরণ ভেদ করিয়া সে-বিষ রক্তে মিশিবামাত্র চকিতে হার্টের গতি বন্ধ হইয়া মৃত্যু!···

শুনিয়া সমর মিত্র স্তম্ভিত! এমন বিষও আছে!

লাশের হত্যার ব্যাপারে বৈদ্যনাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পাওয়া গেল। সমর মিত্র বুঝিলেন, ফণীবাবুর মৃত্যুও ঐ বিষে হইয়াছিল, নিশ্চয়! এবং সে মৃত্যুর মূলে ছিল নিশ্চয় এই বদ্যিনাথ!

কিন্তু তার প্রমাণ মিলিল না···

বহু চার্জে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা চলিল। বিশু পুলিসের তরফে সাক্ষ্য দিয়া এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। বিচারে বদ্যিনাথের হইল ফাঁশি—অন্য পাজীগুলার জেলের ব্যবস্থা হইল! বৃকোদর জেলে গেলেন—দু' বৎসরের জন্য। ভগীরথের জেল হইল এক বৎসর···আর বলাইকে জজেরা খালাশ দিলেন। বলিলেন, গোলাম মাত্র··· ভগীরথের আসল নাম জানিবার তার প্রয়োজন ছিল না; আসল নাম সে জানিত বলিয়া অকাট্য প্রমাণের অভাব!

বিভাস?

নাটকের শেষ অঙ্কে বা উপন্যাসের শেষের পরিচ্ছেদে যেমন সেই প্রতিমার সঙ্গে হইল বিভাসের শুভ-বিবাহ এবং সে বিবাহে বর-কর্তা সমর মিত্র···

মনমোহনবাবু, ধরণী, সুনীল, ইমদাদ, পীরু জমাদার—এ বিবাহে তারা সকলে আসিয়াছিল বৈ কি! শুধু আসা? বরের বাড়ী ক'দিন ধরিয়া তারা সকলে যে-আনন্দ করিয়াছিল, সে আনন্দের স্মৃতি···বিভাস আর প্রতিমার মনে চিরদিন স্বর্ণ-লেখার মতো প্রদীপ্ত থাকিবে!

জীবন-সাথী

এক

বেলা প্রায় এগারোটা। কালীঘাট হইতে যে-সব ট্রাম-বাস এ সময় ধর্মতলার দিকে আসে, সেগুলোয় তিল-ধারণের ঠাঁই থাকে না। লোক একেবারে ঠাশা-ঠাশি—বসিয়া, দাঁড়াইয়া, ঝুলিয়া, হেলিয়া কোনো মতে অফিসে পৌছিবার চেষ্টা সকলের।

এমনি একখানা বাস আসিয়া যখন ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়াইল, তখন ভিড়ের সঙ্গে ধোপদোস্ত পোষাক-পরা এক তরুণীও বাস হইতে নামিল। তরুণীর হাতে ছোট একটা ভ্যানিটি। বাস হইতে নামিয়া তরুণী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোডের দিকে চলিল······বেশ দ্রুত পায়ে।

কর্পোরেশন অফিসের সামনে উঁচু চার-পাঁচতলা মস্ত বাড়ী। দ্বারের সামনে সিঁড়ি এবং লিফ্‌ট্‌। সেই বাড়ীর দ্বারে প্রবেশ করিয়া লিফ্‌টে চড়িয়া তরুণী সোজা তেতলায় উঠিল। তেতলায় বড় ঘরের দ্বারে পিতলের ফলক আঁটা—তাহাতে ইংরেজী হরফে লেখা—দী ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

তরুণী সেই দ্বার দিয়া একটা বড় হলে প্রবেশ করিল। হলের মাঝামাঝি কাঠের পার্টিশন তুলিয়া পায়রার খোপের মতো অনেকগুলো কামরা করা হইয়াছে। তাহারই একটা কামরায় তরুণী প্রবেশ করিল। কামরায় টেবিলের সামনে হাইব্যাক চেয়ারে বসিয়া সাহেবী পোষাক-পরা এক মোটা বাঙালী ভদ্রলোক। তরুণীকে দেখিয়া তিনি ডাকিলেন—সুনন্দা···

সে-আহ্বানে তরুণী তাঁর পানে চাহিল।

—বাঙালী সাহেবটি দেওয়ালে সংলগ্ন বড় ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন—আমাদের ঘড়িটা বোধ হয় ফাষ্ট যাচ্ছে, না? তোমার ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ছাখো তো একবার।

মুখে অপ্রতিভ হাসি···সুনন্দা কহিল—একটু দেরী হয়ে গেছে।

বাঙালী সাহেব বলিলেন—বাসে বড্ড ভিড়,—তাই?

সুনন্দা কহিল—তা নয়। আমার নিজের একটু কাজ ছিল, মিষ্টার বোস।

বাঙালী সাহেবের নাম জটাই বোস। এ-ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

বোস বলিলেন—শুধু আজ নয়—উপরি-উপরি চারদিন তুমি লেট্‌! নিজের কাজে রোজ এমন দেরী করলে কোম্পানির কাজের একটু অসুবিধা হয়-না?

কথার হুলটুকু মনে বিঁধিল। সুনন্দা কহিল—অফিস থেকে রোজই আমি বেরুই সন্ধ্যা ছ'টায়। পাঁচটার পর এক ঘণ্টা থাকি,—সে-জন্য আমি কোনো কথা তুলি না কোনোদিন!

মুখে বক্র হাসি···বোস বলিলেন,—ইংরেজী ভাষায় বলিলেন—তোমার অপার করুণা! যাক, সামনে পূজো···জানো তো, কতকগুলো নতুন বই ছেপে বার করতে

হচ্ছে! পুজোয় বোনাস্ দেবে কোম্পানি—সে-কথা সকলকে জানানো হয়েছে। তুমিও তা জানো নিশ্চয়!

সংক্ষেপে সুনন্দা কহিল—জানি।

বলিয়া সে নিজের ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসিল। টেব্‌লের উপর রাশীকৃত প্রুফ। ফ্যানের সুইচ্ খুলিয়া সুনন্দা প্রুফের তাড়া খুলিল।

নূতন কোম্পানি। সবে এই বৈশাখ মাসে খোলা হইয়াছে। জটাই বোসের অঢেল পয়সা—তার ওপর লিখিবার সখ প্রচণ্ড। কোনো প্রকাশক তার বহি নিজে হইতে ছাপিতে চায় না—নামজাদা মাসিকে বহু গল্প পাঠাইয়া সেগুলো প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা করিতে পারে নাই—তাই আক্রোশে জটাই বোস এই কোম্পানি খুলিয়াছে। একখানা সাপ্তাহিক কাগজও বাহির করিয়াছে। তাছাড়া নিজের এবং বন্ধু-বান্ধবের লেখা কখানি গ্রন্থ ছাপিয়া কোম্পানির কাজ সুরু করিয়াছে। তার উপর এই পূজার সময় মোটা টাকা দাম দিয়া ক'জন নামজাদা লেখকের লেখার প্রকাশ-স্বত্ব কিনিয়া ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোম্পানির কাজে সুবিধার জন্য দুজন বাঙালী তরুণীকে অফিসের কাজে লইয়াছে। সুনন্দা আই-এ পাশ করিয়া সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল, সংসারের আশা ত্যাগ করিয়া কূল খুঁজিতেছিল—গতানুগতিক পথে চলিতেও তার বাধিতেছিল। নিজের অল্প অভিজ্ঞতায় সংসার-সাগরে সে শুধু লোনা জলের স্বাদ পাইয়াছে—মণি-রত্ন কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না! মনও তাই লবণাক্ত হইয়া আছে! নিজে একা থাকিয়া জীবন কাটাইবে, নানা ঘটনায় এমনি বাসনা তার মনে বেশ আঁটিয়া বসিয়াছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই ফার্মে সে দরখাস্ত পেশ করে এবং তাকে বেশ 'স্মার্ট' দেখিয়া জটাই বোস একশো টাকা মাহিনায় তাকে গ্রহণ করিয়াছে।

সুনন্দার কাজ প্রুফ দেখা এবং বৈকালের দিকে কোম্পানির প্রকাশিত বইগুলার বিক্রয় ক্যান্‌ভাস্ করা। চেহারা খুব সুশ্রী না হইলেও কথাবার্তা কহিতে জানে, বুদ্ধিতে দীপ্তি আছে—বেশভূষা পরিচ্ছন্ন—কাজেই ক্যান্‌ভাসিংয়ের কাজ তার দ্বারা মন্দ চলিতেছে না। অপর তরুণীর নাম গীতা দত্ত। গীতার প্রধান কাজ ক্যান্‌ভাসিং এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।

সুনন্দা থাকে মনোহর-পুকুরে। চার-তলা একটা বাড়ীর তিন তলায় দেড়খানা কামরা লইয়া সে বাস করে। কোনো কূলে আত্মীয়স্বজন কেহ নাই! কোম্পানির কাজ করিয়া যেটুকু সময় পায়, খোলা জানালা দিয়া মুক্ত নীল আকাশের পানে চাহিয়া সে আকাশ-কুসুম চয়ন করে,—করিয়া সে-কুসুমে মালা গাঁথে! এমনি করিয়া তার দিন কাটে। কোনোদিক দিয়া কোনো অভিযোগ তোলে না।

গভীর মনোযোগে সুনন্দা প্রুফ দেখিতেছে, পাশে আসিয়া দাঁড়াইল বিভোর দত্ত। বিভোর এ-কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর। তার পয়সা আছে। বিলাতে না গেলেও পাকাসাহেব···বিলাতী পোষাক পরে এবং কথা যা বলে, তার মধ্যে বারো-আনা ইংরেজী মিশানো থাকে। জটাই বোস বন্ধু—দত্তকে কিছু শেয়ার গছাইয়াছে।

বিভোরের কাজ-কর্ম নাই, তাই যখন-তখন অফিসে আসে, সকলের সঙ্গে আলাপ করে, কথা কয়—সুনন্দার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মিয়াছে।

সস্মিত কণ্ঠে বিভোর কহিল—কোন্ বইয়ের প্রুফ দেখা হচ্ছে সুনন্দা দেবী ?

সুনন্দা কহিল,—বড় সাহেবের নতুন গল্পের বই।

বড় সাহেব জটাই বোস।

সুনন্দার কথায় মৃদু হাস্যে বিভোর একবার জটাইয়ের কামরার উদ্দেশে বক্র কটাক্ষে চাহিল, চাহিয়া পরে কহিল—নিরেট গর্দভ! হুঁ! এ চাকরির চেয়ে ঢেঁকিতে চাল কোটার কাজ কি বেশী নীরস, সুনন্দা দেবী ?

কথার অর্থ না বুঝিয়া সুনন্দা বিভোরের পানে চাহিল, নিমেষের জন্য। কহিল—তার মানে ?

হাসিয়া বিভোর কহিল—সব কথার কি সরলার্থ থাকে সুনন্দা দেবী। এর মানে-টানে নেই।···তবু যদি মানে শুনতে চান, মানে বলি। চাল কোটা কাজটা কি জটাইয়ের লেখার লেখা কাটার চেয়ে নোঙরা ? লেখাপড়া ও শিখলো কবে—যা-তা লেখা···স্রেফ রাবিশ!

কোনো কথা না বলিয়া সুনন্দা প্রুফের কাগজে মনোনিবেশ করিল। বিভোর ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বলিল—ও নিজে লেখে···সত্যি? না, পয়সা দিয়ে আর কাকেও দিয়ে লেখায় ? তাছাড়া কি এমন মূল্যবান্ জিনিষ লেখে ? দেখি একটা শ্লিপ পড়ে···যেটা আপনার দেখা হয়েছে···

সুনন্দার উত্তরের তোয়াক্কা না করিয়াই বিভোর কাটা প্রুফের একটা গেলি হাতে তুলিয়া লইল; তার কটা ছত্রে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল—ননসেন্স! এই যে লেখা···এতে কি বলতে চায় ? এ-সব কথার মানে ? হুঁ! দুটো কথা এক সঙ্গে জুড়তে জানে না, অথচ সখ, নভেলিষ্ট হবে! না···স্বায়ত্ত-শাসনের সব আশা এই জানোয়াররাই দুশো-বছর পেছিয়ে দেবে, দেখছি। আবার সেই বর্বর যুগে প্রত্যাবর্তন! আচ্ছা, আপনি প্রুফ দেখলেন তো, এ-লাইনটার মানে কি বুঝলেন, বলতে পারেন ?

চকিতের জন্য প্রুফ-দেখা রাখিয়া সুনন্দা সকৌতুক দৃষ্টিতে বিভোরের পানে চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সে আদার ব্যাপারী, এসব বড় জাহাজের খবরে তার কি প্রয়োজন! মাস গেলে একশো টাকা পাওয়া লইয়া তার কাজ! এ' টাকা না পাইলে তার দিন চলিবে না! অতএব···

কিন্তু বিভোরের যেন রোখ চাপিয়াছে! সুনন্দার প্রুফের কাগজ টানিয়া সে কহিল—প্লীজ—প্লীজ (দেখাইয়া) দয়া করে এর মানে আপনাকে বলে দিতে হবে। প্রুফ দেখচেন···বই হবে···সে বই পাঁচজনে পড়বে—পড়ে মানে বোঝা চাই তো!

অপ্রতিভ ভাবে সুনন্দা কহিল—আমায় ওসব কেন জিজ্ঞাসা করছেন, বিভোরবাবু ? আমি মাছি-মারা কেরাণী মাত্র। লেখা মিলিয়ে ভুল যা পাচ্ছি, কাটছি—'গ'-এর জায়গায় 'প', 'স'-এর জায়গায় 'ন'—এই নিয়ে আমার কারবার।

বিভোর কহিল—না, আমি ছেড়ে দেবো না! দেখাচ্ছি! এইসব যা-তা লিখে জাঁক কত! আমরা ভাবি, সত্যি বুঝি মস্ত লেখক···বথামি না করে বই লেখে! বড় বড় কথা কয়। বলে, বঙ্কিম চাটুয্যে কিস্যু নয়! রাজ্যের অচল মরা-সাহিত্য লিখে গেছেন! রবীন্দ্রনাথ মামুলি! এমনি সব কথা। সে-সব কথার মানে হয় না। শুনলেই মনে হবে—হদ্দ নিরেট। একদম সাহিত্যের হাতী বনেছে! যাকে খুশী শুঁড়ে জড়িয়ে গদিতে বসাচ্ছে, যাকে দেখতে পারে না, তাকে গদিচ্যুত করছে! আরে বেশ তো বাপু, পৈতৃক অর্থ যা আছে, বৈঠকখানায় শুয়ে গড়া আর মোসাহেব প্রতিপালন কর্ গিয়ে—বাংলা দেশের বনেদি চাল যা আছে, তাই নিয়ে থাক্···তা নয়, বই লিখছে!

সুনন্দা সে-কথায় কর্ণপাত করিল না; এক মনে নিজের কাজ করিতে লাগিল।

প্রুফের গেলিটা লইয়া বক্‌বক্ করিতে করিতে বিভোর গেল জটাইয়ের টেবিলে।

কদিন পরের কথা।

জটাই বোসের নূতন গল্পের বই বাহির হইয়াছে। অফিসের বাঁধা রুটিন ধরিয়া সুনন্দা আর-একটা বইয়ের প্রুফ দেখিতেছিল, জটাই আসিয়া কহিল—কি করছো সুনন্দা?

সুনন্দা কহিল—"তিলক-মঞ্জরী" বই ছাপা হচ্ছে, তার প্রুফ···

জটাই কহিল—ঐ চণ্ডীদাস সামন্তর লেখা তো!···তা ও বই এখন রাখো. রেখে একবার এসো। একটা জরুরি কাজ আছে।

মনিবের হুকুম, সুনন্দাকে আসিতে হইল।

জটাই কহিল—একটু কাজ করতে হবে।

সুনন্দা কহিল—বলুন।

জটাই কহিল—মানে, আমার ঐ নতুন বইখানা, ঐ "ডাফোডিল-মালা"—যেটা নতুন বেরুলো···

সুনন্দা কোনো জবাব না দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জটাইয়ের পানে চাহিয়া আছে।

জটাই কহিল—ওর একটা ভালো সমালোচনা লিখে দাও দিকিনি। আমি নিজে একটা লিখেছি! সে-সমালোচনা আমার নিজের কাগজে বেরুবে। সমালোচকের নাম থাকবে অবশ্য—বীরেশ্বর চক্রবর্তী। তার একটু নাম-ডাক আছে সমালোচক বলে। তা তাকে দিয়ে কিছুতে লেখাতে পারলুম না। ভারী গুমর। বলে, সময় পাচ্ছি না ভাই!—অগত্যা নিজেই একটা সমালোচনা লিখে ফেললুম।

কুণ্ঠা-বিজড়িত স্বরে সুনন্দা কহিল—তাঁর নামে সমালোচনা বেরুলে তিনি যদি সে-কথা অস্বীকার করেন?

জটাই কহিল—ক্ষেপেছো! এর দরুণ নগদ পনেরোটি টাকা তাকে দিচ্ছি। এই তার পেশা। কাগজওয়ালারাও জানে না—আড়াল থেকে ব্যবস্থা হয়। যে-লেখক বা প্রকাশক নগদ-কিছু দেয়, তার বইয়ের ভালো সমালোচনা করে; আর যার কাছ থেকে

পয়সা পায় না, তার কপালে তেঁতুল গোলা! থিয়েটারের প্লে, বায়োস্কোপের ছবি—সমস্ত সমালোচনার ব্যাপারে ওর এই প্রিন্সিপ্‌ল্‌···

এ-সব কাহিনী সুনন্দার ভালো লাগিতেছিল না। পরচর্চা তার ধাতে কেমন সহে না। সারা জীবন দুঃখ-কষ্টের সহিত লড়িয়া আসিতেছে! তার ফলে বোধ হয় পরের আঘাত খাইয়াই প্রকৃতি এমন ধীর শান্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—অপরকে আঘাত দিতে সুনন্দার বাধে।

সুনন্দা কহিল—আমায় কি করতে হবে, বুঝিয়ে দিন।

জটাই কহিল—তোমার প্রুফ দেখা কাজ আর-কাকেও দিচ্ছি আমি। প্রুফ রেখে তুমি আমার ঐ 'ডাফোডিল-মালা' বইয়ের একটা সমালোচনা লিখে দাও। খুব প্রশংসা করবে—লিখবে মোপাসা, শেকভ, রবীন্দ্রনাথ—এদের গল্প ফাঁকি! ছোট গল্পের যা জান, সে-সব গল্পে তা নেই। ছোট গল্পের যা-কিছু লক্ষণ, তা এই প্রথম প্রকাশ পেলো শ্রীযুক্ত জটাই বোসের রচনায়! শেষে আর একটা লাইন যোগ করতে পারো—যে, বাঙলার সিনেমা-ওয়ালারা যা-তা গল্প নিয়ে বাঙলা ছবি তুলছে, তারা যদি ছবির মতো ছবি করতে চায়—পশার করতে···পয়সা পেতে চায়,···যে-ছবি চলবে এমন যদি চায় তো জটাই বোসের শরণ নিক্। এমনি পাঁচ রকম গুছিয়ে লিখে ফ্যালো—লক্ষ্মীটি! তারপর আমি টীকা-টিপ্পনী দিয়ে দেবো! বুঝলে, এর জন্য তুমি অবশ্য কিছু পাবে—বেগার নয়!

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, সমালোচনা সে লিখিবে।

জটাই কহিল—আজই চাই। না হলে পূজা-সংখ্যা কাগজে বার করা দায় হবে।

সুনন্দা কহিল—চেষ্টা করে দেখি।···কিন্তু সমালোচনা তো কখনো লিখিনি!

জটাই কহিল,—ও-লেখা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কতকগুলো চেক্‌নাই কথা চাই। ব্যস্, সাহায্য পাবে'খন—আমি কতকগুলো কাগজ তোমায় দিচ্ছি—সমালোচনা লেখা কাগজ। তা থেকে বেছে-বেছে কথা নিয়ো। তবে যা লিখবে, গল্পগুলোর সঙ্গে যেন সে লেখার যোগ থাকে। অর্থাৎ সমালোচনা লেখা একটা আর্ট!···আচ্ছা, আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো! চাই কি, আমাদের সাপ্তাহিকে ফী-হপ্তায় তুমি ঐ বেতার-টেতারের সমালোচনাগুলো লিখো—regularly (নিয়মিত ভাবে)। তা লিখলে মাসে আরো দশ-পনেরো টাকা আয় বাড়িয়ে ফেলতে পারবে।···কি বলো?

মাহিনা বাড়িবার আশায় সুনন্দা খুশী হইল। মৃদু হাসিয়া সে কহিল—আচ্ছা···

কিন্তু লিখিতে বসিয়া বিপদ বাধিল। বিভোরের সেদিনকার সেই কথা মনে জাগিতেছিল,—এ কি লেখা! কোথাও সামঞ্জস্য নাই—ষ্টাইলও অপরূপ! প্রুফ দেখিতে বসিয়া শুধু সে ভুল কাটিয়াছে, রচনার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে নাই! ঐ যে "ষাঁড়াষাঁড়ির বাণ" গল্পে লিখিয়াছে—

"টুকরো ঝুরো আশাগুলো বটের ঝুরির মতো দীপকের মনের পাতালে গজিয়ে উঠছিল। সেগুলোর 'পরে সাহানার দরদ-ভরা প্রাণের রূপালি বাতাস না লাগায় সেগুলো ক্রমে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়ালো! মনে যেন আব গজিয়েছে।

অস্বস্তির চূড়ান্ত। সাহানা বসে গান গায়—দীপক তার মনের রন্ধ্রে আগুন জ্বালায়" ইত্যাদি।

সুনন্দা অস্থির হইয়া উঠিল! এ-কালের দু-চারিটা লেখা চাকরির দায়ে তাকে পড়িতে হয়! এমনি সব লাগসৈ কথার ঝাপটা চোখের সামনে দিয়ে ঘোড়সওয়ারের মত টগাবগ টগাবগ করিয়া ছুটিয়া যায়,—সেগুলো প্রাণী, বা কবন্ধ, বাঙলা ভাষা, না মাডাগাস্কারী বুঝা যায় না! কাজেই মনে কোনো আঁক কাটে না! লেখার জালে এ-কথাগুলোকে জটাই আশ্চর্যভাবে বন্দী করিয়াছে! সত্যই তো, এ-সব কথার অর্থ কি?

বহু আয়াসেও সে অর্থ বুঝিল না। জটাইয়ের তাগিদের স্লিপ আসিতে লাগিল। তাগিদের জ্বালায় পাঁচ-সাতটা সমালোচনা দেখিয়া তাহা হইতে দুর্বোধ্য কটা লাইন বাছিয়া সাজাইয়া এককলম লেখা সম্পূর্ণ করিয়া সুনন্দা সেটা আনিয়া জটাইয়ের সামনে ধরিয়া দিয়া কহিল—দেখুন তো, সুবিধা-মত হয়নি মনে হচ্ছে! তবু আপনি যদি কোনোমতে দাঁড় করাতে পারেন!

জটাই পড়িল, কহিল—বাঃ, সেই বিখ্যাত সমালোচক দুর্জয় বাবুর ষ্টাইলে পত্রচ্ছলে লেখা হয়েছে, তাঁর বাঁধা গৎ পর্যন্ত এতে আছে—

—"আমায় বই পাঠিয়েছো—ধন্যবাদ! কিন্তু এ কি কথা! সমালোচনা করে দিতে হবে? আমার যে ঐখানেই বাধে! পড়তে সাধ খুব কিন্তু যখনি মনে হয়, সমালোচনা লিখতে হবে, তখনি হেগেল, হাক্সলি, পোপোকাটাপেট্‌ল, মহীরাবণ সবাই যেন মাথার মধ্যে ডম্বরু বাজিয়ে বেতাল নাচ সুরু করে দেয়!"

দুই

পূজার ছুটি।

লোকজন ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়াছে। কেহ দেশে—কেহ সুদূর বিদেশে। যেন মুক্তির হাওয়া আসিয়াছে! কাজ, রুটিন—সব ছাড়িয়া চলো, ছুটিয়া চলো। বদ্ধ ঘরে বন্ধ নয়! এই জানা আকাশ, জানা বাতাসের মায়া ছাড়িয়া বাহিরে চলো···বাহিরে!

এ-ডাকে সুনন্দাও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না! সেভিংসব্যাঙ্কের পাশবহি বাহির করিয়া দেখিল, তারপর দেখিল, টাইমটেব্‌ল্।

দুনিয়ায় তার কেহ নাই। অথচ এই গণ্ডীর বাহিরে ঐ বৃহত্তর জগৎ—অজানা কত বৈচিত্র্যে তাহা পরিপূর্ণ! সেখানে কত সুখ, কত আনন্দ, কত আরাম! অবস্থা বুঝিয়া হিসাব মিলাইয়া সে চলিল রাঁচিতে।

কাছারির কাছে মোরাবাদির পথে মস্ত দোতলা বাড়ীতে বেঙ্গল হোটেল। ট্যাক্সি-ওয়ালা সুনন্দাকে আনিয়া সেই হোটেলের দ্বারে নামাইয়া দিল। বাঙালীর পরিচালিত হোটেল—প্রবাসী-জনের বাসের বেশ উপযোগী।

সপরিবারে বহু বাঙালী হোটেলে আসিয়াছে—কেহ-বা একা। দোতলায় বারো নম্বরের কাম্‌রায় সুনন্দা আস্তানা লইল। ভাড়া কম! খাওয়া-দাওয়া, চাকর-বাকরের ঝক্কি নাই। শুধু খাও-দাও, আর যত খুশী বেড়াইয়া বেড়াও! সুনন্দার বুকের উপর হইতে যেন পাথর সরিয়া গেল! দুনিয়ায় বিশ্রামের জন্য এমন ব্যবস্থাও ছিল!

কাহারো সঙ্গে আলাপ নাই—ভিড়ে সে মিশিতে পারে না। কাজেই দু'বেলা পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক—কোথায় সঙ্গী মিলিবে? তবে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখে, তার বয়সী মেয়েরা···হয় স্বামী, নয় মা-বাপ, ভাই-বোনের সঙ্গে হাসি-গল্পে আকাশ ভরিয়া কি আনন্দে পথে চলিয়াছে! তার মন হু-হু করিতে থাকে!

কেহ নাই, তার কেহ নাই! জগৎ-সংসারে সে একা। অতীত জীবনের পানে ফিরিয়া চাহিল। যতদূর দৃষ্টি চলে, কাহারো মুখ মনে পড়ে না! সে একা···একা! ঐ পাহাড়, ঐ বন-ফুল, ঐ সাঁওতাল নর-নারী, ঐ সুবর্ণরেখা নদী—দেখিয়া সে প্রচুর আনন্দ পায়। সেই সঙ্গে কত কথা মনে জাগে! এ আনন্দ সে কাহাকে জানাইবে? কাহার সঙ্গে কথা কহিবে? শুধু বাতাসে নিশ্বাস মেশে—সে হাঁটিতেছে, আর হাঁটিতেছে!

মনের খেয়ালে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন বহু দূরে একেবারে সেই জগন্নাথ পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছিল। নির্জন জায়গা—সীমাহীন শোভা!

ফিরিবার সময় নির্জন পথ। একা পা দুটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে সত্যই কষ্ট হয়। একখানা খালি রিক্‌শ আসিতেছিল—সেই রিক্‌শ ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া সুনন্দা হোটেলে ফিরিল।

হোটেলে তখন খাওয়া-দাওয়া চলিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া সুনন্দা ভৃত্যকে কহিল—আধ-ঘণ্টা পরে আমার খাবার পৌঁছে দিয়ো।

ভৃত্য কহিল—জী!

ঘরে আলো জ্বলিতেছে—অতি ক্ষীণ রশ্মি। পলিতা বাড়াইয়া আলোটুকু দীপ্ত করিয়া বিছানায় বসিয়া বিশ্রাম লইবে—বিছানায় বসিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। বিছানায় একজন পুরুষ মানুষ। লোকটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কে?

চমক ভাঙ্গিলে ঘরের চারিদিকে সে চাহিল। ঘর ভুল করিয়া আর-কাহারো ঘরে ঢোকে নাই তো?

না···তাহারি ঘর। ঐ আলনা—আলনায় তার শাড়ী-সেমিজ ঝুলিতেছে।—এ লোক তবে?

বদমায়েস? জানে, সে নারী, একা থাকে! তাই শয়তানী মতলবে···?

ক্রুদ্ধ রূঢ় স্বরে সুনন্দা কহিল—কে তুমি?

লোকটা জোরে নিশ্বাস ফেলিল—তারপর যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

সুনন্দা কহিল—শুনছো? বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে···নাহলে এখনি পুলিশে দেবার ব্যবস্থা করবো।

লোকটা তবু নড়ে না!

রাগে সুনন্দার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এমন বেয়াদব! সে তার পা ধরিয়া জোরে ঝাঁকানি দিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া লোকটা উঠিয়া বসিল। ভদ্র চেহারা, ভদ্র বেশ···দু'চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন! বয়স নেহাৎ অল্প নয়—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

বসিয়া বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে সে চাহিয়া রহিল—যেন, স্বপ্ন দেখিতেছে! সুনন্দা কহিল—আমার ঘরে···তুমি?

লোকটা কহিল—আপনার ঘর?

বিস্মিত কণ্ঠ। প্রশ্ন করিয়া সে চারিদিকে চাহিল—চাহিতে আচ্ছন্ন ভাব কতক যেন কাটিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—তাইতো···ইস্! আমায় মাপ করবেন! ভুল হয়ে গেছে···

কথার সঙ্গে সলজ্জ মৃদু হাসি। তারপর নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণেক নিশ্চল দাঁড়াইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া সুনন্দা মৃদু হাসিল। ও স্বর, ও দৃষ্টি, ও হাসি অপরাধীর নয়! হইতে পারে না! আঁচলের প্রান্ত পিন-মুক্ত করিয়া ব্লাউশ খুলিতে উদ্যত হইল। সহসা বাহির হইতে দ্বারে করাঘাত! আঁচলটা গায়ে তুলিয়া সুনন্দা কহিল—কে?

দ্বার খুলিল।

সেই লোক। দ্বার খুলিবামাত্র সে ঘরে ঢুকিল। তার মুখে সেই হাসি! সে কহিল—মাপ করবেন। ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার। নাহলে আপনি হয়তো নানা রকম ভাববেন···

সুনন্দা কোনো কথা না বলিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি কহিল—পাঁচদিন আগে আমি রাঁচিতে আসি। এসে বত্রিশ নম্বর কামরা দখল করি। পরশু মোটরে করে হাজারিবাগ গেছলুম, ভাড়া-মোটরে। আজ ফিরেছি। ফেরবার পথে ভারী ঝড় ওঠে—খুব কষ্ট পেয়েছি। তার উপর টিউব পাংচার! অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ৩২ নম্বর ভুল করে ১২ নম্বর কামরায় ঢুকেছিলুম। এমন ক্লান্ত যে জামা-কাপড় ছাড়বার ফুরসুৎ ছিল না। বিছানায় পড়বামাত্র ঘুমিয়ে পড়ি।···আশা করি, সহজ ভাবেই কথাটা বুঝবেন। এর মধ্যে সত্যই আমার কোনো অভিসন্ধি ছিল না।

সুনন্দা তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—নিষ্পলক দৃষ্টি!

লোকটি কহিল—এ-কথা বিশ্বাস করেছেন?

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, করিয়াছে।

লোকটি কহিল—তাহলে ক্ষমা করেছেন নিশ্চয়ই?

সুনন্দা আবার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—হ্যাঁ!

লোকটি কহিল—বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবো।···কমেডি অফ এরর্স—যাকে বলে ভ্রান্তি-বিলাস নাটক! ভাগ্যে লোক ডাকেননি! কেউ এ কথায় হয়তো খুশী হতো না—নিমেষে আমায় শয়তান বানিয়ে খোঁচায় জর্জরিত করে দিত!

কথাটা বলিয়া সে মৃদু হাসিল, হাসিয়া চলিয়া গেল।

সুনন্দা দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিল—কেমন যেন হতভম্ব ভাব।…

রাঁচিতে আসিয়া অবধি হোটেলের ভৃত্য-পরিজন ছাড়া কেহ তার সঙ্গে কথা কহে নাই। অজানার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা! পরিচয়! কিন্তু কি অদ্ভুত রকমে!… কল্পনাতীত ব্যাপার!…

সকালে উঠিয়া চা পান শেষ করিয়া সুনন্দা বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, দ্বারে করাঘাত।

দ্বার খুলিতে সেই ভদ্রলোক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন—রাত্রে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন—কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেননি!

সুনন্দার বিস্ময়ের সীমা নাই। সে হাসিল। ভদ্রলোকটির উপর মমতা হইল। ভারী বিনয়ী, সদালাপী মানুষ। সহসা সুনন্দার মনে হইল, ভদ্রলোক তার ঘরে অতিথি! সুনন্দা কহিল—আপনার চা আনতে বলবো?

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—আতিথ্য? আপনি-আমি, দু'জনেই এ জায়গায় অতিথি! কাজেই আমাদের মধ্যে আতিথ্য-ধর্ম-পালনের কোনো বালাই থাকতে পারে না। আপনি যদি কোনো দিন পায়ের ধুলো দিয়ে আমার ৩২ নম্বর কামরাকে চরিতার্থ করতে আসেন, চায়ের পেয়ালায় আপনাকে আমি অভ্যর্থনা করবো না। অতএব আপনিও তা করবেন না! যেহেতু সে-পেয়ালা ঐ একই ঝর্ণা থেকে ভরা হবে। চায়ের স্বাদে, বর্ণে বা গন্ধে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

কথাটুকু শেষ করিয়া ভদ্রলোক প্রীতি-ভরে সুনন্দার পানে চাহিলেন। সে-দৃষ্টির স্পর্শে সুনন্দার মন কেমন কাঁপিয়া উঠিল! ভদ্রলোককে কি-আতিথ্যে তৃপ্ত করিবে—ভাবিয়া কোনো হদিশ না পাইয়া সে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল!

ভদ্রলোক বুঝিলেন, বুঝিয়া কহিলেন—বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন?

সুনন্দা কহিল—হাঁ।

—কোথায় যাবেন?

মৃদু কণ্ঠে সুনন্দা কহিল—তার কোনো ঠিক নেই। যেদিকে পা চলে, যাই। কাজকর্ম নেই…সারাক্ষণ অবসর!

ভদ্রলোক সুনন্দার পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন—আপনি একা এসেছেন?

ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, হাঁ!

ভদ্রলোক কহিলেন—একটু চমৎকার লাগছে! বাঙালীর মেয়ের এই অকুণ্ঠা… তাই আমি কাল রাত্রে ভাবছিলুম—হঠাৎ এমন ব্যাপার? আপনার বাড়ীর লোক আপনাকে একা ছেড়ে দেছেন,—আশ্চর্য! স্বাধীনতার মস্ত ধ্বজা তুলে বেড়ালেও বহু পরিবারে দেখেছি, এ জায়গায় সেই আদিম সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়ায় স্বাধীনতার ধ্বজা নামিয়ে। নিত্য তাই দেখছি। তাই আপনার একা থাকা আমার এমন চমৎকার মনে হচ্ছিল!

এ-কথায় অনেকখানি দরদ! সুনন্দার সঙ্গহীন চিত্ত দরদে গলিয়া গেল! সে কহিল,—আমার অন্য উপায় নেই! আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই! আমি একা…

—একা!

ভদ্রলোকের মনে একটা করুণ সুরের আঘাত বাজিল। বহুক্ষণ সুনন্দার পানে স্থির-দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন—সুনন্দা তাঁর পানেই চাহিয়াছিল—তার চেতনা যেন বিলুপ্ত! সহসা খেয়াল হইল! অমনি সারা দেহ ঘিরিয়া লজ্জার থমথমে ভাব! সুনন্দা দৃষ্টি নামাইল।

ভদ্রলোক কহিলেন—আমারো কোনো কাজ নেই—আমিও এখানে একা। চলুন, বেড়িয়ে আসি…অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে!

সলজ্জ দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া সুনন্দা কহিল—না, এতে আর আপত্তি কি থাকতে পারে!

ভদ্রলোক খুশী হইলেন, কহিলেন—একা বেড়িয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না। এসে অবধি ক্রমাগত মনে হচ্ছিল,—ভুল করেছি একা এসে।…সেদিন তাই একাই একখানা গাড়ী ভাড়া করে হাজারিবাগ চলে গেলুম।…কিন্তু সেখানেও এই এক ব্যাপার—একা! ভালো লাগলো না একা বলে।

ভদ্রলোক হাসিলেন, তারপর কহিলেন—আমি না হয় বাইরে যাই। আপনি তৈরী হয়ে নিন।

সুনন্দা কহিল—আমি তৈরী আছি।…চলুন।

তিন

দু'জনে চলিলেন…মোরাবাদি পাহাড়।

সুনন্দা কহিল—ঘরের জানলা থেকে পাহাড়টি দেখা যায়। পাহাড়ের কোলে ঐ বাড়ী—দেখায় যেন আকাশের বুকে ফালি চাঁদ!

ভদ্রলোক কহিলেন—আপনি এ পাহাড়ে আসেননি কোনোদিন?

সুনন্দা কহিল—না। বাড়ী আছে বলে ভেবেছিলুম, প্রাইভেট জমি—সাধারণে আসতে পারে না।…তবে এ পথে এসেছি ক'দিন।

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—না। পাহাড়ে সকলের অধিকার এঁরা দেছেন! বাড়ীর অংশটুকু প্রাইভেট!

সুনন্দা কহিল—চলুন…দেখা যাক!

পাহাড়ের মাথায় ছোটখাট গুহা—ঘরের মত বিরামের ঠাঁই! পাহাড়ে দাঁড়াইয়া যেদিকে চাও, সুন্দর দৃশ্য! ঘর-বাড়ী, ক্ষেত, জলা, মাঠ…দূরে ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেগুলা যেন প্রহরী! সুনন্দা একান্ত মনোযোগে এ-সব দেখিতেছিল। কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে সে-বড় একটা আসে নাই—কাজেই এ দৃশ্যের বৈচিত্র্যে তার নয়ন-মন ভরিয়া গেল।

অদূরে একখানা বড় পাথরের উপর ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন,—হঠাৎ কহিলেন—একটা কথা বলবো, ভাবছিলুম···

সুনন্দা তাঁর পানে চাহিল। ভদ্রলোক কহিলেন—আপনি একা এখানে এসেছেন! বলছিলেন, পৃথিবীতে আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই···! এ-কথায় আমার মনে কেমন আঘাত লেগেছে। আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আপনার উপর খুব শ্রদ্ধা হয়েছে—শিক্ষায়-দীক্ষায় আপনাকে বাঙালী-মেয়েদের গৌরব বলে মনে আনন্দ বোধ করছি। তাই···মানে, আপনার পরিচয় জানবার জন্য একটু কৌতুহল···

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আমার পরিচয় এমন কিছু নয়···সে-পরিচয়ে নূতন কিছু নেই। খুব সাধারণ পরিচয়। আর-দশজন গরীব গৃহস্থ ঘরের মতোই। অত্যন্ত দরিদ্র···সহায়-সম্বলহীন···খানিকটা লেখাপড়া করবার সুযোগ পেয়েছিলুম বাবা বেঁচে থাকতে। ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়া কিছু শিখবো কিন্তু বাবা মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়া গেছে···মনের সে ইচ্ছাও গেছে। ভদ্রভাবে বাস করতে হবে। ভিক্ষা নয়, কারো গলগ্রহ নয়···অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য চাকরি করছি। সামান্য চাকরি। শিক্ষা-দীক্ষাও অতি-সামান্য। পৃথিবীকে যদি সাগর বলেন তো সে সাগরে আমি সামান্য কুটো···ভেসে চলেছি—কোনো কিছুতে লোভ নেই!

ভদ্রলোক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া ছিলেন। এ কথার অন্তরালে বেদনার যে সুর, ব্যথার যে আভাস, তাহা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করিল। তিনি কহিলেন—আমরা সকলেই সংসার-সাগরে কুটো···সেজন্য দুঃখ করবার কিছু নেই!

সুনন্দা কোনো জবাব দিল না—যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি অদূরে ঐ ছোট দুটা পাহাড়ের পানে। ভদ্রলোক নির্বাক।

নীচেকার দু'একটা বাংলো হইতে ছেলেমেয়েদের কলগুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে···

সহসা ভদ্রলোক কহিলেন—বসবেন না?···বসুন···এতখানি পথ এসেছেন···এই পাহাড়ে চড়া···ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন! আমি তো পারছি না, পা ধরে গেছে···তাই বসে পড়েছি।

তাঁর পানে চাহিয়া সুনন্দা কহিল—আমার জন্যই আপনার এতখানি কষ্ট হলো।

—না, না, কষ্ট কি! জীবনে আজ নতুন রকমের আনন্দ পেয়েছি···সত্যি! কাজকর্মে সারা জীবন এমন পরিশ্রান্ত···ডাক্তারদের কড়া তাগিদে খোলা হাওয়ায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্য আমাকে আসতে হলো। এসেও কাজের-দড়ি বাঁধা মন—মুক্তির কোনো আনন্দ পাইনি! সেই বাঁধনই যেন অটুট ছিল! আজ প্রথমে মনে হচ্ছে, মুক্তিতে সত্যই আনন্দ আছে! এত আনন্দ যে, তার তুলনা হয় না!

সুনন্দা বসিল। এ-সব কথা তার ভালো লাগিতেছিল। কথাগুলো কাজের কদর্য সুরে ভরিয়া ভারী নয় এবং এ-কথায় কোথাও কালো বাষ্পের আভাস নাই! ভদ্রলোকের কথায় সহজ-প্রাণের স্পর্শ!

ভদ্রলোক কহিলেন—আমি গায়ে পড়ে আলাপ করছি,—আপনার হয়তো বিশ্রী

লাগছে !···কাজেই নিজের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন···না'হলে হয়তো আমায় ভুল বুঝবেন।

সুনন্দার দৃষ্টিতে কৌতুহল ফুটিল। সুনন্দা তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোক কহিলেন—তেমন অবস্থাপন্ন ঘরে আমি জন্মাইনি, অবশ্য তা না-জন্মালেও আমার মনে ভয়ানক ambition—সেই প্রথম যৌবন থেকে। ঘটনাচক্রে এমন কতকগুলো সুযোগ পেলুম, যাকে লোকে বলে luck···ভাগ্য। বন্ধুরা হিংসা করে, কিন্তু এই ভাগ্য বা luck আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। কি কঠিন এ বাঁধন—পদে-পদে বাজছে! তাই মনের সে ambitionকে সজীব করে তুলতে শুধু ছুটছি আর ছুটছি,—সারাক্ষণ,—সে-ছোটায় ভাগ্যের ঐ দড়ির বাঁধন প্রতি পদে! যত ছুটি, ছোটার বিরাম মেলে না! আবার এ-ছোটার শেষে ঐ দড়ি ধরে অন্ধকার ঘরের কোণে ফিরে ফিরে আসি। নিত্য এই ছোটা আর ফেরা, ফেরা আর ছোটা—দিন-গুলো ভয়ানক একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, এমন কি প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। থেকে থেকে মহাপুরুষ শঙ্করাচার্যের কথা মনে পড়ে—

"কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ—
কস্য ত্বং বা কুতোঽয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ!"

এই বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে ইদানীং আমার মন তত্ত্ব-পিপাসু হয়ে উঠেছে! কোনো কাজে আরাম পাই না, সুখ পাই না···কেমন যেন ঔদাস্য, অবসাদ! এখানে এসেছি তাই। কিন্তু এসেও সেই বাঁধন-দড়ির টান প্রতি-নিমেষে অনুভব করছিলুম···

সুনন্দা সুগভীর কৌতুহলে পরম বিস্ময়ে ভদ্রলোকের কথা শুনিতেছিল—কথার সুরে বেদনার রেশ! এ-বেদনার সুর অবসরকালে তার কাণে প্রতিনিয়ত বাজে! কাজকর্ম ছুটাছুটির মধ্যেও যে শ্রান্তির নিশ্বাস···এ ভদ্রলোকটির কথাতেও যেন তেমনি! কিন্তু কোনো কথা সে বলিতে পারিল না—আতুর দৃষ্টিতে প্রাণের দরদ মিশাইয়া তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোক একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া কহিলেন—আপনাকে চাকরি করিতে হয়?

সুনন্দা মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ!

—জিজ্ঞাসা করতে পারি—কি চাকরি?

সুনন্দা কহিল—ক্যালকাটা পাবলিশার্স কোম্পানি আছে, নতুন হয়েছে···সেই কোম্পানিতে জেনারেল এ্যাসিষ্টাণ্ট—তাদের বই-বিক্রীর ক্যানভাশিংও করতে হয়!

সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টিতে ভদ্রলোক সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিলেন—একটা নিশ্বাস তিনি রোধ করিতে পারিলেন না!

নিশ্বাস ফেলিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—Drudgery (নীরস)···চারিদিকে তাই। মানুষের মনগুলো এর চাপে পিষে মলো! নাহলে এই সব মন দুনিয়ায় কত-কি

গড়ে তুলতো! আমি যে এই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, ঐ luck—যে-luck-এর জোরে পার্থিব বহু বাজে মানুষ টাকা রোজগার করে যশ-মান পায়! দুনিয়ায় যাকে বলে, success—সেই success-ই লোকে চোখে দেখে। কিন্তু মন যেমন ফাঁকা, আজীবন তেমনি ফাঁকা রয়ে গেল! লাক-এর ঠেলায় দুর্বারের পিছনে ছোটার বিরাম নেই! কি পাবার লোভে মত্ত হয়ে ছুটে চলেছি, আমার মন তা জানে না! অদ্ভুত জীবন! নয়?

মাথার উপর নীল নির্মল আকাশ রৌদ্রকিরণে ঝলমল করিতেছে—সহসা কোথা হইতে ছোট ছোট মেঘ আসিয়া সে রৌদ্রকিরণ ঢাকিয়া ফেলিতে চায়! সুনন্দার মনে হইল, ওগুলা মেঘ নয়—তাদের বেদনার নিশ্বাস! ধরণীর বিক্ষোভ এ নিশ্বাসে মিশিয়া আকাশের গায়ে মেঘ-বাষ্প জমাইয়া তুলিতেছে! বেদনা-ব্যথা-ভরা ধরণীর গায়ে ও রৌদ্রকিরণ যেন মানায় না! রৌদ্রের দীপ্তিতে যেন বিদ্রূপের নির্মম হাসি! কালো মেঘই যেন এই ব্যথা-ভরা ধরণীর যোগ্য আবরণ!

আরো অনেক কথা হইল—মনের নিষ্ফল সাধনার কথাই এ আলাপের অবলম্বন! তারপর ঐ ছোট-ছোট মেঘগুলো জমিয়া বাড়িয়া আকাশ ছাইয়া সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকুকে ঢাকিয়া যখন বৃষ্টির সম্ভাবনা জাগাইল, তখন ভদ্রলোক কহিলেন—বৃষ্টি নামবে, দেখছি। চলুন, ফেরা যাক!

এ-কথায় যন্ত্র-চালিতের মত সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাহাড় হইতে নামিয়া আবার সেই তরুশ্রেণী-ঘেরা ঘুটিংয়ের রাস্তায়। এ রাস্তা অতিক্রম করিবার পূর্বেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

ভদ্রলোক কহিলেন—ছুটতে পারবেন?

সুনন্দা সলিল—না হয় একটু ভিজলুম!

ভদ্রলোক কহিলেন—আইডিয়া মন্দ নয়।

দুজনে ভিজিয়া হোটেলে ফিরিল। ভদ্রলোক কহিলেন—আপাততঃ তাহলে বিদায় নম্বর-বারো!

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আমার নাম সুনন্দা।

ভদ্রলোক সুনন্দার পানে চাহিলেন। দুজনের দৃষ্টি মিলিল। ভদ্রলোক কহিলেন—আমি এখানে বত্রিশ নম্বর হলেও আমার নাম অশ্বিনীকুমার রায়।...গিয়ে স্নানাহার করুন। ওবেলায় যদি বৃষ্টি না থাকে তো বেরিয়ে অন্য কোনো পাহাড়ে ওঠা যাবে। কি বলেন?

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল—আচ্ছা!

চার

আলাপ নিবিড় হইয়া উঠিল। সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র—সব বিষয়ে আলোচনা হয়! সমাজের গতানুগতিকতা, বদ্ধ পচা সংস্কারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তীব্র করিয়া তুলিতে

অশ্বিনীর উৎসাহ সীমাহীন হইয়া ওঠে! সুনন্দা চুপ করিয়া সে কথা শুনিয়া যায়; সে-তর্কে, সে-আলোচনায় কোনো কথা গুঁজিয়া দেয় না। অশ্বিনীকে সে যত দেখে, তার কথা যত শোনে, সুনন্দার সারা চিত্ত ঘিরিয়া কেমন দরদ, প্রীতি, সহানুভূতি এবং তীব্র কৌতূহল জাগিয়া ওঠে! অতীত দিনগুলায় অশ্বিনী কিভাবে সংগ্রাম করিয়া ফিরিয়াছে—যুদ্ধশেষে গৃহ-শিবিরে কতখানি স্নেহ রচিত থাকে—কে বা তাহা ধরিয়া রাখে—এ অজানা রহস্যে আচ্ছন্ন! ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, অশ্বিনীকে প্রশ্ন করিবে,—এ যুদ্ধের পিছনে বিরামের কি ব্যবস্থা? কিন্তু সঙ্কোচ লজ্জায় কণ্ঠ বাধিয়া যায়—সে প্রশ্ন আর করা হয় না! চুপ করিয়া বসিয়া অশ্বিনীর কথা শোনে! সে কথায় বিচিত্র নূতন জগৎ মনের সামনে বিপুল চাঞ্চল্যে জাগিয়া ওঠে!

সেদিন বেলা নটায় আহারাদি সারিয়া হাজারিবাগে যাইবার কথা। অশ্বিনী মোটর ভাড়া করিয়াছে—দু'চারদিন ঘুরিয়া আসা যাক্। সুনন্দারও ছুটী ফুরাইতে বিলম্ব নাই!

মোটর হোটেল ছাড়িল বেলা সাড়ে নটায়। উঁচু-নীচু পথ বহিয়া সুবর্ণরেখার পুল পার হইয়া গাড়ী চলিল। দু'ধারে প্রকৃতি কি মাধুরী, কি শোভাই না বিছাইয়া রাখিয়াছে! দিগন্তপ্রসারী মাঠ—মাঠের প্রান্তে পাহাড়ের প্রাচীর, তরুশ্রেণী! পাহাড়ের বিরাট বাধা ঠেলিয়া কোথাও জলধারা বিপুল গর্জনে বহিয়া চলিয়াছে! সুনন্দা মুগ্ধ নয়নে দেখিতেছে।

গাড়ী ক্রমে পাহাড়-পথে চলিতে লাগিল—একদিকে উপত্যকাভূমি নীচে আরো নীচে নামিয়াছে—অপর দিকে পাহাড়ের অভ্রভেদী দেহ শ্যামল তরু-পল্লবে ছাওয়া। ধরণীর সবুজ শাড়ী যেন উপর হইতে নীচে পর্যন্ত মেলানো। ক্রমে পথের দুধারে জঙ্গল, ঘন ঘোর জঙ্গল, ঘেষাঘেঁষি ঠেশাঠেশি জঙ্গলে—ভীমকান্ত দৃশ্য।

অশ্বিনী বলিল—এ জঙ্গলে বাঘ আছে, সুনন্দা দেবি···

সবিস্ময়ে সুনন্দা কহিল—বাঘ!

—হ্যাঁ। গল্প শুনেছি। অনেকে নাকি এ-পথে যেতে বাঘ দেখেছেন। আমি কিন্তু বাঘের দেখা কখনো পাইনি!

সুনন্দা কহিল—দিনের বেলায় বাঘ বেরোয়?

অশ্বিনী কহিল—আমার বিশ্বাস হয় না! শিকারের বাসনা যত প্রবল হোক, আত্মরক্ষায় উদাসীন হবে—বনের বাঘ হলেও এতখানি মূর্খ সে নয়!

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল—নিশ্চয়!

এক-জায়গায় জঙ্গল খুব বেশী ঘন। সুনন্দা কহিল—ঐ তো লোকজন রয়েছে—কাঠ কাটছে!

অশ্বিনী কহিল—গাড়ী থামাতে বলবো? নেমে দেখবেন এ-জায়গা?

সুনন্দা কহিল—কোনো অসুবিধা হবে না?

—না, না। অসুবিধা কিসের?

অশ্বিনীর আদেশে ড্রাইভার গাড়ী থামাইল। দুজনে নামিল। থাকে-থাকে

ভাঁজে-ভাঁজে পাহাড়···উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে উঠিয়াছে! দূরে ঐ পথ দেখা যায় অনেক নীচে। সে-পথে একখানা বাস আসিতেছে। সুনন্দা কহিল—যেন ব্র্যাকেট।

অশ্বিনী কহিল—তাই।

আধঘণ্টা ঘুরিয়া চারিদিক দেখিয়া আবার দুজনে আসিয়া গাড়ীতে বসিল। গাড়ী চলিল।

বহুদূরে আসিয়া একদিকে একখানা কাঠের ফলকে লেখা,—TO RAMGHAR (রামগড়ের দিকে)।

অশ্বিনী কহিল—এ পথে রামগড় যাওয়া যায়। চমৎকার জায়গা। কালীমন্দির আছে। উঁচু পাহাড়। আর পাহাড়ের গা ঘেঁষে দামোদরের ভীষণ স্রোত! দেখবার মতো। ফেরবার সময় আমরা রামগড় যাবো! কেমন?

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, হাঁ।

বেলা বারোটায় হাজারিবাগের প্রান্তর দেখা গেল। বন, জঙ্গল, মাঠ, পথ, বাড়ী।

অশ্বিনী কহিল—হাজারিবাগে পৌছেছি!

ক্লারেন্ডন হোটেল অশ্বিনীর পরিচিত। সেই হোটেলে সে উঠিল। পাশা-পাশি দুটো কামরা। সে-দুখানি কামরা 'এন্‌গেজ্' করিয়া অশ্বিনী কহিল—বাথরুমে জল দিয়ে যাচ্ছে এখনি। স্নান সেরে নিন। আমি আহারাদির ব্যবস্থা করে আসি।

সুনন্দা কহিল—আপনি স্নান করবেন না?

অশ্বিনী কহিল—আপনি আগে স্নান করুন—তারপর আমার বাথরুমে জল দেবে। দু'ঘরের সঙ্গে দুটো আলাদা বাথরুম আমরা পাচ্ছি!

সুনন্দা চলিয়া যাইতেছিল,—গেল না; থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল—এখানে ক'দিন থাকবেন?

অশ্বিনী কহিল—ক'দিন আপনি থাকতে চান?

সুনন্দার কেমন ভয় হইতেছিল। ভয়? না, ভয় ঠিক নয়—কেমন সঙ্কোচ! দু'দিন মাত্র আলাপ এই অশ্বিনীর সঙ্গে···তার কতটুকু পরিচয় সে জানে! অথচ তাকে সাথী করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই অজানা বিদেশে আসিয়াছে—তাহারি আশ্রয়ে, তাহারি আতিথ্যে! এক-গৃহে বাস এক-রকম।

বাঙলাদেশের আজন্মের সংস্কার মনের মধ্যে যেন ভারী পাথরের মত মাথা তুলিয়া রহিয়াছে! সহজ-চলার মুখে কেমন বাধা যেন!

অশ্বিনী কহিল—দাঁড়ালেন যে!···বেলা কত, জানেন?

বলিয়া সে হাত-ঘড়িটা সুনন্দার চোখের সামনে ধরিয়া কহিল—সাড়ে বারোটা বেজে গেছে!

ছোট একটা নিশ্বাস···সুনন্দা সে নিশ্বাস রোধ করিয়া কহিল—না, আর দেরী নয়। যাই!

অশ্বিনী কহিল—আমিও ম্যানেজারের কাছে চললুম। লোক দিয়ে বিছানাপত্র গুছিয়ে নেওয়াবার ব্যবস্থা করি। বিশ্রামের প্রয়োজন তো।

অশ্বিনী গেল ম্যানেজারের সন্ধানে—সুনন্দা নিজের কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।···

বৈকালের দিকে ঘন কালো মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। অশ্বিনী কহিল—প্রথম দিনেই এমন বিপ্লব! বেড়াতে বেরুনো অসম্ভব!

সুনন্দা কহিল—বৃষ্টি নামবে, জানা ছিল না তো।

—হুঁ!···কিন্তু হাতে কতটুকু সময়! সে-সময়ের এমন অপমৃত্যু! কথাটা বলিয়া অশ্বিনী হাসিল, তারপর কহিল—চুপচাপ বসে এখন কি করা যায়?

সুনন্দা কহিল—গল্প···

কথাটা বলিবামাত্র তার বুক যেন কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

অশ্বিনী কহিল—ক'দিনে গল্পের পুঁজি কিছু কি বাকী রেখেছি! ওদিকে যে একেবারে নিঃসম্বল!

সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল···নিমেষের জন্য। তারপর মৃদু হাস্যে কহিল—আপনার জীবনের কাহিনী বলুন···সারাজীবন যুদ্ধ করে চলেছেন বললেন—সব তো শোনা হয়নি!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্বিনী কহিল—সে গল্প ভারী নীরস একঘেয়ে। জীবন-ভোর দুঃখ আর বেদনা চলেছে! তার মধ্যে যেটুকু আনন্দের সুর তুলতে পারি—লাভ! ছুটির শেষ কটা মুহূর্ত বেদনায় ভারী করে তোলায় কোনো লাভ আছে সুনন্দা দেবী?

এ কথার উপর সুনন্দা কোনো কথা বলিতে পারিল না—করুণ নয়নে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া রহিল।

এই বেদনার নিশ্বাস সুনন্দার প্রাণের নিভৃত তারে আঘাত দিয়া এমন মমতা জাগায়! মমতার বশে সুনন্দার থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, অশ্বিনীকে মিনতি করিয়া বলে,—কি তোমার বেদনা, কোথায় নৈরাশ্য,—বলো, সে সব প্রকাশ করিয়া তুমি বলো!···আমিও দুঃখী···আজন্ম বেদনায় কাঁটা-পথে শুধু ঘুরিতেছি! এখন গড্ডলিকার প্রবাহে ভাসিতেছি···ভবিষ্যৎ ভাবিতে দিশাহারা হইয়া উঠি। একটু দরদভরে কেহ আমার পানে কোনোদিন চাহে নাই···নিতান্ত একা, নিঃসঙ্গ···কি করিয়া আমার দিন কাটে!

এ নিঃসঙ্গতার প্রাণ তার সারাক্ষণ শ্রান্ত হইয়া আছে!···এমনি চিন্তার গহনে উধাও সে চলিয়াছে···সহসা অশ্বিনী কহিল—গান শুনবেন?

প্রাণের মধ্যে যেন বিদ্যুতের চমক! সুনন্দা কহিল—আপনি গান গাইবেন?

—না—না,—আমি গাইবো কি! আমি না। নীচে এদের গ্রামোফোন আছে, দেখেছি!···বাঙলা রেকর্ডও আছে। যদি গান শুনতে চান, আনাই! নাহলে এই বন্ধ নিঝুম ঘরের মধ্যে থাকবেন কি করে?

সুনন্দা কহিল—আমার বাধে না! চুপচাপ এমনি বসে বসে অনেকগুলো ঘণ্টা

কত সময় আমি কাটিয়ে দিয়েছি। মানে, আমি ঠিক কাটাইনি···ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি কেটে গেছে।

অশ্বিনী কহিল—আপনার এ কথায় কষ্ট হয়। সত্যি—অনেক সময় মনে হয়, যে-নিঃসঙ্গতায় আমি কষ্ট পাচ্ছি, আপনারও যেন সেই কষ্ট!

আর একটা নিশ্বাস! এ নিশ্বাস চাপা গেল না। সুনন্দা জোর করিয়া হাসিল। হাসিয়া বলিল—না, না, তা নয়···আপনি পুরুষমানুষ! ছুটোছুটি, ভিড়···আপনার নিঃসঙ্গতায় তবু বৈচিত্র্য আছে।

বাধা দিয়া অশ্বিনী কহিল,—ছাই বৈচিত্র্য!···কিন্তু এ কথা থাক—এ-কথার শেষ নেই! গ্রামোফোনটা আনাই···

অশ্বিনী চলিয়া গেল; পরক্ষণেই ফিরিল; তার পিছনে হোটেলের খানশামা—খানশামার কাঁধে গ্রামোফোন!

অশ্বিনী তাকে বলিল—এই টেব্‌লের উপর রাখো।

খানশামা গ্রামোফোন রাখিল—দম দিয়া গ্রামোফোনে অশ্বিনী রেকর্ড চাপাইল। খানশামা চলিয়া গেল।

রেকর্ডে গান চলিল,—

আজ কিছুতেই যায়না, যায়না যায়না মনের ভার
সারা আকাশ মেঘে অন্ধকার!

পাঁচ

সারা রাত সমানে বৃষ্টি···সকালে বিরাম হইল।

সারা প্রকৃতি যেন স্নান করিয়া অমল দীপ্তিতে ঝলমল করিতেছে!

বেয়ারা চা, ফল, টোস্ট-রুটী, পোচ্ দিয়া গেল। চা-পানান্তে অশ্বিনী কহিল—গাড়ী বলে রেখেছি। চলুন, সারা হাজারিবাগ প্রদক্ষিণ করে আসি।

সুনন্দা কুণ্ঠিত হইতেছিল, কহিল মিছিমিছি পয়সা খরচ করবার প্রয়োজন কি?

অশ্বিনী কহিল—হেঁটে কতটুকু-বা দেখবেন!

সুনন্দা কহিল—হাঁটায় আনন্দ আছে।

অশ্বিনী কহিল—সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে বলছি না। মাঝে মাঝে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটলেই চলবে।

সঙ্কোচ আর চলিল না। কিন্তু তার জন্য অশ্বিনী কেন মিথ্যা পয়সা খরচ করিবে? এই রাঁচি-হাজারিবাগ যাতায়াতে মোটরের ভাড়া···সুনন্দা বলিয়াছে—এ ভাড়ার অর্দ্ধেক সে দিবে! অশ্বিনী তাহাতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, বন্ধুত্বের এ আনন্দটুকু যদি সে উপভোগ করিতে চায় তো তাহাতে বাধা দিয়া···

অগত্যা সুনন্দা রাজী হইয়াছে! কিন্তু বারে-বারে বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া এ-সব খরচ?···না!

মন 'না' বলিলেও মুখে কিন্তু সে-কথা বলা গেল না। অশ্বিনীর চোখের দৃষ্টিতে কি-আগ্রহ!

বাহিরে সত্যই নূতন জগৎ, নূতন আনন্দ! দুটো দিন কোথা দিয়া কি আনন্দের ঘোরেই কাটিয়া গেল!

সেদিন সন্ধ্যার পর আবার সেই ঘর। ঘরে সুনন্দা একা বসিয়া আছে। দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে বিশ্ব-নিখিলের সেই সনাতন চিন্তা মাথায় জাগিতেছে! এই যে সখ্য···পুরুষ আর নারী—পুরুষের সঙ্গে না মিশিলেও পরিচয়ের অভাব ঘটে নাই! এবং সে পরিচয়···

মনে হইলে এখনো সে শিহরিয়া ওঠে!

কিন্তু অশ্বিনীর আলাপ বা সংসর্গ কোনো স্বার্থের আভাস দেয় নাই। নিঃসঙ্গতার ভারে সে অবসন্ন—মুক্তির আভাস কোনো দিন পায় নাই! ভাগ্যের প্রসন্নতার যে-কাহিনী বলিল, তার মধ্যেও বেদনার, নৈরাশ্যের সেই অবিচ্ছিন্ন সুর! কিসের এ বেদনা? কিসের এ নৈরাশ্য?

এ-সবের পরিচয় সুনন্দার সম্পূর্ণ অজানা! কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যের জাল রচনা করিতে থাকে! সে জাল ছিন্ন করিয়া ভিতরের সন্ধান কোনোদিনই পায় না! আজও সে রহস্যের সন্ধান করিতে বসিয়া যে তিমির, সেই তিমির!···

অশ্বিনী আসিয়া কহিল—কাল বেলা দশটায় তাহলে হাজারিবাগ-ত্যাগের সঙ্কল্প পাকা?

সুনন্দা কহিল—হ্যাঁ। পরশু আমায় রাঁচি ছাড়তেই হবে—সোমবার অফিস খুলবে।

অশ্বিনী কি ভাবিতেছিল, সুনন্দা কহিল—আপনি আর কতদিন রাঁচিতে থাকবেন?

অশ্বিনী কহিল—আমিও তাহলে ঐ দিন ফিরবো।

দু' চোখ বিস্ফারিত করিয়া সুনন্দা কহিল···আপনার এক মাস থাকবার কথা··· বলেছিলেন না?

নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্বিনী বলিয়া ফেলিল—কি সুখে থাকবো?···নেহাৎ একা!··· ক'দিন আপনাকে কাছে পেয়ে তবু···

তার কথায় আবেগ! সে আবেগে স্বর ঈষৎ কম্পিত হইল।

বলিতে বলিতে সহসা সে থামিল—থামিয়া মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল—একা কখনো থাকা যায়? বিশেষ বিদেশে···

সুনন্দা মনে-মনে খুশী হইল, মৃদু হাসিয়া কহিল—একাই তো এসেছিলেন! আমার সঙ্গে আলাপ হবে, সে-কথা ভেবে আসেননি তো!

কথার পিছনে তার অনেকখানি আগ্রহ! কিসের, সুনন্দা স্পষ্ট তাহা না বুঝিলেও, এ-কথা বলিতে সে বড় আনন্দ পাইল।

অশ্বিনী কহিল—নিজের ইচ্ছায় আমি আসিনি, সুনন্দা দেবী!···এসেছি শুধু

লাক্-এর ইঙ্গিতে! সেই লাক্!···দেখছেন তো! কিন্তু খানিকটা পথ লাক্ আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসে, নাহলে আপনার সঙ্গে হঠাৎ এমন আশ্চর্য রকমে দেখা হবে কেন?···হোটেলে আরো অনেক ঘর ছিল, আরো বিস্তর লোক! ৩২ নম্বর ভুল করে আপনার ১২ নম্বরের ঘরে পড়ে থাকা—সে এই লাক্! তারপর দেখুন, আবার সেই নীরস···একঘেয়ে কাজ।

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলিল। সুনন্দা কহিল—যখন-তখন নিশ্বাস ফেলে আপনি ঐ drudgery-র কথা তোলেন! আমায় আজ বলতে হবে—বলতেই হবে সে-কথা ···না, আমি ছাড়বো না। বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে আমি এ-প্রশ্ন করছি। বলুন, আমার কথার জবাব দিন্···

সুনন্দার প্রশ্নে সুগভীর আবেগ! যতখানি আবেগ মুখের কথায় ঢালিয়া দেওয়া সম্ভব, সুনন্দা তার প্রশ্নে ঠিক ততখানি আবেগই ঢালিয়া দিয়াছে।···

অশ্বিনীর মন তাহাতে দুলিল। স্থিরদৃষ্টিতে সে সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল—তারপর একটা নিশ্বাস চাপিয়া কহিল—সত্যই শুনবেন?

সুনন্দা কহিল—শুনবো, নিশ্চয় শুনবো। বলুন···না বললে এইখানেই বিদায় নেবো। সত্যি···

নিশ্বাসটাকে আর চাপা গেল না। নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্বিনী কহিল—কিন্তু কি হবে সে ব্যথার কথা শুনে?···তা শোনবার নয়,—এমন অদ্ভুত! মানে···না···বলা চলে না, সুনন্দা দেবী। আমায় মাপ করবেন···সে-কথা আমি প্রকাশ করে বলতে পারবো না আপনাকে। আমার বাধছে। কোথায় বাধছে, কেন বাধছে, তাও বলতে পারবো না। বলবার বাসনা প্রবল—বিশ্বাস করুন···তবু বলতে পারবো না! আমায় ক্ষমা করবেন!

শেষের দিকে অশ্বিনীর স্বর করুণ, অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীর-পায়ে গিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইল। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া রহিয়াছে। নীচে সবুজ শ্যামল পৃথিবী সে-জ্যোৎস্না মাখিয়া অপরূপ বেশে সাজিয়া আছে।

কতক্ষণ চুপ করিয়া এমনি দাঁড়াইয়া রহিল—সুনন্দার খেয়াল নাই!

সহসা কার হাতের তপ্ত স্পর্শ! শিহরিয়া সুনন্দা ফিরিয়া চাহিল; চাহিয়া দেখে, অশ্বিনী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। তার হাত অশ্বিনী নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে।

মৃদু কণ্ঠে অশ্বিনী ডাকিল—সুনন্দা···

সুনন্দার মাথায় রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল—সারা দেহে রোমাঞ্চ! অশ্বিনীর পানে চাহিয়া নীরবে সে দাঁড়াইয়া রহিল—হাতখানা অশ্বিনীর হাত হইতে টানিয়া মুক্ত করিবে—সে-শক্তি নাই! কিংবা শক্তি থাকিলেও সে-কথা তার মনে পড়িল না! সে-স্পর্শে কতখানি নির্ভর, কতখানি সহায়—সে যেন মনে মনে তাহা অনুভব করিয়া মূর্চ্ছাতুর হইতেছিল! অশ্বিনী কহিল—রাগ করেছেন?

সুনন্দা কহিল—না। তার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

নিজের স্বরে সুনন্দা চমকাইয়া উঠিল।

অশ্বিনী কহিল—অভিমান?

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, না।

অশ্বিনী কহিল—আমায় ভুল বুঝবেন না…বলিয়া সুনন্দার হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া আর্দ্র জড়িত স্বরে সে কহিল—যদি বুকের গোপন ব্যথা অনুভব করা সম্ভব হয় তো আমার বুকে আপনার এই হাত রেখে তা অনুভব করুন! আমার সে ব্যথা, সে বেদনা…

অশ্বিনীর স্বর আবেগে কম্পিত! সুনন্দা ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়াইয়া দু'পা সরিয়া গেল।

অশ্বিনী কহিল—আপনার সঙ্গে আলাপ করে, আপনার সঙ্গে মিশে এক নূতন পৃথিবীর পরিচয় পেয়েছি…যে-পৃথিবী চিরদিন কল্পনা করেছি…স্বপ্নে যে পৃথিবীকে দেখেছি!…

অশ্বিনী চুপ করিল। সুনন্দা ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার চোখের সামনে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ যেন কুয়াশায় ভরিয়া অদৃশ্য হইতেছিল!…

অশ্বিনী কহিল—আপনাকে আমি ভালোবেসেছি সুনন্দা দেবী…আপনাকে যদি কোনোদিন পাশে পাই…সাথী, বন্ধু, সহায়, তাহলে…

সুনন্দা উঠিল; উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল…গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তারপর শ্রান্ত দেহ শয্যায় ঢালিয়া চক্ষু মুদিল। চোখে শ্রাবণের বন্যা নামিল।

সকালে উঠিয়া সুনন্দা জিনিসপত্র গুছাইতেছে, দ্বারের বাহির হইতে অশ্বিনী কহিল —আসতে পারি?

সুনন্দা কহিল—আসুন।

অশ্বিনী ঘরে আসিল—বিশুষ্ক ম্লান মূর্তি।

সুনন্দা তার পানে চাহিয়া রহিল। অশ্বিনী কহিল—আমায় ক্ষমা করবেন। কাল আমি অত্যন্ত অবিনয় প্রকাশ করেছি…

সুনন্দা কোনো কথা কহিল না; অশ্বিনী তার পায়ের কাছে বসিল, বসিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল—ক্ষমা করবেন না? ক্ষমা করতে পারবেন না?…আমি সত্যই অনুতপ্ত…

সুনন্দার পায়ে সে হাত রাখিল। সুনন্দা অশ্বিনীর হাত ধরিয়া তাকে তুলিল, কহিল—এ-সব কথা আর বলবেন না।

যন্ত্র-চালিতের মত অশ্বিনী কহিল—না, কখনো আর বলবো না…

তারপর যাত্রার পালা…সারা পথ দু'জনে চুপচাপ…কাহারো মুখে কথা নাই!

পরের দিন রাঁচি ষ্টেশন। অশ্বিনী কহিল—পাশের কামরায় আমি বার্থ নিয়েছি। দরকার হলে ডাকবেন।

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাই হইবে!…

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল—দু'জনে চুপচাপ কলিকাতায় চলিল।

হাওড়া ষ্টেশনে দু'খানা ট্যাক্সি ঠিক করিয়া একখানায় সুনন্দাকে বসাইয়া কুলিকে অশ্বিনী কহিল—দোশ্‌রা ট্যাক্সিতে তার জিনিষপত্র তুলিয়া দিবে।

ট্যাক্সি ছাড়িবে, সুনন্দা কহিল—একটা কথা···

—বলুন···

—সে-কথা রাখতেই হবে। বন্ধুত্বের দাবী···

—রাখবো। বলুন···

—হাজারিবাগে যা খরচ হয়েছে, ন্যায়তঃ তার অর্দ্ধেক আমার দেওয়া উচিত। সে-অনুমতি থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

অশ্বিনী সুনন্দার পানে চাহিল, কহিল—না হ'লে বেদনা বোধ করবেন ?

মৃদু হাস্যে সুনন্দা কহিল—করবো।

অশ্বিনী কহিল—আনন্দ এটুকু···তাতে বঞ্চিত করবেন ?

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—সব কথায় এত কবিত্ব করবেন না, অশ্বিনীবাবু। বলুন, এ অনুমতি পাবো ?

অশ্বিনী কহিল—তাতে যদি আপনি আনন্দ বোধ করেন, বেশ, তাই হবে। সমস্ত হিসাব শ্রীচরণে দাখিল করবো।

—আবার ঐ কথা !···না, সহজ ভাবে বলুন···

অশ্বিনী কহিল—এ বন্ধুত্ব, এ সখ্যের স্মৃতি তাহলে···

সুনন্দা কহিল—সে স্মৃতি আমার বুকে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন ! এ বন্ধুত্বের গৌরব আমি চিরদিন করবো ! কিন্তু ঐ যা বলেছি···

অশ্বিনী কহিল—বলেছি তো, হিসাব দাখিল করবো। দুশ্চিন্তায় কাতর থাকতে হবে না। এবং এ হিসাব দিতে বিলম্বও হবে না।

—বেশ কথা,—নমস্কার।

—নমস্কার, সুনন্দা দেবী···অভিনয় ভুলে যাবেন, ক্ষমা করবেন···

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় ! তবে দেখবো, হিসাব পেলে ক্ষমার সম্বন্ধে বিবেচনা !

ড্রাইভারকে সে ইঙ্গিত করিল। ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

ছয়

আবার সেই ট্রাম-বাস, ধূলি-ধোঁয়ার রাজ্যে সেই অফিস। অফিসে সেই জটাই বোস, প্রুফের রাশি এবং বই বেচার জন্য সেই উগ্র অভিযান !

দু'একটা কবিতার প্রুফ দেখিতে দেখিতে দু'চারটা চোরা লাইন চোখে পড়ে,—

তোমায়-আমায় সেই যে চকিত দেখা
সবুজ বনে হাওয়ার মতন যেন !

কখনো বা এমনি লাইন—

বুকে স্মৃতি সোনার তারে গাঁথা,
সেই চাহনি, সেই সে কাঁপা স্বর···
হাতের 'পরে হাতটি আছে পাতা,
বইছে বুকে ব্যথার কি সে ঝড়!

এলোমেলো, অসংবদ্ধ কতকগুলা ভাবের টুকরা! কবিতায় সেগুলো ফোটে নাই—ফুটিবার ব্যর্থ প্রয়াসে একদিন শুধু কৌতুক জোগাইত! আজ সেই অসংবদ্ধ এলোমেলো কথাগুলা মনে অনেক কথা জাগাইয়া তোলে। প্রুফ দেখিতে দেখিতে সুনন্দা প্রুফের কথা ভুলিয়া উদাস নেত্রে বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে। কম্পোজিটরদের তরফ হইতে তাগিদ আসে···ব্যস্ত হইয়া কলম হাতে লইয়া তখন সে 'ফ' কাটিয়া 'ক' বসায়, 'ত' কাটিয়া 'ভ' বসায়।

তার দিনের কাজ নিত্যকার বাঁধা রুটীনে আবার চলিতে থাকে।

সেদিনও এমনিভাবে কাজ চলিতেছিল—সহসা বিভোর দত্তর প্রবেশ। একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বিভোর কহিল—তোমার সঙ্গে আজ ভারী সিরিয়স কথা আছে, সুনন্দা দেবী। সে-কথার উপর আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ···মানে, হ্যাঁ, কিংবা না··· বুঝেছো? এ একেবারে জীবন-মরণের কথা। এ প্রশ্ন জীবন-মরণ নিয়ে!

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সুনন্দা বিভোরের পানে চাহিল।

পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া একটা সিগারেট লইয়া টেবিলের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বিভোর কহিল—আমি বিলাত চলেছি। এখানে আর নয়! লক্ষ্মীছাড়া দেশ! আমি চাই এমন কিছু করবো, সারা পৃথিবী যাতে আমার পানে তাকাবে—বিস্ময়ে···শ্রদ্ধায়! এখানে তার না আছে সুযোগ, না কিছু! তাই···

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল—সত্যি, বিলাত যাচ্ছেন?

ভ্রূভঙ্গী-সহকারে বিভোর কহিল—নিশ্চয়। কিন্তু···

বাধা দিয়া সুনন্দা কহিল—বাঃ! শুনে হিংসা হচ্ছে। আমাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে? আপনার সেক্রেটারী হয়ে তাহলে যাই। না হয় একজন বেয়ারা-খানশামারও দরকার হবে তো···

মুখখানা বিকৃত করিয়া বিভোর কহিল—আঃ! ঐ তোমাদের মস্ত দোষ! নিজেকে সব সময়ে সব বিষয়ে ছোট ভাবো কেন? অন্যভাবে যাওয়া চলে না? দরদী বন্ধু সহায় হয়ে। আমি সত্যিই জিজ্ঞাসা করছি সুনন্দা দেবী, সারাজীবনের মত আমার সুখ-দুঃখের ভার নিয়ে আমার সাথী···তোমার আপত্তি আছে?

সুনন্দার মুখে যেন চাবুক পড়িল! সে চমকিয়া উঠিল। চট্ করিয়া মুখে কথা জোগাইল না। এতক্ষণ চোখে-মুখে কৌতুকের যে হাসি ফুটিয়াছিল, সে হাসি মিলাইয়া গাম্ভীর্যের রেখা দেখা দিল।

বিভোর কহিল—ভাবছিলুম, একা এ-রকম কার্তিক সেজে নেচে বেড়ানোতে

কোনো লাভ নেই! মিথ্যা জীবন ক্ষয় করা! এমন দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পেয়েছি··· তাই ভাবছিলুম, একজনকে যদি পাই···জীবনে চির-সাথী হবে। আমি যেমন তার মন বুঝবো, তার সুখ-দুঃখের ভাগ নেবো, সে তেমনি আমার মন বুঝবে, আমার সুখে সুখী হবে, দুঃখে দুঃখী হবে! মামুলি ধরণের একটি মেয়েকে বিয়ে···মানে, যাকে চিনি না, জানি না, তাতে বিপদ কম নয়···এমনি অনেক কথা ভাবছিলুম। ভাবতে ভাবতে মনে হলো···কি মনে হলো বলো দিকিনি সুনন্দা?

সুনন্দা সলজ্জ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে বিভোরের পানে···সে মাথা নামাইল—কোনো কথা বলিল না।

বিভোর কহিল—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো···বাঃ, তুমি আছো—এমন মন, এমন বুদ্ধি, প্রুফের উপর মুখ গুঁজে খেটে মরছো! আচ্ছা, কেন তা করবে তুমি? তোমার মতো স্ত্রী-লাভ ভাগ্যের কথা। বিয়ে···বিয়ে···আমি বিয়ে করবো, সুনন্দা দেবী। একালে ঐ সখীত্বের যে-রেওয়াজ উঠেছে, তা নয়, তাতে কোনো পক্ষে গ্যারান্টি থাকে না! তবে এ-বিয়েতে কারো স্বাধীনতা খর্ব হবে না! আমাদের সমাজে স্ত্রী মানে দাসী—স্বামী হলেই তিনি হবেন পতি পরমগুরু···সে-সব নয়! যাকে বলে, সহধর্মিণী···সহকর্মিণী!

সুনন্দা এ-কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিভোর হাসিল, হাসিয়া সিগারেট ধরাইল; ধরাইয়া সেটা টানিয়া একরাশ ধোঁয়া ছড়াইয়া কহিল—যাক্ এর জন্য তাড়া নেই। আমি এদিকে যাবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করি···তুমিও কথাটা একটু ভেবে ত্যাখো। কাল···না হয় এক সপ্তাহ পরে আমি আবার আসবো। তবে, হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি···তোমার উপর কোনো বিষয়ে জুলুম হবে না, শুধু এই নোঙরা অফিসটা তোমাকে ছাড়তে হবে! সাহিত্য-চর্চার ঝোঁক থাকে—বেশ, ব্রাউনিং-দম্পতীর মত আমরা সাহিত্য-চর্চা করবো। আমারো একটু-আধটু টেষ্ট আছে এদিকে···তবে এমন একজন বন্ধু পাশে চাই, যে আমাকে উৎসাহ দেবে, এবিষয়ে আমার উৎসাহ জাগিয়ে রাখবে!···পাঁচটা বাজে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মনে হয়, এভাবে জীবন কাটানো উচিত নয়—জীবন যখন তুচ্ছ নয়, অবহেলার জিনিষ নয়।

চকিতে আসিয়া চকিতে এতগুলো কথা নিঃশেষ করিয়া বিভোর চলিয়া গেল। কিন্তু এই চকিতের আসা-যাওয়ায় সুনন্দার মনকে সে একেবারে ঝড়ের মুখে ফেলিয়া দিয়া গেল!

সুনন্দা ভাবিতে বসিল, জীবন সত্যই এ-ভাবে পাঁচটা বাজে কাজ লইয়া কাটাইবার নয়—কাটানো চলে না! অবসাদ অনিবার্য। সে অবসাদ এখন দেখা যায় না, এমন নয়! কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই! নহিলে নানা অসুবিধা, নানা অস্বস্তি! তাই দিনের পর দিন মনকে এ-কাজে গুঁজিয়া রাখিতে হয়। ভালো লাগে না—তবু! অশ্বিনীর কথা মনে পড়িল—নীরস একঘেয়েমি! জীবনে অশ্বিনী সম্পদের দেখা পাইয়াছে—তবু প্রতি-নিমেষ সে-কাজে নীরস অবসাদ ছাড়া সে আর

কিছু পায় না। মন নৈরাশ্যে কাতর, বেদনায় আতুর! বিভোরকে সে খোশ-খেয়ালী বলিয়া জানে! সেই বিভোরও তার এ খোশ-খেয়ালীর মধ্যেও ঐ বিষ-বাষ্পে জর্জ্জরিত!

সত্যই জীবনে রস নাই? মাধুরী নাই? আকর্ষণ নাই? কেবলি বোঝা বহিয়া বেড়ানো জীবনের উদ্দেশ্য?

না! তাহা হইলে কদিন পূর্বে অফিসের বাহিরে যে দৃশ্য-বৈচিত্র্য দেখিয়া আসিয়াছে—সেই শ্যামল ক্ষেত, পাহাড় ঠেলিয়া জলস্রোতের উচ্ছ্বাস—সেই গতি··· আকাশে আলো-ছায়ার অপরূপ লীলা···দিকে দিকে এমন বৈচিত্র্য···মানুষের জীবনে সে-বৈচিত্র্য, সে-মাধুরীর এক কণাও নাই? শুধু অবসাদ, নৈরাশ্য আর বেদনা?···

এ-সব লইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না—কোনোদিন বাঁচিতে পারিবে না! হাসি-গল্প—এগুলার সৃষ্টি হইয়াছিল তবে কেন? আনন্দ···পুলক···যৌবন···বসন্ত···এগুলা সত্যই শুধু কবির কল্পনা নয়! নিশ্চয় এ-সবের অস্তিত্ব আছে! নহিলে ধরণীর প্রাণ এমন দীর্ঘ হইত না···ছন্দে লীলায়িত থাকিত না!

সন্ধ্যার পর চিরাচরিত প্রথায় বাসে চড়িয়া বসিল, কিন্তু বাস হইতে নামিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। মাঠে ছেলে-মেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে, খেলা করিতেছে,—যেন আনন্দের মেলা! বয়স্কদলেও হাসিখুশীর অন্ত নেই! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেহ খেলা করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে! কোথাও তরুণ-তরুণী,—কোথাও বা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া···হাসিমুখে গল্প করিতেছে। তাদের পানে চাহিলে মনে হয়, কাজের নোংরা খোলস তাদের কোনোদিন মলিন বা ম্লান করে নাই!···

একটা বেঞ্চে বসিয়া পুলকাকুল দৃষ্টিতে সে এই জগৎ-সংসার দেখিতে লাগিল। ···এখানেও বৈচিত্র্য আছে···এই ধোঁয়া-ধূলায় ভরা সহরের বুকে···ঐ কর্ম্ম-চঞ্চল লোকজনের মনে! দেখিতে দেখিতে এ-দৃশ্যে সে তন্ময় হইয়া গেল।

সহসা পিছনে কে ডাকিল,—সুনন্দা দেবী···

সুনন্দা চমকিয়া চাহিয়া দেখে, অশ্বিনী।

সুনন্দা কহিল—আপনি! তার স্বরে উল্লাসের আবেশ! সে আবেশ রোধ করিয়া সুনন্দা কহিল—বসুন।

সরিয়া বেঞ্চে সে জায়গা করিয়া দিল। অশ্বিনী বসিল, বসিয়া কহিল—মাঠে বেড়াচ্ছিলুম। একটু বসবো বলে চারিধারে বেঞ্চের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম··· সব বেঞ্চি জোড়া। এ বেঞ্চের পানে চেয়ে প্রথমে চমকে উঠেছিলুম! কাজের পর সোজা বাড়ী না গিয়ে সুনন্দা দেবী এসে মাঠে বসেছেন!

সুনন্দা কহিল—কেন? সুনন্দার অপরাধ?

অশ্বিনী কহিল—মানে, আমি প্রায় মাঠে আসি কি না···কখনো আপনাকে দেখি না তো!

সুনন্দা কহিল—হুঁ!···কিন্তু···আপনার অপরাধ এখনো ভঞ্জন হয়নি—সে কথা মনে আছে?

অশ্বিনী কহিল—অপরাধ !

—হ্যাঁ। সেই হিসাব…

—ও! সে হিসাব তৈরী। আদেশ করুন, যে-কোনো মুহূর্তে দাখিল করবো। সত্যি, আমিও ভেবে দেখেছি,—এই অর্থ-সমস্যার দিনে দুদিনের-আলাপী সম্পূর্ণ এক অপরিচিতার বন্ধুত্বের জন্য এতগুলো পয়সা অনর্থক কেন খরচ করি। তা, কালই পেশ করতে রাজী আছি। সময় এবং স্থান নির্দেশ করে দিন…কোনো ত্রুটি হবে না।

সুনন্দা ঠিকানা বলিল,—বাড়ীর ঠিকানা।

অশ্বিনী কহিল—তাইতো, ওদিককার পৃথিবী আমার অজানা—প্রায় সেই নিকারাগুয়া, কঙ্গো ষ্টেটের মত। পথ ভুলে শেষে যদি দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসি ?

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—আজ না হয় সঙ্গে চলুন—ঠিকানা ঠিক করে আসবেন !

অশ্বিনী কহিল—এ-কথা মন্দ নয় !

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—আসুন।

—এখনি ? গায়ে আলো-বাতাস লাগাবেন না ?

—অনেকক্ষণ বসে আলো-বাতাস লাগিয়েছি ! আর নয়…শীতকাল !

অশ্বিনী কহিল—আমার গাড়ী আছে। আসুন তাহলে।

মেমোরিয়ালের ফটকের ধারে একখানা অবর্ণ-কার দাঁড়াইয়া ছিল। সুনন্দাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বিনী গাড়ীতে উঠিল—ড্রাইভারকে কহিল—মনোহরপুকুর !

বাড়ী দেখা হইল। অশ্বিনী নামিল না, কহিল—অপরাধ ভঞ্জন না হলে গৃহ-প্রবেশ করবো না সুনন্দা দেবী ! কাল আসবো তৈরী হয়ে। অপরাধের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে সহজ বেশে সহজভাবে বন্ধু-সম্মিলন হবে !

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—আপনার ইচ্ছা !

সাত

তুচ্ছ হিসাব চুকিলেও আর-একদিক দিয়া বাঁধন কষিতেছিল। কাজকর্মের পর অশ্বিনী প্রায় আসিয়া সুনন্দার সঙ্গে দেখা করে ; কথাবার্তা কহিয়া সত্যই আরাম পায়। সুনন্দারও এ সাহচর্যটুকু ভালো লাগে ! নানা বিষয়ে কথা হয়…সে সব কথার অন্তরালে এক উজ্জল ভবিষ্যতের মায়াপুরী জাগিয়া ওঠে—সে মায়াপুরী সুরে সুরময় !

অফিসে জটাই বোসের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। তার লেখা কেতাবের কটা কড়া সমালোচনা বাহির হইয়াছে। গল্পের প্লটের কথা ছাড়িয়া সমালোচক তার ভাবা লইয়া প্রচুর বিদ্রূপ করিয়াছে—স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে—আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালা পড়িয়া বাঙলা কথা শেখো বাছা, তারপর বই লিখিবার বাসনা করিয়ো ! সে সমালোচনা লইয়া বিভোর দত্তর টিট্‌কারীর আর অন্ত নাই !

বিভোর কহিল,—খাঁটী কথা লিখেছে ! তোমার পয়সা আছে—লোক রেখে

কাগজ চালাও—ছাপাখানা খোলো! নিজে কলম ধরবার স্পর্দ্ধা জাহির করে শুধু নিজের নির্বুদ্ধিতা রটনা করা বৈ নয়! লেখক বলে নাম কেনবার ঝোঁক থাকে তো, বহু লোক আছে বাপু, যারা কিছু-কিছু লিখতে পারে, অথচ, পয়সার দারুণ অভাবে ভদ্রভাবে খেতে-পরতে পাচ্ছে না, তাদের কিছু-কিছু দক্ষিণা দাও—দিয়ে লিখিয়ে নাও!

জটাই বোস কহিল—ও—ওরা গাল দিচ্ছে বলেই আমি ল্যাজ গুটোবো, এমন কাপুরুষ আমি নই! গালাগাল কোন্ লেখককে না কে দিচ্ছে···বিশেষ এই ডিমোক্রেটিক্ —মানে, গণতন্ত্রের যুগে?

বিভোর কহিল—এতে তোমার কাপুরুষতা বা বীরত্ব দেখছি না! নিজের মূঢ়তাই প্রমাণ হচ্ছে! লেখাপড়া শিখতে হয় রে মুর্খ আগে,—তার উপর লেখবার শক্তি থাকা চাই···প্রতিভা!

জটাই বোস কহিল—থামো, থামো। আমি লিখবো—লিখে সে-লেখা ছাপবো—আমার খুশী!

বিভোর কহিল—ছাপো, দুঃখ নেই, কিন্তু সে-সব লেখা কেউ কিনবে না, পড়বে না —মশলা বাঁধার জন্য, জুতো প্যাক করার জন্য, ছাপা-কাগজগুলো বিক্রী হতে পারে ওজন-দরে!

জটাই বোস কহিল—টাকা আমি নষ্ট করবো—আমার খুশী! বিনা-মুল্যে বই বিলুবো—কেউ কিছু বলতে পারে? তুমি বলবে, মিথ্যা পয়সা নষ্ট করছি! তুমি যে চার-পাঁচটা কুকুর পুষেছো—কি উপকারে লাগে কুকুর?···তাতে পয়সা-খরচ নেই? তুমি কুকুর পুষে পয়সা নষ্ট করছো—তার কারণ, তোমার কুকুরের সখ! আমিও বই ছেপে পয়সা নষ্ট করবো, কারণ আমার বই লিখে ছাপাবার সখ!

হাসিয়া বিভোর কহিল—চমৎকার উপমা! কুকুর পোষা আর বই লেখা···

এই বাদানুবাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল সুনন্দা!

জটাই কহিল—হলো?

সুনন্দা কহিল—এই লাইনটার মানে বুঝতে পারছি না।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া জটাই কহিল—মানে?

সুনন্দা লেখা দেখাইল। বিভোর কহিল—ওটা জটাইয়ের লেখা?

সুনন্দা কহিল—হ্যাঁ।

হাসিয়া বিভোর কহিল—জটাইয়ের লেখায় মানে খুঁজবেন না! অর্থ যা, তা ওর ব্যাঙ্কে আছে—পৈতৃক অর্থ! লেখাতেও অর্থ থাকবে? দুনিয়ার সব অর্থ কি ভগবান্ ওকেই দেবেন?

কথা শুনিয়া হাসি পাইল, কিন্তু সুনন্দা হাসিল না। জটাই বোস মনিব—তাই জটাইয়ের কাছে চিরদিন সে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলে! চপল লঘু হইলে জটাই তার কতখানি সুযোগ লইবে, তার দৃষ্টান্ত গীতা···পাশেই আছে।

প্রুফটা টানিয়া লেখায় চোখ বুলাইয়া জটাই কহিল—মানে···মানে একটা আছে

নিশ্চয়! লেখবার সময় সে-মানে মনে ছিল—এখন ভুলে গেছি। যেমন আছে, অমনি ছেপে ফেলুক। মানে খুঁজতে হবে না।

বিভোর অট্টহাস্য করিল। সুনন্দা প্রুফ লইয়া চলিয়া গেল।

সেই টেবিল। টেবিলের উপর প্রুফের তাড়া—যন্ত্রের মত কাটকুট করিল। মন সে-কাজের স্পর্শ পাইল না!···

গৃহে ফিরিয়া এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল···অস্বস্তিতে মন পরিপূর্ণ···বিভোরের কথাগুলা কাঁটার মত সারা মনে বিঁধিয়া আছে!···

অশ্বিনী আসিল, মুখ মলিন।···

সুনন্দার প্রাণ চকিতে সজীব হইয়া উঠিল! ভবিষ্যতের সেই সুর···মনের ঘুমন্ত পুরীতে আবার সেই সুরের হাওয়া!

সুনন্দা কহিল—চা খাবেন?

—না, না,—চা নয়!···

—কি হয়েছে অশ্বিনী বাবু?···

অশ্বিনী হাত বাড়াইয়া কহিল—কাছে এসো।

সুনন্দা কাছে আসিল। অশ্বিনী কহিল—আমি অসহায়···এমনি করে আমার হাত ধরে তুমি আমায় নিয়ে চলো! নাহলে···আমি বাঁচবো না, সুনন্দা!

সুনন্দার পায়ের তলা হতে মাটী যেন সরিয়া যাইতেছে···আজ তার শূন্য মনে এ কি অশ্রুর কলরব ভাসিয়া আসে!

সুনন্দা কহিল—আপনি বিশ্রাম করুন! তারপর কথা হবে।

—না, না,—বিশ্রাম নয়। আমি আশ্রয় চাই, আশ্রয়!

সুনন্দা বিস্ময় বোধ করিল—ভয় না হইল, এমন নয়। অশ্বিনীর কি এমন ঘটিয়াছে···

অশ্বিনী অনেক কথা কহিল—জীবন তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! কাজ, কাজ,··· বাঁধা লাইনে নিত্য ছুটাছুটি—মাথার উপর না আছে রঙীন আকাশ, না ফুলের গন্ধে-ভরা বাতাস! কি লইয়া, কিসের পানে চাহিয়া সে জীবনের পথে চলিবে!

দীর্ঘ পথ আসিয়াছে! কিন্তু এ কি চলা? পরের হাতে যন্ত্র হইয়া···শুধু পরের খেয়ালে!···আর পারা যায় না—সে আর পারে না! দেহে-মনে দারুণ ক্লান্তি! তার চলার শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! এ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে···শুধু সুনন্দা! সুনন্দার হাতখানি যদি সে ধরিতে পায়—বন্ধু, সাথী, সহায়···তাহা হইলে বুঝি কোনো ভয় থাকে না। কোনো চিন্তা, নৈরাশ্যের কোনো বেদনা তার কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না!···

এমনি অসম্বদ্ধ হেঁয়ালি। সুনন্দা মন দিয়া সব কথা শুনিতেছিল···এ হেঁয়ালির মধ্য হইতে সত্য বস্তু কতখানি সংগ্রহ করিতে পারে···সেই উদ্দেশ্যে।

অশ্বিনী অনর্গল এমনি করিয়া বলিয়া চলিয়াছে। ঘড়িতে নটা, দশটা,—এগারোটা বাজিল। দুঃখের কত কথা সে বলিল—উঠিবার নাম নাই তার।

সুনন্দা কহিল—অনেক রাত হয়েছে।

অশ্বিনী কহিল—হ্যাঁ, হয়েছে, বুঝেছি!

—বাড়ী ফিরতে হবে তো?

অশ্বিনী কহিল—যদি তাড়িয়ে দাও,...অগত্যা।

—এ-কথার অর্থ?

অশ্বিনী কহিল—আমার আশ্রয় নেই, সুনন্দা। আমি আজ নিরাশ্রয়। তুমি আমায় আশ্রয় দিতে পারবে না? বলো...সঙ্কোচ করো না...এই শীতের রাত্রে আমি পথে থাকবো?

এ কি বিপদ! সুনন্দা হতভম্বের মত বসিয়া রহিল।

অশ্বিনী কহিল—একটা কথা বিশ্বাস করো সুনন্দা...আমি ভদ্র, ইতর নই। আশ্রয় দিলে তোমায় অনুতাপ করতে হবে না।...

সুনন্দা প্রমাদ গণিল। তবু উপায় নাই! এ-কথা সে বলিতে পারিল না—না, তুমি বাড়ী যাও...এখানে আমি একা...নারী...নারীর বিপদ সীমাহীন!

অশ্বিনী থাকিয়া গেল...একদিন নয়...দু'দিন নয়...দশ দিন।

সুনন্দা নিত্যকার বাঁধা রুটিনে অফিসে যায়—অফিস হইতে বাড়ী আসে। অশ্বিনী ঘর ছাড়িয়া একদণ্ড নড়ে না!

সুনন্দার চিন্তার সীমা নাই! কি হইবে? আকাশে ঘন মেঘ...মনে সারাক্ষণ ছম্‌ছমানি ভাব! এ ব্যাপার যেন...মন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে! কেন? কেন? নিজের কথা, ভবিষ্যৎ...সংসার, সমাজ...দিবা-রাত্র তার মনে যেন ঝড় বহিতেছে!

সেদিন মনকে পাকা রকমে বুঝাইয়া গৃহে ফিরিয়া সে অশ্বিনীকে কহিল—একটা কথা আছে।

—বলো...

—এভাবে বাস করা চলে না! তোমার সঙ্কল্প আমায় খুলে বলো...স্পষ্ট ভাষায়...এতটুকু হেঁয়ালি নয়! কি তুমি চাও?

—কি চাই?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমাকে চাই...আমার জীবনের সাথী...আমার পরমবন্ধু...আমার সকল কাজে তুমি শক্তি দেবে, প্রাণ দেবে, উৎসাহ দেবে!

সুনন্দা চমকিয়া উঠিল! জীবনের সাথী...সুনন্দাকে চায়! কিন্তু নারীকে বড় সাবধানে থাকিতে হয়! মমতায় নারীর চিত্ত বড় সহজে গলিয়া যায়! কিন্তু এ কথা সে বলিতে পারিল না। তার মনে যে ব্যথা বাজিতেছে...এ দরদ, না মমতা, না কি—তাহা বুঝিবার শক্তি সুনন্দার ছিল না! তবে মনে হইতেছিল, যদি অশ্বিনীর এ ব্যথায় কোনো সান্ত্বনা সে দিতে পারে! আহা, বেচারা!

সুনন্দা কহিল—তার মানে, বিবাহ?

—মন্ত্র না পড়লে বিবাহ হয় না?

—না!

—মন্ত্র পড়লেই আমার উপর বিশ্বাস হবে? না হলে, নয়?···বলো।

সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল। অশ্বিনী কহিল—এতদিনেও আমার পরিচয় তুমি পাওনি? ভয় নেই! সে-পরিচয় দেবো, সুনন্দা! তবে এটুকু বিশ্বাস করতে পারো,—আমার পরিচয় পেলে তুমি আমায় ঘৃণা করবে না—তোমার করুণা হবে! প্রথম-আলাপে তোমায় যা বলেছি,—আমি অভাগা! luck আছে—তা সত্ত্বেও অভাগা! একান্ত করুণার পাত্র···জীবনে বহু সঙ্গ পেয়েছি···কিন্তু কঙ্কালের সঙ্গ—ম্যমির সঙ্গ! প্রাণের উত্তাপ কোথাও মেলেনি! শুধু সেই রাঁচির হোটেল···সেই বারো নম্বরের ঘর···

অশ্বিনী থামিল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি যদি মন্ত্র পড়ে তোমায় বিবাহ করি, তাহলে আমার পরিচয় জানো, না জানো—আমায় তুমি পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারবে! আর যদি মন্ত্র না পড়ি, তাহলে আমার পরিচয় তোমার মমতা জাগালেও আমার স্থান হবে না তোমার পাশে, তোমার মনের প্রান্তে!···আলাপ-আলোচনার সাথী—এ বন্ধুত্বে আর কোনো স্বার্থ নেই। বন্ধু, শুধু বন্ধু! মানে, পরস্পরের মনের স্বজন, সহায়, দরদী বন্ধু—তা কি এমন অসম্ভব? তোমার এই শিক্ষা, এই বুদ্ধি—এ-সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে নির্মল, শুদ্ধ রাখতে পারবো না?···

সুনন্দা কোনো কথা বলিতে পারিল না—তেমনি চুপ করিয়া রহিল। তার মনের মধ্যে ঝড়ের আতালি-পাতালি! সারা শরীর ভয়ে-ভাবনায় কাঁপিতেছে—বায়ু-হিল্লোলে পত্র-পল্লবের মত!

অশ্বিনী কহিল—তাহলে আমি চলেই যাই!···যাবার আগে একটা কথা শুধু বলে যাবো। আমি তোমার দেহ বা যৌবনের কামনা করে আসিনি, সুনন্দা! ঐ দেহ, যৌবন—এ-সবের উর্ধ্বে তোমার যে-মন—জীবন্ত প্রত্যক্ষ মন—সেই মনের সঙ্গে আমার মনের সঙ্গ-সহযোগিতা আমি কামনা করছি। এ ভালোবাসা তোমাকে—তোমার দেহ-যৌবনের অতীত যে-তুমি নিত্যকাল তোমার ও-দেহের মন্দিরে বাস করছো—সেই তোমাকে—তোমার মনকে!

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলিল—বলিল—কিন্তু ভুল বুঝেছিলুম!···তা হয় না!···বোধ হয়, এ আমার অসম্ভবের কামনা!···আমি···আর কোনোদিন তোমায় বিরক্ত করতে আসবো না! তবে···এক-একবার মনে করো সুনন্দা আমার কথা···নিজের দুর্বল দেহের মধ্যে, আরো দুর্বল সঙ্গ-সাহচর্যে কি সুস্থ সবল সজীব একটা মন দুনিয়ায় হাহাকার করে বেড়াচ্ছে!···

অশ্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে জামা গায়ে দিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিল, কহিল—আসি···

সুনন্দা নিজেকে অবিচল রাখিতে পারিল না। ছুটিয়া অশ্বিনীর পায়ের উপর

লুটাইয়া পড়িল, কহিল—না, না, অবিশ্বাস নয়···অবিশ্বাস নয়···তুমি মনের কাঙাল—এ-মন দিয়ে তোমার মনকে সত্যই যদি সচেতন করে তুলতে পারি···এসো। আমিও বড় একা, বড় অসহায়···বন্ধুহীন, নিঃসঙ্গ!

আট

অফিস চলিতেছে। জটাই তেমনি তার আসনে বসিয়া আছে, সুনন্দা বসিয়া প্রুফ দেখিতেছে। বেলা প্রায় দুটা···বিভোর আসিয়া উপস্থিত।

বিভোর কহিল—সামনের হপ্তায় আমি বেরুচ্ছি! আমার সে-প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু স্থির করতে পারলে?

সুনন্দা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—না।

বিভোর কহিল—বেশ! কিন্তু একটা কথা শুনছিলুম···

সুনন্দার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বিভোর কহিল—তুমি নাকি ঐ গৃহপালিত জামাতা অশ্বিনীর বাক্‌দত্তা? সে নাকি তোমার ওখানে আসে-যায়? দু'জনে হামেশা বেরোও···গল্প করো!

সুনন্দার মুখে কে যেন তীব্র কশাঘাত করিল! নিমেষে তার মুখ বিবর্ণ মলিন হইয়া গেল!

বিভোর কহিল—মানুষ নয়—যাকে বলে, ছুঁচো! একটা খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করেছে শুধু তার বাপের টাকার লোভে! শ্বশুর পক্ষাঘাতে পঙ্গু—মেয়েটার বিয়ে হচ্ছিল না! শুধু খোঁড়া নয়—হাবা-গোবা মেয়ে। বুদ্ধিসুদ্ধি মোটে নেই—জড় পুতুল! বাপের ঐ একটিমাত্র মেয়ে। জামাই এনে শ্বশুর আড়গড়ায় পুরেছে। তাকে কৌন্সিলে ঢোকাবে, কর্পোরেশনে ঢোকাবে। অশ্বিনী ভালো পাশ-টাশ করেছে, লেখাপড়া বেশ জানে,—মানি! কিন্তু এ-রকম ইতর মন!

সুনন্দা কহিল—এ-সব কথার প্রয়োজন নেই, বিভোরবাবু! অনর্থক এ পরচর্চা কেন?

তার বুক কাঁপিতেছে···মাথায় যেন রক্ত নাচিতেছিল! সারা মনে আবার সেই প্রলয়ের ঝড়!

বক্র কটাক্ষে বিভোর তাকে নিরীক্ষণ করিল, করিয়া কহিল—বেশ, থাক্। তবে, পাগলামি করো না—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—এমনি একটা কথা শুনছিলুম কি না—তাই বন্ধুভাবে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি! যাক্, আমার সম্বন্ধে তোমার মন যখন কোনো দিনই···

বাধা দিয়া সুনন্দা কহিল—আমার কাজ আছে, বিভোরবাবু! প্লীজ, প্লীজ—অফিস-ঘর—এ-সব কথার আলোচনার জায়গা নয়, বোধ হয়! বলিয়া জোর করিয়া মুখে সে হাসির রেখা ফুটাইল। যে-হাসি ফুটিল, তাহা দেখিলে বুক কাঁপিয়া উঠে! অশ্রুর চেয়েও করুণ সে হাসি!

বিভোর চলিয়া গেল। সুনন্দা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইল, এ-

পৃথিবী তার চিরাভ্যস্ত ঘূর্ণন থামাইয়া একদম নিথর হইয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে আলো-বাতাস সব জমাট···পাথরের মতো নিশ্চল নিস্পন্দ !

কি করিয়া ছুটির পর বাসে চড়িয়া সে গৃহে ফিরিল—যেন পরম বিস্ময় !

অশ্বিনী গৃহে নাই। সে আর এখন চুপচাপ পড়িয়া থাকে না। মনে উৎসাহের জোয়ার প্রচুর। কাজে গা ঢালিয়া দিয়াছে ! কর্মময় জগৎ—আলস্যে কাটাইবার জন্য এই রৌদ্রালোকিত দিবসের সৃষ্টি হয় নাই।

অশ্বিনী আসিল···রাত তখন দশটা।

সুনন্দা গম্ভীর মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্বিনী কহিল—কৌন্সিলে ঢোকবার আশা খুবই আছে—তবে জোগাড়যন্ত্র ঠিকঠাক চালিয়ে যাওয়া চাই।

সুনন্দা কহিল—কথা আছে।

তার গাম্ভীর্য দেখিয়া অশ্বিনী একটু চিন্তাগ্রস্ত হইল, কহিল—কি কথা ?

সুনন্দা কহিল—তুমি বুঝছো, কল্পনার স্বর্গ ভেঙ্গে মাটীর নীচে পাতালে চলেছি ! কিন্তু এ পাতাল আমি সহ্য করবো না ! স্বর্গ নয় !—এই মর্ত্য আমার চাই—পাতালে স্থান নেবো না !

—পাতাল !

অশ্বিনীর বিস্ময়কে চূর্ণ করিয়া সুনন্দা কহিল—যেদিন দেহের উর্ধ্বে মনের সঙ্গ-লোভ দেখিয়েছিলে, সেদিন এ-কথা তুমি বুঝেছিলে, সে শুধু আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন ! মাটীর মানুষ—কালো মাটী নিয়েই তার কারবার ! আমিও তা বুঝিনি, এমন নয়। মনের সঙ্গে দু'জনেই ছলনা করেছিলুম ! এখন ভয় হচ্ছে, এ ছলনার খোলস ছিঁড়ে সত্য ভাবে আমায় তোমার সাথী করে তোমার পাশে দাঁড়াতে দিতে হবে। তাতে মহত্ত্ব নয়, তোমার কর্তব্য করা হবে !

বিস্ময়-চকিত স্বরে অশ্বিনী প্রশ্ন করিল—এ কথার মানে ?

সুনন্দা কহিল—মানে তুমি বুঝতে পারছো না ? এত স্পষ্ট এ-ব্যাপার···সে-কথা আমার মুখে শুনবে ? বেশ, শোনো।

একটা প্রবল নিশ্বাস ঝড়ের মত সুনন্দার বুকটাকে ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইল। সুনন্দা কহিল—আমার গর্ভে তোমার সন্তান ! তাকে স্বীকার করা তোমার কর্তব্য। আমার স্বার্থ নিয়ে এ-কথা বলছি না—আমি যে-পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তুত ! কিন্তু এ বেচারী···যে আসছে ! আমায় বিবাহ করো···দেরী নয়—কালই ! তিথিক্ষণের প্রয়োজন নেই,—কালই তোমায় বিবাহ করতে হবে !

অশ্বিনী যেন ভূত দেখিয়াছে—এমনি তার মুখের ভাব ! এমন দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে ? সে শিহরিয়া উঠিল !

সুনন্দা কহিল—চুপ করে রইলে যে ! কিসের এত দ্বিধা ? দু'জনের মনের অগোচর তো কিছু নেই ! বিবাহের ব্যবস্থা করো।

অশ্বিনী কহিল—কিন্তু এ কি বিপদের কথা বলছো, সুনন্দা !

—বিপদ! সুনন্দার দু'চোখে আগুন জ্বলিল! তীব্র স্বরে সে কহিল—তুমি বালক নও! আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে সে-আগুনে পুড়তে হয়—এ-জ্ঞান তোমার আছে, নিশ্চয়!

চোরের মত ভীত কম্পিত স্বরে অশ্বিনী কহিল—কিন্তু…

—কিসের কিন্তু?

—আমার স্ত্রী আছে। তাকে ভালো না বাসি—আমার মনের সাথীও সে নয়—সাথী সে হতে পারে না। তবু বড় দুর্ভাগিনী, বড় করুণার পাত্রী! তাছাড়া তোমার সঙ্গে বিয়ে…আমাদের হিন্দু-শাস্ত্র সে বিয়ে স্বীকার করবে না!…সিভিল ম্যারেজ! কিন্তু সে উপায়ও নেই—এ-স্ত্রী বেঁচে থাকতে…

সুনন্দা সগর্জনে কহিল—বটে! তাঁর উপর করুণার সাগর উথলে উঠছে! আর আমি?…পথের একটা গণিকার মতো…সকলের ঘৃণা-অবজ্ঞার মধ্যে…ওঃ…এতখানি হীন নীচ তোমার মন! আর সখ্য, বন্ধুত্বের ছলনায় তুমি এ-ভাবে আমায় ভুলিয়ে রেখেছিলে! আমার বিশ্বাসকে এ-ভাবে পীড়ন করবার বেলা তো একদিনও মমতা জাগেনি! আমার মধ্যে গণিকার নির্লজ্জতা তুমি কোথায় দেখেছিলে?

সুনন্দা কাঁদিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সে কান্নার বিরাম নাই—যেন কোন্ মহাসাগরের জলরাশি সহসা বন্যার প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া তার চোখে আশ্রয় লইয়াছে!

অশ্বিনী তার পানে চাহিয়া রহিল…সে যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে!…অনেকক্ষণ!

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে কাছে আসিয়া বসিল, ডাকিল—সুনন্দা!

সুনন্দা মাথা তুলিল—ঝাপসা জল ভরা চোখে দেখিল, সামনে বসিয়া অশ্বিনী! অশ্বিনীর চোখে করুণ দৃষ্টি!

রাগে সুনন্দার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল…ঘৃণা, দারুণ ঘৃণা! চকিতে বাঘের মত ঝাঁপাইয়া অশ্বিনীর উপর. পড়িয়া সে তার মুখে, চোখে, মাথায় কিল-চড়-ঘুষি মারিয়া তাকে জর্জরিত করিয়া দিল—পরে সহসা ভীম-ভয়ঙ্করী বেশে রূঢ়স্বরে কহিল—বেরোও, এখনি বেরোও তুমি আমার সামনে থেকে! পাজী, ইতর, ছোটলোক—ভদ্র বেশে, ভদ্র কথায় চোরের চেয়েও জঘন্য উপায়ে নারীর সর্বনাশ করে বেড়াও! বেরোও, বেরোও তুমি এখনি। নাহলে…নাহলে আমি তোমায় খুন করবো…হ্যাঁ, খুন!

বলিতে বলিতে সুনন্দার মাথায় সত্যই খুন চাপিল! বিস্রস্ত বসন—আঁচল উড়িতেছে…পাগলের মত মূর্তি! সামনের চেয়ারখানা তুলিয়া সুনন্দা অশ্বিনীকে লক্ষ্য করিয়া সেটা নিক্ষেপ করিল। অশ্বিনীর চশমা চূর্ণ হইয়া গেল, মাথা কাটিয়া গেল।

ফুঁসিয়া সুনন্দা কহিল…এখনো গেলে না? এখনো না? বেহায়া নির্লজ্জ…

মার-মূর্তিতে সুনন্দা আগাইয়া আসিল। সে-মূর্তি দেখিয়া বেত্রাহত কুকুরের মত অশ্বিনী তার দেহটাকে টানিয়া কোনোমতে বিদায় লইল।

কলরব শুনিয়া পাশের ফ্ল্যাট হইতে সাড়া জাগিল…কলরব ফুটিল…চারিদিকে অসংখ্য কুতুহলী দৃষ্টি!

সহর কলিকাতা···কৌতূহল-নিবৃত্তির কোনো উপায় না দেখিয়া সকলে নিজের নিজের ঘরে ফিরিয়া কুৎসার কালিতে চাঁদের বুকে কলঙ্কের আঁচড় টানিতে মত্ত হইল! না-জানা, না-ঘটা কত ব্যাপার কল্পনায় গড়িয়া চিত্তকে তারা পরিতৃপ্ত করিল, তবে তাহাতে স্বস্তি মিলিল! তারপর সকলে ঘুমাইয়া বাঁচিল।

নয়

সুনন্দা!

অভিশাপের মত এ জীবন-ভার বহিয়া বেড়ানো কঠিন! এত বড় ছলনা! এমন বিশ্বাসঘাতকতা! সারা পৃথিবীর গায়ে নিমেষে কে যেন কালো কালি ঢালিয়া দিয়াছে! কোথাও ফাঁক নাই—শুভ্র আলোর রেখা দেখা যায় না কোথাও!

পরের দিনই টালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাড়ীর নীচের তলায় দুখানা ঘর দেখিয়া সুনন্দা সেই বাসায় উঠিয়া গেল। কাল রাত্রের ঐ কলরবের পর এখানে থাকা আর চলে না। সকালে লোকজনের প্রশ্ন-ভরা কেমন ঐ দৃষ্টি—সে যেন কাঁটার তীর! কাঁটা সহ্য হয়, কিন্তু এ-তীর অসহ্য!

জীবনে তার রুচি নাই, মরণেও স্পৃহা নাই। অথচ সে যেন নিশ্চেতন, জড়! প্রাণের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এ-ভাবে জীবন কাটানো কত-বড় দুর্ভোগ···কে বুঝিবে?

অফিস আছে—ছাড়া চলে না। বিশেষ এই যে এক অজানা অতিথির আসিবার সম্ভাবনা! জীবনে মস্ত কলঙ্ক···তবু···উহার কি দোষ?

ছুটির পর বিছানায় পড়িয়া এই অজানা অতিথির কল্পনা লইয়াই কোনোমতে সে মনকে খাড়া রাখিয়াছে। প্রয়োজন ভিন্ন কাহারো সঙ্গে কখনো মিশে নাই—আজো মিশে না! তবে বাড়ীওয়ালার বিধবা মেয়েটি মাঝে মাঝে আসিয়া কাছে বসে। তাকে ঠেলিয়া চলা দায়! সে বকে—তাইতো দিদি, তুমি নালিশ করো। এমন স্বামীকে ক্ষমা করা উচিত নয়। এই অবস্থা, আর সে চেয়ে ছাখে না!

সুনন্দার চোখ জলে ভরিয়া আসে! সজল চোখে দরদী মেয়েটির পানে চাহিয়া সে বলে—কি হবে ভাই? জোর করে কি ভালোবাসা আদায় করা যায়?

মেয়েটি বলে—মুখ্যুসুখ্যু হলেও না হয় কথা ছিল। কালো কুৎসিত নও! এমন লেখাপড়া জানো···এমন বুদ্ধি! তোমার স্বামী এমন বেয়াড়া হতে পারে? আশ্চর্য!

নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুনন্দা বলে—আমার ভাগ্য!

মেয়েটি বলে—না, তুমি একবার চিঠি লিখে ছাখো দিদি।

সুনন্দা কহিল—যেচে মান···কদিন টেঁকে ভাই?

এমন কথা প্রায় হয়। দিনের পর দিন চলিয়া যায়। কাহারো দুঃখ দাঁড়াইয়া দেখিবে, সে নিয়ম দিনের নাই!

শেষে সে-দিন আসিল—যেদিন শিরা-উপশিরায় অসহ টান পড়িল। বুঝি দেহখানা ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যাইবে।

বাড়ীওয়ালা-লোকটি ভালো। মেয়ের কথায় গাড়ী ডাকাইয়া সুনন্দাকে তাহাতে তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল।

হাসপাতালে সুনন্দার এক পুত্র জন্মিল। তার পর সুনন্দাকে লইয়া যমে-মানুষে সংগ্রাম চলিল। দুনিয়ায় তার নাকি আজ মূল্য নাই—তাই যম তাকে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। সুনন্দা বাঁচিয়া উঠিল। ডাক্তাররা মোটা খাতায় মস্ত রিপোর্ট লিখিলেন—এমন কেস্ হাজারে একটা যদি বাঁচে! বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরবে তাঁরা দিশাহারা!

সারিয়া সুনন্দা ভাবিল, সেই পুরানো জগতে এ আবার কি নূতন বেশে আজ তাকে দাঁড়াইতে হইবে। অদৃষ্টে আরো কি আছে, কে জানে! তার উপর এই···

ছেলে! এ-ছেলে কে চাহিয়াছিল? তার অভাবে কোথায় বাধিতেছিল?···কি কলঙ্কের পশরা মায়ের মাথায় চাপাইয়া এ আসিয়া উদয় হইল!···সুনন্দার জীবনে কোনো দুঃখ ছিল না! এ অভাবের কথা কোনো দিন তার মনে জাগে নাই! আজ অভিশাপের মতো···

···কিন্তু না, ঐ হাসিতেছে! আহা, বেচারী! বেচারী আমার! শিশুকে সুনন্দা বুকে চাপিয়া ধরিল।···

কিসের কলঙ্ক? কোথায় অভিশাপ?···ওরে, তুই, তুই আজ সুনন্দার আশা, ভরসা···তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ···তার সব, সব···

এই ছেলের পানে চাহিয়াই সে বাঁচিবে! বাঁচা ছাড়া তার আজ উপায় নাই। মরণ যদি আসে, মরণের পায়ে ধরিয়া বলিবে, আজ নয়, আজ নয়গো, আজ আমায় ফেলিয়া রাখিয়া যাও। নহিলে এই শিশু···একান্ত অসহায়! এ-বেচারী···ইহাকে কে দেখিবে?

অফিসে ছুটি লইয়াছিল···দু'চারিটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইলেও তার সিঁথিতে সিঁদুর দেখিয়া সে-গুঞ্জন থামিয়া গেল।

শরীর সারিলে আবার সেই অফিস। ছেলে একা থাকিবে, সে-চিন্তা ছিল না। বিধবা মেয়েটি বড় ভালো, ছেলেকে বুকে করিয়া রাখে। সুনন্দার অফিসে যাইতে ব্যাঘাত ঘটে না!

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া চলিল—বড় ধীরে···তবু কাটিয়া চলিল।

সুনন্দার শিশুর বয়স পাঁচ বৎসর। বিধবা মেয়েটি তার নাম রাখিয়াছে অমল।···

মনে মনে অদৃষ্টের উদ্দেশে সুনন্দা কহিল, কালির বন্যায় আসিয়াছে, তাই অমল! পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিল। কালি যা-কিছু সুনন্দার গায়েই লাগিয়াছে—থাকুক লাগিয়া! দুঃখ নাই! কিন্তু এই শিশু? সে অমল বৈ কি! কাজেই তার অমল নাম বাহাল রহিল।

অফিসে বসিয়া নিত্যকার মত সে প্রুফ দেখিতেছে,—জটাই বোস আসিয়া কহিল—ও প্রুফ রেখে দাও। এ লেখাটা এ-হপ্তায় যাবে না···এ-হপ্তায় কৌন্সিলের ব্যাপারের উপর এই টিপ্পনীটা যাবে! এখনি প্রেসে পাঠানো চাই।

একরাশ গেলি-প্রুফ সুনন্দার টেবিলের উপর রাখিয়া জটাই বোস চলিয়া গেল।

সুনন্দা প্রুফের তাড়া হাতে লইল। খুলিয়া পড়িতে গিয়া দেখে,—এ কি! তার হাত কাঁপিল! শ্লিপের মাথায় বড় বড় হেড-লাইন···

কৌন্সিলের দ্বারে বৎস অশ্বিনীকুমার

তারপর তীব্র গালির বন্যা চলিয়াছে—

গৃহ-জামাতা-পুঙ্গব শ্বশুরের আড়গড়ায় ছোলা খাইয়া এমন শক্তি পাইয়াছে যে, কৌন্সিল-হলে ঢুকতে চায়—তাজ্জব কী বাৎ বটে! কিন্তু ধোপার গাধা—মোট বহিবার জন্য যার জন্ম, ঘোড়ার বরাদ্দ ছোলা খাইলেই কি সে ঘোড়া হয় রে বাপু!

তারপর বহু কুৎসা। ছড়াও আছে। ছড়াটা এই—

খাঁদা হাঁদা মেয়ে দেখে, শুধু টাকার লোভে
বিয়ে করতে নারাজ নয় হতচ্ছাড়া গোবে!
তার 'পরে হায় দেশবাসী, কিসের এত বিশ্বাস?
টাকা হাতে পেলে সে করবে তোমাদের সর্বনাশ!

সুনন্দার বুক ভরিয়া নিশ্বাসের ঝড় বহিল! এ কথার অর্থ? 'খাঁদা-হাঁদা' মেয়ে? 'গৃহ-জামাতা'? বিভোর দত্ত বহুকাল পূর্বে এমনি একটা কথার ইঙ্গিত দিয়াছিল যেন! অশ্বিনীর দুঃখ-বেদনা-নৈরাশ্যের অন্তরালে তাহা হইলে···

অশ্বিনীর সেই মুখ, চোখের সেই করুণ কাতর দৃষ্টি, সেই আশ্রয়-ভিখারীর মিনতি-ভরা কণ্ঠ—সব মনে পড়িল! সে-সব সর্বক্ষণ মনে জাগিয়া আছে—তবু এখন যেন আরো স্পষ্ট রেখায় দীপ্ত বর্ণে ফুটিয়া উঠিল। হায়রে, চাকরি করিয়া তুচ্ছ দু'টো পয়সা মিলিবে, সেই পয়সার মায়ায় সে এ কি করিতেছে! অশ্বিনী! তার বিরুদ্ধে এই যে প্রবল বিদ্বেষ, ইতর চক্রান্ত···এ-সব তাহারি হাতে দীপ্ত বেশে উজ্জ্বল ভূষায় ছাপার অক্ষরে সাজিয়া সকলের চোখের সামনে গিয়া দাঁড়াইবে।

প্রাণ তার বেদনায় আর্ত হইল। ইহার প্রতিকারের কি-উপায় সে করিতে পারে? জটাই বোসকে গিয়া বলিতে পারে না—দয়া করুন, তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযান বন্ধ করুন?···জটাই শুনিবে না! দুনিয়ায় কাহারো কুৎসা করিতে পাইলে জটাই বর্তাইয়া যায়! ভাবে, দেশের কাজ করিতেছে। সে মস্ত লোক! পয়সার বস্তাবাহী নিরেট গর্দভ—অথচ প্রচণ্ড শয়তানীতে চিত্ত ভরা! ধরার বুকে জটাই এক অপরূপ প্রাণী, না পশু, না মানুষ!

নাই, উপায় নাই! অদৃষ্টের কি এ নির্মম পরিহাস!

প্রুফ দেখা হইলে শ্লিপগুলা লইয়া সে জটাই বোসের ঘরে গেল। জটাই বোসের

সামনে বসিয়া নেড়া-মাথা মোটা এক ভদ্রলোক—পরণে গেরুয়া, মাথায় টিকি! জটাই বোসকে সে বলিতেছিল—ওর চেয়ে কড়া হবে—এই লাইনটা গুঁজে দিন, বুঝলেন। স্বভাব-চরিত্রের উপর একটু ঠেশ্ না দিলে···মানে, খানিকটা স্কাণ্ডাল···অর্থাৎ নোংরা কথা না বললে দেশের লোক·টলবে না! বলবে—ঘর জামাই তো কি হয়েছে? হাতে টাকা না থাক্‌লে ঘর-জামাই হতে কে না চায়? তবে সকলের ভাগ্য তেমন নয়, তাই···

সুনন্দাকে দেখিয়া জটাই বোস কহিল—প্রুফ এনেছো! বেশ। তাহলে ঐ চেয়ারটা টেনে বসো—ওরই এক জায়গায় কটা লাইন গুঁজে দিতে হবে! তুমি পাশে এক-জায়গায় টুকে নাও, আমি বলি···

আদেশানুসারে পাশের ছোট টেবিলের ধারে গিয়া সুনন্দা বসিল। জটাই বোস বলিতে লাগিল—"গৃহ-জামাতা বলিয়া লোকটিকে নেহাৎ নিরীহ ভাবিবেন না। এক কুল-মহিলার ইনি সর্বনাশ করিয়াছেন। সে সংবাদ সবিস্তারে···

আর বলিতে হইল না। একটা অস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিয়া সুনন্দা টেবিলের উপর মাথা রাখিল।

মূর্চ্ছার ভাব···নিমেষের জন্য।

চোখ চাহিয়া সুনন্দা দেখে, তার পানে চাহিয়া সকলে বসিয়া আছে!

জটাই বোস কহিল—ব্যাপার কি?

সুনন্দা মৃদুস্বরে কহিল—মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো!

গেরুয়া কহিল—কাহিল শরীর···সন্তান-প্রসব···তা একটা টনিক খান্ না কেন?

অপরিচিত পুরুষের মুখে এ-কথা শুনিয়া লজ্জায় সুনন্দা মাথা নামাইল! কিন্তু এ লজ্জা চলে না! যখন বাহিরে পুরুষের দলে পুরুষের মতো তাহাকে চলিতে হইবে, তখন বাহিরের ঝঞ্ঝা পুরুষের মতোই সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই!

জটাই বোস কহিল—মাথা সারলো?

সুনন্দা কহিল—হ্যাঁ।

—তাহলে লেখো!

কুণ্ঠা-ভরে সুনন্দা কহিল—এ-কুৎসাগুলি···

শান্ত স্বরে গেরুয়া কহিল—দেশের মঙ্গলের জন্য! পাবলিক ইনটারেষ্ট।

সুনন্দা কহিল—আমি লিখতে পারবো না। আমি স্ত্রীলোক—এ-সব কথা লিখতে আমার বাধে!

—বাধে? জটাইয়ের চোখ দুটা বুঝি ঠিকরাইয়া ছিটকাইয়া পড়িবে—বিস্ময়ে এমন বিস্ফারিত হইল!

—হ্যাঁ।···বলিয়া সুনন্দা দাঁড়াইল।

জটাই কহিল—কিন্তু চাকরি! তোমার এ চাকরি। চাকরি করতে গেলে···

সুনন্দা সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না—নিজের ঘরে চলিয়া আসিল।

কদিন পরের কথা।

সেই এসপ্লানেড। অফিসের পর সুনন্দা ট্রামে চড়িতেছে, সামনে হইতে কে ডাকিল—সুনন্দা।

যে ডাকিল, সে ঐ ট্রাম হইতে নামিতেছিল—সুনন্দা চোখ তুলিয়া দেখে, অশ্বিনী!

অশ্বিনী কহিল—ফেরবার ভাড়া আছে?

সুনন্দার বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া উঠিল! কোনো কথা না বলিয়া সে মাথা নামাইল!

অশ্বিনী কহিল—ভিড়ে ধাক্কা খাবে! যদি সময় থাকে, ঐ কার্জ্জন পার্ক, ওখানে দু'দণ্ড যদি বসো!

সুনন্দা কহিল—না!

সে ফিরিল। অশ্বিনী কহিল—ট্রাম ভর্তি—দাঁড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না! কষ্ট পাবে! সারাদিনের পরিশ্রম···

সুনন্দা হাসিল। মনে হইল, ইস্, এত দরদ! ট্রামে দাঁড়াইয়া যাইতে কষ্ট হইবে! যে-কষ্ট তোমার আঘাতে এ ক'বৎসর সহ্য করিতেছি, তার চেয়ে বেশী কষ্ট দুনিয়ায় আর কেহ পাইয়াছে কখনো? তার সমস্ত বিশ্ব-নিখিল কি আবর্জনায় যে তুমি ভরিয়া দিয়া গিয়াছ!

সুনন্দা কহিল—পরের ট্রামে যাবো। এখানে দাঁড়াই।

অশ্বিনী কহিল—কথা শোনবার সময় তাহলে হবে না?

গম্ভীর কণ্ঠে সুনন্দা কহিল—না।

মুখে না বলিলেও অন্তরে যা হইতেছিল, অন্তর্যামীর তাহা অগোচর ছিল না! তিনি বুঝি বুক হইতে করুণার পাট এখনো মুছিয়া দেন নাই! তাই···

পরের ট্রাম আসিল···প্রায় খালি। সুনন্দা ট্রামে চড়িল। অশ্বিনীও তার পিছনে ট্রামে উঠিল।

যে-সীটে সুনন্দা বসিল, ঠিক তার পিছনের সীটে বসিল অশ্বিনী।

সেই অশ্বিনী···আবার এত কাছে! তার সান্নিধ্য···না, না, সুনন্দার আজো তাহা কাম্য! বিবাহের মন্ত্র সে পড়ে নাই, সত্য! কিন্তু মন্ত্র-পড়া বিবাহের স্ত্রীর চেয়ে তার দরদ, তার ভালোবাসা এই অশ্বিনীর 'পরে এতটুকু কম নয়। নিমেষের চঞ্চলতায় চেতনা হারাইয়া, জ্ঞান হারাইয়া সেদিন সে যা করিয়াছিল, সে-সবের জন্য মায়ায় মমতায় অনুতাপের ভারে সুনন্দার মন ভরিয়া আছে! তার পর দিনে-দিনে পলে-পলে যে-বেদনাকে সে জীবনের সাথী করিয়াছে—ভগবান, এমন বেদনাও তুমি মানুষকে দিতে পারো!

ট্রাম চলিতেছে। ট্রামে বসিয়া পথের পানে চাহিয়া সুনন্দা এমনি নানা কথা ভাবিতেছে।···অশ্বিনী কোথায় চলিয়াছে? তার ওখানে?···ভাবিতে আনন্দ হইল! ···না, সে নিষেধ করিবে না!···ভাগ্য যদি···

কিন্তু কার্জ্জন পার্কে যাইতে বলিলে সে-কথা সুনন্দা শোনে নাই। সে-জন্য যদি অভিমান হইয়া থাকে? সেই অভিমানে যদি পথের মাঝে নামিয়া যায়? এতখানি

পথ···সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো তাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবে? অথচ এই অশ্বিনী ···তার জীবনে সে কে, কি, কতখানি···

বার-বার মনে হইতে লাগিল, পিছনে তাকাইয়া একবার বলে—তুমি রাগ করিয়ো না। সঙ্গে এসো। আসিয়া দেখিবে, কি-ধন তুমি ফেলিয়া রাখিয়াছ। স্বীকার করিবার কথা পলকের জন্য তোমার মনে জাগে না?

এলগিন রোডের মোড়···ট্রাম থামিল। অশ্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার বুক কাঁপিল। পিছন-পানে তাকাইয়া সে কহিল—এখানে নামবে?

অশ্বিনী কহিল—হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।

সুনন্দার বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। ঠিক হইয়াছে। যেমন তুই কথা শুনিস্ নাই, তেমনি···

তবু সুনন্দা কহিল—খুব দরকারী কাজ?

—হ্যাঁ। কেন বলো তো এ-কথা জিজ্ঞাসা করছো?

সুনন্দা কহিল—এমনি!

—ও!···

অশ্বিনী নামিবার উদ্যোগ করিল। সুনন্দা চাহিয়া দেখিল। আর এক-পলক! তারপর বিপুল জন-তরঙ্গে ছোট ছোট ঢেউয়ের মত অশ্বিনী মিলাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে! জীবনে বোধ হয় কখনো আর দেখা হইবে না।

অথচ বলিবার অনেক কথা আছে! বিশেষ করিয়া অমলের কথা! রাত্রে বিছানায় শুইয়া এ-কথা কেবলি মনে জাগে! যদি সুনন্দা মরিয়া যায়···নামহীন দুর্ভাগার মত অমল পথে পথে ফিরিবে? অশ্বিনী বাঁচিয়া থাকতে? তার জন্য এতটুকু আশ্রয়···বেশীদিনের জন্য নয়। যতদিন না সে মানুষের মত হয়···কিন্তু···

সময় নাই···সময় নাই! অশ্বিনী নামিয়া গিয়াছে! কণ্ডাক্টর ঐ ঘণ্টার দড়িতে হাত দিয়া···পিছনের গাড়ী হইতে একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে।

সুনন্দা ছুটিয়া সীট ছাড়িয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। ঐ অশ্বিনী···ঐ একখানা ট্যাক্সি ধরিবার উদ্দেশে চলিয়াছে!

সুনন্দা এক-রকম ছুটিয়া তার কাছে আসিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল—বড্ড দরকারী কাজ তোমার?

অশ্বিনী কহিল—হ্যাঁ। কেন, বলো তো?

সুনন্দা বলিতে যাইতেছিল···কার্জন পার্কে এ প্রয়োজনের কথা মনে জাগে নাই তো! কার্জন পার্কে বসিবার জন্য অমন আগ্রহ!

কিন্তু বলা হইল না। এখনো অভিমান! ওরে অভাগিনী, ওরে পরিত্যক্তা, উপেক্ষিতা, পথের আবর্জনা, কিসের তোর এত দর্প রে!

সুনন্দা কহিল—নাহলে আমার ওখানে একবার যেতে বলতুম! অমল তোমায় ছাখেনি। জন্মের মত একবার দেখতো!

অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর কহিল—পথে দাঁড়িয়ে কথা হয় না, সুনন্দা।

গাড়ীতে এসো। বেশ, তোমার ওখানেই যাবো, চলো। কাজ না হয় আর-এক সময় হবে!

সুনন্দা ট্যাক্সিতে উঠিল।

আবার অশ্বিনীর পাশে! হাজারিবাগ যাওয়ার কথা মনে পড়িল। সেদিন সে ছিল কত ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময়ী। আর আজ? অতি-দীন পথের কাঙাল!

ট্যাক্সি আসিয়া বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল। অশ্বিনী ভাড়া চুকাইয়া দিল। সুনন্দা কহিল—ওকে দাঁড়াতে বলো। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া বড় শক্ত—বিশেষ সন্ধ্যার পর। এখনি ফিরবে তো!

মৃদু হাস্যে অশ্বিনী কহিল—যদি আজ না ফিরি?

সুনন্দা কহিল—না, না, তা হয় না। সে আশা আমি করি না!

অশ্বিনী কহিল—দুরাশার বস্তুও মানুষ কখনো-না-কখনো পায় তো···না-চেয়েও! এই যে আমি আজ তোমায় পেয়েছি! এ যে মস্ত দুরাশা ছিল, সুনন্দা!

সুনন্দা কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। তার চোখে স্নিগ্ধ রমণীয় দৃষ্টি। অশ্বিনীর কথায় তার বুক দুলিয়া উঠিল।

হায় নারী, শক্তির এত দর্প করো—কিন্তু কি দুর্বল তোমার মন! কত সহজে সে-মন কাতর হইয়া নুইয়া পড়ে!

সুনন্দা কহিল—এসো।

ছোট ঘর। দীন বেশ। একটা হারিকেন জ্বলিতেছে! অমল বসিয়া ছবি দেখিতেছে—পাশে বাড়ীওয়ালার সেই বিধবা মেয়ে তারা!

সুনন্দা অশ্বিনীর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—একটু ওদিকে যাও তো।

অশ্বিনী সরিয়া গেল। সুনন্দা ডাকিল—তারা···

তারা ফিরিল। ছুটিয়া অমল আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, ডাকিল—মা।

সুনন্দা তারাকে কহিল—উনি এসেছেন। তুই একটু ও-ঘরে যা তো ভাই।

—উনি! এসেছেন!—রাজ্যের আরাম আর আনন্দ বহিয়া খুশীমনে তারা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সুনন্দা অশ্বিনীকে ডাকিল; তার পর দু'জনে ঘরে আসিল।

অশ্বিনী সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিল; চাহিয়া কহিল—এই ঘরে তুমি থাকো সুনন্দা!

সুনন্দা কহিল—বনে যাওয়া সম্ভব হলো না···শুধু এর জন্য—তাই।

সে অমলের দিকে ইঙ্গিত করিল। তারপর কহিল—ওকে ডেকে একটু কাছে নাও ···আমি দেখি! সুনন্দার স্বর বাষ্পে আর্দ্র, জড়িত!

অশ্বিনী অমলকে টানিয়া কোলের কাছে আনিল; তার পানে চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অমলের বিস্ময় সীমাহীন।

সুনন্দার দু'চোখে জল। সুনন্দা কহিল—চিনতে পারছো না, অমল?···

বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে অমল মায় পানে চাহিল। সুনন্দা কহিল—তোমার বাবা।

অমলকে সঙ্গে লইয়া অশ্বিনী ঘাটে বসিল। সেই ঘাট। যে ঘাটে একদিন সে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

অশ্বিনী কহিল—তোমার নাম কি?

অমল কহিল—অমল।

সুনন্দা কহিল—সব নামটুকু বলো।

অমল কহিল—শ্রী অমলকুমার চৌধুরী।

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সুনন্দা দু'জনার পানে চাহিয়া রহিল। মুখ বুক তার আনন্দে পরিপূর্ণ! নাই, নাই, আজ আর তার কোনো অভাব মনে নাই! সকল কামনার তৃপ্তি হইয়াছে!···

সেই নির্মম বিদায়-রাত্রির পর হইতে যে-ভাবে তার দিন কাটিতেছে···দীর্ঘ···দীর্ঘ কাল ধরিয়া···

এই অমল দিনে-দিনে বাড়িয়া এত-বড় হইয়াছে! তার হাসি, গল্প, তার খেলা —আর ঐ-মুখ···ও-মুখে অশ্বিনীর মুখের ছায়া যেন কে মেলিয়া রাখিয়াছে! এ সব না থাকিলে সুনন্দা কি এত দুঃখ সহিয়া বাঁচিত—না, বাঁচিতে পারিত?

সুনন্দা কহিল—আমায় তুমি স্বীকার না করো, ক্ষতি নেই—আমাকে স্বীকার করতে বলছি না···এমনি আবর্জনার মত আমি পথে পড়ে থাকি, দুঃখ নেই! কিন্তু অমল···তোমার ছেলে···ওকে স্বীকার করো···তোমার পায়ে পড়ি।

অশ্বিনীর মুখে কথা নাই! সে কি ভাবিতেছে।

তারা লুচি-তরকারী করিয়া পাঠাইয়া দিল। সুনন্দা কহিল—খাও।

অশ্বিনী কহিল—খেতে হবে?

—খাবে না? তারা তৈরী করেছে কত যত্নে। বড় ভালো মেয়েটি। উনিশ বছর বয়স—এই বয়সেই সব সুখ ঘুচে গেছে। বিধবা।

অশ্বিনীকে খাইতে হইল। তারপর অশ্বিনী কহিল—আজ আমার সব কথা শোনো সুনন্দা—শুনে তুমি বিচার করো। বিচারে যে-শাস্তি দিতে চাও, দিয়ো—আমি মাথা পেতে নেবো!

অশ্বিনী সংক্ষেপে নিজের কাহিনী খুলিয়া বলিল,—গরীবের ঘরে তার জন্ম! অথচ মনের নজর ছিল চিরদিন ঊর্ধ্বে,—ঐ আকাশের পানে! বামন হইয়াও মানুষ চাঁদ ধরিবার লোভ করে। লেখাপড়ায় ভালো পাশ করিলেও তার স্বস্তি ছিল না। ডিগ্রীর জোর কতটুকু! যার মুরুব্বির জোর আছে, জোর শুধু তারই আজ এযুগে! অশ্বিনী দশের একজন, দেশের একজন হইবে—এই তার সাধ। হঠাৎ সুযোগ মিলিল। ভাটুলিয়ার জমিদার দীনবন্ধু রায়ের একটিমাত্র মেয়ে—বিপত্নীক জমিদার—মেয়েটি জন্ম-রুগ্ন। একটি পা পক্ষাঘাতে পঙ্গু—মাথাও বেশ পরিষ্কার নয়। সে মেয়ে জমিদারের প্রাণ। বহু চিকিৎসাতেও মেয়ে সারে নাই। এই মেয়েকে লইয়া বুড়ার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। বুড়ারও পক্ষাঘাত হয়। তাঁর সেই মেয়ের সঙ্গে অশ্বিনীর বিবাহ হইয়াছে।

দেশের ও দশের একজন হইয়া দিন কাটাইবেন—ইহা ছিল বুড়ার সাধ! তাঁর সে-সাধ পূর্ণ হইল না! সে-সাধ মিটাইবার কোনো উপায়ও ছিল না। জামাইকে দিয়া সে-সাধ মিটাইতে চাহিলেন। অশ্বিনীকে তাঁর ইঙ্গিতে চলাফেরা করিতে হয়, মাঝে মাঝে সে দমিয়া পড়ে—এ-কাজের আড়ালে আরাম নাই! সে-আরাম মিলিবার উপায়ও নাই! ঘরে যে-স্ত্রী···সে মানুষ নয়! সোনার শিকল···নড়িতে-চড়িতে ঝম্-ঝম্ করিয়া বাজে! অথচ গৃহ-সুখের কল্পনা অশ্বিনীর মনে ছিল কতখানি···

দারুণ অশ্রুভরা করুণ মিনতি! এই বুড়ার পয়সাতেই অশ্বিনী লেখাপড়ার সুযোগ পায়। কৃতজ্ঞতা আছে! তারপর বুড়া জমিদার বুঝাইলেন, শূন্যতায় তাঁর প্রাণ হা-হা করিত, অশ্বিনীর উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের দিনগুলো কাটাইয়া দিবেন!

এমনি করিয়া দশ-বারো বছর কাটিয়া গেছে। অশ্বিনীর প্রায় উন্মাদ হইবার জো—মস্তিষ্কের পীড়া!—ডাক্তারের কথায় সে রাঁচিতে যায়···এবং রাঁচিতে সুনন্দার সঙ্গে দেখা! সুনন্দা যেন তার আজন্মের কামনা···মূর্তি ধরিয়া সেখানে দেখা দিল!

বিবাহ অসম্ভব ছিল। বেচারী ভানু···তার স্ত্রী। আর সেই অর্থহীন ফ্যালফেলে দৃষ্টি···কি বেদনায় যে মাখানো···অশ্বিনীর গা কাঁপিত! তবে সুনন্দার কাছে সে চাহিয়াছিল, দেহের স্পর্শ-লেশহীন অকলুষ প্রেম। সে-বস্তু যে আকাশ-কুসুম—অশ্বিনী সত্যই তাহা বোঝে নাই! এক কোণে সকলের আড়ালে সে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, জীবনের সম্বন্ধে তার যা ধারণা তা কল্পনায়-রচা বই হইতে পাওয়া!

তারপর সুনন্দার চিন্তা তার বুকে কাঁটা হইয়া ফুটিয়া আছে···সারাক্ষণ!

অশ্বিনী কহিল—তুমিই বলো, কি উপায় আছে? এসো, বিবাহ করি···গোপনে। না হলে যতদিন ভানু বেঁচে আছে—সে আর কিছু না বুঝুক, এটুকু বোঝে! আদর চেয়ে এমন কাঙালের মত করুণ মূর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়!

সুনন্দা বসিয়া সব কথা শুনিল, শুনিয়া বলিল—বিবাহ চাই না···জীবনে তোমায় যেটুকু পেয়েছি, সে-পাওয়া আমার সার্থক হয়েছে! আজ যত-দূরেই তুমি থাকো, আমার মনের বাইরে যেতে পারবে না। এতদিন নিমেষের জন্যও তা পারোনি!

সুনন্দা!···আবেগে সুনন্দার হাত ধরিয়া অশ্বিনী তাকে কাছে টানিল, পরে উদ্ভ্রান্ত অধীর চুম্বন···

সুনন্দা বাধা দিল, দিয়া কহিল—না···ও-সবে আমার কোনো লোভ নেই, কোনো কামনা নেই আর। শুধু তুমি অমলকে স্বীকার করো—ওকে ভদ্র আসন দাও···তোমার ছেলে বলে ও যেন সকলের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে! আর কিছু নয়···আর কিছু আমি চাই না!

অশ্বিনী কহিল—তাই হবে। কিন্তু তুমি? দুঃখই পাবে?

সুনন্দা কহিল—এ হলেই আমার জীবনে কোনো দুঃখ থাকবে না!

এগারো

কৌন্সিলের নির্বাচন-উপলক্ষে কাগজে-কাগজে বাক-যুদ্ধ বেশ জমিয়া উঠিল। কৌন্সিলের সদস্যদের কি কাজ, কি কর্তব্য—সে সব যারা কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, এমন বহু ভাগ্যান্বেষী-বেকারও শস্তার কাগজ বাহির করিয়া গলা বাজাইতে ছাড়িল না। যাহাদের এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বার্থ আছে, তাহারা পয়সা দিয়া ভাড়াটিয়া লেখক যোগাড় করিয়া যা-তা কুৎসা লেখাইয়া—রঙদার বুকনি হাঁকিয়া পশার জমাইয়া তুলিতে ছাড়িল না। এমনি একখানা কাগজ নূতন বাহির হইয়াছিল—প্রতিদ্বন্দ্বীরা পয়সা খরচ করিয়া এমন দু-চারখানা কাগজ চিরদিন বাহির করে; এবারও করিয়াছে। আর-একখানা কাগজে অশ্বিনীর নামে যা-তা কুৎসা বাহির হইল। এ কাগজখানার নাম "হাঁড়ি"। সম্পাদকীয় 'মটো' বলিয়া কাগজের শিরোনামায় লেখা আছে, "আমরা সকলের হাঁড়ির খবর রাখি—সে হাঁড়ি এবার হাটে ভাঙ্গিব। ইতি বিট্‌কেলানন্দ শর্ম্মা।"

সুনন্দা বসিয়া ক্যালকাটা পাব্লিশার্সের নূতন ক্যাটালগ বহির প্রুফ দেখিতেছিল, জটাই বোসের খানশামা সুখন আসিয়া সংবাদ দিল, বড়সাহেব সেলাম দিয়াছেন।

সুনন্দা আসিল জটাই বোসের ঘরে। জটাই বোসের ঘরে আরো তিনজন ভদ্র ব্যক্তি বসিয়া আছে। একজন সেদিনকার সেই গেরুয়া-টিকি-ধারী···নাকে ঘন ঘন নস্য গুঁজিতেছে···অপর দু'জনের মধ্যে বেশভূষায় একজন পাকা সাহেব, তৃতীয় জনের পরণে খদ্দর। টেবিলের উপর নোটের তাড়া।

সুনন্দাকে দেখিয়া জটাই বোস কহিল—এ কাগজখানায় নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া যতখানি লেখা আছে, সে লেখাটুকু আলাদা শ্লিপে লিখে প্রেসে পাঠাতে হবে। আমি বেরুচ্ছি। তোমার উপর এ-কাজের ভার। এটুকু বেশ ডিস্‌প্লে করে এই হপ্তার কাগজেই ছাপানো চাই। তুমি দেখে-শুনে ছাপতে দেবে।···এর জন্য অনেকগুলি টাকা লাভ হবে···হ্যাঁ, তাহলে ওঠা যাক্। আসুন বিপ্রবাবু···

সকলে উঠিল। বিপ্রবাবু ওরফে সেই খদ্দর-পরা বিপ্রদাস আবেশ-ভরা দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল।

কাগজ হাতে সুনন্দা কামরা ত্যাগ করিয়া আসিল। তার বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামরার মধ্যে এক বিরাট অট্টহাস্য। সুনন্দার কাণে সে-হাস্য বাজের মত বাজিল।

সুনন্দা আসিয়া নিজের চেয়ারে বসিল। কাগজখানা খুলিয়াছে, বিপ্রদাস আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, কহিল—আপনার নাম সুনন্দা দেবী?

তার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে সুনন্দা কহিল—হ্যাঁ।

বিপ্রদাস কহিল—অফিসের কাজের পর আপনার যদি অবসর থাকে, তাহলে কিছু কাজের ভার দি।

সুনন্দা কোনো কথা না বলিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল। বিপ্রদাস কহিল—জটাই বাবুর কাছে শুনেছি, আপনি শিক্ষিতা-বুদ্ধিমতী···তা এই ইলেক্‌সনের ব্যাপারে আপনাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবো···মোটা পয়সা পাবেন তার জন্য।

লোকটার চোখে যেন শিকারীর লোলুপ দৃষ্টি! সে দৃষ্টির সহিত পরিচয় কিছুমাত্র না থাকিলেও সে-দৃষ্টি গায়ে যেন চিড়্‌বিড়্‌ করিতেছিল! সুনন্দা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিল।

সুনন্দা কহিল—কিন্তু আমার তেমন অবসর নেই···বাড়ীতে কাজকর্ম আছে।

বিপ্রদাস কহিল—তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি ঠিক করে নিতে পারবো। দশ মিনিট টাইম দিতে পারবেন না? অথচ দশ মিনিটে দশে-দশে একশো টাকা করে পাবেন—ক্যাশ টাকা! জটাইয়ের কাছে আপনার শক্তি আর প্রতিভার কথা শুনছিলুম কি না···তা, সে-কথা এখানে হয় না। মানে, সব শুনে আপনি চিন্তা করে দেখবেন··· যদি অসুবিধা না হয়, অবশ্য! তাই বলছিলুম, আপনার ঠিকানাটা যদি···যে-কোনো সময়ে আপনার সুবিধা হয়—সন্ধ্যার পর। তাহলে সবিস্তারে জানাতে পারি। খুব ভয়ঙ্কর কিছু কাজ নয়—প্রত্যহ দশ মিনিট করে—ব্যস! এই অবধি বলিয়া বিপ্রদাস ব্যাগ খুলিল—খুলিয়া দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া হাত বাড়াইল, কহিল— এ্যাডভান্স দশটা টাকা বরং রাখুন···সময়ের দাম আছে। এ-বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপনার সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা খুলে বলবো!

নোটখানা টেবিলের উপর রাখিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সুনন্দাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপ্রদাস কহিল—এই কৌন্সিলের ইলেক্‌সন ব্যাপারে অনেকে তিন-বছরের রোজগার পকেটস্থ করতে পারবে! জানেন না তো, এ একেবারে বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার!···হ্যাঁ, তাহলে আপনার ঠিকানা···

কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠে সুনন্দা কহিল—আমার সময় হবে না। আমায় মাপ করবেন।

বাহির হইতে জটাই বোস ডাকিল—বিপ্রবাবু···

বিপ্রদাস কহিল—আচ্ছা, আর এক সময়ে কথা হবে'খন।

বিপ্রদাস বাহির হইয়া গেল। সুনন্দা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

ঘড়িতে ছটা বাজিল। ঘড়ি বাজিতে তার চেতনা হইল। সেই নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া লেখাটা।···

জটাই বোস অফিসে নাই! এই ব্যাপারের কি-একটা সূত্র-সংগ্রহে গিয়াছে। যাইবার সময় তাগিদ দিয়া গিয়াছে, লেখাটা যেন শীঘ্র প্রেসে দেওয়া হয়—প্রুফ দেখিয়া ছাপিবার জন্য ওটুকু যেন রেডি থাকে! এখন সে-লেখা পড়িবার অবসর হইল। পড়িল। পড়িয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। কে একজন মথুর হালদার কৌন্সিলে ঢুকিতে চায়—তার নামে অতি ইতর, জঘন্য কুৎসা! কোন্ রঙ্গালয়ের নটী গোপনে মথুর হালদারের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট হইতেছে···কোন্ কুলকামিনী তার প্ররোচনায় কুল-ত্যাগ করিয়া যথাসর্বস্ব হালদারের পায়ে সঁপিয়া আজ পথে বসিয়াছে! তাদের নাম-ধামও সুস্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে!

এই লেখা···সুনন্দাকে স্বহস্তে লিখিয়া দিতে হইবে?···ছি ছি ছি! ভদ্র সমাজে এই সব লেখা ছাপাইয়া এঁরা সম্পাদকীয় কর্তব্য করিতে চান! অশিক্ষিত ম্যাথর-মুর্দফরাশের মত এমন বর্বর ইতর! না, এ সব কথা নিজের হাতে সে লিখিবে না। লিখিতে পারিবে না!

কিন্তু ভার যখন লইয়াছে! জটাই বোস অফিসে থাকিলে এখনি গিয়া তাকে এ কাগজ ফিরাইয়া দিত, দিয়া বলিত, এ ইতরতার প্রশ্রয় সে কোনো রূপে দিবে না, দিতে পারিবে না···সেজন্য যদি চাকরি খোয়াইতে হয়, তাহাতেও সে রাজী!

জটাই বোস অফিসে নাই!···অথচ কর্তব্য!

সে স্থির করিল, আজিকার মত লিখিয়া দিবে—এবং চিঠি লিখিয়া চাকরি ছাড়িবে। স্পষ্ট বলিবে, এমন ইতর চাকরি তার পোষাইবে না!

তাই হইল। লেখাটুকু আলাদা কাগজে লিখিয়া ছাপিতে দিয়া পরে তার প্রুফ দেখিয়া সে গিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল—তারপর জটাই বোসের নামে বিদায়-পত্র লিখিল—

—মহাশয়,

এ-সব কাজ আমার দ্বারা হইবে না। যদি কথা দেন, এ-সব ইতর লেখার সহিত আমার কোনো সংস্রব থাকিবে না—তবেই কাল অফিসে আসিব, কাজ করিব। নচেৎ আমার ইস্তফা গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি দিবেন। ইতি—

শ্রীসুনন্দা দেবী

চিঠিখানা লিখিয়া লেফাফায় মুড়িয়া সুনন্দা সে লেফাফা জটাই বোসের টেবিলের উপর রাখিল, তারপর গৃহে ফিরিবার বাসনায় অফিসকামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিফ্‌টে উঠিবে, লিফ্‌টে দুজন লোক। তাদের মধ্যে একজন···বিভোর। হাসিয়া বিভোর কহিল—হ্যালো সুনন্দা দেবী···গুড্ ইভনিং! তারপর কেমন আছো?

সুনন্দা কহিল—ভালো! আপনি ভালো আছেন?

—ভালো?···বিভোর সুনন্দার পানে চাহিল, তারপর একটা ঢোক গিলিয়া কহিল—হ্যাঁ, অমনি একরকম—মানে, মন্দ নেই।

সুনন্দা কহিল—আমি যাই···

পকেট হইতে কেস্ বাহির করিয়া বিভোর একটা সিগারেট গ্রহণ করিল; সেটা মুখে দিয়া জ্বালাইয়া কহিল—তারপর আমার কথাটা বিবেচনা করে দেখেছো?

সুনন্দা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল।

বিভোর কহিল—সেই···যা বলেছিলুম···আমার সারা জীবনের সাথী···

সুনন্দা কহিল—না।

বিভোর কহিল—বিবাহ না করে নিঃসঙ্গ জীবন···এমন একা···

সুনন্দা কোনো উত্তর না দিয়া গমনোদ্যত হইল।

বিভোর কহিল—ও···হ্যাঁ···সিঁথেয়-সিঁন্দুর! বটে! আমি খেয়াল করিনি। তা জানতে পারি, এ ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে—যাকে পাণিদানে তুমি ধন্য করেছো?

সুনন্দা কহিল—আমায় যেতে দিন···

বিভোর কহিল—আহা, বেয়ো! দুটো আলাপ করতে ক্ষতি কি!···তা যাক, এখানে কাজকর্ম চলছে কেমন? সম্প্রতি নূতন উৎসাহ···এই ইলেক্‌সন্‌ এলো··· রোজগারের মরশুম। জটাই চালাক ব্যক্তি—কষে দাঁও মারছে, বোধ হয়? তোমরা কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছ? ওঃ, মানুষ কতখানি বর্বর হয়ে কি সব জঘন্য লেখা ছাপাচ্ছে!

সুনন্দা দেখিল, কোন কথা না কহিলে নড়া যাইবে না! সে বলিল—এঁরা অশ্বিনীবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন!

—অশ্বিনী! ও! সেই গৃহ-পালিত জামাই-বাবাজী! আরে রামচন্দ্র···সেটা কি মানুষ! ক্যাড্‌···হতভাগা···জানোয়ার! শ্বশুরের পয়সা আছে—একদিক থেকে শ্বশুর তাকে ঠেলছে—যাও বৎস, যুদ্ধে যাও···অন্যদিকে ভোটারের দল বীরের গর্বে মত্ত হয়ে ডাকছে, এসো, তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গি! তা, লোকটা এদিকে ভিজে বেরালটির মতো থাকলেও ওর নানা কীর্তির কথা কাণে আসছে! বহুৎ কেচ্ছা শুনছি তার সম্বন্ধে!

সুনন্দার এবার অসহ্য বোধ হইল। সে কহিল—পর-চর্চা রেখে এখন আপনি বিলেত থেকে এলেন কবে, বলুন?

বিভোর কহিল—বহু দিন হলো, ফিরেছি। সে-দেশ—নাঃ, পোষালো না! টাকা ছড়াও—দুনিয়া হবে তোমার গোলাম!—সেখানেও তাই! ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। পয়সা যেখানে ছড়াবো, সেইখানেই সকলে আমাকে মাথায় তুলে নাচবে! এ-আর এমন কি! দু-চারটে ব্যাপারে কি ঠকানটাই ঠকেছি! যাক—অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়! তার জন্য টাকা যদি কিছু যায়—ভাববো, অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের দাম!

সুনন্দা কহিল—আসি তাহলে···

বিভোর কহিল—আমার কথাটা একটু বিবেচনা করো···লক্ষ্মীটি! এটুকু আমি বুঝেছি, যে বিবাহ করেনি, যার স্ত্রী নেই, তার ঘর নেই!···কিছু নেই! এবং সেই স্ত্রী ···আমি মিনতি করছি, এক-হপ্তা সময় নাও—তার মধ্যে মনকে ঠিক করে ফেলো! দেখবে, আমি মোটে জুলুমবাজ নই! আমাকে জীবন-সাথী করে নিলে জীবনে কখনো অশান্তি ভোগ করবে না! আমি নিরীহ···এবং অনুগত স্বামী হয়ে থাকবো! আমার কথা যদি···

সুনন্দা আর দাঁড়াইল না—কথার ঝড়ের মধ্যে দিয়াই সে চলিয়া গেল।

বিভোর ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর সিগারেটটা সবলে নিক্ষেপ করিয়া সে অফিস-কামরায় প্রবেশ করিল।

বারো

বাড়ী ফিরিয়া সুনন্দা দেখে, অশ্বিনী বসিয়া আছে। অমলের জন্য একটা পোষাক, একরাশ চকোলেট, লজেঞ্জেশ, খেলনা প্রভৃতি আনিয়াছে। অমল ঘরের মেঝেয় খেলার মোটর-গাড়ীতে দম দিয়া মহানন্দে খেলা করিতেছে!

সুনন্দাকে দেখিয়া অশ্বিনী কহিল—তোমার দেরী হলো যে?

সুনন্দা কহিল—না, দেরী নয়···এই সময়ে আসি।

অশ্বিনী কহিল—একটা আইডিয়া আমার মাথায় জেগেছে···কদিন তাই আসিনি। আজ সে-আইডিয়া এমন অধীর করে তুললো—চলে এলুম।

সুনন্দা কহিল—কিসের আইডিয়া?

অশ্বিনী কহিল—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এসো···বিশ্রাম করো···তারপর বলবো। আমার তাড়া নেই।

সুনন্দা মুখ-হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরে ফিরিল। অমল তখন মোটা একখানা ছবির বই খুলিয়া বসিয়াছে।

সুনন্দা কহিল—তোমার মাসিমা ডাকছেন, অমল। বই নিয়ে মাসিমার কাছে যাও—মাসিমা ছবি দেখাবেন।

মাসিমা···তারা।

অমল ওঘরে গেলে সুনন্দা আসিয়া অশ্বিনীর পায়ের কাছে বসিল।

অশ্বিনী কহিল—যা বলবো তা ভালো করে বুঝো। এ ছাড়া নিঃশব্দে আর কোনো ব্যবস্থা আপাততঃ বোধ হয় সুবিধার হবে না। এ ব্যবস্থা মাথায় এসেছে তোমার সেদিনের সে-সঙ্কল্প বিবেচনা করে···

নম্র ধীর স্বরে সুনন্দা কহিল—বলো···

অশ্বিনী কহিল—আমার সব পরিচয় তোমায় বলেছি···ঘরের সব কথা···ভানুর কথাও! সে যেমনই হোক, তার মনটা ভারী নরম। শ্বশুরমশায়ও লোক ভালো! আমাদের ছেলেপিলে হয়নি—কোনোদিন হবে না···ওঁরা একটি ছেলেকে এনে মানুষ করতে চান। বহুদিন থেকে এ সঙ্কল্প চলেছে—আমি মত দিইনি। কাল আমি বলেছি, মনের মতো একটি ছেলে আছে—তাকে পোষ্যপুত্র নিতে আমি রাজী আছি।

সুনন্দার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া পরম আগ্রহে অশ্বিনী এ কথা বলিতেছিল—সুনন্দার দৃষ্টিতে চপল আগ্রহ···

সহসা সে-দৃষ্টি স্থির অচপল দেখিয়া অশ্বিনী কহিল—ভুল করে দু'জনের জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছি, সে জটিল গ্রন্থি···দাও সুনন্দা, সে-গ্রন্থি খুলে জীবনকে সহজ সুন্দর করবার সুযোগ দাও! অমলকে তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করি!··· তারপর তুমি—দেবতা সাক্ষ্য রেখে তোমায় আমি বিবাহ করবো। তবে ওখানে তোমায় নিয়ে গেলে চারিদিকে হয়তো বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে···'হয়তো' বলছি···হবেই, এমন নয়! তুমি দয়া করো, আমার কথা রাখো···

সুনন্দা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···তার চোখের সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা! সে গ্রন্থি···

অশ্বিনী কহিল—আমরা যে ভুল করি, তার সংশোধন পুরোপুরি হয় না সবসময়ে। তবু চেষ্টায় যতখানি শোধরানো সম্ভব, কেন শোধরাবো না, সুনন্দা?

রুদ্ধ নিশ্বাসে সুনন্দা কহিল—কি করতে চাও?

অশ্বিনী কহিল—অমলকে নিয়ে যাবো! মনকে বোঝাবার জন্য শাস্ত্রীয় বিধি মেনে ওঁরা হয়তো যাগ-যজ্ঞ করে আইনের দিক দিয়ে পোষ্যপুত্রের আসন কায়েমি করবেন! আমি জানি, অমল আমার কে—সেজন্য আমার মনের দিক থেকে কোনো আড়ম্বর, কোনো যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন হবে না! তবে ওঁদের তৃপ্তি, সমাজের মনস্তুষ্টি, শাস্ত্র আর আইনের মর্যাদা…সব রক্ষা পাবে! এতে তুমি রাজী …হও লক্ষ্মীটি!

অশ্রু-জড়িত চক্ষে সুনন্দা অশ্বিনীর পানে চাহিয়া রহিল—নির্বাক্ নিস্পন্দ!

অশ্বিনী কহিল—স্ত্রী যদি সত্যই জীবনের সাথী, মনে-জ্ঞানে স্বামীর সঙ্গিনী, স্বামীর সহধর্মিণী, সহকর্মিণী হয়, তাহলে তুমি আমার সেই স্ত্রী! বিবাহে মন্ত্র দরকার—লোক-জানাবার জন্য! বিবাহের মধ্যে কোনো গোপন রহস্য না থাকে, সেই জন্য! এসো সুনন্দা, আমরা লোকাচারকে শ্রদ্ধা করে শাস্ত্রীয় বিধি মেনে আজ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হই! মনের দিক থেকে আমাদের বিবাহ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে সকলের চোখের আড়ালে! সে ব্যাপারে লোকাচারের বিন্দু-বিসর্গ ছিল না…আজ লোকাচারকে মেনে, এসো, এ বিবাহকে সামাজিক আসনে প্রতিষ্ঠিত করি—সমাজ এ বিবাহ মেনে তাকে মানবে, মর্যাদা দেবে!

সুনন্দা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—না, তার আর প্রয়োজন নেই আমার! তোমার অমলকে তুমি স্বীকার করো…তাহলেই আমার কোনো অতৃপ্তি থাকবে না!

অশ্বিনী কহিল—আমাকে তুমি গ্রহণ করবে না?

সুনন্দা কহিল—সেদিন তো বলেছি, কোনো দিক থেকে তোমায় পেতে আমার বাকী নেই! তোমায় চূড়ান্ত পাওয়া পেয়েছি…জীবনের সাথী!…নাই বা সমাজ, আইন, শাস্ত্র সে পাওয়া মানলো! আমি এমনি একান্তে দূরে থেকে তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো…তাতেই আমার তৃপ্তি! আমি তোমারই আছি—জেনো।

অশ্বিনী কহিল—সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে?

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল—সন্ন্যাসিনী নই…আমার স্বামী, পুত্র, সংসার সবই রইলো—তাদের মায়ায় প্রাণ সারাক্ষণ ভরে থাকবে! তাদের বিপদ দেখলে আমার বুক সবার চেয়ে কাতর হবে। তাদের স্মৃতিই আমার সংসার। আমি তাদের ত্যাগ করছি না—তারা ত্যাগ করবার নয়! তবে তাদের নিয়ে আমার উদ্দামতা নেই। তারা সুখে থাকুক, তাহলেই আমার সংসার শৃঙ্খলায় চলছে, জানবো! আর তা চলবেও।

অশ্বিনী কোনো কথা কহিল না…সুনন্দার মুখে কথা নাই! দুজনে নির্বাক… ঘরের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা শুধু দুলিয়া দুলিয়া একঘেয়ে রব তুলিতেছে!

অমল আসিল, কহিল—তোমার খাবার এখন দেবে মাসিমা?

অশ্বিনী তার পানে চাহিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল—কাছে এসো।

অমল আসিল। তাকে কোলের কাছে টানিয়া অশ্বিনী তার মুখে চুমু দিয়া সস্নেহে কহিল—আমার সঙ্গে তুমি বাড়ী যাবে অমল?

ডাগর চোখের দৃষ্টি অশ্বিনীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া অমল কহিল—কাদের বাড়ী ?

—তোমার নিজের বাড়ী !

—এ বাড়ী ?

—এ বাড়ী তোমার নয়। তোমার বাড়ী ঐদিকে আছে—আমি সেখানে থাকি।

—মা যাবে ?

—তোমার মাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। সেখানে আমার কাছে তুমি থাকবে। তোমায় কত আদর করবো, কত জিনিস দেবো।

—মোটর-গাড়ী দেবে ?

—দেবো। ওর চেয়ে ঢের বড় মোটর।

বিস্ফারিত চক্ষে দেওয়ালের পানে চাহিয়া থাকিয়া অমল কহিল—খুব বড় ?

অশ্বিনী কহিল—খুব বড়।

—এ্যাত্তো বড় ? সে-গাড়ী রাস্তায় চলবে ?

—হ্যাঁ।

অমলের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে যেন মানস-চক্ষে দেখিতেছিল, পথে তার মোটর চলিয়াছে—প্রকাণ্ড মোটর···লোকারণ্য মথিত করিয়া !

সুনন্দা সাগ্রহ দৃষ্টিতে ছেলের পানে চাহিয়া ছিল—অমলকে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া সে কহিল—সে-গাড়ী কে চালাবে, অমল ?

অমল কহিল—আমি !

—তুমি !

—হ্যাঁ···দম দিয়ে চড়ে বসবো—ব্যস, গাড়ী চলবে।

সুগভীর আনন্দে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া অমল প্রশ্ন করিল—ঠিক দেবে তো তুমি ? এই, এ্যাত্তো বড় গাড়ী ?

অশ্বিনী কহিল—ঠিক দেবো।

—কবে ?

—কাল।

অমল নির্বাক্···কেমন একরকম দৃষ্টি তার চোখে! সে চাহিল সুনন্দার দিকে, বলিল—তুমিও যাবে মা, আমাদের সে-বাড়ীতে ?

নিশ্বাস চাপিয়া সুনন্দা বলিল—না বাবা, আমি যাবো না। মাসিমা একলা যে থাকবে তাহলে ! মাসিমার মন কেমন করবে।

অমল কি ভাবিতে লাগিল···ভাবিয়া একটু পরে সে বলিল—মাসিমাও যাবে আমাদের সঙ্গে।

সুনন্দার মুখে মলিন হাসি···সুনন্দা বলিল—পাগল ছেলে ! তাহলে এ-বাড়ীতে কে থাকবে ?

অমল বলিল—বাড়ীতে চাবি দিয়ে যাবে—নাই-বা কেউ থাকলো ! মাসিমাও যাবে—আমি মাসিমাকে বলে আসি।···মাসিমা···

অমল ছুটিল তারার উদ্দেশে।

জল-খাবার আসিল। সুনন্দা কহিল—খাও···

—রোজ খেতে হবে? কেন খাবো?

সুনন্দা কহিল—বাহিরের লোক এলেও মানুষ তাকে খেতে ছায়···এ হলো আতিথ্য পালন!

—আমিও অতিথি?

সুনন্দা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—অতিথি বৈ কি!···আমার সবচেয়ে বড় অতিথি!

কথার শেষ দিকে সুনন্দার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অশ্বিনী তার পানে চাহিয়া রহিল।

সুনন্দা কহিল—খাও, আমার পানে চেয়ে থাকলে খিদে-তেষ্টা মিটবে না।

—মিটবে।···অন্ততঃ খিদে-তেষ্টার কথা এখন আমার মনেও নেই।···

আবার দুজনে চুপ করিয়া রহিল। তারপর অশ্বিনী প্রথমে কথা কহিল, বলিল—শোনো সুনন্দা···

—বলো···

—খেতে আমি রাজী···এক সর্তে···তুমিও যদি আমার সঙ্গে খাও···তবে। না হলে নয়।

—অমল এখনো খায়নি।

—তাকেও ডাকো, তিনজনে একসঙ্গে বসে খাবো···এক-পাতে। তাহলে বুঝবো, আমায় জাতে-ঠ্যালা করে রাখোনি! তোমাদের সঙ্গে এখনো এক-পঁইঠেয় আছি, আমি অস্পৃশ্য নই!

সুনন্দা কহিল—বেশ!···

তারপর বিদায়ের পালা—সাগ্রহে সুনন্দার হাত ধরিয়া অশ্বিনী তার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল···সুনন্দা চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে মাথা নামাইল।

অশ্বিনী ডাকিল—সুনন্দা···

—বলো

—দক্ষিণা দাও···পাথেয়···যা সম্বল করে পথে বার হতে পারি।···

—কি দক্ষিণা দেবো? কি চাও তুমি···বলো···

অশ্বিনী সুনন্দার মুখের কাছে মুখ আনিল···সুনন্দা কহিল—না···আমায় ক্ষমা করো—ও-লোভে আর আমায় প্রলুব্ধ করো না।

—আমি স্বামী···

—জানি।···তবু···না, আমায় মাপ করো। অমলকে আদর করো, সে-আদর আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে!···

অধীর সাগ্রহ দৃষ্টিতে অশ্বিনী সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আসি। ওদের সঙ্গে এ কথা পাকা করে তোমাকে খবর দেবো!

দিন-ক্ষণ ওঁরা দেখবেন, নিশ্চয়। দেখুন। শুভ কাজ! তারপর অমলকে নিয়ে যাবো···কেমন?

ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা সম্মতি জানাইল।

অশ্বিনী কহিল—অমলকে ছেড়ে তুমি একা থাকতে পারবে সুনন্দা, নিশ্চিন্ত হয়ে?

গাঢ় স্বরে সুনন্দা কহিল—তোমার কাছে রেখে যদি নিশ্চিন্ত না হই, তাহলে কোথাও আর আমার নিশ্চিন্ত থাকবার আশা থাকবে না!

তেরো

বিদায়-ক্ষণ!

তারা কাঁদিতেছে। সুনন্দার চোখে জল নাই! অমলকে স্নান করাইয়া তার মাথা আঁচড়াইয়া দিয়া সুনন্দা কহিল—সেখানে আমায় না দেখে কেঁদো না···

অমল কহিল—তুমি যাবে না মা?

সুনন্দা কহিল—যাবো। গিয়ে আবার চলে আসবো। বলেছি তো, মাসিমা এখানে থাকবে···একলাটি···মাসিমার মন কেমন করবে যে, বাবা।

অমল কি ভাবিল, ভাবিয়া সে কহিল—কার কাছে আমি থাকবো?

সুনন্দা কহিল—উনি আছেন···তাছাড়া তোমার আসল-মা আছেন সেখানে··· ভালো মা···সারাদিন তোমায় কাছে কাছে রাখবেন, খুব ভালোবাসবেন।

অমল কহিল—আসল-মা, কি···মা?

সুনন্দা কহিল—বড় হলে বুঝবে, অমল।

অমল চাহিল মার মুখের পানে, চোখের কোণে জল টলটলিয়া উঠিল। সে কহিল—তুমি তবে কোন্‌-মা? না, তুমি মিছে কথা বলচো! মা বুঝি আবার অনেক থাকে—ভাই-বোনের মতো?

সুনন্দা কহিল—থাকে। পুতুল যেমন অনেক হয়, তেমনি মা'ও অনেক হয়, অমল।

অমল কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—না, আমি আসল-মা চাই না···আমি এই-মা নিয়ে খেলা করবো।

মার বুকে ঝাঁপাইয়া অমল কাঁদিতে লাগিল! তারা ভর্ৎসনা করিল—কি হচ্ছে দিদি? তুমি পাষাণ বলে ভাবো, ছেলের মনও পাষাণে গড়া?···না অমল, তুমি এসো আমার কাছে···মা ভারী দুষ্টু হয়েছে।

সুনন্দা কোনো কথা না বলিয়া তারা ও অমলের পানে চাহিয়া রহিল।···

তারা কহিল—স্বামী তুমি চাও না দিদি! অবাক করলে!

সুনন্দা কহিল—চাইলেই কি সব পাওয়া যায়, তারা?

তারা কহিল—কিন্তু এ তোমার চাওয়া নয়, দিদি···তিনি তোমাকে চাইছেন···কোন্‌ প্রাণে এ-ডাক ঠেল্‌চো?

সুনন্দা ডাকিল—তারা···

তারপর চুপ···সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তারা সুনন্দার পানে চাহিল, সুনন্দা কহিল—তুমি

ক'দিন পেয়েছিলে ভাই তোমার স্বামীকে? সে-পাওয়ায় প্রাণ তোমার আজো ভরপুর হয়ে আছে বলেই না পৃথিবীর দিকে চাইতে পারছো···সকলকে দেখছো!

তারা কহিল—আমার মতো দুর্ভাগিনীর সঙ্গে তোমার তুলনা করো না! এ কত-বড় অভিশাপ, কি কষ্ট,—তা যেন অতি-বড় শত্রুকেও কোনোদিন জানতে না হয়! কিন্তু তুমি···

সুনন্দা কহিল—তোকে সত্য বলছি, তারা, আমি কিছু চাই না। স্বামী যা পেয়েছি, তেমন-পাওয়া—জানি না, আর কেউ এমন পাওয়া পায় কি না! যে-আলো জ্বলতে জ্বলতে নেবে, তার জলুশ্, তার গৌরবের সীমা থাকে না! কিন্তু যে-প্রদীপ আলো তেলের অভাবে, পলতের অভাবে মিট্‌মিট্ করতে করতে নিবে যায়, তার সে দুর্ভাগ্য··· প্রদীপের বুক পোড়ে, পুড়ে হয় কালি। সে কালি ঘোচবার নয়, মোছবার নয়! সে-নেবা দেখলে শিউরে উঠতে হয়! স্বামীর ভালোবাসা···প্রথম-বসন্তের যা-কিছু ঐশ্বর্য, আমি পেয়েছি···সে-ভালোবাসা কমলে কি হয়, জানতে চাই না! তা জানতে হলে মরে যাবো!···যাকে দেবতার মত দেখি, সে যেন দেবতার আসনেই থাকে—তাকে মানুষ ভাবে দেখতে চাই না···নিত্যকার কাজে, হাসি-বিরাগ, ধুলা-মাটির মধ্যে!—এই জন্যই আমাদের দেশে পূজা-পার্বণের যা-কিছু ধুম, সব ঐ এক-বেলা, নাহয় একটা দিন—তারপর বিসর্জন! দশ দিন ধরে যদি পূজার ধুম চলতো, তাহলে পূজার এ-আদর, এ-গৌরব থাকতো না বোধ হয়!

বিস্ময়-বিমুগ্ধের মতো তারা সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল—সুনন্দা বলে কি!

বেলা চারিটার সময় ভালো দিন—অমৃতযোগ, না, এমন কি! মোটর আসিল, লোকজন আসিল—সেই সঙ্গে অশ্বিনী। তারপর অমলের হাত ধরিয়া সুনন্দা গিয়া গাড়ীতে বসিল। অশ্বিনী কহিল—তোমাকে আর ফিরে আসতে দেবো না।

সুনন্দা হাসিল, মুখে কিছু বলিল না।···অশ্বিনী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল।

বালিগঞ্জে মাঠের সামনে ফটকওয়ালা মস্ত বাড়ী—সঙ্গে বাগান। বাড়ী ও বাগানের অবস্থা জীর্ণ···তেমন পারিপাট্য নাই, শৃঙ্খলা নাই। যত্নের অভাবে শ্রীহীন মলিন!

সুনন্দা কহিল—কি করে রেখেছো! এমন ইন্দ্র-ভবন!

অশ্বিনী কহিল—আমারি মত ছন্নছাড়া। প্রাণ নেই,—না?

কথাটা সুনন্দার গায়ে বিঁধিল—তীরের মতো! সত্যই যেন তাই!

ছেলেকে পাইয়া ভানুবালার আনন্দের সীমা নাই। অমলকে বুকে চাপিয়া সে কহিল—বলো, বলো, আমায় মা বলো—ডাকো···মা বলে ডাকো!

অকস্মাৎ আদরের এই আতিশয্যে অমল কেমন হকচকিয়া গেল—সে চাহিল সুনন্দার পানে। মৃদু হাস্যে সুনন্দা কহিল—তোমার মা। মা বলে ওঁকে ডাকো, অমল।

বিশুষ্ক কণ্ঠে কোনোমতে অমল ডাকিল—মা···

শুনিয়া ভানুর কি আনন্দ! নাড়িয়া-চাড়িয়া অমলকে দেখিতে লাগিল। অবোলা পশু যে-আবেগে নিজের সন্তানকে দেখে, ঠিক তেমনি!

তারপর অমলের হাত ধরিয়া সে চলিয়া গেল।

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—এই ভানু···আমার যে স্ত্রীর কথা তোমায় বলেছিলুম? বুদ্ধিসুদ্ধি মানুষের মতো নয়—যেন শিশু!···অথচ বোঝে সব। দেখবে?

সুনন্দা কোনো কথা কহিল না—নীরবে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তার জীবনে সে যেন আজ ইচ্ছা-মৃত্যুর পরশ বুলাইয়া লইতে আসিয়াছে! আত্মবলি! তাহাতে এমন বেদনা, আগে বোঝে নাই!

অশ্বিনী চলিয়া গেল—তখনি ফিরিল—সঙ্গে ভানু। সুনন্দার দিকে চাহিয়া অশ্বিনী ডাকিল—ভানু···

ডাগর দুটি করুণ চোখ মেলিয়া ভানু অশ্বিনীর পানে চাহিল। অশ্বিনী কহিল—এ মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো, ভাবছি। দু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকবে তোমরা···কি বলো?

নিমেষে ভানুর মুখে ছায়া নামিল! যেন বিভীষিকা দেখিয়াছে, এমন আতঙ্ক! অস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিয়া অশ্বিনীকে সে চাপিয়া ধরিল—তারপর শঙ্কিত নেত্রে সুনন্দার পানে চাহিয়া কহিল—না, না—তুমি যাও—তুমি যাও···আমার ভয় করছে!···বলিতে বলিতে তার দু'চোখে অশ্রুর ধারা বহিল।

সুনন্দার মন বেদনায় দুলিয়া উঠিল। সে কহিল—না, না, তোমায় ভয় দেখাচ্ছেন! আমি ওঁকে বিয়ে করবো কেন? আমার স্বামী আছে···খুব ভালো স্বামী!

ভানু যেন আরাম বোধ করিল, কহিল—আছে?

তারপর সে অশ্বিনীর পানে চাহিল, কহিল—আমায় ভয় দেখাচ্ছিলে?

কাকুতি-ভরা মলিন দৃষ্টি···ভানু বলিল—না, ভয় দেখিয়ো না। আমার···আমার ভারী কষ্ট হয়! আমি···আমি···

সুনন্দা কহিল—ছি, ভয় দেখিয়ো না! বেচারী!···

ভানু কহিল—আমি যাই,—ছেলে এসেছে···আমার ছেলে! তাকে খেলনা দেবো। এ্যাত্তো খেলনা আনিয়েছি।

ভানু চলিয়া গেল।

অশ্বিনী কহিল—নিজের খেলনা আছে প্রচুর—কখনো ছোট ছেলেমেয়ের মত খেলনা নিয়ে খেলতে বসে—কখনো আবার যেন পাকা গিন্নী! অদ্ভুত! ডাক্তাররা বলেন—ছেলেটিকে পেয়ে যদি এ ভাব কাটে—যদি মানুষ হতে পারে।

—যদি বুদ্ধি থাকতো! ও যদি···

অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর বলিল—তাহলে আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না—তোমাকে নেওয়ার বাধাও থাকতো না!

সুনন্দা কোনো কথা কহিল না—তার মানস-নয়নের সম্মুখে অশ্বিনীর জীবনের যে

ব্যথা-ভরা ছবির আভাস জাগিতেছিল,—সে-ব্যথার স্পর্শে তার প্রাণ মমতায় ভরিয়া উঠিয়াছে!

অশ্বিনী কহিল—শ্বশুর-মশায়ের কাছে অমলকে নিয়ে যাই। তুমিও এসো। তাঁর উত্থান-শক্তি নেই।

দু'জনে আসিল। দোতলার ঘরে জমিদার দীনবন্ধু রায় বিছানায় কাৎ হইয়া পড়িয়া আছেন—পাশে একরাশ খবরের কাগজ আর বই।

সুনন্দা আসিয়া তাঁকে প্রণাম করিল। দীনবন্ধু কহিলেন—ইনি ··?

অশ্বিনী কহিল—ছেলের মা। ছেলের বাপ আসতে পারবেন না—আসবার উপায় নেই। আপনার চেয়েও তিনি পঙ্গু, অক্ষম!—ইনি চাকরি করে যা পান, তাতেই সংসার চলে। বাপের মনে ছেলের সম্বন্ধে আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক—ছেলে দশজনের একজন হবে! অথচ তাঁর নিজের শক্তি নেই! তাই আপনার হাতে ছেলেটিকে তুলে দিচ্ছেন!

দীনবন্ধু রায় সুনন্দাকে মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া কহিলেন—তুমি এ-ছেলেটিকে নাও। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের পথে একে ঠিকভাবে চালাবার ব্যবস্থা করো। তার চেয়ে শিক্ষার বড় উপায় আর নেই! ছেলেটিকে ওঁরা নিঃস্বত্ব হয়েই তো দান করেছেন? তুমি বুঝিয়েছো, ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নেবে? ছেলের নাম গোত্র···

অশ্বিনী কহিল—গোত্র এক—তবে নাম-সম্বন্ধে এঁদের একটু অনুরোধ আছে।

—কি অনুরোধ?

—ছেলেটির নাম অমল। আমরা যেন ঐ অমল নামই রাখি!

দীনবন্ধু বলিলেন—তা বেশ ভালো নাম তো! ঐ নামই থাকবে।

তারপর তিনি সুনন্দার পানে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন—তোমায় দেখে বুদ্ধিমতী বলেই মনে হচ্ছে, মা। আমি বলছিলুম কি,—দু'এক হপ্তা এইখানে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না?···ছেলের পক্ষে নতুন সংসারে থাকা নাহলে সম্ভব হবে কি? প্রতিক্ষণ তোমাদের অভাব অনুভব করে ওর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে—মনও হয়তো কাতর থাকবে!

এ কি বিপদ, ভগবান!···অশ্বিনী সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে চাহিয়া কহিল—আমিও সেই কথা বলছিলুম দু'এক হপ্তা কেন, যদি বরাবর এখানে থাকেন···

সুনন্দা সবিনয়ে কহিল—না, আমার স্বামী···

দীনবন্ধু কহিলেন—তিনি রাজী হবেন না?···ঠিক! মানী লোক···অবস্থার ফেরে বুকখানাকে ভেঙ্গে ফেলছেন! দুর্দৈব!···না মা, সে-কথা আমি বলতে পারি না। তবে পাঁচ-সাতদিন থাকতে পারলে···অন্ততঃ তুমি!···কিন্তু স্বামী। অক্ষম রুগ্ন স্বামীকে একা রেখে থাক্‌বে কি করে?···আমি তা বলতে পারবো না।

দীনবন্ধু সখেদে নিশ্বাস ফেলিলেন।

অশ্বিনী কহিল—আপনার স্বামীর সঙ্গে রোজ দেখা করবেন···মানে, রাত্রে যদি এখানে থাকতে পারতেন।

সুনন্দা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অশ্বিনীর পানে চাহিল, কহিল—না।···আমি বরং রোজ এসে দেখে যাবো।···তাছাড়া ছেলে আমার ঘেঁষা নয় খুব—প্রতিকূল অবস্থার জন্য, মা-বাপ ছাড়া হয়েই ও মানুষ। ছেলে খুব শান্ত! শিক্ষা যা পেয়েছে···আমাদের ছেড়ে থাকতে কাতর হবে না!··

মার ব্যথা দীনবন্ধু অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন—যা তুমি ভালো বোঝো, করো মা। ছেলেকে নিচ্ছি বলে ওর সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক কেটে দিচ্ছি না···তুমি ওর মা রইলে। বেশীর ভাগ আমার মেয়ে হলে!···আমার আর-একটি মেয়ে আছে, সে ছোট মেয়ে! সেই চক্ষেই যেন আমরা পরস্পরকে দেখি! কি বলো মা?

মমতা-ভরা এ-কথায় সুনন্দার চোখে জল টল্‌টল্‌ করিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অশ্বিনী ও সুনন্দা বসিয়া কথা কহিতেছে। নিজের প্রাণটাকে এইখানে রাখিয়া সুনন্দাকে এবার যাইতে হইবে। অমল ভানুর কাছে—ভানু তাকে খেলনা দিয়া, আদর দিয়া অনেকখানি বশ করিয়াছে।

অশ্বিনী কহিল—এখানে থাকা তোমার পক্ষে সত্যই সম্ভব হবে না, সুনন্দা?

সুনন্দা কহিল—চোরের মতো? না। থাকবার গৌরব যখন ভাগ্যে নেই, তখন সে-লোভে আমি আকুল হবো না। এ-লোভ আমায় দেখিয়ো না।

সুনন্দা চুপ করিল। গলার কাছে কি যেন ঠেলিয়া আসিল—কথা বাধিয়া গেল। তারপর ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কাশিয়া গলা সাফ করিয়া মলিন মৃদু হাসিমুখে সে আবার কহিল—এতখানি প্রলোভনের সামনে নিজেকে ক'দিন ধ'রে রাখতে পারবো? না··· তোমরা শান্তিতে থাকো—সুখে থাকো! ডাক্তারদের কথা সত্য হোক্, তোমার স্ত্রীর মন সজীব, সচেতন হোক! আমি দূরে থেকে ভগবানকে এই কামনাই জানাবো!

অশ্বিনী কহিল—কিন্তু কোনোদিন যদি ভানুকে বোঝাতে পারি···শ্বশুরমহাশয়কে বোঝাতে পারি?

মাটির দিকে চাহিয়া নত-মুখেই সুনন্দা কহিল—না—সে চেষ্টা করো না!—তোমায় কতবার বলবো, আমার চাওয়া পাওয়া শেষ হয়ে গেছে। চাইবার বা পাবার আর কিছু নেই! মনে কোন ক্ষোভও নেই···এক বিন্দু না···তুমি বিশ্বাস করো!

অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—আমায়···না···আমার পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই তুমি করছো!

—ছি। ও-কথা বলো না।···আমি তাহলে উঠি।

অশ্বিনী তার হাত ধরিল, কহিল—একটা অনুরোধ···

—বলো···

—ও-বাড়ীতে অমন দীনভাবে তোমার থাকা হবে না সুনন্দা। তোমার থাকবার ব্যবস্থা করি। সে-অনুমতি···

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা কহিল—না···তারা। তাকে ছেড়ে কোথাও যাবার শক্তি আমার নেই! আমার নিজের বোন থাকলে সেও বুঝি আমায় এমন ভালবাসতো না! তাকে ছেড়ে আর কোথাও আমি থাকবো না—থাকতে পারবো না! হ্যাঁ, তবে একটা

কথা···তোমার এই চলার পথে···মানে, ঐ ইলেক্‌সনের ব্যাপারে চারিদিকে এই যে ইতর চক্রান্ত চলেছে, তুমি তা নীরবে সহ্য করবে?

—কাদা মাখতে বলো তুমি? ওদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ তুলে?

—কিন্তু এই সব ইতর কুৎসা···এর প্রতিকার?

—ওদের মস্ত দল···বিভোর দত্ত বলে' এক পয়সা-ওয়ালা নিষ্কর্মা আছে—তাকে বাগিয়ে এরা চক্র গড়েছে! শ্বশুর-মশায় জানলে ক্ষেপে উঠবেন···তাই হুঁশিয়ার আছি, ওদের ওই বিষমাখা কথা ওঁর কাণে না যায়!···এ নিয়ে কথা বলতে গেলে কালি মাখা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না!

শেষের কথাগুলো সুনন্দার কাণে গেল না। বিভোর দত্ত! বিভোর! নামটা মনের মধ্যে ঝড় তুলিয়া দিল!···

তার পর বিদায়ের পালা···

ভানু কহিল—তুমি থাকো···যেয়ো না।

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—কিন্তু তুমি সহ্য করতে পারবে? শুনলে তো, তোমার স্বামী বলছিল, আমায় বিয়ে করবে!···

ভানু আবার সেই প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া সুনন্দার মুখের পানে চাহিল, কহিল—করুক্ বিয়ে! আমার ছেলে আছে!

তার গলাটা টিপিয়া দিয়া সুনন্দা কহিল—না···তুমি লক্ষ্মী, সুখে থাকো, সুস্থ হও। সুস্থ হলে বুঝবে, এ-সংসারে আমার না থাকাই উচিত!···আসি, ভাই। তোমার ছেলে, স্বামী—সকলকে নিয়ে তুমি চির-সুখে সুখী হও।

চৌদ্দ

এলগিন রোডের মোড়ে অশ্বিনীর গাড়ী সুনন্দা ছাড়িয়া দিল।

বিভোর দত্ত! বিভোর! তার পয়সায় এ অভিযান!···সে অফিসে আসিল। অফিস বন্ধ। দারোয়ানটা নীচের তলায় সিঁড়ির পাশে বসিয়া সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছে। সুনন্দা ডাকিল—দরোয়ানজী···

দরোয়ান সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দা কহিল—বিভোরবাবু···মানে, দত্ত সাহেবের বাড়ী কোথায়, জানো?

দরোয়ান কহিল—হাঁ···গোয়াবাগান।···মস্ত বাড়ী। বাড়ীর ফটকে নাম লেখা আছে!···

সুনন্দা তখনি ফিরিয়া ট্রামে চড়িল এবং সোজা এস্‌প্লানেডে আসিল। রাত হইয়া গিয়াছে—এখন কি দেখা পাইবে?

আবার মনে হইল, বুঝাপড়া যা হয়, রাত্রির নির্জনতার মধ্যেই হোক!···অশ্বিনীকে এ ইতর-আক্রমণ হইতে সে রক্ষা করিবে!

ট্রামে চড়িয়া সে নামিল হেদুয়ার ধারে।···বিভোরের গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট

হইল না। ফটকে পিতলের ফলকে নাম লেখা। সুনন্দা ফটকে ঢুকিল—বাহিরে ড্রয়িং-রুম···বিভোর একটা সোফায় বসিয়া আছে—সামনে ছোট টেব্‌লের উপর বোতল, গ্লাস···

দেখিয়া সুনন্দা কাঁপিয়া উঠিল। বিভোর সুরা পান করে, এ পরিচয় তার জানা ছিল না। জানিলে হয়তো রাত্রে এখানে আসিত না। কিন্তু যখন আসিয়া পড়িয়াছে···

বিভোর কহিল—কে?

সুনন্দা কহিল—আমি!

—সুনন্দা দেবী!—আরে···এসো···এসো···এসো···আমার ক্ষুধিত তাপিত তৃষিত চিত,—এসো তুমি, এসো!···বসো···

অভ্যর্থনায় বিপুল উৎসাহ! সুনন্দা বুঝিল, মত্ততার লক্ষণ।

বিভোর কহিল—কি খবর? দেখছো—এখনো তোমার পথ চেয়ে বসে আছি আমি···এমনি বসে রবো···জনম-ভোর।

কথাগুলো সে বলিল একটু সুর করিয়া!

সুনন্দার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! তবু মনে সাহস আনিয়া সে হাসিল—অতি দৃঢ় কঠিন হাসি। বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···যেন প্রলয়ের ব্যাপার!

সুনন্দা কহিল—আপনি মদ খান? তার কণ্ঠে বিস্ময়।

—মদ!···ও, একটুখানি···মানে, একটু চাঙ্গা হওয়া! তুমি যদি বলো, আদেশ করো, সব ফেলে দিচ্ছি···বলিতে বলিতে বোতল আর গ্লাস হাতে লইয়া লোষ্ট্রবৎ সে দূরে নিক্ষেপ করিল···ঝন্ ঝন্ শব্দে বোতল গ্লাস পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল।

বেয়ারা-খানশামা ছুটিয়া আসিল। বিভোর কহিল—ভেঙ্গে ফ্যাল্ সব বোতল। আমায় মাতাল ভেবেছিস্ ব্যাটারা! মদ গেলাতে চাস? না,—খবর্দার দিবিনে—চাইলেও নয়! ভেঙ্গে ফ্যাল্ সব বোতল আর গেলাস!

বেয়ারা খানশামার দল বেকুব বনিয়া সরিয়া গেল।

বীরের ভঙ্গীতে বিভোর কহিল—দেখলে, তোমার সম্মান রাখতে কি না করতে পারি!

সুনন্দা একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোনো কথা বলিল না।

বিভোর কহিল—কিন্তু হঠাৎ···? আমার দুঃখ বুঝে করুণা হলো অবশেষে! তা বেশ, দেখে যাও।···না, এসো, আসতে হবে···এত বড় বাড়ী যেন নির্জন গুহা—এ গুহায় রাজ্য গড়ে তোলো···এ রাজ্যের সিংহাসন তোমার···এসো, দেখো, কি হয়ে আছে! এই কি রামের অযোধ্যা!

মাতালের উৎসাহ! সুনন্দাকে উঠিতে হইল—এবং সারা বাড়ী ঘুরিয়া দেখিতে হইল।

সিঁড়ি, ঘর, দোতলার বারান্দা···চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া আছে। বাতাসের উতল দোলা।

বিভোর কহিল—এখন কি জন্য শুভাগমন দীনের কুটীরে ?

সুনন্দার বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—না, না, এ সে কি বলিতে আসিয়াছে! কার কাছে ? একটা মাতাল···ছি !

এ-সব সাজে নভেলে···বাস্তব জীবনে বিসদৃশ ! অত্যন্ত কুৎসিত কদর্য ! অসম্ভব !

বিভোর কহিল—জানো তো, তোমার জন্য দুনিয়ায় আমি সব করতে পারি···যে-আদেশ করবে—বিনাবাক্যে আমার তা শিরোধার্য।

সুনন্দা কহিল—আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

—বলো···এত সঙ্কোচ কেন ? বলো—তোমার পায়ে আমার পৃথিবী আমি সমর্পণ করতে পারি !

—অশ্বিনীবাবুর বিরুদ্ধে এই যে ইতর অভিযান চালিয়েছেন, এ বন্ধ করতে হবে।

সুরা-পান করিলেও বিভোর চেতনা হারায় নাই ! সে কহিল—জিজ্ঞাসা করতে পারি দেবী—কেন ? সে ভিজে বেড়ালটির জন্য তোমার এত দরদ কেন ?

সুনন্দার ঠোঁট কাঁপিল, গলা কাঁপিল—কম্পিত ভাবে সে কহিল—বড় দুঃখী—এ কাজ নেওয়া ছাড়া দুনিয়ায় তার আর কিছু নেই···কোনো অবলম্বন নেই।

স্থির দৃষ্টিতে বিভোর সুনন্দার পানে চাহিল—অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল,—পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—হুঁ···তার উপর তোমার এত করুণা ! অথচ আমার উপর···

সে দৃষ্টির সামনের সুনন্দা নিজেকে অটল রাখিতে পারিল না ! বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া মাথা নামাইল। বিভোর কহিল—মূল্য !—আমি রাজী···কিন্তু তুমি জানো, তার সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গেছে···সে কত-বড় স্কাউণ্ড্রেল ! একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করেছে—তার জীবন !—মানে হাসপাতালে একটি ছেলে হয়েছিল। ক' বছর আগে ! সে ছেলের বাপের নাম অশ্বিনী !···ঐ অশ্বিনী আর তোমার অশ্বিনী এক ব্যক্তি কি না—সন্ধান চলেছে তার !

সুনন্দা কোনোমতে নিজেকে দাবিয়া রাখিয়া কহিল—যদি ইনিই হন ?···তার জন্য দেশের কাজে তাঁর অধিকার থাকবে না, এমন কথা কেন ভাবেন ? যারা বড় বড় কাজ করে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি করছেন, তাঁদের প্রাইভেট জীবনে কোনো দোষ-দুর্বলতা নেই ? তাই নিয়েই তাঁদের বিচার করবেন ? সে-সব অন্যায়ের পিছনে···যদি অন্যায়ও তাঁরা করে থাকেন···তার কি কারণ আছে, সে সন্ধান না নিয়েই ?

অশ্রুর বাষ্পে সুনন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সে চুপ করিল।

বিভোর কহিল—মানি—তবু কি জানো, একটা হুজুগ। গোড়ায় এ-সবের মধ্যে আমি ছিলুম না···কিন্তু বলেছি তো, জীবনটা এমন ফাঁকা মনে হয় ! মনে হয়, যেন মরে যাবো ! একটা কিছু চাই···অবলম্বন। তাই দিনের বেলা হুজুগে মেতে থাকি···হৈ-হৈ করে বেড়াই। আর সন্ধ্যার পর লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বাড়ীতে বসে একটু-আধটু পান করি—কোথাও বেরুই না ! সন্ধ্যার পর সব-সময়ে আমাকে বাড়ীতে পাবে—কখনো বেরুই না,—কোথাও না। অথচ মনে করলে কি না করতে পারি··· বদখেয়ালির চূড়ান্ত ! কিন্তু রুচি নেই ! কি সুযোগ না আমার আছে ! তবু না !

জানো সুনন্দা দেবী···দু'চারবার দলে ভিড়ে জাহান্নমের দরজা অবধি গিয়েছি···কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার ঐ দুটি চোখ—সব-সময়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—আমাকে রক্ষা করেছে তোমার চোখের ঐ দৃষ্টি !

বিভোর নিশ্বাস ফেলিল—ফেলিয়া কহিল—না, না, ভূতের মতো নয়—দেবীর মতো !

সুনন্দার দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে-জল দু'গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। নির্বাক নিস্পন্দ সুনন্দা বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার পা কাঁপিতেছে। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না···দুনিয়ার এতখানি বেদনায় পাণ্ডু-মলিন হইয়া গেছে যেন !

তার চোখের সে-জল বিভোর লক্ষ্য করিল, কহিল—কাঁদচো সুনন্দা।

তার বুকে বেদনা জাগিল ! সে কহিল—বুঝেছি ! বেশ, এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াবো···ফাঁশিয়ে চুর করে দেবো অশ্বিনীর বিরুদ্ধে এ চক্রান্ত। ভাগ্যবান অশ্বিনী ! আমি তার দিক নিয়ে দাঁড়াবো। শুধু দাঁড়ানো নয়—তার দিক নিয়ে আমি ফাইট করবো ! জটাই কোম্পানিকে—জটায়ু বধ না করে আমি ছাড়বো না। হ্যাঁ··· আমার পণ ! তুমি কেঁদো না সুনন্দা !

সুনন্দার আঁচল ধরিয়া সেই আঁচলের প্রান্ত দিয়া বিভোর তাঁর চোখের জল মুছাইয়া দিল।

সুনন্দা কহিল—আমি···আমি...এ ঋণ চিরদিন···

সুনন্দার কথা শেষ হইল না—অশ্রুর বাষ্পবেগে ফাঁপিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কথা বাধিয়া গেল। চোখে রাজ্যের কাতরতা !

বিভোর কহিল—আমি বুঝেছি। বহুৎ আচ্ছা ! কিছু ভেবো না। তোমার জন্য ···তোমায় খুশী করবার জন্য যা বললে, করবো। তা করতে পারবো ! অনেক সুখ পাবো···অনেক···তারপর তুমি···বেশ, এ জন্মে না হয়,—পরের জন্ম আছে—তার পরের জন্ম···দুঃখ কি !

কথাটা বলিয়া সে হাসিল। সুনন্দা কহিল—আপনি মহৎ !

বিভোর কহিল—মহৎ নই। কিন্তু যাক—একটা কথা···বলবে ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুনন্দা চাহিল।

বিভোর কহিল—এই অশ্বিনীকে তুমি ভালোবাসো ?

গাঢ় স্বরে সুনন্দা কহিল—আমার স্বামী !

আকাশখানা যদি সেই মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া বিভোরের মাথায় পড়িত, সে তত চমকিত হইত না ! এ-কথায় তার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। অস্ফুট স্বরে সে কহিল—স্বামী ! এ তো ভারী আশ্চর্য কথা ! স্বামী···

—হ্যাঁ।—বিবাহের মন্ত্র পড়িনি···তবু ! ও ছেলে আমারি···ওঁর ছেলে ! সে-ছেলেকে আজ স্বীকার করেছেন। ওঁর স্ত্রী আছে। তবু উনি বড় দুর্ভাগা ! দেখে মনে হয়···না, আমি ওঁর কাছে কিছু চাই না—আমাকে যদি স্ত্রী বলে সমাজে স্বীকার না করেন—আমার দুঃখ থাকবে না। আমার জন্য উনি আজ সব করতে প্রস্তুত ! কিন্তু

ওঁর সব পরিচয় জেনে···না···আমি তা করতে দেবো না—দিতে পারি না। ছেলেকে সমাজ স্বীকার করবে—ওঁরা তাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন!···এ কথা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। তৃতীয় ব্যক্তি···আপনি এখন জানলেন। আপনি ওঁর সহায় হয়ে, বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়ান! এইটুকু দয়া শুধু···আমি ভিক্ষা চাইছি। ওঁর বন্ধু নেই, সহায় নেই!—বড় দুর্ভাগা।

বিভোর কহিল—এই! যাক, যাক—তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে···বিশ্বাস করো সুনন্দা দেবী—ভালোবাসি, চিরদিন ভালোবাসবো···প্রথম যেদিন মনে হলো··· লজ্জায় মুখ ফুটে জানাতে পারিনি। চান্স—জীবনে মস্ত চান্স হারিয়েছি! তারপর—কিন্তু না, তুমি আমাকে আশ্চর্য করে দিলে···নিজেকে স্যাক্রিফাইস্—এমন ত্যাগ! আশ্চর্য! জীবন্ত মানুষ এমন! এই পর্যন্ত বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল—নিশ্বাস ফেলিয়া বিভোর বলিল—তোমাকে পাবার আশা আমার পক্ষে—এ মথ ফর দি ষ্টার··· বামনের চাঁদে লোভ।

সুনন্দা কহিল—আমায় পাবার সম্ভাবনা কেন থাকবে না? আপনাকে বরাবর আমি সব চেয়ে বড় বন্ধু বলে জানি। এবং তাই জানবো—যতদিন বাঁচবো।

—বেশ, তাই হোক—আমায় বন্ধু হতেই দাও! এই আমরা—বিভোর সুনন্দার হাত ধরিল; আবেগ-জড়িত স্বরে কহিল—আমরা বন্ধু। একজন অতৃপ্ত বাসনায় দুঃখী ···আর একজন বরেণ্য···সব বাসনা, কামনার ঊর্ধ্বে···ভগবানের মতো বরেণ্য!

পনেরো

পরের দিন···

দেহ-মন অবসাদে ভরিয়া আছে···দীনবন্ধুর গৃহ হইতে ফিরিতে অনেকখানি রাত্রি হইয়া গেল। আসিবে, পা উঠিতে চায় না—কিন্তু উঠিতেই হইবে! যে করিয়া সুনন্দা ফিরিয়াছে, তাহা জানেন তার অন্তর্যামী···আর কিছু বুঝিয়াছে তারা।

তারাও গিয়াছিল···ক'দিনই তাহাকে যাইতে হইয়াছে। অমল মাসিমাকে চায়··· অশ্বিনীরও খুব অনুরোধ—তোমার অমলের বাড়ী—কেন তুমি যাবে না?

অশ্বিনীর সঙ্গে তারা কথা কয়। তারা অশ্বিনীকে দেখে নিজের দাদার মতো। তারাকে অশ্বিনীর বড় ভালো লাগে। এ বয়সে বিধবা হইয়া শুধু কতকগুলো আচার-নিয়ম নিষ্ঠাভরে মানিয়া নিজেকে ইহলোক হইতে সরাইয়া বাস করে না তারা—ইহলোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছে। কাহারো উপর দ্বেষ নাই, হিংসা নাই···সকলকে আপন করিয়া লইবার আশ্চর্য ক্ষমতা এই মেয়েটির! অথচ মনের দৃঢ়তা এবং তেজ···অশ্বিনীর বার-বার মনে পড়ে কবে কোন্ কবিতায় পড়িয়াছিল—

ইহলোকে আছো তুমি! ইহলোক হতে
তবু যেন কত ঊর্ধ্বে নিজ মহিমাতে!
ধূলার মাটির স্পর্শ লাগেনা কোথাও—
প্রীতির পরশটুকু সবারে বিলাও!

এই প্রীতির বশেই একদিন অশ্বিনীকে তারা বলিয়াছিল—দিদির দিন কি এমনি করেই কাটবে চিরকাল ?

নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্বিনী জবাব দিয়াছিল—তুমি তো সব শুনেছো ওঁর কাছে··· আমার অপরাধ হয়েছিল—সেজন্য যে শাস্তি উনি দেছেন, তাও তেমনি কঠিন !

তারাকে সুনন্দা জীবনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। তারার ভালোবাসায় না বলিয়া সুনন্দা পারে নাই।

বাড়ী ফিরিয়া সুনন্দা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তারা তার কর্তব্য সারিয়া আসিয়া বলিল—শোবে না ? এমনি বসে থাকবে ? তাতে লাভ ?

নিশ্বাস ফেলিয়া সুনন্দা বলিল—লাভ-লোকসান···কোনো কথাই ভাবছি না, তারা !

—তবে কি ভাবছো ?

—ভানুর কথা ভাবছি। বেচারী !···ভাবছি, কেন ওর বিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা !

তারা বলিল—বাঙালীর ঘরে জন্মেছে···মেয়ে···বিয়ে দিতেই হবে !

—হুঁ ! কিন্তু উনি ? তাই ভাবছি, উনি ওকে বিয়ে করলেন কিসের প্রত্যাশায় ? তোমার কাছে বলতে বাধা নেই—লোকে আজ এই ইলেকসনের ব্যাপারে যা বলছে··· সব জেনে-শুনে উনি ও মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন শুধু টাকার লোভে···সত্যই তাই ?

নিশ্বাসের বাষ্পে সুনন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

তারা বলিল—তা কেন দিদি ? বিয়ে হলে স্বামীর আদর-ভালোবাসায় মনে যদি চেতনা জাগে—ডাক্তাররাও তাই বলেছিলেন···শুনেছো তো দাদার মুখে। তাছাড়া দীনবন্ধু বাবুও তাই বলছিলেন।

—হুঁ ! তাই ভাবছি তারা, মানুষের জীবনে কত কি যে ঘটে !···এই ভাই, সত্য বলছি, আমার এতটুকু হিংসা নেই···ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, অমলকে ছেলে বলে মনে-মনে পেয়ে যদি ও মানুষের মতো হতে পারে···ও সুখী হোক্···উনিও তাহলে সুখী হবেন।

তারা বলিল—তাই হবে। তুমি কেন ভাবছো দিদি ? ক'দিন কথাবার্তা কয়ে তো দেখলুম, একেবারে জড় নয়। সময়-সময় ছেলেমানুষী ভাব হলেও মাঝে-মাঝে চমৎকার কথা কয়···শুনে মনে হয় না, অমন অবস্থা ! জানি না, বিয়ের আগে মন কেমন ছিল ! তাই আমার মনে হয়, অমলকে পেয়ে হয়তো সেরে উঠবে। তোমার-আমার মতো না হলেও···খানিকটা মানুষ হতে পারে ! কিন্তু এ-সব কথা থাক ভাই— শোবে চলো, কাল আবার তোমার অফিস আছে তো !

নিশ্বাস ফেলিয়া সুনন্দা বলিল—শুতে হবে···ঘুমোতেও হবে, তারা···চলো।

কিন্তু ঘুম কি হয় ! দু'চোখ চাপিয়া থাকিলেও মনকে কিছুতে চাপা দেওয়া যায় না। মনের উপর কল-তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে কত···কত রকমের চিন্তা !···অমল, অশ্বিনী, ভানু···আবার ভানু···অশ্বিনী···অমল···আরো কত চিন্তার টুকরো ভাসিতেছে ! সুনন্দাকে ছাড়িয়া সেখানে অমল কি করিতেছে শুধু অশ্বিনীকে পাইয়া ? অথচ সুনন্দা

যতক্ষণ ছিল, কিছুতে সুনন্দার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছিল না। যতক্ষণ সুনন্দা ছিল, সুনন্দার পাশে-পাশে নানা ছলে…অশ্বিনী আসিয়া বারবার ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে…ভানু কত-কি জিনিষ আনিয়া তার সামনে ধরিয়াছে…তবু সে…

কিন্তু ছেলে ভালো! সুনন্দার চোখের ইঙ্গিত! অমল কাহাকেও এতটুকু অবহেলা করে নাই! অশ্বিনীর সঙ্গে গিয়াছে—ভানুর সঙ্গে গিয়াছে! সুনন্দার প্রাণ কি কাঁদে না তার জন্য? কিন্তু উপায় নাই! তার এ-জন্মটাই বুঝি কাঁদিয়া কাটাইবার জন্য! নারী আর পুরুষ…দুজনকে সমাজ এমন আলাদা-আলাদা করিয়া দেখে কেন?

কিন্তু না, ইচ্ছা করিয়া যাদের উপর সব দাবী ছাড়িয়া দিয়াছে, তাদের লইয়া মনকে কেন মিথ্যা উতলা করা! তারা দূরে থাকিলে যদি তাদের মঙ্গল হয়, সুনন্দা তাদের ডাকিবে না! না…না…না…

এমনি নানা চিন্তা। এত চিন্তার মধ্যেও সর্বশরীর ঝিমাইয়া অবশ হইয়া আসে…তন্দ্রা আসিয়া দু'চোখ চাপিয়া ধরে। কিন্তু সে কতক্ষণ! স্বপ্ন দেখে সুনন্দা…স্বপ্ন তার সে-তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া দেয়!

এমনি ঘুমে-জাগরণে রাতটা কাটিয়া গেল। তারপর সকাল-সকাল কাজের ডাক। মনকে দু'পায়ে মাড়াইয়া দেহখানাকে লইয়া সুনন্দাকে ছুটিতে হইবে!

যথাসময়ে সুনন্দা বাড়ী হইতে বাহির হইল। অফিস…ট্রামে চড়িয়া সেই সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড।

অফিসে আসিয়া দেখে, জটাইয়ের ঘরে জটাই নাই, দু'জন কেরাণী বসিয়া গল্প করিতেছে।

সুনন্দা আসিয়া নিজের কামরায় চেয়ারে বসিল। টেবিলে একরাশ প্রুফ…একখানা উপন্যাস ছাপা হইতেছে, তার প্রুফ! প্রুফের তাড়া খুলিয়াছে, গীতা আসিল। গীতার বেশভূষায় বেশ পরিপাট্য…যেন কোথা পার্টিতে যাইবে!

গীতা আসিয়া বলিল—এই যে এসেছো! প্রুফ রাখো। অন্য কাজ আছে…আমার সঙ্গে এখনি বেরুতে হবে।

—বেরুতে হবে! কোথায়? সাশ্চর্যে সুনন্দা করিল প্রশ্ন।

গীতা বলিল—বুক চক্রবর্তি…ঐ বক্কেশ্বর চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার…ইলেকসনে দাঁড়াচ্ছে সাউথ-ক্যালকাটা থেকে। তাঁর জন্য বাড়ী-বাড়ী আমাদের দু'জনকে ক্যানভাশ করতে যেতে হবে…তুমি যাবে খিদিরপুর আর টালিগঞ্জের দিকে…আমি যাবো ভবানীপুর, কালীঘাট। দু'খানা গাড়ী রেডি। তুমি কাল সকাল-সকাল চলে গেছ অফিস থেকে…অনেক কাজ ছিল বলে আমাকে থাকতে হয়েছিল রাত নটা পর্যন্ত। রাত্রে প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে…মিষ্টার বোস ঐ কাজে বেরিয়েছেন তাছাড়া মাণিক সেনও গেছেন।

সুনন্দা প্রমাদ গণিল! এই বকু চক্রবর্তি…নামেই ব্যারিষ্টার…বাপের অগাধ পয়সা, সে পয়সার জোরে সহরে বখামি করিয়া বেড়ায় বলিয়া বেশ নাম রটিয়া গিয়াছে।

তার পয়সার উপর ভাগ করিয়া পাঁচজনে ধরিয়া তাকে ইলেকসনে নামাইয়াছে—মাতামাতি করিবার জন্য। বকুকে দাঁড় করানো হইয়াছে অশ্বিনীর বিরুদ্ধে।

কথা শুনিয়া সুনন্দা স্থির দৃষ্টিতে গীতার পানে চাহিয়া রহিল···তার মুখে কথা নাই।

গীতা বলিল—কি, বসে আছো যে! ওঠো···চলো—

সুনন্দা বলিল—কিন্তু···

গীতার চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক···গীতা বলিল—অশ্বিনী রায়ের রাইভাল পার্টি বলে কুণ্ঠা। সত্যি ভাই, অশ্বিনী রায়ের উপর তোমার এত দরদ কেন?

প্রশ্নটা করিয়া যে-দৃষ্টিতে গীতা সুনন্দার পানে চাহিল···সুনন্দা লক্ষ্য করিল সে-দৃষ্টিতে বেশ খানিকটা কৌতুক!

সুনন্দা বলিল—তা নয়। তবে···এ-কাজ মানে, লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে···

গীতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—জানি সুনন্দা, কিন্তু টু-পাইস্ আছে এতে। অফিসের মাহিনা যা পাবার, তা তো পাবোই!···তার উপর এক-মাসের জন্য ডেলি দেবে ত্রিশটা করে টাকা প্লাশ টিফিন এ্যাণ্ড ফ্রী মোটর-কার।

সুনন্দার চোখের সামনে যেন অকূল সমুদ্র!···চাকরি করে···যদি বলে, না, এ-কাজ করিব না, করিতে পারিব না—তাহা হইলে চাকরি করা চলে না! চাকরি করিতে আসিলে চাকরির নিয়ম-কানুন মানা প্রয়োজন···না-মানা অন্যায়···অপরাধ! অথচ···

উপায় নাই! চাকরি নহিলে দিন চলিবে না! এ চাকরি না-হয় ছাড়িয়া দিলাম···কিন্তু আর কোথাও চাকরি করিতে হইবে তো! চাকরি ছাড়া উপায় নাই! নূতন জায়গায় চাকরি করিতে গেলে তারা বলিবে যেখানে কাজ করিতে, ছাড়িলে কেন? জবাবে যদি বলে, সেকাজে তাহার রুচি ছিল না···সে-কাজ অন্যায় বলিয়া ছাড়িয়াছে···তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে···অফিসের কাজে নিজের রুচিবিরাগ যদি মানো বাপু, তা হলে পরের অধীনে চাকরি তুমি পাইতে পারো না···পথ দ্যাখো!

সুনন্দা ভাবিল, অপটুতার জন্য ডিসমিস নয় তো! আজ এ-কাজে বাহির হইবে···কিন্তু কাজ হইতে তার ছুটী চাই—নহিলে চাকরিত্যাগের অনুমতি!

সুনন্দা উঠিল···গীতার সঙ্গে বাহিরে আসিল। অফিসের সামনে দু'খানা মোটর···একখানা মোটরে সেদিনকার সেই রোগা লোকটি। পরণে খদ্দর···মাথায় খদ্দরের টুপি। সুনন্দাকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সে অভ্যর্থনা করিল, বলিল—আপনি আসুন আমার গাড়ীতে···আমরা যাব খিদিরপুর আর টালিগঞ্জ।

প্রথম-দর্শনেই লোকটাকে সুনন্দার ভালো লাগে নাই···কিন্তু সে ভালো না লাগা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার? অফিসের মনিব জটাই বোসকেও তো ভালো লাগে না! তবে···

সুনন্দা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সে লোকটি বসিল সুনন্দার পাশে···বসিয়া ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল—খিদিরপুর···

ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল—গাড়ী চলিল।

গাড়ীতে বসিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া পাঁচু সান্যাল (রোগার নাম পাঁচকড়ি সান্যাল)···পাঁচকড়ি বলিল—এটা হচ্ছে খিদিরপুরের ভোটারদের লিষ্ট···যে-সব নামে দাগ দেওয়া আছে, দেখুন···শুধু মেয়ে-ভোটারদের নাম···এঁদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে জনা-জনাকে বুঝিয়ে অনুরোধ করা—বকু চক্করবর্তিকে ভোট দেবেন। বকু চক্করবর্তি বেশ বোনেদী বড় ঘরের ছেলে···ব্যারিষ্টার···চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে···দেশের কাজে, দশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। এঁর রাইভাল অশ্বিনী রায় বলবেন —লোকটা, লোকটা লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ হলে কি হবে, ব্যবসাদার মানুষ···তাছাড়া টাকার লোভে এক মস্ত বড়-লোকের হাবা-গোবা মেয়েকে বিয়ে করে লায়েক হয়েছে— স্বভাব-চরিত্রও খারাপ···যত ভদ্র ঘরের মেয়েদের উপর নজর···একটি মেয়ের এমন সর্বনাশ করেছে যে বলবার নয়···হাসপাতালে সে-মেয়েটির এক ছেলে হয়েছে। এ তো একটি! এ-ছাড়া···

পাচু সান্যাল বক্‌বক্‌ করিয়া যা—তা বকিয়া চলিয়াছে। অশ্বিনীর নামটাকে কালো কালিতে যতখানি পারে—কালো করিয়া আর বকু চক্করবর্তিকে সোনার জলে চুবাইয়া···

সুনন্দার কানে কথাগুলো আসিয়া বাজিতেছে···ঝন্ ঝন্ ঝন্। সে-সব কথা মনের দ্বারেও ঘা দিতে পারে না! সুনন্দার মন উধাও হইয়া চলিয়াছে, কালিকার সেই আনন্দ-সমারোহের মধ্যে···অশ্বিনী, ভানু, অমল এবং অমল, ভানু, অশ্বিনীর সঙ্গে সঙ্গে···চোখের সামনে সেই উৎসবের দৃশ্য!

ষোল

চাকরি···ডিউটি···

খিদিরপুরে এক-একটা মোড়ে মোটর দাঁড়ায়···পাঁচুর কথায় সুনন্দা গাড়ী হইতে নামে···নামিয়া বাড়ীগুলার অন্দরে দিয়া মহিলাদের ধরিয়া বলে···আপনারা ভোট দেবেন বকু চক্করবর্তিকে···তিনি দেশের কাজে···দশের কাজে জীবন উৎসর্গ করছেন!

কোনো বাড়ীর মেয়েরা বলে···যাকেই দিই, আপনার কথায় দেবো না, ভেবে-চিন্তে দিতে হবে! দেশের আর দশের কাজে কোন্ লোক জীবন দিচ্ছে, আমাদের তা দেখতে, কি, জানতে বাকি নেই!···

কোনো বাড়ীতে মেয়েরা বলে···ও-সব ভোট-ঘোঁট···বাড়ীর পুরুষ-মানুষরা যা বলবেন, তাই হবে! ওঁরা বোঝেন, জানেন, কে কেমন কাজের মানুষ···সেই বুঝে ভোট দেওয়া···এর জন্য আপনারা কেন যে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ান, বুঝি না!

সুনন্দা বাহির হইয়া আসে, আসিয়া আবার এক গলিতে যায়। গাড়ী চলে···সময়-সময় কোনো মোড়ে দাঁড়ায়···সুনন্দা গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ী-বাড়ী···

সুনন্দার কোনো খেয়াল নাই যেন! মাঝে-মাঝে মনে হয়, সত্যই সে ভোটের দালালি করিয়া বেড়াইতেছে? না, স্বপ্ন?

কোনো-কোনো বাড়ীতে পায় খাতির-যত্ন—কোথাও বা শ্লেষ-টিটকারী। এমনি করিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে বেলা ছুটো বাজিল। এবার গাড়ীতে আসিয়া বসিতে পাঁচু সান্যাল দিল সুনন্দার হাতে ত্রিশটা টাকা, বলিল···আপনার আজকের রেমুনারেশন! হ্যাঁ, এবার একটু জিরুনো···টিফিন। চলুন, গাড়ী আছে তো, চৌরঙ্গীতে···ফির্পো কিম্বা, কনটিনেণ্টাল···

সুনন্দা বলিল—না টিফিনের কোনো দরকার নেই আমার···টাকা নিয়েছি যখন, টাকার কাজ যতটা চুকিয়ে দেওয়া যায়···

—তা বলে কিছু না খেয়ে?

সুনন্দা বলিল—আমাদের আবার খাওয়া! এক বাড়ীতে মেয়েরা ধরে আমাকে এক পেয়ালা চা খাইয়েছেন, আমার আর কিছু খাবার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, আপনার খাওয়া···তা আপনি এখন গাড়ী করে গিয়ে খেয়ে আসুন। আমি ততক্ষণে লিষ্ট দেখে কতকগুলো বাড়ী···একটা সময় বলে যান বরং ঠিক করে···বলে যান কখন ফিরবেন···কোথায় এসে দাঁড়াবেন···আমাকে ঠিক সে-জায়গায় হাজির পাবেন।

—না, না, তা কখনো হয়? একজন লেডি···এ্যাণ্ড ইয়ং—তাঁকে এখানে উপোসী রেখে আমি ষণ্ডামার্ক জোয়ান মানুষ, গিলে আসবো? ও নো, নেভার···এক্সকিউজ্ মী প্লীজ!

—তাহলে?

—আপনাকে যেতেই হবে। একটু-কিছু মুখে দেওয়া···নাহলে আমি···

সুনন্দা ভাবিল, আশ্চর্য মানুষ তো! তার মনে বেশ সংশয় জাগিল। বুঝিল, ঘনিষ্ঠতা করার মতলব! প্রথম যেদিন অফিসে দেখা···বলিয়াছিল, খুব প্রয়োজনীয় কাজ আছে—দশ মিনিট যদি সময় দিতে পারি, তাহা হইলে দশ টাকা রোজগার···এমন কি কাজের কথা? একবার মনে হইল, সে-কথা একটিবার বলিল না তো! ভুলিয়া গিয়াছে? তার মানে, সেটা কাজের কথা নয়—একটা অছিলামাত্র···সুনন্দার সাহচর্য পাইবার অভিসন্ধি! এ-বয়সে পেটের জন্য চাকরি করিতে বাহির হইয়া কত রকমের মানুষ না দেখিল! রাগ হওয়ার চেয়ে মজা লাগে! বাহিরের পুরুষগুলো এমন বেকুব! আশ্চর্য বোধ হয়, কি করিয়া ভাবে, ফিটফাট পোষাকে একটু দুরন্ত আদব-কায়দা আর ছুটো চাটুবাক্য···ইহারি মোহে আমরা নিজেদের ভুলিয়া উহাদের হাত ধরিয়া নৃত্য করিব? সব ভুলিয়া উহাদের ল্যাংবোট হইয়া ঘুরিব? দু-চারজন মেয়ে এমন আছে স্বীকার করি···কিন্তু দুজন নির্বোধ দুর্লভের স্বপ্নে ভুলিয়া না বুঝিয়া যা-তা করে বলিয়া সকলেই···? ঐ বেকুব পুরুষগুলো যা ভাবে, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে দুনিয়ায় গৃহ-সংসার বলিয়া কোনো-কিছুর অস্তিত্ব থাকিত না। সুনন্দা ভাবিল, একটু কৌতুক···মন্দ কি! জীবনে একটু বৈচিত্র্য!

সুনন্দা বলিল—আপনি মুস্কিলে ফেললেন পাঁচুবাবু! আমি খাবো না বলে আপনিও···তাহলে চলুন, কোথায় যেতে চান।

—চৌরঙ্গীতে। সেখানে যেমন···

—বেশ···কিন্তু আমাকে বেশী কিছু খাবার অনুরোধ করবেন না! আমি যাচ্ছি জাষ্ট টু কীপ ইউ কম্প্যানি।

এ-কথায় পাঁচু যেন স্বর্গ হাতে পাইল! সে বলিল—আচ্ছা, বেশ···আপনার যা অভিরুচি।

গাড়ী আসিল পার্ক ষ্ট্রীটে এক হোটেলের সামনে! সুনন্দাকে লইয়া পাঁচু ঢুকিল ভিতরে···ভিতরে প্রকাণ্ড হল···সে হলে চেয়ার-টেবিলের কেয়ারি। সে সব টেবিল ঘিরিয়া নানা জাতের নানা সাজের স্ত্রী-পুরুষ···পান-ভোজন চলিয়াছে—সেই সঙ্গে হাসি, গল্প···প্রমোদের ফোয়ারা বহিতেছে যেন!

একদিকে একটা খালি টেবিল···সুনন্দাকে বসাইয়া পাঁচু বসিল সুনন্দার সামনের চেয়ারে···বসিয়া বেয়ারাকে বলিল—পহিলে চা—ঔর তুমারা আচ্ছা যো ডিশ···

বেয়ারা গেল আদেশ পালন করিতে। সুনন্দা নীরবে ভিড়ের উপর ততক্ষণ চোখ বুলাইয়া লইতেছে···চোখ বুলাইয়া মৃদু হাস্যে সুনন্দা বলিল—একটা কথা বলবো, যদি কিছু মনে না করেন!

—না, না—সে কি, আপনার কথায় কি আবার মনে করবো সুনন্দা দেবী! আপনি জানেন না, আপনাকে আমি হাউমাচ্···হাউমাচ্ আই ওয়ার্শিপ···

পাঁচুর কণ্ঠ বেশ উচ্ছ্বসিত···দু'চোখের দৃষ্টি আবেশে নিমীলিত-প্রায়।

তাহা লক্ষ্য করিয়া সুনন্দা কৌতুক বোধ করিল। কিন্তু প্রশ্রয় দেওয়া নয়···ও কণ্ঠে উচ্ছ্বাস আর অবাধে উৎসারিত হইতে দেওয়া নয়! তাই···

পাঁচুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া সুনন্দা বলিল—মানে, এখানে এত লোক খেতে বসেছে ···এদের মধ্যে আপনার বেশভূষা একেবারে আলাদা—যাকে বলে, ইউনিক! আপনার পরণে খদ্দর···মাথায় খদ্দরের টুপি······এটা যেন খাপ খচ্ছে না!

—কি জানেন সুনন্দা দেবী···পাঁচু সান্যাল বলিল—খদ্দরটা হলো খোলশ ···ওটাতে আমার আসল পরিচয় পাবেন না। আমার আসল পরিচয়···এই বুকের মধ্যে।

বাধা দিয়া মৃদু হাস্যে সুনন্দা বলিল—খদ্দরে মুড়ে নিজেকে দাঁড় করানো—সেই ঈশপের গল্প যেন! দাঁড়কাক নিজের পরিচয় ঢাকতে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেছিল!

এ-কথার অর্থ পাঁচু সান্যাল চট করিয়া বুঝিতে পারিল না···ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল —তার মানে?

হাসিয়া সুনন্দা বলিল—এর মানে···আসল পরিচয় এরকম করে ঢেকে নকল পরিচয়ে জাহির করতে গেলে বিপদ ঘটে, পাঁচুবাবু!

পাঁচু সান্যাল এ-কথারও অর্থ বুঝিল না, তবু খুশী। সে বুঝিল···সুনন্দা তার সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছে! এমন হাস্য-পরিহাস তার ভালো লাগে। বিশেষ সে হাস্য-পরিহাস যদি বর্ষিত হয় সুনন্দার বয়সী মেয়েদের তরফ হইতে! পাঁচু ও-কথায় কি বলিবে ভাবিতেছে—কিন্তু বলা হইল না—বেয়ারা ট্রে আনিয়া সামনে ধরিল।

সুনন্দা বলিল—বলেছি তো, আমি শুধু চা খাবো—এ্যাণ্ড নাথিং এল্‌স্‌···আপনিও কথা দেছেন এবং আমার আশা আছে, আপনি ভদ্রলোক···কাজেই কথার খেলাপ করবেন না। কথার শেষটুকু সুনন্দা বলিল···ইংরাজী ভাষায়।

সুনন্দার এ-কথায় পাঁচুর তাক লাগিল। সে অনেক-কিছু ভাবিয়াই আজ সুনন্দাকে লইয়া খিদিরপুরের দিকে ক্যানভাসের কাজে বাহির হইবার ভার লইয়াছে। জানে, সুনন্দা সামান্য একশো টাকা মাহিনায় জটাইয়ের পাবলিকেশন ফার্মে চাকরি করে—ইলেকশনের ব্যাপারে প্রত্যহ এখন ত্রিশ টাকা নগদ···পাঁচুর হাত হইতেই সুনন্দা পাইবে নিজের হাতে—তার উপর তাকে ইংরেজ-পাড়ার হোটেলে আনিয়া টিফিন খাওয়ানো···বকু চক্করবর্তির টাকার বদান্যতায় বিমুগ্ধ করিয়া দিবে। সুনন্দা ভাবিবে, পাঁচু সান্যাল লায়েক আদমি এবং···কিন্তু চা ছাড়া সুনন্দা আর কিছু মুখে দিবে না···পণ করিয়াছে! মেয়েটির তেজ আছে—বন্ধুদের দৌলতে দু-চারজন চাকরি-জীবী কিশোরীর সঙ্গে সে মিশিয়াছে কিন্তু এ তাদের মতো নয়! তার সযত্ন আতিথ্যে এবং আচরণে প্রথমেই খদ্দর আর দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ···কি কতকগুলো বলিল, সে কথার সঠিক অর্থ না বুঝিলেও পাঁচু বুঝিয়াছে, সুনন্দা তার পোষাক লইয়া পরিহাস করিতেছে! ভয় হইল—ইহার উপর আর-কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিলে হয়তো সুনন্দার মন পাঁচুর উপর বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিবে! কালকের অভিযানে হয়তো সুনন্দা বাঁকিয়া বসিবে, বলিবে, না, আমি যাবো না, পাঁচু সান্যালের সঙ্গে। বিশেষ জটাই বলিয়াছে, সুনন্দার সঙ্গে যেন প্রেম করতে যেয়ো না···শী ইজ ফেয়ারলুকিং নো ডাউট বাট ব্লেজিং ফায়ার!

তাই পাঁচু বলিল—পণ করেছেন, চা ছাড়া আর কিছু না?

হাসিয়া সুনন্দা বলিল—চা ছাড়া কিছু নয়···নট এ ক্রাম্ব অফ পেস্ট্রি অর ব্রেড!

পাঁচু বলিল—বেশ, আমিও তাহলে আপনার মান রাখতে শুধু চা খাবো! কিন্তু অর্ডার দিয়েছি···তা যাক্! ·

সুনন্দা এ-কথার জবাব দিল না; বুঝিল, লোকটা বেকুব! ইহার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে লজ্জা হইল!

বেহারা ট্রে রাখিয়া চলিয়া গেল। সুনন্দা পেয়ালায় চা ঢালিল, বলিল—ক'চামচ চিনি খান?

—ও···হ্যাঁ···তা দিন একটু বেশী করে···আমি বড্ড বেশী চিনি খাই—ব্যাচিলর মানুষ কিনা···মানা করবার কেউ নেই। তা ছাড়া এতগুলো পয়সা দিচ্ছি যখন, যতটা উশুল করা যায়!

সুনন্দা মনে মনে হাসিল—বেকুবরা এমনি করিয়াই নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে!

পাঁচুর পেয়ালায় চা চিনি দুধ ঢালিয়া পেয়ালাটা তার সামনে রাখিয়া সুনন্দা বলিল—খান···

বলিয়া সে নিজের পেয়ালায় চা ঢালিল···ঢালিয়া কোনো ভূমিকা না করিয়া মুখে পেয়ালা তুলিল।

পাঁচু চায়ে চুমুক দিল। তার মনে দুঃখ-ক্ষোভের সীমা নাই! পার্ক স্ট্রীটের হোটেল···সেখানকার ডিশ···অর্ডার দিয়া ফেরত দেওয়া···পয়সা ছাড়িবে না!···এবং ইহা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে সুনন্দা কি ভাবিবে! এ লোকটার এখানে খাওয়া এই প্রথম···কায়দা-কানুন জানে না! তারপর···

কিন্তু মুখে বলিয়া ফেলিয়াছে—সুনন্দার মর্যাদা রাখিতে সে-ও চা ছাড়া আর কিছু মুখে দিবে না—কাজেই চা ছাড়া এ সব কিছু খাওয়া চলে না। যাক্···টাকা বকু চক্করবর্তির, সে টাকার বদান্যতা দেখানো যাক্। এগুলা স্পর্শ করিবে না এবং স্পর্শ না করিয়াই এগুলার পুরা দাম দিয়া যাইবে। সুনন্দার কাছে পোজিশন থাকিবে। সুনন্দা ভাবিবে, দিল্-ওয়ালা মানুষ—পয়সার কেয়ার করে না। এবং এই বদান্যতার দৌলতে হয়তো···

তাহাই হইল। দুজনে দু-পেয়ালা চা খাইল, তারপর বিলের টাকা দিয়া প্রস্থান।

আবার খিদিরপুর···এ-যাত্রায় আরো কতকগুলা গলি সারিয়া বেলা পাঁচটা নাগাদ পাঁচু সান্যাল বলিল—আজ এই পর্যন্ত···এখন অফিসে ফিরবেন ?

সুনন্দা বলিল—না, বাড়ী যাবো।

—কোথায় থাকেন ?

—টালিগঞ্জে। আমাকে নামিয়ে দিন ঐ বর্ধমানের মহারাজার বাড়ীর কাছে—আলিপুরের ট্রাম ধরে আমি বাড়ী যাবো।

পাঁচু বলিল—না, না, তা কেন? আমাকে টালিগঞ্জে যেতে হবে। আমাদের ক্যাম্প সেখানে রিজেণ্ট পার্কে···বেশ, আপনাকে তাহলে একেবারে আপনার বাড়ীতে···

বাড়ীতে এ লোকটাকে লইয়া যাইতে সুনন্দার ইচ্ছা নাই। কে জানে, তাহা হইলে যখন-তখন আসিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিবে! সুনন্দা বলিল—কোনো দরকার নেই তার···আমাকে টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোয় নামিয়ে দিলেই হবে। সেখান থেকে আমি অনায়াসে···

পাঁচু বলিল—বেশ, তাই হবে।

মোটর চলিল টালিগঞ্জের উদ্দেশে···চেৎলার পুলে না গিয়া কিন্তু খিদিরপুরের পুল পার হইল। রেস-কোর্সের ধারে আসিবামাত্র জটাই বোসের সঙ্গে দেখা। একখানা মোটরে জটাই বোস, গীতা এবং আরো দুজন ভদ্রলোক···সে মোটর চলিয়াছে পূর্ব দিকে। জটাইয়ের নির্দেশে পাঁচুর মোটর দাঁড় করানো হইল।

জটাই বলিল—এই যে সুনন্দাও আছো! ভালো হলো—কালকের জন্য অন্য একটা কাজ আছে—এসো তাহলে আমাদের ক্যাম্পে—সেখানে পনেরো মিনিট···তারপর তোমাকে দেবো ছুটি!

মনিবের কথায় 'না' বলা চলে না! সুনন্দা কোনো জবাব দিল না।

জটাইয়ের মোটর চলিল বিদ্যুৎগতিতে···পাঁচুর মোটর চলিল সে মোটরের পিছনে। সুনন্দার নামা হইল না···সেও চলিল রিজেণ্ট পার্ক ক্যাম্পে। পাঁচু মহাখুশী। আরো খানিকক্ষণ···

সতেরো

গাড়ী গিয়া ঢুকিল রিজেণ্ট পার্কে। সিধা রাস্তা বাঁকিয়া যে রাস্তা গিয়াছে আরো দক্ষিণে, সেই পথে! দুখানা গাড়ী চলিয়াছে কাছাকাছি···আগে-পিছনে। আগে জটাইয়ের গাড়ী, পিছনে পাঁচুর গাড়ী। এ-গাড়ীতে পাঁচু কি-সব বকিয়া চলিয়াছে··· ইলেকসন, বকু চক্করবর্তির জিতিবার সম্ভাবনা কতখানি···এই সব···রিজেণ্ট পার্কে নিজের বড় বাগানখানা ছাড়িয়া দিয়াছে ভলাণ্টিয়ারদের ক্যাম্পের জন্য! সে ক্যাম্পে প্রত্যহ দু'বেলা যেন বৃষোৎসর্গ ব্যাপার চলিয়াছে—তার জন্য যারা কাজ করিতেছে··· তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং আমোদ-প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা। এবং এ-কথাগুলার সঙ্গে নিজের অতীত-দিনের নানা কীর্তির কথা গুঁজিয়া দিতে ভুলিতেছে না!···সে-সব কীর্তি অর্থাৎ—তার কি বিরাট প্রতিপত্তি কলিকাতা সহরে, চাকরি নয়, আর পাবলিক কাজ···সেই নন-কো-অপারেশনের যুগ হইতে! তখন কি-বা তার বয়স! সবে স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিয়াছে! ইংরেজের পুলিশের বা জেলের তোয়াক্কা না রাখিয়া···শেষে সি. আর. দাশের নজরে পড়ে। পাঁচুর উপর তাঁর কি স্নেহ—কি বিশ্বাস আর নির্ভর। মনে করিলে সে কি-না হইতে পারিত···কর্পোরেশনে চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পোষ্ট···মুখের কথা একবার খসাইলে সি. আর. দাশ তখনি তাকে! কিন্তু না···

এমনি আরব্য উপন্যাসের গল্প বকিয়া চলিয়াছে···তাও সঙ্গত সংলগ্ন পর্যায়ে টানা সরাসরি ভাবে নয়—আর পাঁচটা কথার সঙ্গে লেজুড়ের মতো গুঁজিয়া! সুনন্দার মনে হইতেছে প্রুফের কথা কপি ছাড় গেলে প্রুফে যেমন একটু মার্কা দিয়া গেলির গায়ে নূতন করিয়া লেখা জুড়িয়া দিতে হয়···তেমনি। এ-সব কথা শুনিয়া তার যেমন ঘৃণা হইতেছে, তেমনি কৌতুকে মনটা ফুলিয়া উঠিতেছে···বেলুনের মতো! জোর করিয়া সে কান দিল আগেকার গাড়ীর হাস্য-পরিহাসের দিকে···যতটুকু তার কানে আসে— শুনিতেছে—ও-গাড়ীতে কি আলোচনা·· তার সঙ্গে গীতার উচ্চকণ্ঠে হাসির মাতন! পুরুষের দলে মিশিয়া এমন নির্লজ্জ হাসি এ-বয়সে কোনো মেয়ে হাসিতে পারে! আশ্চর্য!

দুখানা গাড়ী ঢুকিল পর-পর একটা বাগানের জীর্ণ ফটকে···ফটক হইতে খানিকটা পথ ঘুরিয়া বাড়ী। জীর্ণ দশা···চুণবালি-খসা দেওয়ালগুলা কোনোমতে খাড়া আছে। গাড়ীবারান্দার নীচে গাড়ী থামিল। বিরাট অট্টরবে অভ্যর্থনা···থ্রী চীয়ার্স ফর মিষ্টার চাকারবার্টি···বন্দে মাতরম্!

গাড়ী হইতে নামিয়া সামনে কাঠের সিঁড়ি বহিয়া দোতলায় ওঠা···উঠিয়াই একটা টানা বারান্দা···তার কোলে বড় একখানা ঘর···ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চ পাতা—চার

পাঁচটা এসেটিলিন জ্বলিতেছে। ইলেকট্রিকের তার আছে—ধুলা-বালি মাখিয়া কাটা তারগুলা কোথাও ঝুলিতেছে বটগাছের ঝুরির মতো—কোথাও একগোছা তার কুণ্ডলী পাকাইয়া বাঁধিয়া ঝুলানো! দেখিলেই বুঝা যায়, দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ের জন্য পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ীখানাকে কোনোমতে যজ্ঞের আসর করিয়া তোলার প্রয়াস।

এ-ঘরে পা দিয়া সুনন্দা চমকিয়া উঠিল। এমন ব্যাপার সে চোখে কখনো দেখে নাই! অফিসের পাবলিকেশন উপন্যাসের প্রুফ দেখিতে বসিয়া দু-একটা অতি-বাস্তব লেখায় এ ব্যাপারের পরিচয় পাইয়াছে। মেঝেয় সতরঞ্চের উপর একদিকে একটা বোতল আর খালি গেলাশ···একদিকে বাঁয়া-তবলা হইতে সুরু করিয়া হার্মোনিয়ম এবং পায়ের ক'জোড়া ঘুঙুর পর্যন্ত···ঘরে মেয়ে-পুরুষের জটলা এবং তাদের কি বিচিত্র ভঙ্গী।

জটাই বলিল সুনন্দাকে—তোমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে হয়তো! এসব কখনো চোখে ছাখোনি! কিন্তু উপায় নেই সুনন্দা···যে-কাজের জন্য যে-রকম দরকার!

তার মুখের কথা লুফিয়া কে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, যেমন দেবতা, তার পুজোর তেমনি আয়োজন চাই তো! সত্যনারায়ণের পুজোয় বাতাসা আর শিন্নী···কালী-পুজোয় মোষ পাঁটা বলি!

কথা শুনিয়া সুনন্দা ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, অফিসের সেই গেরুয়া এ-কথা বলিল! সে একেবারে কাঁটা! এ যেন সার্কাসের তাঁবু! ছেলেবেলায় দেখিয়াছে, মাঠে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিতেই সামনে হাতী, কুকুর, বানর, ঘোড়ার ভিড়···এও ঠিক তেমনি।

পাঁচু সান্যাল খাতির করিয়া বলিল—বসুন সুনন্দা দেবী···

সুনন্দা চাহিল জটাইয়ের পানে, বলিল—কি কাজ আছে, যদি দয়া করে বলেন! আপনি বললেন, পনেরো-কুড়ি মিনিটের কাজ। আমি···মানে, সারাদিন ঘুরেছি তো, অত্যন্ত ক্লান্ত···বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম···

জটাই কি বলিতে যাইতেছিল, গেরুয়া বলিল—ও, তা বিশ্রামের জন্য এখানে জায়গা আছে···ঐ পাশের ঘর···ওখানে দিবান আছে···সোফা-কোচ আছে! মানে···

সুনন্দার গা ছমছম করিয়া উঠিল! এখানকার বাতাস তার বিষের মতো মনে হইতেছে!—সে কোনো জবাব না দিয়া তাকাইয়া আছে জটাইয়ের পানে।

জটাই যত নীতিজ্ঞানবিবর্জিত হোক···তার অফিস আছে···কারবার আছে···এবং সে অফিসে সুনন্দা কতখানি কাজের মানুষ, জটাই তা বোঝে! তাই সুনন্দার অনেক কাজে প্রতিবাদ তুলিলেও সুনন্দাকে নোটিশ দিতে পারে না এবং গীতার সঙ্গে যে ব্যবহার করে, সুনন্দার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ভরসা পায় না! জটাই বলিল গেরুয়াকে—বকু এসেছে?

গেরুয়া বলিল—না!

জটাই বলিল—তাইতো···এখনো আসেনি! আসবার কথা ছিল পাঁচটায় কাঁটায় কাঁটায়! এখানে আসা চাই—কালকের ব্যাপারে বেশ মোটা টাকা খরচ আছে। দীনুর পার্টি সায়েস্তার করতে রাজী, তবে সেজন্য মোটা টাকা চায় দীনু। এবং দিতে

হবে অগ্রিম···বাকি টাকা পোলিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে! এ কাজে আমি সুনন্দার সাহায্য চাই···

গেরুয়া বলিল—এখনি এসে পড়বে'খন। কোথাও হয়তো আটকে পড়েছে!···আধ ঘণ্টা বড় জোর···সুনন্দা দেবী আধ ঘণ্টা বসতে পারবেন না?

জটাই চাহিল সুনন্দার দিকে, বলিল—কি বলো সুনন্দা? আধ ঘণ্টা? তোমাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসা হবে!

সুনন্দার হাতের কবজীতে হাত-ঘড়ি···হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া সুনন্দা বলিল—ছটা সতেরো মিনিট···আধ ঘণ্টা! বেশ, সাতটা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারি।

—হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি···তাই করো। বলিয়া জটাই তাকে একান্তে আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—পাঁচশো লোক—মানে, এ-ব্যাপারে···তোমার আণ্ডারে কাজ করবে—তুমি তাদের কণ্ট্রোল করবে। কেননা, দীনুর পার্টিতে বহু আধুনিক-মহিলা আছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে তুমি যেমন···বুঝলে কিনা!

কিন্তু বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না। কোনোমতে এদের সাহচর্য কাটিয়া বিদায় লইতে পারিলে সে বাঁচে!

জটাই বলিল—তাহলে তাই, কেমন?

গেরুয়া বলিল—পাশের ও-ঘরে তাহলে···

পাঁচু সান্যাল বলিল—হ্যাঁ···ও-ঘরে কেউ যাবে না। মানে, ও-ঘর হলো আমাদের অফিস-রুম···প্রাইভেট।

সুনন্দার কি মনে হইল, সে বলিল—না, থাক, এইখানেই এক ধারে আমি বসছি।

সুনন্দা বসিয়া আছে···নিরুপায়, অসহায়!···ঘরে কত রকমের লোক আসা-যাওয়া করিতেছে···কত মাতন···কত কীর্তি! ওদিকে যেন···

দেখিয়া-শুনিয়া সুনন্দা শিহরিয়া উঠিতেছে! হঠাৎ এক তরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল···একজন কিশোরীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে বলিল—এসো···তোমাকে নিয়ে একটু ডান্স···তোমার জন্য আমার···বুঝলে, ডার্লিং···

কিশোরী লজ্জায় জড়োসড়ো···আতঙ্কে। এখান হইতে মুক্তির জন্য তার মিনতি···অনুরোধ।

জটাই দিল তরুণকে ধমক—এ কি বেলেল্লাপানা বলাই, নো সাচ্ কণ্ডাক্ট্···

তরুণের নাম বলাই। বলাইয়ের দিকে জটাই অগ্রসর হইতেছিল—পাঁচু সান্যাল জটাইয়ের হাত ধরিয়া টানিল, বলিল—না, জটাইবাবু, বলাইকে ঘাটাবেন না। জানেন, ওর আখড়া আছে। সেই আখড়ার ও আখড়াদার। ওর হাতে দেড়শো ভোটার···ওকে কিছু বলে যদি ওর কাজে ইনটারফিয়ার করেন—তাহলে দেড়শো ভোটার খোয়াবো আমরা।

জটাইকে অগত্যা থামিতে হইল—বিরক্তিতে আক্রোশে সে শুধু ওদিকে চাহিয়া হাত কচলাইতে লাগিল।

সুনন্দা থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আমাকে মাপ করবেন মিষ্টার বোস···আমি আসি···

জটাইয়ের কেমন তিক্ত ভাব! সুনন্দাকে সে জানে। সে বলিল—হ্যাঁ!···চলো, তোমার জন্য গাড়ী বলে দি।

পাঁচু সান্যাল বলিল—বেশ, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

সুনন্দা বলিল—না, গাড়ীর দরকার নেই। একটু আগে ট্রামডিপো···এ পথটুকু আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবো।

এ-কথা বলিয়া আর এক মিনিট অপেক্ষা করা নয়! সুনন্দা দ্রুতপায়ে আসিল ল্যাণ্ডিংয়ে···তার হাতে ছাতা এবং ভ্যানিটি। লেডিস্ ছাতা···এ-ছাতা তার হাতে থাকে। অফিসে যাইবার সময় রৌদ্র আছে···বৃষ্টি আছে···দিনের বেলায় ছাতা ছাড়া বাহির হয় না। ছাতা লওয়াটা জুতা পায়ে দেওয়ার মতো অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া মস্ত লন। লনে আলো নাই। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িয়াছে···বড় বড় গাছ, সে-সব গাছের ডালপালার ফাঁকে গেট অবধি জ্যোৎস্না। সেই আবছা আলোয় পথ দেখিয়া সুনন্দা চলিয়াছে। পিছনে হঠাৎ দ্রুত-পায়ে-চলার শব্দ···বেশ জোর-পায়ে কে এদিকে আসিতেছে। যে আসুক, সুনন্দার কি? সুনন্দা চলিয়াছে ফটকের দিকে।

পায়ের শব্দ খুব কাছে। সুনন্দা শুনিল কণ্ঠ···সুনন্দা দেবী···

—কে? সুনন্দা ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—কে?

—আমি পাঁচু সান্যাল।

—কেন? কি দরকার?

—মানে, আমি বলছিলুম, হেঁটে যাবেন কেন? গাড়ী যখন রয়েছে!

—না, গাড়ীর কোনো দরকার নেই! হাঁটা আমার অভ্যাস আছে।

—কিন্তু···আমি·· মানে, আপনার সঙ্গে অনেক কথা ছিল—কাজের কথা।

—কি কথা?

—মানে···আপনাকে আমি···মানে—এটা নিন তো আগে। তারপর···মানে···

একখানা খাম পাঁচুর হাতে···সুনন্দা দেখিল···কহিল—কি? চিঠি?—না। দেখুন আপনি! এ আগুন নয়···হাতে ফোস্কা পড়বে না!

সুনন্দা ভাবিল, ভোটের ব্যাপারে কোনো লেখা নাকি? খামখানা সে হাতে লইল। খোলা খাম···খুলিয়া দেখে, একখানা দশ টাকার নোট!

সুনন্দার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা! সুনন্দা বলিল—টাকা!

—হ্যাঁ···প্রথম কিস্তি···দশ।

—এ-টাকা···?

চারিদিকে চাহিয়া পাঁচু বলিল···মানে···আপনার সেবায় প্রথম কিস্তি···মানে, আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি। আজ রাত্রে···

রাগে সুনন্দার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। খামখানা মুড়িয়া সে ফেলিয়া দিল,

দিয়া বলিল—আপনি ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেন! মেথর-মুর্দ্দফরাসরাও যে-কথা বলতে লজ্জা পায়…

কথাটা বলিয়া সুনন্দা ফটকের দিকে চলিল—রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে।

পাঁচু যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সুনন্দার একখানা হাত সে চাপিয়া ধরিল, বলিল—'কিসের এত ঝাঁজ দেখাও, সতী-লক্ষ্মী…তোমার পরিচয় আমাদের জানতে বাকি নেই। এই ইলেকসনের দৌলতে সব খবর জেনেছি। ঐ অশ্বিনীর সঙ্গে…তারপর হাসপাতালে চুপি-চুপি গিয়ে ছেলে-বিয়ানো…

—রাস্কেল! বলিয়া সুনন্দা সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া হাতের সেই ছাতা দিয়া পাগলের মতো পাঁচুকে সবলে পিটিল—অনেকগুলো আঘাত, মুখে নাকে মাথায় গায়ে…দিক-বিদিক জ্ঞান হারাইয়া পিটন দিল। পাঁচু এ অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়া গেল, তারপর হুঙ্কার তুলিল—তবে রে…

অকথ্য ইতর গালি দিয়া সে ঝাঁপাইয়া পড়িল সুনন্দার উপর…কিন্তু সুনন্দার দেহে তখন নৃমুণ্ডমালিনীর আবির্ভাব যেন! পাঁচুকে ছাতার আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া সুনন্দা পাগলের মতো ছুটিয়া ফটক পার হইয়া রাস্তায় আসিল। তারপর জোর-পায়ে চলা… ট্রাম-ডিপো লক্ষ্য করিয়া।

ডিপোর কাছাকাছি আসিয়া পথের আলোয় দেখে, পরণের শাড়ীখানা ছিঁড়িয়া নিশানের মতো ঝুলিতেছে…হাতে জ্বালা…পাঁচুর নখের আঘাতে হাতে দু-চার জায়গা ছড়িয়া গিয়াছে…রক্ত ঝরিতেছে। শাড়ী এমন…এ-বেশে পথ চলা…অথচ পথে দাঁড়াইয়া শাড়ীখানা ঘুরাইয়া পরিবে, সে উপায় নাই। চকিতের জন্য সুনন্দা থমকিয়া দাঁড়াইল…ওদিক হইতে শ্লোগান শুনা যাইতেছে—অশ্বিনীবাবুকে ভোট দিন… অশ্বিনীবাবু…

শ্লোগান এদিকে আসিতেছে। একদল ছেলে এ মোড় বাঁকিল·· এদিকে আসিতেছে। এরা অশ্বিনীর পক্ষে—ঘন অন্ধকারে সুনন্দা যেন একটু আলোর রেখা দেখিল!

ছেলেরা কাছে আসিল—তাদের সঙ্গে বিভোর দত্ত। এই লোকটির কথাই পথে দাঁড়াইয়া সুনন্দার মনে জাগিতেছে। বিভোর দত্ত! সে দেখিল সুনন্দাকে…দেখিয়া কাছে আসিল, বলিল—সুনন্দা…তুমি এখানে!…এ কি বেশ…মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো রুক্ষ! শাড়ী…

সুনন্দা একটা নিশ্বাস ফেলিল, বেশ বড় নিশ্বাস…নিশ্বাস ফেলিয়া সুনন্দা বলিল—অনেক কথা আছে, বলতে চাই…একটু আড়ালে…

ছেলেদের অগ্রসর হইতে বলিয়া বিভোর দাঁড়াইল। সুনন্দা সব কথা খুলিয়া বলিল—আজ সকালে অফিসে যাওয়া ইস্তক যাহা-যাহা ঘটিয়াছে…পাঁচুর ইতরামির কথাও…এতটুকু গোপন রাখিল না।

রাগে বিভোর দত্ত জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—রাজ্যের যত স্কাউণ্ড্রেল জুটে বোকা চক্করবর্তির পয়সায় শয়তানীর চূড়ান্ত করছে, জানি। তা বলে পেঁচো ব্যাটা…

সুনন্দা বলিল—শুধু জটাইবাবুর কথায় বিশ্বাস করে…

বাধা দিয়া বিভোর দত্ত বলিল—জটাই! এরকম ইতরামির বুদ্ধি বা সাহস তার হবে না—ওর নজর শুধু টাকার দিকে। টাকা! চক্করবর্তি রাজসূয় যজ্ঞ করছে জেনে ও বেশ মোটা রকম কিছু হাতাতে চায়। তা বলে পেঁচোকে ছাড়া হবে না। এর হেস্তনেস্ত করা চাই। ব্যাটা ছুঁচো···কিন্তু না, আগে তোমাকে বাড়ী পৌঁছুনো··· একখানা ট্যাক্সি। চলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুনন্দা বলিল—পৌঁছে দেবার দরকার নেই। এ বেশে বড় রাস্তায় যেতে লজ্জা হচ্ছে। যদি একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেন—কিংবা একটা রিকশ!

বিভোর তখনি মোড় হইতে ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। সুনন্দাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া বিভোর কহিল—বাড়ীর ঠিকানাটা যদি···

সুনন্দা ঠিকানা বলিল।

বিভোর বলিল—তুমি বাড়ী যাও। আমি একটু পরে গিয়ে খবর নেবো। ঐ কাটা-ছড়াগুলোয় বাড়ী গিয়েই অয়োডিন দেবে। কুকুরের নখের আঁচড়···না হলে বিষিয়ে উঠবে।

ট্যাক্সিতে করিয়া সুনন্দা ফিরিল বাড়ী।

ঘণ্টাখানেক পরে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া থামিল সুনন্দার গৃহের সামনে। সুনন্দা আসিয়া সদর খুলিয়া দিল। বিভোর দত্ত! উত্তেজনায় ফুঁশিতেছে!

উদ্বেগে আকুল কণ্ঠ···সুনন্দা বলিল—ব্যাপার কি?

বিভোর কহিল—বলছি, আগে একটু জল দাও।

বিভোরকে আনিয়া সুনন্দা ঘরে বসাইল···তাকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিল—তারাকে বলিয়া আসিল—চট্ করে চা তৈরী করে দাও তো ভাই তারা!

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া বিভোর কহিল—আমি কিছুতে সামলাতে পারলুম না সুনন্দা—গিয়েছিলুম ওদের আড্ডায়···পেঁচোটাকে এমন ঠেঙিয়ে দিয়ে এসেছি, এক হপ্তা ও আর নড়তে পারবে না! যেমন কুকুর—তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করে এসেছি। অসবার সময় বোকা চক্করবর্তির সঙ্গে দেখা—তাকে বললুম, বাপের পয়সাগুলো অন্য-রকমে লুটিয়ে দিতে পারো না? যত ছুঁচো-প্যাঁচার কেত্তন লাগিয়েছো।

বিভোর তখনো হাঁপাইতেছে।

সুনন্দা বলিল—দেখুন তো, এ আপনি···

—ঠিক করেছি! মেয়ে-মানুষের অপমান করে! মদ খাবি, খা, মাতাল হয়ে যা-খুশী কর—সব সহ্য হবে! তা বলে মেয়েদের অপমান! নো, দিস আই ক্যান নেভার টলারেট!

বিভোরকে শান্ত করিতে অনেকখানি সময় লাগিল। তারপর বিভোর উঠিবে, অশ্বিনী আসিয়া হাজির।

বিভোর তার হাতখানা ধরিয়া বলিল—আপনি···মানে, আপনি আমার পরম-

আত্মীয়। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকলেও আপনার হয়ে ক্যানভাশ চালিয়েছি···আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন হয়তো!

অশ্বিনী বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চাহিল বিভোরের পানে।

বিভোর হাসিল, হাসিয়া বলিল—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! এ ক্যামপেনে আমাকে লাগিয়েছেন ইনি—শ্রীমতী সুনন্দা দেবী—ইয়োর ওয়াইফ এ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ড··· গাইড···মাই···মাই ইনস্পিরেশন টু নোব্‌ল্‌নেশ!

কথাটা বলিয়া বিভোর দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল।

বাহিরে ট্যাক্সির শব্দ···ঘরের মধ্যে অশ্বিনী এবং সুনন্দা। দুজনেই নির্বাক—দুজনে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

একখানা নাটকের অভিনয় হইয়া গেল যেন!

আঠারো

ইলেক্‌শন আসন্ন···বিভোর একা একেবারে একশো জন হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে! জটাইয়ের দল কুৎসা ছাপিয়া সহরের গায়ে পোষ্টার আঁটিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বিভোরের লোকজন সে-সব পোষ্টারের উপর তাদের ছাপা নূতন পোষ্টার আঁটিয়া চলিয়াছে। এ পোষ্টারে লেখা—অশ্বিনাবাবুকে ভোট দিবেন—কেননা, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলে! ও-দল ধনীর জামাতা বলিয়া হিংসার যত বিষ ছড়াক্‌—মনে প্রাণে অশ্বিনীবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন এবং গরীব গৃহস্থের সুখ-দুঃখ তিনি যেমন বুঝিবেন, এমন আর কেহ বুঝিবে না!

তারপর টাকা! ভোটের ব্যাপারে টাকার জেরে আসল জোর। বিভোর নিজে হইতে টাকা খরচ করিতেছে—এবং অশ্বিনীর শ্বশুরের মনেও উৎসাহের সীমা নাই! তিনিও তাঁর ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। জীবনে এই একটিমাত্র কন্যার জন্য মনে কখনো সুখ পান নাই! নিজের জীবনের কোনো সাধ মিটে নাই! বড় আশা করিয়া অশ্বিনীর সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন···ভাবিয়াছিলেন, পঙ্গু আমি, আমার কোনো সামর্থ্য নাই—কিন্তু ছেলেমেয়ে হইবে···তাদের লইয়া জীবনকে সার্থক করিব। হায়রে, ভগবান সেদিকেও বাদ সাধিলেন! অশ্বিনীর আচরণে তিনি কখনো ত্রুটি দেখেন নাই! তবু বোঝেন তো, শিক্ষিত তরুণ-বয়সী ছেলে···স্ত্রীর কাছে মানুষের কত প্রত্যাশা থাকে—অশ্বিনীর কোনো প্রত্যাশা মিটিবার উপায় নাই! অনেক সময় মনে হইয়াছে, জীবনে অশ্বিনীর কি সুখ? ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ লাগিয়া থাকে কিন্তু মানুষের মন তাহাতে ভরে না! ভাগ্য! এ-অবস্থায় অনেকে নানা ভাবে সুখ-সম্ভোগের জন্য ছোটে—অশ্বিনীর সেদিকে প্রবৃত্তিমাত্র নাই। এ বড় সহজ কথা নয়। হাতে পয়সা—ব্যয় করিলে সে ব্যয়ের কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। তবু ও-সবে ঝোঁক নাই! কোনোদিন সুরা স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া তিনি শোনেন নাই। মেয়ের চেয়ে অশ্বিনীর ব্যথা-বেদনা, তার জীবনের ব্যর্থতার কথাই শ্বশুরের মনে তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধিতে

থাকে! মেয়েরও ছেলেমেয়ে হইল না···এ-ক্ষেত্রে মনের মতো একটি ছেলেকে যদি পোষ্য লইয়া—

সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছে অমল! ছেলেটি চমৎকার! অমলের মাকেও তাঁর খুব ভালো লাগিয়াছে। মায়ের ব্যথা তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন। ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য এমন ত্যাগ। ছেলেকে পোষ্য দিয়া মানুষ কত টাকা-কড়ি সংগ্রহ করে—ছেলের চেয়ে টাকা-পয়সার দামটাই তারা অনেক বড় করিয়া দেখে! কিন্তু অমলের মা সুনন্দা···একটি পয়সা স্পর্শ করে নাই! অত সাধ্য-সাধনা করিয়াও সুনন্দাকে এখানে রাখিতে পারিলেন না! এমন নিস্পৃহ—খাটিয়া অন্ন সংস্থান করিবে—কাহারো কাছে হাত পাতা নয়! এমন মন পুরুষের থাকে না—সুনন্দা তো মেয়ে!··· চমৎকার মেয়ে! কতখানি স্বাবলম্বী। বৃদ্ধের মনে এ-কথাগুলো সব সময়ে কি তরঙ্গ তোলে! সুনন্দাকে তিনি ভালোবাসেন—শ্রদ্ধা করেন।

এখন অশ্বিনীর ভোটের ব্যাপারে তিনি নিজের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন। বিভোরের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া দীনবন্ধুবাবু বলিলেন—ওরাই আমার সব···তুমি বাবা যে-টাকা খরচ করতে চাও, করো, আমি দেবো। তোমার জন্যই অশ্বিনীর জয় হবে!

এবং তাই হইল! পাঁচ-সাত হাজার বেশী ভোটে অশ্বিনী বিজয়লাভ করিল!

ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! বকু চক্করবর্তির মতো মানুষ···তার পর বকুর পক্ষে যারা মাতব্বর দাঁড়াইয়াছিল—ভোটারদের মাথা আছে, চোখ আছে···নল-নীল গয়-গবাক্ষের যুগও এ নয়—কাজেই বাজে ধাপ্পায় ভোটার ভুলিল না। এত পয়সা কি ভাবে ব্যয় হইতেছে দেখিয়া কে ভোট দিবে বকুকে।

সেদিনকার আনন্দ···শ্বশুর একেবারে যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন! ক'দিন ধরিয়া বাড়ীতে উৎসব চলিল···দীয়তাং ভুজ্যতাং রব।

সুনন্দাকে আসিতে হইল। শ্বশুর চিঠি লিখিয়া গাড়ী পাঠাইয়া সুনন্দাকে আনাইলেন, বলিলেন—তুমি আমার পর নও মা···অমলের গর্ভধারিণী তুমি···আমার মেয়ে তুমি···আমার বড় মেয়ে! আমার বাড়ীর কাজ···তাতে তুমি যদি না দাঁড়াও, আমি এতটুকু আনন্দ পাবো না···আমার সব মিথ্যা হবে!

আনন্দে সেদিন···সে-রাত্রি কাটিল। পরের দিন সুনন্দা বাড়ী যাইবে, সকালে ভানুর খুব অসুখ···ভেদ-বমি···এবং অবস্থা চকিতে এমন হইল যে, বুঝি ভানুর জীবন-দীপটুকু আর বাঁচাইয়া রাখা যায় না।

যে-বাড়ীতে কাল আনন্দ-উৎসবের সুর বাজিয়াছে, লোকারণ্যে শুধু আনন্দের কলরব—সে-বাড়ীতে আজ লোক গিশগিশ করিলেও কাহারো মুখে কথা নাই। ভানুর জন্য সকলের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। সুনন্দার ফেরা হইল না—ডাক্তারের পর ডাক্তার আসিয়া জমিতেছে···ঔষধের পর ঔষধ···ইন্‌জেকশন···সেবা···দু'জন নার্শ আসিয়াছে। কিন্তু সুনন্দা নার্শদের বড় পাত্তা দেয় নাই। সে নিজে রোগী লইয়া মাতিয়া আছে।

এমন অনলস সেবা—নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে যেন! যে দেখিতেছে, মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছে, যদি বাঁচে তো এই মেয়ের সেবাতেই···

তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ চলিল। চতুর্থ দিনে সকল ডাক্তাররা আশা দিলেন। কিন্তু···ভাগ্য! হঠাৎ দুপুরের পর আবার নূতন কতকগুলো উপসর্গ···

তারপর আরো দুদিন যুদ্ধ চলিল। কিন্তু মৃত্যুর হইল জয়—সন্ধ্যার সময় ভানু জন্মের মতো চোখ বুজিল।

বাড়ীতে হাহাকার···

সুনন্দাকে দু'হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধের কান্না—মাগো···যে ক'টা দিন আমি আছি, ছেড়ে যেয়ো না। একটা মেয়ে গেছে···তুমি আছো! আমার অমলকে তোমার হাতে দিয়ে সে চলে গেছে মা, তাকে মানুষ করে তুলতে হবে তোমায়। তুমি এখানে থাকো···চলে যেয়ো না।

সুনন্দা বলিল—কিন্তু···

—না, না—কোনো কিন্তু নয়। পয়সা-কড়ির কথা নয়, মা! আমার মেয়ে তুমি···মেয়ে হয়েই আমার কাছে থাকো···তুমি থাকো···নাহলে আমি···আমি···তার উপর অমল···আমার অমলের মা তুমি—তোমাকে ছাড়বো না···ছাড়তে পারবো না। ভয় করে, তাহলে অমলকেও আমি রাখতে পারবো না। যে ক'টা দিন আমি বেঁচে আছি···আমার মুখ চাও···তুমি 'না' বলো না।

ইহার পর যাওয়া চলে না। সুনন্দার যাওয়া হইল না।

আরো একমাস পরে···

শ্বশুরের মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ···নানা কল্পনা···একদিন তিনি সুনন্দাকে বলিল—একটা কথা বলবো মা?

সুনন্দা বলিল—বলুন···

শ্বশুর বলিলেন—তুমি অমলের মা—সত্যই যদি মা হয়ে বসো···শুধু অমলের নয়—আমাদের মা—এই সংসারের মা। অশ্বিনী বড় দুঃখী, আমি জানি, মা! ওর মতো শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে শুধু ভানুর মুখ চেয়ে···ভানুর উপর করুণা করে নিজের জীবনকে কি ভাবে না বঞ্চিত করেছে! স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি তা দেখিনি! শুধু ভানুর নিশ্চিন্ত আশ্রয় করে ওকে রেখেছিলুম। কিন্তু ও মানুষ, মা···যদি বলি, তোমার সঙ্গে অশ্বিনীর বিবাহ···

—না, না, না। চমকিয়া স্খলিত কণ্ঠে সুনন্দা দিল জবাব।

—কেন না, মা? আমি শুনছি মা···তোমার স্বামী মারা গেছেন···তুমি বিধবা। তবু? বিধবার বিবাহ কেন হবে না? বিশেষ তোমার বয়সী বিধবা···শাস্ত্র-ধর্ম··· কোনো দিক থেকে বাধা নেই, মা! তা ছাড়া একটা সংসারকে রক্ষা করা। আর তোমার ছেলে···তোমার ছেলেকে আমরা এমন আপন করে নিতে পারলুম, আর তোমাকে পারবো না?

—না, না, দয়া করে এ-কথা আপনি বলবেন না!

শ্বশুর বলিলেন···না বলে উপায় নেই! একটি সংসার না হলে রক্ষা পায় না! এতে অশ্বিনীও মানুষের মতো বাঁচতে পারবে—অমলও মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে। তুমি কত বড় লক্ষ্মী···তোমাকে যেদিন দেখেছি, সেইদিনই তা বুঝেছি। তোমাকে আমি···মিনতি করছি মা···তুমি এ-সংসারের ভার নাও। আমার ভার···অশ্বিনীর ভার···অমলের ভার নাও! নাহলে আমার সব যাবে! ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন!

সুনন্দা যেন কাঠ! বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে দুলিতেছে···মনে হইতেছে, এখনি বুকের আবরণ চূর্ণ করিয়া সেটা ফাটিয়া পড়িবে! তার মুখে কথা নেই!

অশ্বিনী আসিয়া উপস্থিত···উস্কোখুস্কো চেহারা···নিজের বেশভূষার দিকে কোনো দিনই তার লক্ষ্য নাই! সংসারকে বজায় রাখিতে কারবার অবলম্বন করিয়া দিন কাটানো···পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ···এ-সবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই!

কথাটা শ্বশুর নূতন করিয়া পাড়িলেন অশ্বিনীর কাছে···অশ্বিনী শুনিল···কোনো কথা বলিল না।

শ্বশুর বলিলেন—আমার যা বলবার···ওঁকে বলেছি! এখন তোমাদের হাতে শুধু আমার প্রাণ নয়···সকলের সব-কিছু নির্ভর করছে!

শ্বশুর চলিয়া গেলেন।

অশ্বিনী আর সুনন্দা—দুজনে অনেকক্ষণ নির্বাক্···

সুনন্দা প্রথমে কথা কহিল। সুনন্দা বলিল—উনি এ কি যা-তা বলছেন! তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, এ হতে পারে না।

—কেন হতে পারে না, সুনন্দা?

—না। ভানুকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না···তোমার আমার মধ্যে ভানু···তার সেই করুণ হাসি···সেই অখণ্ড বিশ্বাস! না···

অশ্বিনী বলিল—কিন্তু ভানু নিজেও তোমাকে একদিন বলেছিল, সুনন্দা···না!

অশ্বিনী বলিল—জীবনে মানুষকে অনেক কিছু জোড়াতালি দিয়ে বাঁচতে হয়! নিজের জন্য নয়···অপরের সুখের জন্য···অপরের শান্তির জন্য···অপরের মুখ চেয়ে! তা যদি মানুষ না পারে, তাহলে পৃথিবী মিথ্যা···সব মিথ্যা হয়ে যায়, সুনন্দা।

—কিন্তু···

অশ্বিনী বলিল—আমি বুঝেছি, তুমি যা বলবে। কিন্তু যদি আমি বলি, সমাজের সামনে বিবাহ হলেও আমি যদি কোনোদিন স্বামীর অধিকার না দাবী করি? দুজনে পাশাপাশি থাকবো···জীবনে সাথী হয়ে···বন্ধু হয়ে···সহায় হয়ে···এ-ছাড়া স্বামী বলে কোনো দাবী থাকবে না কখনো?

অশ্বিনীর দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিল। গভীর কণ্ঠে অশ্বিনী বলিল—আমি আর পারছি না সুনন্দা, বিশ্বাস করো—অমলের পানে চাইলে—তোমার কথা মনে হলে অপরাধের গ্লানিতে আমার মন ভরে ওঠে—আমার শুধু মনে হয়, কেন আর বাঁচা! এ-বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভালো!

বলিতে বলিতে অশ্বিনী একেবারে অশ্রুর বন্যায় ফাটিয়া পড়িল।

সুনন্দা স্থির থাকিতে পারিল না···তার মনের মধ্যে যা হইতেছিল···

অশ্বিনীর পায়ের কাছে পড়িয়া সে বলিল···আমি···আমি···আমি···তোমাকে আমি কি করে বোঝাবো···আমার···আমার মন কি চায়···কিসে আমার···শান্তি! মনকে আমি কত করে ফিরিয়ে রাখতে চাই! তবু···তবু···

সুনন্দার হাত ধরিয়া অশ্বিনী তাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল···বলিল—মিথ্যা যা-তা ভেবে মনকে উপবাসী রাখা···এ কৃচ্ছ্র-সাধন কিসের জন্য, সুনন্দা? আমরা কি মহাপাতক করেছি, যার জন্য···

বাহির হইতে অমলের কণ্ঠ শুনা গেল! অমল ডাকিল—মা···

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল···অমল কহিল—দাদু তোমাদের ডাকছেন।

অশ্বিনী চাহিল সুনন্দার পানে···বলিল—ওঁর মনের ব্যথা একটু বুঝে ত্থাখো সুনন্দা ···সকলের মঙ্গল হবে!

—মঙ্গল! তবে তাই হোক্!

আরাম-বাগ

প্রোফেশর জগৎ চাটুয্যে

রবিবার। বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরের ঘরে তক্তপোষে বসিয়া প্রোফেশর জগৎ চাটুয্যে এগজামিনের খাতা দেখিতেছেন, চায়ের পেয়ালা হাতে এক তরুণী সে-ঘরে প্রবেশ করিল।

সামনের ছোট টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিয়া তরুণী ডাকল,—জগৎদা…

জগৎ-প্রোফেশর খাতা হইতে মুখ তুলিয়া তরুণীর পানে চাহিলেন, বলিলেন,—ও, কনক!

কনক বলিল—হ্যাঁ। চা এনেছি। চা খান্। আমি আপনার জন্য মোহনভোগ নিয়ে আসি। কেমন?

দু'চোখে গভীর মমতা…জগৎ চাটুয্যে কনকের পানে চাহিলেন, কহিলেন—কেন এত হাঙ্গাম করতে গেলে, কনক? এক পেয়ালা চা হলেই হতো…তার সঙ্গে আবার মোহনভোগ কেন?

কনক হাসিল। হাসিয়া বলিল—একটু মোহনভোগ খেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। খাতা দেখা কামাই যাবে না তাতে।

জগৎ বলিল—এই হপ্তার মধ্যে সব কাগজ দেখে শেষ করা চাই। আসছে-সোমবার হলো মার্ক সাব্‌মিট্ করবার লাষ্ট দিন।

কনক কহিল—কথা না কয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে নিন্…আমি মোহনভোগের প্লেট নিয়ে আসি।

কথাটা বলিয়া কনক চলিয়া গেল…জগৎ চাহিয়া রহিল কনকের পানে, দু'চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি…

কনক চলিয়া গেলে জগতের বুকের মধ্যে বেদনার খানিকটা কালো ছায়া…জগৎ ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন, আহা…তোমার মতো এমন-মেয়েকে দেখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! দশ বৎসর বয়সে মা-বাপ মরিয়া গেল! আর বিবাহের পর একটা বৎসরও কাটিল না, কোথায় গেল সে বর…সে ঘর! ভুলিয়া শ্বশুররা একটা উদ্দেশও লইল না কোনো দিন!

কনকের ছোট জীবনের সমস্তটা ছবির মতো জগতের মনের পটে সমুদিত হইল। একদিন এই কনক…

চিন্তায় বাধা পড়িল কনকের পুনরাবির্ভাবে।

কনক আসিল। তার হাতে প্লেট। সে প্লেটে মোহনভোগ…মোহনভোগ হইতে তখনো ধোঁয়া উঠিতেছে।

কনক বলিল—ও কি, পেয়ালা এখনো মুখে স্থান্নি?

জগৎ বলিল—খাচ্ছি ভাই···

কনক বলিল—বললেন, গলায় একটু ব্যথা হয়েছে···গরম চা খাবেন।

জগৎ বলিলেন—ও···হ্যাঁ···ভুলে গিয়েছিলুম!

দু'চোখ কপালে তুলিয়া কনক বলিল—ভুলে গেছলেন! অসুখের কথা বুঝি মানুষ ভোলে কখনো? বৌদি সাধে বকাবকি করে!

জগৎ বলিলেন—হুঁ···

বলিয়া তিনি চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিলেন।

কনক বসিল তক্তাপোষের প্রান্তে। বলিল—আর ক'খানা খাতা আছে, জগৎ দা?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—খান-পঞ্চাশেক।

কনক বলিল—দেখতে কদিন লাগবে?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—রোজ সাত-আটখানা করে যদি দেখতে পারি, তাহলে সাত-সাত্তে কিম্বা সাত-আটে···ক'দিন হয়?

কথার শেষে জগৎ চাটুয্যে হাসিলেন।

কনক বলিল,—আপনি যে-রকম নিখুঁৎভাবে খাতা দেখেন, অন্য এগজামিনাররা যদি তেমনিভাবে দেখতেন, তাহলে কোনো ছেলের উপর বোধ হয় অবিচার হতো না!

হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—এত-বড় defamatory (মানহানিকর) কথা বলো না, কনক! এ-কথা এগজামিনার-সমাজে যদি প্রকাশ পায়, তাহলে তোমার নামে সিভিল-ক্রিমিনাল···দু-রকম কেশ রুজু হবে!···সব এগজামিনাররাই ঠিক ভাবে খাতা দেখেন···না হলে মাথার উপর আছেন হেড-এগজামিনার, নয়তো চেয়ারম্যান··· কোনো এগজামিনারের ভুল বা যথেচ্ছাচার করবার উপায় নেই, ভাই! এ ভুল আমাদের হবে না বলেই ইউনিভার্সিটি একেবারে কড়াক্কড়ি সব নিয়ম করে দেছে।

কনক এ-কথা শুনিল···তারপর বলিল—তোমাকে ছাত্র-বাড়ীতে যেতে হবে তো?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—হ্যাঁ···এটি রবিবারের ছাত্র। হপ্তায় একদিন করে একে পড়াতে হয়···দু'ঘণ্টা···সাতটা থেকে নটা।

কনক কহিল—এত খাটুনি কি করে তুমি খাটো জগৎদা···সত্যি! দেখে আমি অবাক্ হয়ে যাই। পাশাপাশি আরো পাঁচটা বাড়ীতে তো দেখি, বাড়ীর কর্তারা অফিস-আদালতে কাজ করেন···কাজের পর বাড়ী ফিরে কেউ বিছানায় গড়াগড়ি খান্, কেউ তাস-পাশা-দাবা খেলে সময় কাটান্। তোমাকে কখনো দেখলুম্ না, চুপচাপ বসে বা বাজে গল্প করে সময় কাটালে!

হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে কহিলেন—তোমার বৌদিকে এর জন্য ধন্যবাদ দাও। সৌখীন মানুষ···কতদিকে তাঁকে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চলতে হয়! এই দ্যাখো, মাস-কাবার হতে-না-হতে এক-কাঁড়ি বিল এসেছে···বলিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একরাশ কাগজ বাহির করিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—জুয়েলার শান্তারাম থেকে আরম্ভ করে পীরু দর্জির ব্লাউশ্-কিমোনো-পেটিকোটের বিল। সবশুদ্ধ জড়িয়ে হবে তা প্রায় পাঁচাশি টাকা!

ভাবো তো, যদি না খাটি, তাহলে ওঁর ইজ্জৎ কি করে বাঁচাবো? এ সব বিলের টাকা শোধ হবে কি উপায়ে?

এ-কথার অন্তরালে কতখানি মর্মভেদী অশান্তি···কলহ-কলরবের কি নিবিড় বিষ মিশিয়া আছে, কনকের তাহা অবিদিত নাই! সে জানে, এমন ব্যোম্-ভোলানাথের মতো জগৎদা···বিরোধ জানেন না, কলহ জানেন না···শান্তিতে বাস করিতে পারিলে নিজের সর্বস্ব যিনি অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারেন···মাঝে মাঝে অশান্তি-উৎপাতের কি পাথরে ধাক্কা খাইয়া কি ভাবেই না তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হয়! এবং এ অশান্তি-উৎপাত যা ঘটে, তা ঐ টাকা-পয়সা লইয়া! বৌদি চন্দ্রমুখী স্বাধীন জেনানা···জুনিয়র কেম্বিজ পাশ করিয়াছে। ভাবে, সকলকে একেবারে কৃতার্থ করিয়া দিয়াছে! একদা লরেটোয় পড়াশুনা করিয়াছে···তখন হইতে দু'চারিটা চ্যারিটি-শো উপলক্ষে নানা নৃত্যলীলায় ছাপার অক্ষর-অবলম্বনে কাগজে কি খ্যাতিই না প্রচারিত হইত!···তারপর ঘটনাক্রমে জগৎদার সঙ্গে চন্দ্রমুখীর শুভ-বিবাহ এবং তারপর হইতে চন্দ্রমুখীর বন্ধু-বান্ধবের নানা-তাগিদে এ-গৃহে উৎসব-অনুষ্ঠানের সমারোহ নিত্যই প্রায় লাগিয়া আছে! সে সব অনুষ্ঠানে দুনিয়ার কত জীব আসিয়া দেখা দেয়···সে উৎসবে নাই শুধু এই জগৎদার স্থান! তাঁকেই অথচ উৎসব-অনুষ্ঠানের সকল ব্যয় শিরোধার্য করিতে হয়!

সাধে শিরোধার্য করেন? এ ব্যাপার লইয়া কতবার জগৎদা ভালো কথায় চন্দ্রমুখীকে বুঝাইতে গিয়াছেন···সে বুঝানোর ফলে চন্দ্রমুখী একেবারে খড়ের আগুনের মতো দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে! সে আগুন এমন প্রচণ্ড হয় যে কনকের ভয় হয়, ঘর-সংসার বুঝি তাহাতে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইবে!

কুণ্ঠিত মনে চুপ করিয়া সে বেচারী এ অগ্নিকাণ্ড চোখে দেখে! মুখে কিছু বলিবার উপায় নাই! সে যে কতখানি অসহায়, এ-গৃহে কি করিয়া কোথা হইতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে, এ-সব কাহিনী মনের মধ্যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের মতো একেবারে ছন্দে-ভাষ্যে মুখর হইয়া ওঠে!

কনক এ-কথার জবাব দিল না, শুধু করুণ দীন নয়নে চাহিয়া রহিল জগৎ চাটুয্যের পানে।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বুঝে খরচ করবেন না তো! আমার হলো বাঁধা মাইনে। দু'চারটে টুইশনি নিতে হয়েছে শুধু ওঁর এই সব খরচ-পত্রের জন্য!···সময়-সময় এমন অশান্তি মনে জাগে···

কথা বলিয়া জগৎ চাটুয্যে নিশ্বাস ফেলিয়া উদাস নয়নে খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কনক সে উদাস নয়নের দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। ও-দৃষ্টিতে কতখানি নিরুপায়তা, নৈরাশ্যের কতখানি বেদনা···সে তাহা মর্মে-মর্মে জানে।

কিন্তু সে কি করিবে? এ গৃহে সে আশ্রিতা···প্রায় দাসীর মতো! বৌদি চন্দ্রমুখী যেভাবে ব্যবহার করে···দাসীর মতোই এখানে থাকিতে হয়! জগৎদা? জগৎদার

স্নেহে শুধু সে দাসীত্বের কথা ভুলিয়া যায়! স্নেহের আশায় তাই সে চায় এই জগৎদার পানে!

জগৎদার সঙ্গে কি-বা তার সম্পর্ক! জগৎদার পিশি বিমলা দেবী···সেই বিমলা দেবী ছিলেন কনকের জ্যাঠাইমা। কনকের মা মারা যান···কনকের বয়স তখন তিন বৎসর। বাপ নৃপনাথ কানপুরের এক মিলে চাকরি করিতেন। সামান্য বেতন। কনক ছাড়া সংসারে তাঁর আর কেহ ছিল না। বিমলা দেবী ছিলেন সাঁচ্চা মনের মানুষ। দেবরের সংসারে তিনি এই কনককে লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া ছিলেন। ভালো পাত্র দেখিয়া কনকের বিবাহ দেন। ছ মাস না যাইতে কনকের ইহ-জন্ম ব্যর্থ করিয়া তাকে ফেলিয়া স্বামী চলিয়া গেল! কনককে নৃপনাথ লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন—গান-বাজনা, লেখাপড়া···অর্থাৎ কনককে সব দিক দিয়া স্বাধীন করিয়া তুলিবেন, ইহাই ছিল তাঁর সংকল্প! এবং সে সংকল্প-সাধনে নৃপনাথের যেমন দৃষ্টি ছিল বিমলা দেবীরও ছিল তেমনি সহযোগিতা এবং সহানুভূতি! মেয়েটা যদি লেখাপড়া শেখে, তাহা হইলে ব্যর্থ জীবনকে কোনোমতে বহিতে পারিবে!

কানপুরে ভালো ভাবেই কনকের দিন কাটিতেছিল···কিন্তু কি যে দুর্গ্রহ! তার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন বিধাতা আবার অকরুণ হইলেন! নৃপনাথকে তিনি ইহ-জগৎ হইতে অপসারিত করিলেন! পিসিমা কনককে লইয়া কানপুরে থাকিতে পারিলেন না···তাই কনককে লইয়া তিনি আসিলেন কলিকাতায় দূর-সম্পর্কীয় ভাইপো এই জগতের গৃহে। আসিয়া তিনি একটি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন···কনকের আবার বিবাহ দিবেন বলিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। কিন্তু সে কথা পাকা হইবার পূর্বেই তাঁর ডাক আসিল,—তিনি চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কনক এই গৃহে রহিয়া গিয়াছে!···বিমলা দেবীর মৃত্যুর পর জগৎ চাটুয্যের সঙ্গে চন্দ্রমুখীর বিবাহ হইল···সে বিবাহের অন্তরালে ছিল একটু রোমান্স···

কিন্তু সে রোমান্সের কথা এখানে না বলিলেও আমাদের এ কাহিনী বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবে না!

চন্দ্রমুখী এ-গৃহে আসিয়া কনকের উপর সংসারের ভার দিয়াছে। মিথ্যা একটা বামুন রাখিয়া কি ফল! বামুনকে যে-টাকা মাহিনা দিতে হয়, সে টাকায় সিনেমা দেখার খরচ চলিবে! তাছাড়া···

অর্থাৎ সেকালে রাজান্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রীর যে-আসন ছিল, সঙ্গীকে-সঙ্গী দাসীকে-দাসী! কনককে চন্দ্রমুখী এ গৃহে সেই আসন দিয়াছে। তাকে দিয়া দাসীর কাজ করাইয়া লয়, আবার প্রয়োজন হইলে সখীর আসনে বসাইয়া পাঁচজনের কাছে আত্ম-প্রচার করে। চন্দ্রমুখীর সে-নীতির পরিচয় আমরা পরে বুঝিতে পারিব।

যে-কথা বলিতেছিলাম···কনক ডাকিল,—জগৎদা···

জগৎ চাহিলেন কনকের পানে···

কনক বলিল—চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ও···দেখেছো, ভুলে গিয়েছিলুম!

হাসিয়া কনক বলিল—এত ভুল হলে তো চলবে না জগৎদা!···তোমার গলায় ভোলানাথের মাদুলি পরিয়ে দিতে হবে তাহলে!

মৃদু হাস্যে জগৎ বলিলেন,—তাই দিয়ো···

তারপর জগৎ চাটুয্যে চা শেষ করিয়া মোহনভোগের প্লেট হাতে লইলেন।

কনক কহিল—বৌদি কখন ফিরবে, জানো জগৎদা?

জগৎ বলিলেন—না।

কনক বলিল—বললে, নারী-সমিতির কি মিটিং আছে···বৌদিকে তারা করেছে সেক্রেটারি।

জগৎ বলিলেন,—সেক্রেটারি করেছে, কি প্রেসিডেণ্ট করেছে, আমি জানি না। তোমার বৌদি সে-সম্বন্ধে কোনো কথা আমায় বলেন নি···আমিও জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন ভাবিনি। আমাকে দশটি টাকা চাঁদা জোগাতে হয়েছে···তাই নারী-সমিতি নামটা আমার মনের দশদিক ভরে' জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে! কথার শেষে জগৎ চাটুয্যে একটু হাসিলেন।

কনকও হাসিল। সে হাসি কি করুণ!

মোহনভোগের প্লেট খালি করিয়া জগৎ বলিলেন—এক-গ্লাস ঠাণ্ডা জল দেবে না খেতে দিদি?

কনক বলিল—গরম চায়ের পর ঠাণ্ডা জল?

জগৎ বলিলেন,—না হলে আমার চলে না, কনক···

কনক বলিল—বৌদি বারণ করে। বলে, চায়ের পরে নাকি মানুষ আবার জল খায়!

জগৎ বলিলেন,—তোমার বৌদি যেটাকে ফ্যাশন বলে মানেন, সে ফ্যাশনে আমার যদি অস্বাচ্ছন্দ্য হয়?

কনক বলিল—কোনো অসুখ করবে না তো?

জগৎ বলিলেন—না···

কনক বলিল—তাহলে আমি আনি।

গ্লাসে ভরিয়া কনক জল আনিল। জল পান করিয়া জগৎ আবার খাতা-দেখায় মনোনিবেশ করিলেন।

খোলা খড়খড়ির ধারে কনক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···

একটু দূরে মাঠের এক প্রান্তে দেখা যাইতেছিল। ছেলেরা ফুটবল খেলিতেছে। তাদের কলরব-কোলাহল···বল লইয়া দারুণ উত্তেজনা-উৎসাহ···

কনক অবিচল নেত্রে দেখিতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দু'টা বাজিল। কনকের চমক ভাঙ্গিল!

কনক ফিরিল জগতের পানে···জগৎ লাল-নীল পেন্সিল হাতে উত্তর-পত্রের গায়ে দাগ টানিতেছেন।

কনক কাছে আসিল, ডাকিল,—জগৎদা···

জগৎ বলিলেন—কেন ?

কনক বলিল—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি···শোনবার সময় হবে ?

জগৎ বলিলেন—খুব বড় কথা ?

কনক বলিল—না, কথাটা ছোট। তবে সে-কথা শোনবার আগে একখানা চিঠি আছে···পড়তে হবে।

···চিঠি !

কনক বলিল—হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু লিখেছে এলাহাবাদ থেকে···উর্মিলা। কানপুরে আমরা পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতুম। উর্মিলা লিখেছে। তুমি পড়ো সে চিঠি···

আঁচলের খুঁট খুলিয়া তার প্রান্তে বাঁধা একখানা ছোট চিঠি সে দিল জগতের হাতে। ভাঁজ খুলিয়া জগৎ চিঠি পড়িলেন। ছোট চিঠি···মেয়েলি হাতের লেখা।

চিঠিতে লেখা আছে—

ভাই কনক তোকে একটু বিরক্ত করবার জন্য এ চিঠি লিখছি। কাজের চিঠি। এ চিঠিটাকে আমার চিঠি বলে না ধরে স্রেফ বিজনেশ-লেটার বলেই মনে করিস। বিজনেশ মানে, একজনের সঙ্গে তোর একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

এঁর এক বন্ধু প্রদোষ রায় কলকাতায় যাচ্ছেন। ভদ্রলোক চিরদিন পশ্চিমে কাটিয়েছেন। কখনো এর আগে কলকাতায় যাননি। সেখানে তাঁর জানা-শোনা কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ও কেউ নেই! প্রদোৎ বাবু লোক খুব ভালো এবং বেশ পয়সাওয়ালা লোক। কলকাতায় তাঁর খুব জরুরি কাজ। আমি বলেছিলুম, তোমার জগৎদা তো প্রোফেশর-মানুষ···যদি ওখানে গিয়ে ওঠেন, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কি ? প্রদোষ বাবু হয়তো একদিন কি দুদিন তোদের ওখানে থাকবেন, তারপর যদি বেশী দিন কলকাতায় থাকতে হয়, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে নেবেন। তোর চিঠি পেলে তিনি এখান থেকে রওনা হবেন।

তুই আমার সঙ্গে লুকোচুরি করিস্‌নে! আমি তো জানি, তুই সেখানে নেহাৎ আশ্রিত। তবে লিখিস কিনা, যে তোর জগৎদা এমন মানুষ যে তাঁকে তোর মায়ের পেটের ভাই ভাবতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। তাই তোকে এ চিঠি লিখছি। জগৎদা যত ভালো হোন্‌, আমরা তো বুঝি, বাড়ীর অন্য লোকজন যদি অচেনা-অজানা কোনো ভদ্রলোকের দু একদিনের জন্য আস্তানা নেওয়া পছন্দ না করেন, তাই তোকে এ চিঠি লেখা। তুই এতটুকু লজ্জা করিস্‌নে ভাই, প্রদোষ বাবু লোকটি খুব ভালো···সে একেবারে দশ-বারো বছর বয়সের ছেলের মতো সরল! চিঠি পাবামাত্র বুঝে-সুঝে তুই সঠিক জবাব দিস্‌ কিন্তু।

আজ এই পর্যন্ত। এর পর আমার সত্যিকারের চিঠি পাবি, ভাই। আমরা ভালো আছি। ছোট খোকাটা যা হয়েছে—যাকে বলে দুরন্ত বর্গী। আটমাসের ছেলে, তার দৌরাত্ম্যের জ্বালায় ত্রাহি-মধুসূদন ডাকতে হয়।

তোর

চির-আদরের

ঊর্মি

মনোনিবেশ-সহকারে জগৎ চাটুয্যে চিঠি পড়িলেন, পড়িয়া কনকের মুখের দিকে চাহিলেন। খোলা খড়খড়ি দিয়া অস্ত-সূর্যের লাল রশ্মি আসিয়া কনকের মুখে পড়িয়াছে···তার উপর লজ্জার রক্ত রাগ···কনকের দু-গালে যেন দুটি লাল পদ্ম ফুটিয়াছে!

জগৎ বলিলেন—জবাব দেছ?

—না···

—কেন?

কনক বলিল—কি জবাব দেবো?

জগৎ বলিলেন—জবাব দেবে, হ্যাঁ, তিনি এখানে আসবেন···আমাদের তাতে কোনো অসুবিধা হবে না; সাধ্যমতো আমরা আতিথ্য-ধর্ম পালন করবো।

এ-কথায় কনকের মুখে হাসির আভাস দেখা গেল না···তার মুখ তখনো গম্ভীর!

জগৎ বুঝিলেন। বলিলেন,—তোমার বৌদি···?

দু' চোখের দৃষ্টিতে অনেকখানি দ্বিধা-সংশয় ভরিয়া কনক শুধু জগতের পানে চাহিয়া রহিল···নিরুত্তরে।

জগৎ বলিলেন,—তিনি তাঁর খেয়াল-ভরে থাকেন···ভিড়ে মিশে তিনি এমন তন্ময় থাকেন যে আমাদের কোনো বন্ধু এলেন কি গেলেন, তাতে তাঁর কিছু এসে যাবে না, কনক! তুমি লিখে দাও, পত্রপাঠ তিনি এখানে এসে উঠবেন। কবে আসবেন, শুধু আসার আগে যেন একটু খপর পাই!

প্রদোষ রায়

তিন দিন পরে টেলিগ্রাম আসিল। কনকের নামে টেলিগ্রাম। ঊর্ম্মিলার টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামে লেখা—

প্রদোষ স্টার্টিং তুফান-এক্সপ্রেশ এক্সপেক্ট এ্যাকর্ডিংলি···

(প্রদোষ তুফান-এক্সপ্রেশে রওনা হইতেছে। যথাসময়ে তার পৌছানোর আশা রাখিয়ো)

টেলিগ্রাম আসিল বেলা তখন বারোটা। জগৎ কলেজে গিয়াছেন···চন্দ্রমুখী পিয়ানোর সামনে বসিয়া একটা নাচের গৎ বাজাইতেছে। চন্দ্রমুখীর দুই সখী আসিয়াছে পত্রা আর গীতি। পত্রা সম্প্রতি ষ্টেজে নাচের আসরে দিগ্বিজয়ে নামিবে···তাই রিহার্শাল দিতে আসিয়াছে!

এ-টেলিগ্রামের সংবাদ চন্দ্রমুখী জানিতে পারিল না !

বৈকালে জগৎ আসিলে কনক তাঁকে টেলিগ্রাম দেখাইল। জগৎ বলিলেন—টাইম্ টেব্‌ল্ আছে কনক ?

কনক বলিল,—না···যা আছে, সে অনেকদিনের পুরোনো···

জগৎ বলিলেন—আজকের ইংরেজী খপরের কাগজখানা আনো তো ভাই···

কনক তখনি গেল খপরের কাগজ আনিতে।

আনিয়া রেলোয়ে টাইম-কলম খুলিয়া তাহাতে চোখ বুলাইয়া বলিল—এই যে জগৎদা, হাওড়ায় তুফান-এক্সপ্রেশ সন্ধ্যা ছটা ষোল মিনিটে পৌঁছুবে।

জগৎ বলিলেন,—ক্যালকাটা-টাইম ? না, ষ্টাণ্ডার্ড-টাইম ?

কনক বলিল—ক্যালকাটা-টাইম।

জগৎ বলিলেন—ও ! আজই সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুবেন ভদ্রলোক···

কনক বলিল—হ্যাঁ···

জগৎ বলিলেন—আমার তাহলে হাওড়ায় যাওয়া উচিত।

কনক কোনো কথা কহিল না, সাগ্রহে জগতের পানে চাহিয়া রহিল।

জগৎ বলিলেন—তুমিও যাবে আমার সঙ্গে ?

কনক বলিল—কিন্তু চিনবো কি করে···ঐ ভিড়ে···কে প্রদোষবাবু ?

জগৎ বলিলেন—হুঁ···মুস্কিল তো ! তুমি তাঁকে কখনো ছাখোনি ?

—না। চিনি না, তা চোখে দেখবো কি !

জগৎ বলিলেন—তাহলে ?

কনক বলিল,—আপনি বলুন···আমি কি জানি তার ? বাঃ !

জগৎ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন···দু চোখে তীব্র কৌতূহল ভরিয়া কনক চাহিয়া রহিল জগতের দিকে।

একটু পরে জগৎ বলিলেন—ঠিক হয়েছে। একটু আগে যদি আমরা বেরুই ? ট্রেণ প্লাটফর্মে ইন্ হবার আগে থেকে আমরা প্লাটফর্মে থাকবো। চিঠিতে তোমার বন্ধু লিখেছেন, প্রদোষবাবু বড়লোক···তাহলে ফার্ষ্ট ক্লাশে না হোক, সেকণ্ড ক্লাশে আসবেন নিশ্চয় !···সঙ্গে ট্রাঙ্ক থাকবে···তাতে লেবেল মারা···

উচ্ছ্বসিত হাস্য-তরঙ্গে দুলিয়া কনক বলিল—প্রোফেসর-মানুষ···দেখুন তো, ভেবে ঠিক উপায় বার করেছেন !

জগৎ বলিলেন—তাহলে···কটা বাজলো ? দেরী করা চলে না···আমরা বেরিয়ে পড়ি।

কনক বলিল—আপনি জলটল খান···এখনো পাঁচটা বাজেনি।

—বাজেনি ?

—না। পাঁচটা বাজতে এখনো পঁচিশ মিনিট বাকী।

জগৎ বলিলেন—যদি একখানা ট্যাক্সি নি ?

কনক বলিল—না জগৎদা, মিছিমিছি ট্যাক্সি নিয়ে অনর্থক বাজে খরচ ! এ ট্যাক্সি-

ভাড়ার জন্য আপনি হয়তো হেঁটে ক'দিন কলেজ থেকে ফিরবেন! আমরা বাসে করে যাবো জগৎদা।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তোমার বৌদি যদি তোমার মতো হিসেব করে' চলতেন, কনক···

কনক বুঝিল, বলিল—কি করবে বলো জগৎদা? বৌদি ভাবে, তাহলে তোমার ইজ্জৎ থাকবে না···

হাসিয়া জগৎ বলিলেন—দেনার দায়ে যদি আদালতে দাঁড়াতে হয়, তাহলে এ ইজ্জৎ কোথায় থাকবে?

কনক বলিল—এ সব কথা ভেবে মন খারাপ করো না জগৎদা। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।···আজ আমি কী করেছি, জানো?

জগৎ বলিলেন—কি?

কনক বলিল—বৌদির দুজন বন্ধু এসেছিল শশাঙ্কবাবু আর গীতি। বৌদি বললে, আইস-ক্রীম করো কনক···খরমুজার আইস-ক্রীম করেছি···তোমার জন্যও করেছি জগৎদা···

জগৎ বলিলেন—তোমার?

কনক বলিল—আমি আইস-ক্রীম খাইনা।

জগৎ নিরুত্তরে চাহিয়া রহিলেন কনকের পানে···অবিচল দৃষ্টি···

সে দৃষ্টি কতখানি মর্মভেদী···কনক মর্মে-মর্মে তাহা উপলব্ধি করিল। করিয়া কনক বলিল,—সত্যি জগৎদা, আমি মিথ্যা বলিনি।

জগৎ বলিলেন—তাহলে আমিও একটা সত্যি কথা বলছি, শোনো কনক···সে কথা, তুমি না খেলে আমিও আইস-ক্রীম খাবো না।

কনকের বুকের কোথায় এ-কথা যে তরঙ্গ তুলিল···কনকের বুকের মধ্যটা তাহাতে যেন ভাঙ্গিয়া গেল! একটা উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া কনক বলিল—আচ্ছা, আমি খাবো। আমার জন্য একটু রেখো তুমি···প্রসাদ!

কনক চলিয়া যাইতেছিল, জগৎ ডাকিলেন—কনক···

কনক দাঁড়াইল।

জগৎ বলিলেন—তোমার বৌদি?

কনক বলিল—বললে, কোন্ বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি···রিহার্শাল আছে।

—কার বাড়ী, বলেছে?

কনক বলিল—হ্যাঁ। বললে, যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি কোথায় গেছি, বলো, বেলা চক্রবর্তীর বাড়ী।

জগৎ কোনো কথা বলিলেন না। কনক চলিয়া গেল।

বেলা পাঁচটা।

দুজনে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, একজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত।

জগৎ বলিলেন—সুরেশ! কি খপর?

ভদ্রলোকের নাম সুরেশ।

সুরেশ বলিল—একবার আমার ওখানে যেতে হবে দাদা। আমার জামাই…ঐ রাস্কেল পাঁচু…জানো তো, দেনা করে বেলার বিয়ে দিয়েছি…রাস্কেলরা যা চেয়েছিল…মায়, টেব্‌ল-হার্মোনিয়ম পর্যন্ত দিয়েছি। তা হতভাগা জামাইটা বয়ে গেছে…লেকের ওদিকে ক্লাব করেছে…ক'জন ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে থিয়েটারের দল খুলেছে। তাদের প্লে হবে, তার রিহার্শাল বসছে। বেলাকে সকলের পরিচর্যা করতে হয়। তাতে সে কিছু বলেনি। মুখ বুজে সকলকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে সেবা-পরিচর্যা করছিল। তারপর করেছে কি জানো দাদা? মেয়ের দামী বেনারসী শাড়ীটাড়ী নিয়ে গেছে সেই থিয়েটারে। ওর ডাকিনী-যোগিনীদের পরিয়ে তাদের রাণী সাজাবে, নর্তকী সাজাবে। মেয়েকে আমি শাসন করে দিছি…তবু মেয়ে শাড়ী দেছে। আজ গহনা নিয়ে টানাটানি…মেয়ে দেয়নি। তাকে প্রহার করেছে। তারপর জামাই ক্লাবে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, গহনা চাইই—নাহলে মেয়েকে ক্লীয়ার-আউটের নোটিশ দিয়ে গেছে।

শুনিয়া জগৎ চাটুয্যে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন,—বলো কি সুরেশ!

সুরেশ বলিল—এর একটি বর্ণ অতিরঞ্জিত নয়, দাদা…

জগৎ বলিলেন—তারপর?

সুরেশ বলিল—তারপর জামাই বেরিয়ে গেলে আমার মেয়ে তার গহনাগাঁটি নিয়ে আমার এখানে এসেছে। মেয়ে এসেছে বেলা তখন দুটো। এখন জামাই বাবাজী রুদ্র-মূর্তিতে এসে হাজির! জুলুম…দাও গহনা। আমরা বলেছি, দেবে না। জামাই শাসিয়ে গেছেন, তিনি থানায় চললেন চুরির নালিশ করতে। আমি গিয়ে মেয়ের সঙ্গে ষড় করে দুজনে মিলে তাঁর ফ্যামিলি-জুয়েলারি চুরি করে এনেছি। যদি একটা কেলেঙ্কারী করে? তাই আমি এসেছি।

জগৎ দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন…চোখের সামনে দেখিলেন বিস্তীর্ণ অন্ধকার। সে-অন্ধকারের বুকে আলোর চিহ্ন নাই!

সুরেশ ডাকিল,—দাদা…

এ স্বরে নাড়া পাইয়া জগতের চিন্তা ও মৌনতার পাথর যেন মনের উপর হইতে সরিয়া গেল…জগৎ যেন চেতনা পাইলেন! চেতনা পাইয়া তিনি বলিলেন,—কিন্তু আমি যে হাওড়া ষ্টেশনে যাচ্ছি সুরেশ…একটি ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে। আমার এখানেই আসছেন…এলাহাবাদ থেকে আসছেন। টেলিগ্রাফ করে' জানিয়েছেন। Expect accordingly….

অকূল সমুদ্রের মাঝখানে অবলম্বনের আভাস মুছিয়া যায় দেখিয়া সুরেশ আকুল হইল।

সে বলিল,—তাহলে…

কনক এতক্ষণ ছিল পর্দার আড়ালে…ও-দিকে। সে বাহির হইয়া আসিল, বলিল —আমি একলাই যাই, জগৎদা। হাওড়া ষ্টেশন তো…

জগতের দু' চোখে প্রচুর বিস্ময়…জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ঐ ভিড়ের মধ্যে তুমি একলা যাবে?

মৃদু হাস্যে কনক বলিল—কেন পারবো না? হাওড়া ষ্টেশন তো চিনি। কোন্ প্লাটফর্মে গাড়ী আসবে, দেখে নেবো। এত আগে যাচ্ছি…

জগৎ বলিলেন—পারবে?

—পারবো, জগৎদা…কোনো ভয় নেই।

জগৎ বলিলেন—সাবধানে যেয়ো কিন্তু। আচ্ছা চলো, তোমায় বাসে তুলে দি… দিয়ে আমি সুরেশের সঙ্গে যাই। এসো কনক…

তিনজনে বাহির হইলেন।

বালিগঞ্জ রেলোয়ে-ষ্টেশনের পশ্চিম-দিকে যে-কলোনি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই কলোনিতে জগৎ চাটুয্যের বাড়ী।…বাড়ীর সঙ্গে বাগান। চন্দ্রমুখী ফ্যাশন করিয়া বাড়ীর নাম রাখিয়াছে আরাম-বাগ।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তিনজনে আসিলেন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে।

কনককে বাসে তুলিয়া উপদেশ দিয়া জগৎ সুরেশের পানে চাহিলেন, কহিলেন— চলো সুরেশ…

সুরেশ বলিল—এসো…

দুজনে চলিলেন।

সুরেশ বলিল—আমার মেয়ে বেলা। কি কুক্ষণে শুধু পয়সা দেখে ও-ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলুম! একদিনের জন্য মেয়েটা সুখী হলো না!

জগৎ বলিলেন—বিবাহ আমাদের দেশে আজ দারুণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোথায় সে প্রীতি-ভালোবাসা! কোথায় বা দরদ-সহানুভূতি! Love-marriage…(ভালোবাসিয়া বিবাহ) তাতেও দু'দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অহি-নকুলের সম্পর্ক হয়ে উঠছে!…কেন হবে না? নকলিয়ানার বিষে আমরা জর্জরিত হয়ে গেলুম! লেখাপড়া শিখেও মনকে বশে রাখতে পারি না আমরা, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে!

সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরেশ বলিল—ভাগ্য!

জগৎ বলিলেন—না সুরেশ…ভাগ্য নয়, এ কর্মফল! যে যেমন কাজ করবে, তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে বৈ কি!

ওদিকে বাস গিয়া হাওড়া-ষ্টেশনের সামনে থামিল।

বাস থামিলে কনক নামিয়া ষ্টেশনে ঢুকিল; তারপর এনকোয়ারি-অফিসে সন্ধান লইয়া সঠিক প্লাটফর্মে…

সিগনাল পড়িয়াছে। ট্রেণ আসিতে বিলম্ব নাই। কুলির দল সতর্ক হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে পশ্চিম-দিকে চাহিতেছে। এবং যথাসময়ে তুফান-এক্সপ্রেস আসিয়া প্লাটফর্মে থামিল।

প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেণে যত লোক আসিয়াছে, তার চেয়ে বেশী লোক আসিয়াছে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে···

ফার্ষ্ট-ক্লাশ···সেকণ্ড-ক্লাশ কামরা···এ দুই কামরাতেও যাত্রী। যে-সব যাত্রী পত্নী-পুত্রসহ আসিয়াছে, তাহাদের চকিত-দৃষ্টিপাতে ত্যাগ করিয়া কনকের দু চোখের সন্ধানী দৃষ্টি অজানা একা-বাঙালী যাত্রীর উদ্দেশে আকুল অধীর !···কৈ সে যাত্রী ?

ভিড়ের ধাক্কা হইতে নিজেকে যাথাসম্ভব বাঁচাইয়া নিরাপদ ঠাই বাছিয়া কনক দাঁড়াইয়াছিল। প্লাটফর্ম জুড়িয়া হাস্য-কলরবের তরঙ্গ উত্তাল হইয়া স্পর্শ দিয়া চলিয়াছে···সে হাস্য-কলরব কনকের কাণে প্রবেশ করিতেছে না। তার সকল মন দু' চোখের দৃষ্টিতে সংবদ্ধ হইয়া শুধু এক অপরিচিতের সন্ধান করিতেছে। কনকের বহিশ্চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে !

চেতনা ফিরিতে দেখে, প্লাটফর্ম প্রায় খালি। গাড়ীগুলিকে বহিয়া কোলিশন্-দুর্বিপাক বাঁচাইয়া এক্সপ্রেসের এঞ্জিন নিরাপদে এখানে পৌছাইয়া এখন কর্তব্য-শেষে সদর্প-গর্জনে ভোঁশ-ভোঁশ করিতে করিতে ও-পাশের লাইন ধরিয়া নিজের বিশ্রাম-নীড়ে চলিয়া যাইতেছে···গার্ডের গাড়ীর কাছে কটা লগেজ পড়িয়া আছে এবং দু'চারিজন যাত্রী হুঁশিয়ার ভাবে সে-লগেজের স্তূপ হইতে নিজেদের লগেজ বাছিয়া লইতেছে।

ব্রেকের সামনে এই যাত্রীদের উপর কনকের দৃষ্টি পড়িল। তিনজন। তাদের মধ্যে দুজন বাঙালী ; একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বাঙালী দুজনের মধ্যে একজনের বয়স হইয়াছে···মাথায় টাক···ময়লা রঙ। মন বলিল, নাম যার প্রদোষ, ও-চেহারা তার হইতে পারে না ! আর-একজন বাঙালী ? গায়ে কোট···কোঁচানো ধুতি···পায়ে ফিতা-বাঁধা জুতা···চেহারা ভদ্রলোকের মতো। বয়স···?

বয়স ঠিক করিতে পারিল না। মন বলিল, ঐ ভদ্রলোক হয়তো প্রদোষ ! চেহারায়-পোষাকে কলিকাতার ফ্যাশন্ নাই।

ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে কে ডাকিল,—বালিগঞ্জ থেকে এসেছেন ?

বালিগঞ্জ !

কনক ফিরিল। পিছনে সিল্কের পাঞ্জাবি-গায়ে এক তরুণ ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে কুলি। কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক, বিছানাপত্র···

ট্রাঙ্কের গায়ে লেবেলের উপর চোখ পড়িল। ইংরেজী অক্ষর P. Roy···

সলজ্জ মৃদুভাষে কনক কহিল—আপনি এলাহাবাদ থেকে আসছেন ?

মৃদু হাস্যে তরুণ বলিল—ও···হ্যাঁ, আমার নাম প্রদোষ রায়।

কনকের সর্ব-শরীর বহিয়া বিদ্যুতের চমক ! সে কোনো জবাব দিল না।

প্রদোষ বলিল—আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন ! কখনো দেখিনি আপনাকে···অথচ কি করে চিনলুম !

কনক তাই ভাবিতেছিল ।

প্রদোষ বলিল—আপনার একখানি ফটোগ্রাফ দেখেছি বৌদির কাছে। বৌদির নাম উর্মিলা দেবী। আসবার সময় বৌদি বললে, তুমি এলাহাবাদ ছাড়লে একখানা টেলিগ্রাম করে দেবো···তাকে আসতে বলবো ষ্টেশনে। আমি বললুম, আমাকে চেনেন না, জানেন না···তাছাড়া বাঙলা দেশে বাঙালী-ঘরের মেয়ে আসবেন ষ্টেশনে অজানা লোককে রিশিভ করতে ! তাতে বৌদি বললেন, তুমি তাকে জানো না ঠাকুরপো···সে ভারী মিশুক। তার উপর কলকাতার আবহাওয়া এমন হয়েছে যে সেখানকার মেয়েদের আর জুজুর ভয় মোটে নেই !

চমৎকার কথা···বলিবার ভঙ্গীটুকুও চমৎকার !

কনক নিরুত্তর থাকিতে পারিল না। কনক বলিল—জগৎদা বললেন, আপনি এখানে নতুন আসছেন···কলকাতায় কখনো আসেন নি। আপনাকে নিতে আসতে দুজনেই বেরিয়ে ছিলুম। পথ থেকে তাঁকে একটা খুব জরুরি কাজে যেতে হলো···অথচ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমি ফিরে যেতে পারলুম না। ভয়ে-ভয়ে এসেছি···ভাবিনি, এ-ভিড়ে আপনাকে পাবো !

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—আপনার সে ভাবনা অন্যায় হয়নি। কারণ, আপনি আমাকে দেখতে পাননি···আমিই আপনাকে দেখেছি। আসুন···

—হ্যাঁ, চলুন···

কুলির দিকে চাহিয়া প্রদোষ কহিল—চলো···

চলিতে চলিতে প্রদোষ বলিল—একটা কথা আছে···

কনক চাহিল প্রদোষের পানে···

প্রদোষ বলিল—আপনাদের ওখানে গিয়ে ওঠবার কথা ছিল। কিন্তু তা আর যাবো না ।

এ-কথায় কনকের মনের কোণে মৃদু আঘাত বাজিল ।

প্রদোষ কহিল—বেরুবার আগে আমার এক পিসতুতো ভাই একটি হোটেলের সন্ধান দেছে।···তার এক বন্ধু সে হোটেলের মালিক। সেইখানে গিয়ে উঠবো। তাদের ওখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি তারা ঘর-টর ঠিক করে রাখবে। সে হোটেল হলো পার্ক সার্কাসে। হোটেলের নাম ওরিয়েণ্ট।

কনকের বুকের মধ্যে কে যেন একখানা পাথর চাপিয়া ধরিল···নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যাইবে !

প্রদোষ বলিল—বৌদির কাছে সব শুনলুম। দয়া করে দুঃখ করবেন না আপনি। মানে, জগৎবাবু খুব ভালো লোক কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই···জানা-শোনাও নেই। আপনি উর্মিলা বৌদির বন্ধু···কাজেই আপনি অজানা নন···আপনাকে সহজেই বন্ধু বলে শিরোধার্য্য করা চলে। কিন্তু জগৎবাবু? তাই ভেবে···তাছাড়া জানা-

হোটেল পাচ্ছি···অনেক দিন থাকতে হবে তো। তাই গেলুম না। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। উর্মিলা বৌদি কি রকম impulsive জানেন তো। যেমন শোনা কলকাতায় আসছি, অমনি তাঁর কোথায় কে আত্মীয়-বন্ধু আছেন··· আমাকে তাঁদের চার্জে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চান্···পাছে আমার কোনো অসুবিধা হয়, এই ভেবে তিনি আকুল! কলকাতায় না এলেও তিনি ভাবেন, আমি একেবারে শিশু আছি! এখানে এসে দাঁড়াবামাত্র ছেলে-ধরায় আমায় ধরে নিয়ে যাবে!

কথার শেষে প্রদোষ হাসিল। প্রাণের অকপট হাসি!

কনক নিরুত্তরে চলিতেছিল।

দুজনে বাহিরে আসিল।

সামনে ট্যাক্সি···

প্রদোষ কহিল—ট্যাক্সি নি। আপনাকে পৌছে দিয়ে জগৎবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হোটেলে যাবো। আপনাদের বাড়ী হয়ে বালিগঞ্জ রেলোয়ে-ষ্টেশন থেকে···আমার এ হোটেল কত দূরে হবে?

কনক কহিল,—বেশী দূরে নয়। তবে বালিগঞ্জে যেতে পথে আপনার হোটেল পড়বে।

প্রদোষ কহিল,—ও···তা হোক্, তাতে কিছু এসে যাবে না।

কনক কোনো কথা কহিল না···যে-আগ্রহ লইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল, সে-আগ্রহ বাণে-বেঁধা পাখীর মতো যেন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে!

মনকে লইয়া সে বিব্রত··কেবলি বুঝাইতে চায়, কেন···কেন তোর এত উচ্ছ্বাস? আর কেনই বা ও-কথায় তোর সে উচ্ছ্বাস ভাঙ্গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতে চায়?

ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া প্রদোষ কহিল—উঠুন···

এ-কথায় কনকের যেন ঘুম ভাঙ্গিল! এতক্ষণ সে যেন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল!

ট্যাক্সি···দরজা খুলিয়া প্রদোষ তাকে বলিতেছে—উঠুন···

কনক বলিল—আমি বাসে ফিরবো। আপনি যখন হোটেলেই যাবেন···

প্রদোষ বলিল—হোটেলে যাবার আগে আপনাদের ওখানে যেতেই হবে। যাওয়া আমার কর্তব্য। জগৎবাবু আমার জন্য আশা করে আছেন! ওখানে গিয়ে উঠবো বলে খপর দিয়ে তাঁকে ব্যস্ত করে শেষে না যাওয়া—এর জন্য ক্ষমা না চাইলে দারুণ অভদ্রতা হবে!

এ-কথার কি উত্তর দিবে, কনক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

প্রদোষ কহিল—উঠুন···না, আপ্-আগাড়ি উঠিয়ে বলে খানিক লৌকিকতার অভিনয় চলবে!

কনক তবু উঠিল না···উঠিতে পারিল না। কে যেন তার পা দুটাকে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

প্রদোষ বলিল—সে-অভিনয়ে আমার কিন্তু আপত্তি আছে···যেহেতু খিদে যেমন

পেয়েছে, তেমনি তেষ্টা। আপনার ওখানে গিয়ে চটপট যদি এক-পেয়ালা চা পাই, তাহলে আমার আরামের সীমা থাকবে না।

এ-কথায় কনকের পায়ের বাঁধন খুলিয়া গেল। কনক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। কনক বসিলে প্রদোষ উঠিয়া তার পাশে বসিল···

ট্যাক্সি চলিল।

হাওড়ার পুল···

প্রদোষ কহিল—মা-গঙ্গা···কি করে মাকে বেঁধে রেখেছে! এর চেয়ে আমাদের ওখানে গঙ্গা-যমুনা···তাঁদের দেহে প্রাণ আছে···প্রাণের সাড়া পাই, সত্যি। বালির চড়া হলেও মানুষের তৈরী শৃঙ্খল নয়!

সবুজ দ্বীপ

হাওড়ার পুল পার হইয়া এপারে কলিকাতা। দুজনের কাহারো মুখে কথা নাই।

জেনারেল পোষ্ট অফিস, লাল-দীঘি, গবর্ণমেণ্ট হাউস পার হইয়া ট্যাক্সি আসিল মাঠের পথে!

প্রদোষ বলিল—বাঃ···বাড়ী-ঘরের আড়ালে খোলা মাঠ দেখে কি আরাম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, পার্ক-সার্কাসটা কোথায়?

কনক বলিল—সে হলো সার্কুলার রোডের পুব-দিকে···

প্রদোষ বলিল—পথে পার্ক-সার্কাস্ পড়বে আগে, বললেন না?

কনক বলিল—হ্যাঁ···

প্রদোষ বলিল—তাহলে এক কাজ করলে হয়!

কনক সাগ্রহ দৃষ্টিতে প্রদোষের পানে চাহিল।

প্রদোষ বলিল—পার্ক-সার্কাসের হোটেলে মালগুলো রাখি। কেন না, গন্ধমাদন-ঘাড়ে জগৎবাবুর ওখানে গিয়ে তার পর আবার সে গন্ধমাদন মাথায় নিয়ে পার্ক-সার্কাসে আসা···তাই ভাবছি, মালগুলো হোটেলে নামিয়ে গেলে দু'দণ্ড আপনাদের ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাবে, কি বলেন?

কনক বলিল—বেশ হবে।

ট্যাক্সি-ওয়ালাকে কনক বলিল—পার্ক-সার্কাস চলো···

ট্যাক্সি তখন মাঠ পার হইয়া পার্ক ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া চলিল···সোজা পূর্ব-মুখে।

প্রদোষ বলিল—সিটি অফ্ প্যালেসেশ বলে কলকাতাকে···সত্যি তাই। শুধু বড় বড় বাড়ী আর বাড়ী···আমেরিকাকে যেন ধরে এনেছে এই কলকাতা! উঃ, এক-একটা বাড়ী বোধ হয় সাত-তলা আট-তলা!

কনক কোনো কথা বলিল না।

প্রদোষ বলিল—বৌদির সঙ্গে···মানে, উর্মিলা বৌদির সঙ্গে আপনার বোধ হয় বহুকাল দেখা হয়নি?

কনক বলিল—না।

প্রদোষ বলিল—আমি বলে এসেছি, কলকাতায় আমি একটি আস্তানা ঠিক করে বসলে তাঁকে ধরে আনবো এখানে। বেশ হবে, না?

কনক বলিল—হ্যাঁ।

সেমিট্রির পাশ দিয়া ট্যাক্সি পূর্ব-মুখী পথ ধরিল।

কনক বলিল—আপনার হোটেলের ঠিকানা জানেন? কোন্ রাস্তায়, কত নম্বর বাড়ী?

প্রদোষ বলিল—রাস্তার নাম আমীর-আলি এভিনিউ···

—ও···কনক ড্রাইভারকে বলিল—আমীর-আলি এভিনিউ···

তার পর সে চাহিল প্রদোষের পানে, বলিল—ও রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

আমীর-আলি এভিনিউয়ে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিবার পর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইল না···ডান দিকে চার-তলা একটা বাড়ী। বাড়ীর মাথায় লাল-নীল বাল্‌বের আলোয় ইংরেজী হরফ চোখ বুজিয়া চোখ খুলিয়া পথিকদের কাছে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে···T H E O R I E N T···

কনক বলিল—ডান দিকে ঐ চার-তলা বাড়ী···

প্রদোষ বলিল—ঠিক! ভাগ্যে আপনি ছিলেন গাইড্···নাহলে এত বড় সহরে কোথায় পার্ক-সার্কাস আর কোথায় এই ওরিয়েণ্ট···সাত দিন সাত রাত ঘুরলেও আমি আন্দাজ করতে পারতুম না!

হাসিয়া কনক বলিল—পথে যাকে জিজ্ঞাসা করতেন, সেই বলে দিত।

প্রদোষ বলিল—তা বটে! বোধ হয়, কলম্বাস এমনি জিজ্ঞাসা করতে-করতে গিয়ে এ্যামেরিকা আবিষ্কার করেছিল! আপনি তাহলে আমায় কলম্বাস হতে দিলেন না!

ওরিয়েণ্টের সামনে ট্যাক্সি থামানো হইল। হোটেলের বেয়ারা-খানশামা ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। প্রদোষ বলিল—মাল নামাও···

খানশামা মালপত্র নামাইতে লাগিল···প্রদোষ চাহিল কনকের পানে, কহিল—নামবেন না? ঘরটা দেখে যেতেন···

কনক নামিল।

এবং দুজনে আসিল হোটেলের অফিস-ঘরে। প্রশ্ন করিতে সন্ধান মিলিল··· টেলিগ্রাম আসিয়াছে এবং টেলিগ্রাম-মাফিক প্রদোষের জন্য তিন-তলার দক্ষিণ-দিকে একটি ভালো কামরা বুক্ করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রদোষ বলিল—দয়া করে মালপত্রগুলো সেখানে তুলিয়ে দিন। আমি ঘুরে আসছি। আমার ফিরতে দু-তিন ঘণ্টা লাগবে। রাত্রে বেশী কিছু খাবো না। শুধু দুটি ভাত আর মাছের ঝোল। মানে, লঘু আহার! বুঝলেন?

তারপর কনকের পানে চাহিয়া বলিল—আপনাকে এখন আর তিন-তলায় তুলে কষ্ট দিতে চাই না। আসুন, এবার গিয়ে জগৎ বাবুর সঙ্গে আলাপ করবো এবং আপনাকেও নামিয়ে দিয়ে আসবো।

দুজনে আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিল। প্রদোষ বলিল—লীড্ মী অন্ নাউ প্লীজ্… (আমায় এবার লইয়া চলুন)।

আমীর আলি এভেনিউ ধরিয়া গাড়ী এবার চলিল সোজা দক্ষিণ দিকে…

বালিগঞ্জের পুরানো রাস্তা ধরিয়া গাড়ী আসিল রাসবিহারী এভেনিউর মোড়ে…

প্রদোষ বলিল—কলকাতা-সহর আকারে এত বড়…আমার আইডিয়া ছিল না! তার উপব এত-বড় সহরের সবটুকু শুধু ঘরবাড়ীতে ভরা! মনে হয়, সারা পৃথিবীর লোক যেন এখানে এসে আস্তানা নেছে। ওঃ…এ ভিড়ে আপনারা হারিয়ে না গিয়ে ঠিক থাকেন কি করে? বাড়ী থেকে বেরিয়ে আবার ঠিক নিজের বাড়ীতে ফেরেন কি করে, ভেবে আমার তাক্ লেগে যাচ্ছে!

কথাগুলা সরল প্রাণের অকপট উচ্ছ্বাস! কনকের ভালো লাগিল। হাসিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে আবার তাহলে এসে আপনাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে যেতে হবে, দেখছি।

প্রদোষ বলিল,—দিলে নিশ্চিন্ত হবো। না হলে ট্যাক্সিওলা যদি অন্য কোথাও নিয়ে যায়, আমি মোটে বুঝতে পারবো না!

কনক বলিল—যদি সত্যি মনে হয় আপনি হারিয়ে যাবেন, একা ফিরতে পারবেন না…তাহলে পৌছে দিয়েই যাবো!

প্রদোষ বলিল—এখানে আপনাকেই শুধু জানি…না হলে this world is strange to me (এ পৃথিবী আমার অজ্ঞাত)…

রাসবিহারী এভেনিউর মোড় ছাড়াইয়া খানিকটা অগ্রসর হইবামাত্র বাঁয়ে পথ বন্ধ। দুখানা মোটরে ধাক্কা লাগিয়া সামনে মস্ত ভিড়। যেন পর্বতের আড়াল উঠিয়াছে!

প্রদোষের ট্যাক্সি থামিল।

সকলে ছুটিয়া ট্যাক্সির কাছে আসিল, বলিল—দয়া করে গাড়ীটা যদি ছেড়ে দেন মশায়! দুজন লোক ভয়ানক জখম হয়েছে। মোটরে-মোটরে কোলিশন হয়েছে। এ্যাম্বুলান্স আসতে দেরী হবে তো…তার মানে, যদি আপনাদের অসুবিধা না হয়! ভারী আর্জেন্ট ম্যাটার!

শুনিয়া প্রদোষ স্তম্ভিত! নিমেষের জন্য…পরক্ষণে বলিল,—বেশ, নিন আপনারা গাড়ী।

বলিয়া সে কনকের পানে চাহিল। কনককে কিছু বলিতে হইল না। কনক তখনি গাড়ী হইতে নামিল। প্রদোষ নামিয়া মীটার দেখিয়া ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া চুকাইয়া দিল

দিয়া কনকের পানে চাহিয়া বলিল,—আমরা আর-একখানা গাড়ী নি—কি বলেন?

কনক বলিল,—বেশ।

গাড়ী ছাড়িয়া দু'জনে উত্তর-মুখে চলিল ট্যাক্সির সন্ধানে।

প্রদোষ বলিল—আপনাদের বাড়ী এখানে থেকে কত দূর?

—দু মাইল হবে।

—কোন্ দিকে?

—বালিগঞ্জ ষ্টেশন। তার কাছে।

দুজনে প্রায় মোড়ের কাছাকাছি আসিয়াছে, সহসা রেডিয়োর গানের সমারোহে ফুট-পাথে ভীড়।

বাড়ীর দ্বারে আলোর হরফে লেখা—গ্রীন্ আইল্ (Green Isle)।

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—হোটেল?

কনক বলিল,—শুনেছি, সৌখীন লোকদের মজলিশ।

—তেষ্টায় আমার গলা কাঠ! একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক...মানে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে!

কনকের কি আপত্তি! ভদ্রলোক পিপাসায় আকুল···কনক বলিল,—চলুন।

দুজনে ভিতরে আসিল।

ভিতরে যেন অলকা-পুরী! ক্যাশানোভার আদর্শে চতুর একজন বাঙালী ভদ্রলোক লেকের কাছে এই সবুজ দ্বীপ রচনা করিয়াছেন। নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ পান-ভোজনের উৎসব-মণ্ডপ যেন!

দেখিয়া প্রদোষ অবাক! কহিল,—Merry-makers··· (প্রমোদ-পিয়াসী)! বিলেতের গল্প শুনি···এখানে বিলেত গড়ে তুলেছে! আপনি কালিদাসের কবিতা পড়েছেন? কালিদাস লিখে গেছেন—স্বর্গের এক-টুকরো ভেঙ্গে এনে এখানে এই মর্ত্ত্যলোকে বসিয়েছে। কালিদাসের কি দূরদৃষ্টিই ছিল, ভাবুন! ভদ্রলোক মানস-চক্ষে আজকের কলকাতার এ প্রগতি আভাসে দেখেছিলেন···তাই লিখেছিলেন, স্বর্গের অর্থাৎ বিলেতের এক-টুকরো অর্থাৎ এই প্রমত্ত আমোদ-প্রমোদ দিয়ে এই মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, বেকার-সমস্যা এবং দারিদ্র্য-অভাব-ক্লিষ্ট বাঙলা দেশে স্বর্গ এনে বসানো হয়েছে!···চারদিকে বড় বড় বাড়ী, আর সন্ধ্যার পর এই দিলখোলা আমোদ-প্রমোদ···এতেও লোকে বলে, বাঙালীর পকেটে পয়সা নেই!

কনক কোনো কথা বলিল না···তার দু' চোখে বিস্মিত দৃষ্টি!

প্রদোষ বলিল—এখানে বসে কোল্ড-ড্রিঙ্ক চাইলে বোধ হয় গ্রাহ্য করবে না··· তাড়িয়ে দেবে। তবু দেখা যাক, যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ!

ধোপদোস্ত পোষাক-পরা পাগড়ী-মাথায় খানশামা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

প্রদোষ বলিল—লীমন-স্কোয়াশ···দো' গ্লাস···

বলিয়া কনককে ইঙ্গিত করিয়া একটা গোল-টেবিলের সামনে চেয়ার টানিয়া বসাইল। কনক বসিলে প্রদোষ একখানা চেয়ারে বসিল।

বেয়ারা লিমন-স্কোয়াশ আনিল, কহিল—ঔর কুছ, সাব?

প্রদোষ বলিল—কি দিতে চাও?

বেয়ারা বলিল—আইশ-ক্রীম···এগ্···টোষ্ট? গোস্? পুডিং? পেগ্?

প্রদোষ চাহিল কনকের পানে, কহিল—কি বলবো? আইস-ক্রীম? না, পুডিং?

কনক বলিল—আমি খাবো না।

প্রদোষ কনকের পানে চাহিল। তার পর বেয়ারার পানে চাহিয়া কহিল—থাক্ !

বেয়ারা চলিয়া গেল।

কনকের দিকে গ্লাস আগাইয়া দিয়া প্রদোষ কহিল,—খান···

কনক যেন কাঁটা হইয়া উঠিল! কহিল—আমি খাবো না।

—খাবেন না?

—না।

—কেন?

—আমাকে খেতে নেই।

···প্রদোষের মনে পড়িল, ঠিক! উর্মিলার মুখে শুনিয়াছে, এই বয়সেই কনকের জীবনের খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে! তার বুকে আলোর যে-দীপ্তি···এ-কথা মনে হইবামাত্র একরাশ অন্ধকার আসিয়া সে-দীপ্তি ঢাকিয়া দিল···

কনকের পানে সে চাহিল,—চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল!···সে এখনো ছেলেখেলা লইয়া তন্ময়···সামনে জীবনের দেনা-পাওনা সব বাকী! আর কনক? তার চেয়ে বয়সে কত ছোট···অথচ দেনা-পাওনা শেষ করিয়া জীবনের পাট শেষ করিয়া যেন ওপারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! বেচারী কনক!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রদোষ বলিল—থাক্, আমিও খাবো না।

কনক চমকিয়া উঠিল! কহিল,—সে কি! তাছাড়া আমার তেষ্টা পায়নি··· আপনার তেষ্টা পেয়েছে···

প্রদোষ কহিল—না। সামান্য তেষ্টার কষ্টটুকু সহ্য করতে পারবো না···মানুষ হয়ে জন্মেছি?···আর আপনি? তারপর কি যে বলিবে, কথা বাধিয়া গেল। 'আপনি' কথার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর হাসি-গান কথা-আনন্দ···একেবারে কণ্ঠনলীতে ভিড় করিয়া থামিয়া রহিল!

প্রদোষ বলিল—দাম দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্!···আপনাকে কাঁহাতক্ ল্যাংবোট করে ঘুরবো! বাড়ী থেকে কখন আপনি বেরিয়েছেন! আমার অন্যায়···আপনাকে এ-রকম করে ষ্টেশনে আনা রীতিমত ক্রুয়েল (নিষ্ঠুর)···

কনক তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, সত্যি তা নয়। ষ্টেশনে যেতে আমার এতটুকু কষ্ট হয়নি!

প্রদোষ বলিল—তাহলে ওঠা যাক।

কনক বলিল—আপনি লিমন-স্কোয়াশ খান, নাহলে আমি উঠবো না। তেষ্টা পেয়েছে, বললেন···

প্রদোষ বলিল—জীবনে মানুষ কত বড়-বড় দুঃখ সহ্য করছে, সামান্য তেষ্টায় এত বিচলিত হওয়া আমার উচিত হবে না!

কনক বুঝিল, কিসের ব্যথায় প্রদোষ এ-কথা বলিল। কনক বলিল—আমি অনুরোধ করছি বলে' খান···নাহলে আমার মনে ভারী দুঃখ হবে।

প্রদোষ চাহিল কনকের পানে…কনকের চোখের দৃষ্টিতে আকুলতা…

প্রদোষ আর কোনো কথা না বলিয়া লিমন-স্কোয়াশটুকু পান করিল। তারপর বেয়ারাকে দাম দিয়া বলিল—এবারে যাওয়া যাক…

কনক উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র…একটু দূরে টেবিল ঘিরিয়া একদল সৌখীন নর-নারীর উচ্চ হাস্য-রব শুনিয়া সেইদিকে চোখ ফিরাইল।

চোখ ফিরাইতে দেখে, ও-টেবিলে পাঁচ-সাতজন সুবেশ নর-নারীর সঙ্গে চন্দ্রমুখী।

দেখিয়া কনক শিহরিয়া উঠিল! বাড়ীতে বলিয়া আসিয়াছে, রিহার্শালে যাইতেছে…

কনক কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল…

প্রদোষ কহিল—কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

চন্দ্রমুখীর হাত ধরিয়া টানিয়া সাহেবী পোষাক-পরা একজন ভদ্রলোক বলিল—এসো…যাই।

কথাটা কনকের কানে গেল…

কনক যেন কাঁটা! তার চেতনা যেন লুপ্ত হইয়াছে…রক্তের তরঙ্গ মাথার মধ্যে চকিতে খরস্রোতে আসিয়া জমিতে লাগিল!

চন্দ্রমুখী উঠিয়া সে ভদ্রলোকের সঙ্গে এদিকে অগ্রসর হইয়া আসিল…

চন্দ্রমুখী কনককে দেখিল…দুজনের চারি-চক্ষে মিলন। ভদ্রলোকের হাত ছাড়িয়া চন্দ্রমুখী ধনু-নিক্ষিপ্ত তীরের মতো সবেগে আসিল কনকের কাছে। বলিল—এখানে! গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছো বুঝি?

কথা নয়, চাবুক! সে চাবুকে কনকের চেতনা হইল। কনক বলিল—আমি…আমি এখানে এসেছি…

আর বলিতে পারিল না…

কথা বাধিয়া গেল।

চন্দ্রমুখী বলিল—ফের যদি দেখি, আমার পাছু নেছ…ভালো হবে না।…রিহার্শালের পর সকলে এখানে এসেছিলুম একটু খাওয়া-দাওয়ার জন্য। কিন্তু তুমি এখানে আসো কোন্ মুখে? তুমি না বিধবা!

প্রথম কথায় কনক যদি বা ব্যথা না পাইত, শেষ-কথার আঘাত তার খুব বেশী বাজিল! এ-কথায় তার মুখ নিমেষে পাংশু-বিবর্ণ হইয়া গেল। কথা কহিবে কি, মনে হইল, তার জিভটাকে কে যেন সবলে বুকের মধ্যে টানিতেছে! বুক হইতে কণ্ঠনলী পর্যন্ত রসহীন বিশুষ্ক…যেন সাহারা-মরুভূমির মতো দারুণ দাহে জ্বলিয়া যাইতেছে!

চন্দ্রমুখীর পানে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিল; দেখিল, চন্দ্রমুখীর দু'চোখে যেন মোটর-গাড়ীর হেড-লাইটের মতো তীব্র অগ্নিশিখা!

চন্দ্রমুখী বলিল—কি করে খোঁজ পেলে আমি এখানে এসেছি?

বহু কষ্টে কনক কথা কহিল। বলিল—একলা আসিনি…এঁর সঙ্গে এসেছিলুম…

অতি মৃদু কণ্ঠ…কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষের দিকে কনক চাহিল। প্রদোষ তার কাছে দাঁড়াইয়া আছে…যেন কাঠের পুতুল!

চন্দ্রমুখী চাহিল প্রদোষের পানে। দিব্য-কান্তি তরুণ! সে যে ধনী ও বনিয়াদী ঘরের ছেলে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

চন্দ্রমুখীর চোখের দৃষ্টিতে যে-আগুন জ্বলিতেছিল, প্রদোষকে দেখিয়া সে-আগুন নিবিয়া জল হইয়া গেল! এখন সে চোখে ফুটিল যেন চাঁদের জ্যোৎস্না! চন্দ্রমুখী ভাবিল, কনক এমন তরুণ বন্ধুকে কোথায় পাকড়াও করিল? উহাকে কখনো দেখে নাই তো।

চন্দ্রমুখী বলিল—ইনি?

ভাবিল, হয়তো কনকের কোনো আত্মীয়-জন··নহিলে এতদিন এখানে আছে, রাগ যত করুক, হাবে-ভাবে আচারে-ব্যবহারে কনককে এমন কখনো দেখে নাই যে তার এমন বন্ধুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়!

চন্দ্রমুখীর কথায় ঝাঁজ নাই দেখিয়া কনকের ভয়-দ্বিধা খানিকটা বিদূরিত হইল। সহজ কণ্ঠে সে বলিল—ইনি উর্মিলাদির ভ্যাওর।

কে উর্মিলাদি, সে-পরিচয় চন্দ্রমুখী জানে না। কনকের কথায় কুতূহলী দৃষ্টিতে প্রদোষের পানে চাহিল। প্রদোষ বলিল—আমি পশ্চিমে থাকি···এলাহাবাদে। বৌদি এঁকে চিঠি লিখেছিলেন, নতুন মানুষ এখানে আসছি···হাওড়া ষ্টেশনে এসে আমাকে যদি ওখানে নিয়ে যান···

চন্দ্রমুখী বলিল—ও, তাহলে আমাদের ওখানে যাচ্ছেন?

প্রদোষ কহিল—না।

কনক বলিল—ইনি বৌদি···জগৎদার স্ত্রী···

প্রদোষ কহিল—ও · নমস্কার···

বলিয়া কৃতঞ্জলি-পুটে নতি জানাইল, তারপর কহিল—আপনাদের ওখানে গিয়ে আপনাদের আর কষ্ট দেবো না। শাস্ত্রে বলেছে, অজ্ঞাতকুলশীল লোককে বাসো দেয়ং ন কস্যচিৎ···বাড়ীতে স্থান দেওয়া বারণ। তাছাড়া গেলে পাছে এঁকে খানিকটা বিব্রত হতে হয়! আমি একটা হোটেল পেয়েছি পার্ক-সার্কাসে।

কথাটা বলিয়া প্রদোষ চাহিল কনকের পানে···

কনক বলিল—হোটেলের নাম ওরিয়েণ্ট।

চন্দ্রমুখী বলিল—কনক-ঠাকুরঝির বৌদির ভ্যাওর আপনি! তাহলে আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকলে ঠাকুরঝি বিব্রত হবে কেন?···ও-বাড়ী আমাদের যেমন, ঠাকুরঝিরও তেমনি!

এ-কথা শুনিয়া প্রদোষ হাসিল, কহিল—হোটেলে থাকলেও আপনাদের ওখানে যাবো বৈ কি···প্রায় যাবো। কত জ্বালাতন করবো। তখন বলবেন, ভালো আপদকে আসতে বলেছেন! এখন আপনাদের ওখানেই যাচ্ছি···এঁকে পৌছে দেবো···সেই সঙ্গে অমনি বাড়ী দেখে আসবো।

চন্দ্রমুখী বলিল—নিশ্চয় আসবেন। না এলে আমাদের খুব বেশী অভিমান হবে।

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—অভিমানের কোনো কারণ রাখবো না, দেখবেন।

চন্দ্রমুখী বলিল—কতদিন আপনি কলকাতায় আছেন ?

প্রদোষ বলিল—বলতে পারি না। আপাততঃ এক-মাস আছি, নিশ্চয়। তারপর হয়তো এলাহাবাদ ছেড়ে এইখানেই চিরদিনের জন্য আস্তানা নিতে হবে।

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি এখন যেতে পারছি না…একটু কাজ আছে। একটা ডান্স-রিসাইটাল হবে—তার রিহার্শাল চলেছে। আমাকেই সব দেখতে শুনতে হচ্ছে। আজকের জন্য মাপ করবেন। কিন্তু পরে আসবেন একদিন…নিশ্চয়। ঠাকুরঝি, তোমার উপর ভার রইলো…

এই পর্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী আবার চাহিল প্রদোষের পানে, বলিল—আপনার নাম জানলুম না তো!

প্রদোষ বলিল—আমার নাম প্রদোষ।…আমরা তাহলে আসি।

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ…

কনকের পানে চাহিয়া প্রদোষ বলিল—চলুন…

প্রদোষের সঙ্গে কনক ফিরিতে উদ্যত হইল…সাহেবী-পোষাক-পরা একজন ভদ্রলোক আসিয়া চন্দ্রমুখীর সামনে দাঁড়াইল, বলিল—What's the idea ? You are busy here…(ব্যাপার কি ? খুব ব্যস্ত দেখছি)।

মৃদু হাস্যে চন্দ্রমুখী বলিল—না, চলো…বলিয়া চন্দ্রমুখী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া ছোট আয়না বাহির করিয়া মুখে পাউডার-পাফ্ বুলাইল…

প্রদোষ তখন কনকের সঙ্গে হোটেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বামী-স্ত্রী

প্রদোষ-কনক চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী তাদের পানে চাহিয়া রহিল…অনেকক্ষণ।

সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির নাম ব্রতীন গুপ্ত। ব্রতীন লক্ষ্য করিল…চন্দ্রমুখীর দু'চোখে একাগ্র দৃষ্টি !

প্রদোষ ও কনক দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইলে ব্রতীন বলিল—কি হলো মিসেস চ্যাটার্জী ? নব ভাবোদয় দেখছি যে!

দু'চোখে মৃদু ভৎ'সনা…চন্দ্রমুখী বলিল—Don't make a jealous fool of yourself, Gupta…(হিংসা-বিষ মনে পুষিয়া নিজেকে নির্বোধ করিয়া তুলিয়ো না গুপ্ত)…কনক-ঠাকুরঝি…মানে, আমাদের সংসারে থাকে…দাসীর কাজ করে, রান্না-বান্না করে। সত্যিকারের ননদ নয়, এমনি ঠাকুরঝি বলি! বাড়ীতে বলে এসেছি, রিহার্শালে যাচ্ছি—আমাকে এখানে তোমার সঙ্গে দেখে অন্য কিছু না ভাবে, তাই কথা কইতে এসেছিলুম! আর ওর সঙ্গে ঐ যে ভদ্রলোকটি…ওকে জন্মে কখনো দেখিনি…বললে, এলাহাবাদ থেকে এসেছে। নাম বললে, প্রদোষ…

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্রতীন বলিল—প্রদোষ!…প্রদোষ ঘোষাল নয় তো ? এলাহাবাদের প্রদোষ ঘোষাল ?

ব্রতীন্দ্রর দু'চোখে তীব্র কৌতূহল।

চন্দ্রমুখী বলিল—ঘোষাল, কি, মশাল, তা জানি না। নাম বললে প্রদোষ…তার বেশী আর কোনো পরিচয় ছায়নি… Believe me, I never knew him (বিশ্বাস করো, উহাকে আমি জানি না)।

ব্রতীন্দ্র কি ভাবিতেছিল…

চন্দ্রমুখী বলিল—প্রদোষ ঘোষালই যদি হয় ?…এলাহাবাদের প্রদোষ ঘোষাল…কে লোকটি শুনি যে তুমি প্রদোষ আর এলাহাবাদ শুনে একেবারে ধ্যানস্থ হলে !

ব্রতীন্দ্র বলিল—প্রদোষ ঘোষালের নাম শোনোনি ?…আমাদের ব্যাঙ্কেই ও-ভদ্রলোকের ক্রেডিটে টাকা আছে প্রায় পাঁচ লক্ষ। প্রদোষ ঘোষাল হলো—এলাহাবাদের বিখ্যাত ধনী কারবারী ছিলেন অন্নদা ঘোষাল,—তাঁর নাতি। অন্নদা ছিল দারুণ কৃপণ। লোকে তার নাম করতো না…বলতো একাদশী ঘোষাল ! একাদশীর এক ছেলে বরদা ঘোষাল। বাপ মারা যেতে বরদা ঘোষাল নানা কারবারে বাপের টাকা খাটিয়ে সে-টাকাকে পাঁচ ছ'গুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। বেহালা আয়রন-ওয়ার্কস্, বারুইপুর পেপার মিল্‌স্—এ-সবের সৃষ্টি করে গেছে ঐ বরদা ঘোষাল। তারপর বারাকপুরের কাছে আছে ইছাপুর—সেখানে যে নতুন ইছাপুর ক্লথ মিল্‌স্ হয়েছে, সে-মিল্‌স্ বরদা ঘোষালের ছেলে প্রদোষ ঘোষাল খুলেছে, বোম্বাইয়ের কাপড়ের মিলের সঙ্গে পাল্লা দিতে। বোম্বাইয়ের কাপড় আর সার্টিংকে দেশ থেকে বিদূরিত করবে বলে। বরদা ঘোষাল আজ দু'বছর মারা গেছে…ঐ একটি ছেলে রেখে। ছেলের নাম প্রদোষ… ব্যবসায় ছেলের মাথা বাপের চেয়েও ঢের ক্লেভার।…সেই প্রদোষ নয় তো তোমাদের এই নতুন বন্ধু ?

একাগ্র মনোযোগে চন্দ্রমুখী শুনিল ব্রতীন্দ্রর কথা। চন্দ্রমুখীর মনের মধ্যে যেন বৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হইল ! এ প্রদোষ যদি এলাহাবাদের সেই প্রদোষ ঘোষাল হয় ?

মন বলিল, যে-ই হোক্…তোমার তাহাতে কি আসিয়া যায় ?

পরক্ষণে মনের কোণ হইতে কে বলিল, তোমার আসিয়া না যাক, যদি সেই প্রদোষ ঘোষালই হয়…তোমার বাড়ীতে যে-কনক দাসী-বৃত্তি করিয়া দিন কাটাইতেছে…সে হইবে ঐ প্রদোষের অন্তরঙ্গ বন্ধু ! এবং এই অন্তরঙ্গতার ফলে দুজনে যদি ভালোবাসা… জীবনে কনক কোন-কিছুর স্বাদ কোনোদিন পায় নাই ! এ-বয়সে তার মন নিঃসঙ্গতায় হা-হা করিতেছে, নিশ্চয়…এবং এই হা-হা নিঃসঙ্গতার মাঝখানে এই দিব্য-কান্তি তরুণ প্রদোষ ঘোষাল…কে জানে, এ অন্তরঙ্গতা কোথায় কি-ভাবে ইহার পরিণতি ঘটিবে !

মন বলিল, পরিণতি যদি তেমন হয়, কনককে তুমি হারাইবে।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়…তোমাকে অবহেলা করিয়া এই প্রদোষ ঘোষাল তোমার অনুগৃহীতা কনকের মধ্যে কি পাইল যে…

না…না…

ব্রতীন্দ্র বলিল—এখানে আবার গম্ভীর হয়ে বসলে যে ! এসো, কাশানোভায় যাই…

চন্দ্রমুখী বলিল—চলো…

দুজনে বাহিরে আসিল।

বাহিরে ছিল ব্রতীন্দ্রর টু-শীটার গাড়ী। জীর্ণ মামুলি গাড়ী…

ব্রতীন্দ্র গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলিয়া গাড়ী চলিতে সুরু করিল। সে আর্তনাদে মনে হইল, গাড়ী বলিতে চায়, সে আর চলিতে পারে না…তবু জোর করিয়া চালাইয়া কেন তার জীর্ণ হাড়-পাঁজরা গুলাকে আরো জীর্ণ করো!

গাড়ী চলিলে ব্রতীন্দ্র বলিল—ড্রাইভ্ করা শিখবে না? অত সখ তোমার…

চন্দ্রমুখীর কিছু ভালো লাগিতেছিল না…মনের উপর কে যেন পাহাড় চাপিয়া ধরিয়াছে!

চন্দ্রমুখী বলিল—যতদিন না ভদ্রলোকের মতো গাড়ী কিনবে, ততদিন নয়!… তোমার এ-গাড়ীতে চড়ে কোথাও যেতে আমার মাথা কাটা যায় ব্রতী, সত্যি…পাঁচ জনে চেয়ে দেখে, আমার মনে হয়, মাটিতে মিশিয়ে যাই।

ব্রতীন্দ্র বলিল—আর দুটো মাস সবুর করো। তারপর প্ল্যান যা করেছি…এটা বেচে দেবো…দিয়ে হায়ার-পার্চেজ্ সিষ্টেমে কিনবো একখানা গাড়ী…আর দুটো মাস শুধু…

চন্দ্রমুখী বলিল—দু মাস পরে কি এমন ডার্বির টাকা পাবে?

ব্রতীন্দ্র বলিল—ডার্বি নয়। ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লে এ পর্য্যন্ত সাতান্ন টাকা সাত-আনা পেয়েছি। ফী বারে পাঠাই…একবার নিশ্চয় ফার্স্ট-প্রাইজ মেরে দেবো…

ঝাঁজালো স্বরে চন্দ্রমুখী বলিল—তুমি পাগল! ক্রশ-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ সল্‌ভ্ করে টাকা পাবে, সেই টাকায় কিনবে মোটর!

ব্রতীন্দ্র বলিল—না, না, তা নয়। গাড়ী কেনার সম্বন্ধে অন্য প্ল্যান করছি। যখন গাড়ী কিনবো, জানতে পারবে।

•

দুজনে আসিল কাশানোভায়—

সেখানে পান-ভোজনে ঘণ্টাখানেক কাটিল। তারপর, লেকের ধারে পরিক্রমণ …জ্যোৎস্নায় বেঞ্চে বসিয়া সুখ-দুঃখ-নিবেদনে কি সে উচ্ছ্বাস…

তারপর চন্দ্রমুখীকে আরাম-বাগে নামাইয়া দিয়া ব্রতীন্দ্র যখন বিদায় লইল, রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রমুখী গৃহে আসিল…এসেন্সের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল।

চন্দ্রমুখী নিজের ঘরে যাইতেছিল, জগৎ চাটুয্যে আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—একটা কথা আছে…

বুকখানা চকিতের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিল! এক্সপ্লানেশন? কৈফিয়ৎ? কনক আসিয়া বলিয়াছে বুঝি…

ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে জগতের পানে চাহিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—আমায় বলছো?

—হ্যাঁ…

চন্দ্রমুখী দাঁড়াইল, বলিল—বলো…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—দাঁড়িয়ে কথা হয় না···আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসতে হবে। পাঁচ মিনিট···

চন্দ্রমুখী কহিল—চলো···

দুজনে আসিল জগতের বসিবার ঘরে।

জগৎ বলিলেন,—কোথায় গিয়েছিলে?···ফিরতে এত রাত হলো?

দু'চোখে রোষের অগ্নি-শিখা! চন্দ্রমুখী বলিল—স্পাই পাঠিয়েছিলে···শুনেছো তো!

চাটুয্যে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন,—স্পাই!

চন্দ্রমুখী বলিল—হ্যাঁ···তোমার রূপসী যুবতী সখী কনক···

জগৎ চাটুয্যের দু'চোখে বিস্ময়! তিনি বলিলেন,—কনক!

চন্দ্রমুখী বলিল—কনক এসে বলেনি কোথায় গিয়েছিলুম?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—না। কনক আবার তোমার কথা কি বলবে!

চন্দ্রমুখীর মন একটু শান্ত হইল। কনক তবে বলে নাই! সে বলিল—যাবার আগে বলে গিয়েছিলুম বোধ হয়, বেলাদের বাড়ী যাচ্ছি···সেখানে রিহার্শাল হচ্ছে···

কথাটা শেষ করিয়া চন্দ্রমুখী চাহিল জগতের পানে···জগৎ তারা পানে চাহিয়াছিল ···স্থির অপলক দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি বাণের মতো চন্দ্রমুখীর বুকে বিঁধিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—বিশ্বাস হলো না বুঝি?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বেলার বাবা সুরেশ আমার এখানে এসেছিল···এসে আমাকে বেলার ওখানে নিয়ে গিয়েছিল!···যাবার সময় তুমি বলে গিয়েছিলে বেলার ওখানে যাচ্ছো···সেখানে আজ রিহার্শাল আছে। সেখানে গিয়ে তোমাকে দেখলুম না···কাকেও দেখলুম না কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম···

এ কথায় চন্দ্রমুখীর বুকের মধ্যে আবার আগুন জ্বলিল! চন্দ্রমুখী বলিল—তাই জিজ্ঞাসা করছো! কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করবে, বলতে পারো? তুমি যেখানে খুশী যাচ্ছো, আমায় কখনো তার রিপোর্ট দেছ? আমি তোমায় কখনো জিজ্ঞাসা করেছি, কোথায় গেছলে? বা কি করছিলে সেখানে?···আমাকে বিয়ে করেছো···আমি তোমার স্ত্রী। বাঁদী বা দাসী নই যে সব বিষয়ে তোমাকে কৈফিয়ৎ দেবো···সব কাজে গলায় বস্ত্র দিয়ে তোমার অনুমতি নেবো! আমাকে যদি সন্দেহ হয়, সে-কথা স্পষ্ট বলতে পারো।···বলো, কি সন্দেহ হয়? কার সঙ্গে সন্দেহ হয়?···আমি অমন মিন্‌মিনে লুকোচুরি ভালোবাসি না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবে···অথচ সে-সন্দেহের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না···এমন ইতর ছোট লোককে আমি ঘৃণা করি!

কথায় চন্দ্রমুখী এমন বজ্র হানিবে, জগৎ চাটুয্যে স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই! এ কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত রহিলেন।

চন্দ্রমুখী গমনোদ্যতা হইল।

জগৎ চাটুয্যে ডাকিলেন,—চন্দ্রা···

চন্দ্রমুখী দাঁড়াইল।

জগৎ বলিলেন—তোমার যা খুশী হয় করো, যেখানে খুশী যাও···তাতে আমি

কোনো কথা বলবো না। তবে একটা বিষয়ে কথা না বলে থাকা গেল না। আমাকে ভুগতে হয় বলে এ-কথা বলছি···

চন্দ্রমুখী বলিল—বলো। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী···আমাকে আশ্রয় দেছ, খেতে-পরতে দিয়ে আমার পিতৃ-পুরুষকে কৃতার্থ করছো···বলো, কি বলবে···আমি নতশিরে তোমার কথা শুনতে বাধ্য!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—নিত্য তোমার এই জামা-কাপড় কেনা···সেণ্ট-সাবান, রুজ-পাউডার কেনা···এত দেনা আমি কোথা থেকে শোধ দেবো, বলতে পারো? আমি সত্যি রাজা রাজেন্দ্র-মল্লিকের এস্টেটের মালিক নই···ছাপোষা সামান্য প্রোফেসর···মাহিনা পাই সামান্য। আমার আয় বুঝে তোমার চলা উচিত। তোমাকে কাপড়-গহনা দেবো না, এমন কথা বলিনি। যা রয়-সয়, এমন ভাবে চলবে, এ-আশা আমি তোমার কাছে ন্যায্যতঃ করতে পারি, বোধ হয়!···তোমার এই বিলের দায়ে আমাকে যদি আদালতে দাঁড়াতে হয়···এই ভিটে-আশ্রয়টুকু তাহলে রাখতে পারবো বলে মনে হয় না।

চন্দ্রমুখীর সর্বাঙ্গে যেন কাঁটার চাবুক পড়িল! তেমনি জ্বালায় চন্দ্রমুখী বলিল—স্ত্রীকে গহনা-কাপড় যে দিতে পারবে না, তার বিয়ে করবার সখ কেন হয়েছিল, জবাব দিতে পারো?···আমার মতো লেখা-পড়া-জানা স্ত্রী···সৌখীন স্ত্রী···যার নাম করলে সমাজের পাঁচজনে তোমাকে চিনবে···তাকে তার যোগ্য স্টাইলে যদি রাখতে না পারবে, কেন তবে তাকে বিয়ে করে তার সর্বনাশ করলে, বলতে পারো?···I cannot live like a beggar-woman (ভিখারিণী নারীর মতো আমি থাকিতে পারিব না)···আমার স্পষ্ট কথা! এ জন্য তোমায় বাড়ী বেচতে হবে, কি জেলে যেতে হবে, আমি তা দেখবো না···দেখতে পারবো না। জানো, আইনে আমি তোমায় বাধ্য করতে পারি to maintain me properly and according to position (আমাকে যোগ্যভাবে আমার পোজিসন-মতো পালন করতে আইন-মতে তুমি বাধ্য)!

জগৎ চাটুয্যে নিঃশব্দে বসিয়া এ কথা শুনিলেন; শুনিয়া বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিলেন। তারপর শান্ত স্বরে তিনি বলিলেন,—বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে অনেক কথা বলেন। বলেন, আমার মন দুর্বল, আমি স্ত্রৈণ···আমি···অর্থাৎ সে সব কথা আমি বলতে চাই না! কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, তুমি যে-পথে চলেছো, এ-পথে শুধু আমার সর্বনাশ হবে না, তোমারো সর্বনাশ হবে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না ···কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি না···বলবার প্রয়োজন জীবনে কোনোদিন হয়নি ···হবে বলেও মনে করি না। এবং সে-কথা এই যে তুমি আমার স্ত্রী···আমাকে তুমি ভালোবাসো না, জানি। আজ শুনলুম, আমাকে তুমি ঘৃণা করো! তবু তোমার এ-ঘৃণা শিরোধার্য করে আমি চাই তোমার মান-ইজ্জৎ রক্ষা করতে! তাই আমি স্থির করেছি···যা তোমার আছে, থাকবে···কিন্তু ভবিষ্যতে জামা-কাপড় পাউডার-সেণ্ট বা গহনার বিল আমি দেবো না···দিতে পারবো না। তোমার যা দরকার, আমাকে বলবে। আমি যদি বুঝি, সে সব জিনিষের সত্যি প্রয়োজন আছে, দেবো। যদি বুঝি, প্রয়োজন নেই—দেবো না। তিনশো টাকা মাইনের প্রোফেসর

আমি···তুমি সেই প্রোফেসরের স্ত্রী···আমার স্ত্রীর যোগ্য-সাজে যদি সাজো, লোকে তোমাকে ভালো বলবে। তা না সেজে তুমি যদি আই-সি-এসের স্ত্রীর সাজে সাজো, তাহলে সমাজ তোমার তারিফ করবে না···তোমাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসবে··· এই কথাটা মনে রেখো।

কথা শুনিয়া চন্দ্রমুখী যেন নৃমুণ্ডমালিনীর মতো ক্ষেপিয়া উঠিল! বলিল,—তুমি বুনো, তোমার সমাজ বুনো—তোমার ঐ বুনো সমাজের জীব আমি নই যে তোমার মতো আর তোমার সমাজের মতো আমি ভূত হয়ে বাস করবো!···আমার প্রাণ যা চায়, আমি করবো···কারো বাধা আমি মানবো না। তুমি স্বামী, স্বামীই আছো··· আমার মনিব তুমি নও, আর আমি সেকেলে মুখ্যু গেঁয়ো স্ত্রী নই যে তোমাকে দেবতা ভেবে তোমার পাদোদক খাবো···তোমার সব কথা শিরোধার্য্য করবো! I would always be free and my mind always unchained (আমি সব সময়ে স্বাধীন মনে কাজ করবো এবং আমার মন থাকবে শৃঙ্খলমুক্ত)।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—সেদিন খপরের কাগজে পড়ছিলুম, একজন বিলেত-ফেরৎ বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে মেরেছেন। আমি বুঝতে পারছি, স্ত্রীকে গুলি করে মারা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়, বোধ হয়!

বুক চিতাইয়া চন্দ্রমুখী জগতের সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া রুদ্রস্বরে বলিল—আক্ষেপ রাখবে কেন? তুমিও মারো···মারো গুলি আমার বুকে···

জগৎ চাটুয্যে চলিয়া যাইতেছিলেন···চন্দ্রমুখী বলিল—কাওয়ার্ড! তুমি আমাকে গুলি মারবে? সে-সাহস যদি তোমার থাকতো, তাহলে তোমাকে হয়তো একটু মানতে পারতুম! অপদার্থ ক্লীব কোথাকার! তোমার বিয়ে করা উচিত হয়নি··· একটা worm (কীট)—মানুষের মনের দাম বোঝো না! কতকগুলো বই মুখস্থ করে শুধু এগজামিন্ পাশ করেছো···you are a stone...do you hear, a stone ...mere stone...a burden on Earth···(তুমি পাথর! শুনিতেছ, একটা পাথর মাত্র···পৃথিবীর বুকে ভার গলগ্রহ তুমি)। আমাকে খুন করবে, ভয় দেখাচ্ছো ···কিন্তু ও-ভয় আমি করি না!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—না, সে ভয়ের কারণ তোমার নেই। আমি পাথর··· কিন্তু তবু বলছি, তোমার আজকের তারিখ পর্যন্ত বিল আমি কড়াক্রান্তি হিসাবে শোধ করবো। কাল থেকে একটি পয়সার বিল আমি শোধ করবো না। লোকে হাসবে, কিন্তু দায়ে পড়ে আত্ম-রক্ষার জন্য কালই আমি কাগজে-কলমে নোটিশ দেবো যে আমার সই না থাকলে আমার স্ত্রী যে-সব জিনিষের অর্ডার দেবেন, তার বিল শোধ করতে আমি বাধ্য থাকবো না। তুমি আমাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছো যে আমার মান-ইজ্জৎ বলে কোথাও আর এক-তিল বাধবে না, চন্দ্রা—

কথাটা বলিয়া জগৎ চাটুয্যে বাহির হইয়া গেলেন···

চন্দ্রমুখী ক্ষণেক স্পন্দিত দাঁড়াইয়া রহিল···তার পায়ের নীচে ঘরের মেঝে যেন ভূমিকম্পের বেগে দুলিতেছিল!

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা। সন্ধ্যা হয়-হয়। চন্দ্রমুখী গিয়াছিল মিউনিসিপাল-মার্কেটে; সঙ্গে ছিল পাঁচুগোপাল এবং সাধনা হালদার। তিনজনে গিয়াছিল নকল কতকগুলি জুয়েলারি কিনিতে—কিনিয়া মার্কেট হইতে বাহির হইবে, সামনে চন্দ্রমুখী দেখে, প্রদোষ রায়।

চন্দ্রমুখী বলিল,—আপনি!

নমস্কার করিয়া প্রদোষ কহিল—একটু দরকার ছিল…

চন্দ্রমুখী বলিল—আমাদের ওখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আসুন…চায়ের ব্যবস্থা করি…

মৃদু হাস্যে প্রদোষ বলিল—একটু ব্যস্ত আছি। যাবো…নিশ্চয় যাবো…তবে দু'চার দিন পরে।

চন্দ্রমুখী ইতিমধ্যে প্রদোষের অনেক কথা শুনিয়াছে…শুধু ব্রতীন্দ্রর মুখে নয়…আরো দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে। শুনিয়াছে, তিনপুরুষে বহু টাকা জমাইয়াছে এবং এই টাকার একমাত্র মালিক প্রদোষ। কলিকাতায় সে আসিয়াছে ইছাপুরে কাপড়ের যে-মিল বসাইয়াছে, সেই মিলের সর্বাঙ্গীন সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতে।

শুনিয়া অবধি কনকের উপর চন্দ্রমুখীর আক্রোশ বাড়িয়াছে…প্রদোষের উপরও আক্রোশের বহ্নি-কণা বর্ষণ করিতে সে ছাড়ে নাই! পয়সাওয়ালা তরুণ ভদ্রলোক…চন্দ্রমুখীকে সেদিন সামনে দেখিয়াও আলাপে আগ্রহ দেখাইল না! চন্দ্রমুখী কথা কহিলে মানুষ বর্তাইয়া যায়—এতদিন তাই সে দেখিয়া আসিতেছে! ষাট বছর বয়সের বুড়া লাহিড়ী-সাহেব সেদিন চন্দ্রমুখীর জুতার বোতাম আঁটিয়া দিল…চন্দ্রমুখী তো জানে তার কথা, তার হাসি, তার চোখের একটি অতি-মৃদু কটাক্ষের কি দাম! আর এই প্রদোষ…চন্দ্রমুখী নিজে যাচিয়া আলাপ করিল…বাড়ীতে আসিতে বলিল! তা ক'দিনে তার সঙ্গে দেখা করিবার কথা প্রদোষের মনে জাগিল না! টাকার এত দর্প!

প্রদোষ বলিল—তাছাড়া দুদিন আমি গিয়েছিলুম আপনাদের ওখানে…মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সত্যিকারের পণ্ডিত মানুষ! প্রোফেসর বলাতে শুধু নিজের গণ্ডীটুকুতেই আবদ্ধ নন্…পৃথিবী যে রেটে চলেছে, সে রেট, সে চলার সব খবর উনি রাখেন। আলাপ করে খুব শ্রদ্ধা হলো, সত্যি! কনক দেবী আলাপ করিয়ে দিলেন। বেশ ছোটখাট পরিবারটি…সত্যি, মিস্টার চাটুয্যে আর কনক দেবীকে এই অজানা সহরে পেয়ে আমি যেন আরাম পেয়েছি! নাহলে ছুটোছুটির পর কোথায় গিয়ে দু'চারটে কথা কয়ে আরাম পেতুম…মনে দারুণ দুর্ভাবনা ছিল!

কনকের সঙ্গে, মিস্টার চাটুয্যের সঙ্গে এতখানি পরিচয়…চন্দ্রমুখীর মনে আক্রোশের আগুন খোঁচা খাইয়া আরো যেন সতেজ হইয়া উঠিল!…ঐ আশ্রিতা কনক-মেয়েটার মধ্যে প্রদোষ কি পাইয়াছে? ও কি মানুষ? ও কি-কথা জানে যে আলাপ করিবে!

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি বাড়ী ছিলুম না…

প্রদোষ কহিল—না। শুনলুম, আপনাদের কি প্লে আছে···তার রিহার্শাল নিয়ে আপনি খুব ব্যস্ত···

ভ্যানিটী-ব্যাগ খুলিয়া পাউডার-পাফ্ বাহির করিয়া মুখে বুলাইয়া চন্দ্রমুখী বলিল —হ্যাঁ। আমাকে ওরা ভারী ধরেছে। বলে, আমি না হলে চলবে না···আমার ভরসাতেই এতখানি আয়োজন করতে ওদের সাহস হয়েছে! কলেজে এককালে আমাকে প্লে প্রোডিউস্ করতে হতো···

কথাটা বলিয়া চন্দ্রমুখী হাসিল।

প্রদোষ বলিল—গুণী লোক···আর্টিস্ট···ছাড়বে কেন?

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—কিছু না জেনে হঠাৎ এত-বড় কম্প্লিমেণ্ট দিচ্ছেন যে! কি করে জানলেন, আমি আর্টিস্ট?

প্রদোষ বলিল,—কনক দেবীর মুখে শুনেছি। তিনি বৌদির নাচ-গানের রীতিমত এ্যাডমায়ারার। বলেন, দেখলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন প্রদোষ বাবু!

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—আপনারা ব্যবসায়ী লোক···টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ীরই দাম বোঝেন···এ সব বোধ হয় ছেলেমানুষী বলে' ভাবেন! ভাবেন We are indolent set···good-for-nothing people ··(আমরা কুড়ের দল—নেহাৎ অপদার্থ)!

প্রদোষ বলিল—আমাকে না জেনে এমন অপবাদ দিচ্ছেন!

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ, জানবার অবকাশ দিন। একদিন আসুন আমাদের রিহার্শালে···

প্রদোষ বলিল—Very sorry (বড় দুঃখিত)! আমার এখন এমন চলেছে যে নিশ্বাস নেবার অবসর মিলছে না! নাচ-গান-রিহার্শাল···নিশ্চিন্ত না হলে কি ও-সব এ্যাপ্রিসিয়েট করা যায়!

ছোট একটা নিশ্বাস! সে নিশ্বাস রোধ করিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—একদিন সন্ধ্যাবেলায় না হয় বাড়ীতে আসুন···একটু চা খাবেন·· সেই সঙ্গে যদি বলেন, দু-একখানা গানও শুনবেন'খন···

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—আই উড বী প্লীজড্, মিসেস চ্যাটার্জী। (খুব খুশী-মনে যাইব)।

চন্দ্রমুখী বলিল,—কবে আসছেন, বলুন?···কাল?

প্রদোষ বলিল,—কাল?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যা ছটায়।

প্রদোষ বলিল—আচ্ছা, যাবো।

চন্দ্রমুখী বলিল—পাকা কথা?

প্রদোষ বলিল,—আমরা ব্যবসায়ী লোক। আমরা চিরদিন পাকা কথা কই মিসেস চ্যাটার্জী···

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ, দেখা যাক সত্যিকারের ব্যবসা-বুদ্ধি আপনার কতখানি!

নমস্কার করিয়া প্রদোষ চলিয়া গেল···

পাঁচু বলিল—ভদ্রলোকটি হন্ কে?

চন্দ্রমুখী বলিল—এলাহাবাদের প্রদোষ ঘোষাল···

উচ্ছ্বসিত স্বরে সান্ত্বনা হালদার বলিল—ও···ঐ বহু কারবারের মালিক! ভদ্রলোককে টাকার কুমীর বললে চলে! এত কম বয়স···আর এমন সাদাসিধে চাল···

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পাঁচুগোপাল বলিল—A miserly rat (দারুণ কৃপণ)···ভগবান শুধু পয়সাই দেছেন···সে-পয়সা খরচ করবার মতো বুদ্ধি ত্থান্নি!

সাধনা বলিল,—আমাদের প্লেতে কিছু আদায় করো না চন্দ্রাদি।

চন্দ্রমুখী বলিল—আমার সঙ্গে এখনো তেমন আলাপ হয়নি। কনকের সঙ্গে আলাপ।

পাঁচু বলিল—কনক! আঃ, খাশা মেয়ে, সত্যি! ওকে যদি কনভার্ট করতে পারতেন মিসেস চ্যাটার্জী···ওঁকে যদি প্লেতে নামাতেন···ওঃ···She has got admirers··· (ওঁর যা স্তাবক আছে)···and a lot (বহু)! আপনার ওখানে ওঁকে যে দেখেছে, সে-ই ওঁর তারিফ করেছে···But she is so wild···(একদম্ বুনো)···জীবনটাকে ব্যর্থ করেছেন with her···

ছু'চোখে ভৎর্সনা···চন্দ্রমুখী বলিল—পাঁচু বাবু···

পাঁচু বলিল—নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি। নাহলে···

সাধনা বলিল—You are a rogue (তুমি বদ্ লোক)···

পাঁচু বলিল—মনে ভাবোদয় হলে আমি তা চেপে রাখতে পারি না।

সাধনা বলিল—তা বলে you would express yourself in such manner··· (এমন ভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবে)!

তিনজনে আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিল। তারপর সকলে আসিল ব্রতীন্দ্রর ফ্ল্যাটে। ব্রতীন্দ্র থাকে হিন্দুস্থান পার্কে। একা থাকে। বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রী থাকে দেশের বাড়ীতে। এখানে তিন-তলার ফ্ল্যাটে ছু'খানা কামরা লইয়া ব্রতীন্দ্রর বাস। একটা নেপালী চাকর আছে। চাকর-বামুন—ছু'জনের কাজ করে। বাড়ী হইতে তাগিদ আসিলে ব্রতীন্দ্র কচিৎ কখনো সেখানে বিশ-পঁচিশ টাকা করিয়া পাঠায়। সস্তায় সেখানে সংসার চলিয়া যায়। পোষাকে, আসরে, বিলাসিতায় এখানে বাধা পড়ে না। ব্রতীন্দ্রের দিন আরামে কাটে।

ব্রতীন্দ্র ফ্ল্যাটে ছিল। সগু স্নান সারিয়া সাজ-পোষাক করিতেছিল, সঙ্গিনীদের দেখিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল,—হ্যালো···সদলে হঠাৎ? কি খপর?

পাঁচুগোপাল বলিল,—একখানা পোষ্ট-ডেটেড চেক আছে, কাল সেখানার গতি করে দিতে হবে!

চেক লইয়া নিজের দায়িত্বে ব্রতীন্দ্র বন্ধু-সমাজের উপকার করে; না করিয়া পারে না! যে-সমাজে বাস, সে-সমাজের রীতি—আয়নায় মুখ দেখার মতো! তুমি যদি আমায় ত্থাখো, আমিও তোমাকে দেখিব! এবং এই রীতি মানিয়া সকলের মন

রাখিতে গিয়া দশ দিক দিয়া দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধন এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে সে-বাঁধনের চাপে নিজেকে মাঝে-মাঝে গচ্চা দিতে হয়! তবু এ বন্ধন কাটিবার উপায় নাই!

পাঁচুর কথা শুনিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল,—কার চেক?

পাঁচুগোপাল বলিল—মফঃস্বলের এক জমিদার-নন্দনকে আমাদের দলে নিয়েছি। প্লের জন্য চাঁদা চেয়েছিলেন সাধনা দেবী। একখানা পঞ্চাশ টাকার ক্রশ-চেক্ দেছেন।... তবে আজ হলো সাত তারিখ...চেকের তারিখ হলো বারো! বলেছেন, এর মধ্যে মোটা খরচ আছে, চেকখানা যেন কদিন পরে ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়! আমাদের কিন্তু খরচের জন্য এখনি পঞ্চাশ টাকার দরকার।

ব্রতীন্দ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, তারপর বলিল,—অল্ রাইট! কাল ব্যাঙ্কে এসো—বেলা এগারোটায়। দেরী করো না। টাকা দেবো। চেকখানা ঠিক তো? ভাঁওতা নয়?

সাধনা বলিল,—না, না...

পাঁচু বলিল—সাধনা দেবীর সঙ্গে সদ্য আলাপ। এবং সাধনাকে খুশী করবার জন্য ভদ্রলোক সাধনা করছেন! এ-সময় ভাঁওতা চেক দেবে না!

মৃদু-হাস্যে ব্রতীন্দ্র কহিল,—তাহলে ভয় নেই...কেমন?

কথাটা ব্রতীন্দ্র বলিল সাধনাকে উদ্দেশ করিয়া।

সলজ্জ হাস্যে সাধনা বলিল—যান...আপনিও! দ্যাখোনা চন্দর্দি...

চন্দর্দি ওরফে চন্দ্রমুখী তখন বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মুখে পাউডার দিতেছিল...সাধনার কথায় চন্দ্রমুখী বলিল,—সাধনাকে তুমি তামাসা করো কি বলে?... তোমার চেয়ে বয়সে ও অনেক ছোট!

ব্রতীন্দ্র বলিল,—তোমাদের মধ্যে কাকেও আমি ছোট দেখি না। তোমরা সবাই বড়।...আকাশের ঐ চাঁদের মত বড়! জানো, সেই যে একজন প্রেমিক-কবি লিখেছেন...বাঙালী কবি...বাঙলা কবিতা...লিখেছেন,

> কে বলে তোমায় ছোট? চতুর্দশী তুমি
> ষোড়শী, বিংশতি, ত্রিংশ, চত্বারিংশ-বর্ষী—
> এই বুক তোমাদের দিব্য লীলাভূমি—
> সবারে আনন্দ দাও—করো সেবা হর্ষী!

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল,—বেছে-বেছে ভালো কবিতা মুখস্থ করেছো ব্রতী...

ব্রতীন্দ্র বলিল,—কবি এ-কবিতা লিখে ছাপাতে পেরেছে আর আমি সে-কবিতা মুখস্থ করলে দোষ হবে? আসল কথা, কবিতাটি খুব ভালো লেগেছে! এ একেবারে আমাদের দলের প্রাণের কথা...কিন্তু ও কথা যাক। এসেছো, ভালো হয়েছে মিসেস চ্যাটার্জী...না হলে আমাকে ফোন্ করতে হতো...

চন্দ্রমুখী কহিল,—কারণ?

ব্রতীন্দ্র বলিল,—কাল মেট্রোয় বারোটার সময় ট্রেড্-শোর কম্প্লিমেণ্টারী কার্ড পেয়েছি...বেলা বারোটায় ওদের ছবি সুরু হবে...ডরোথি লামুর আছে মেইন্ রোলে। দুজনে দেখে আসবো।

চন্দ্রমুখী বলিল,—উইথ্ গ্রেট্ প্লেজার (মহানন্দে)।...কিন্তু অফিস থেকে তুমি বেরুতে পারবে ও-সময়?

ব্রতীন্দ্র কহিল,—নিশ্চয়।

তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর পানে চাহিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল—প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হলো?

সাধনা বলিল,—প্রবাসী বন্ধু!

ব্রতীন্দ্র বলিল—এলাহাবাদের লোক এসেছেন...তরুণ প্রবাসী...

পাঁচুগোপাল চতুর ব্যক্তি...পাঁচু বলিল,—ও, সেই ভদ্রলোকটি?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ব্রতীন্দ্র চাহিল চন্দ্রমুখীর পানে, কহিল,—তোমাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে নাকি পাঁচু?

পাঁচু বলিল,—মার্কেটের সামনে দেখা হলো...এই মাত্র। কাল সন্ধ্যায় তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন মিসেস চ্যাটার্জী।

ব্রতীন্দ্র বলিল,—ও, মার্কেটে সাক্ষাৎ হচ্ছে! ভালো...ভালো! আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি মিসেস চ্যাটার্জী!

চন্দ্রমুখী বলিল—You are growing meanly jealous (তুমি ইতরের মতো সন্দিগ্ধ হইতেছ)!...কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়...কিছু বলো না তো! ওঁর সঙ্গে দেখা হলো...কথা কইলেন...তুমি বলতে চাও, আমি কথা কবো না?

ব্রতীন্দ্র বলিল,—নিশ্চয় কথা কইবে...প্রাণের কথা!

চন্দ্রমুখী বলিল—মিষ্টার চ্যাটার্জী তো ঢের ভালো দেখছি! সে জেলসি জানে না। তবু স্বামী! বিয়ে করেছে! তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা করি, কখনো সেজন্য একটা কথা বলে না তো!

ব্রতীন্দ্র বলিল,—তিনি...he is great and magnanimous (আশ্চর্য মহাপুরুষ) ...তাঁর উদারতার জন্য আমরা কৃতার্থ। কি বলো পাঁচু?

পাঁচু বলিল,—আমি কোনো কথা বলবো না...আমার শ্বশুর-মশায় হলেন প্রোফেসর চ্যাটার্জীর বন্ধু।

সাধনা বলিল—পাঁচু বাবুর নিষ্ঠা অসাধারণ...

সাধনা হাসিল...

প্রসাধন সারিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—ও-সব তামাসা থাক্। এখন প্রোগ্রাম কি হবে, বলো...

পাঁচু বলিল—আজ রিহার্শাল হলো না। মানে, আমার বাড়ীতে গোলযোগ চলেছে। শ্বশুর-মশায় এসে খাণ্ডারী-মূর্তি ধরে তাড়া করছেন। তিনি একা এলে গ্রাহ্য করতুম না। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর সুগ্রীব-মিতাকে...আই বেগ্ ইওর পার্ডন... সুগ্রীব মানে, প্রোফেসর চ্যাটার্জী। তাঁকে সুগ্রীব mean করিনি! I mean his spirit (তাঁকে এ বিশেষণ হইতে মুক্তি দিতেছি)...তিনি চন্দ্রমুখীর স্বামী...উদার-চরিত বন্ধু। চন্দ্রমুখীর স্বামী বলে তাঁকে কোনো কথা বলতে বাধে...চোখ রাঙাতেও পারি

না! অর্থাৎ…কিন্তু এ রকম হলে রিহার্শাল চলতে পারে না। আর্টিষ্টদের মান-ইজ্জৎ আছে তো!…প্লে নিশ্চয় করবো…রিহার্শালের জন্য জায়গা চাই…

সাধনা বলিল—হুঁ। আচ্ছা, আসামের সেই জমিদার ব্রজসুন্দর বড়ুয়াকে ধরে ব্যবস্থা করা যায় না?

পাঁচু বলিল—হুর্‌রে…He is the man…our new find (ঐ ঠিক লোক… আমাদের নূতন আবিষ্কার)…ওঁকে ধরতে হলে সাধনা দেবীই প্রধান সহায়…

সাধনা বলিল—আচ্ছা, আমি খুব tactfully manage (কৌশলে ব্যবস্থা) করবো। দাঁড়ান…

পাঁচু বলিল—দেবীরা সহায় আছেন বলেই ভরসা! বলে, দেবীই একদিন শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছিলেন…আর একালের দেবীরা যদি এই সব চুনোপুঁটী বধ করতে না পারবেন, তাহলে মহাদেবীর অংশ বলে ওঁদের স্বীকার করবো কেন?

চন্দ্রমুখী বলিল—পাঁচু বাবু দয়া করে কথায়-কথায় সাহিত্য রচনা করবেন না আর। নিজেদের স্তুতি-গান আপনাদের মুখে এত বেশী শুনি যে কাণ তাতে পচে গেছে!

পাঁচুগোপাল বলিল—মডার্ণ সাহিত্যিক আমি…আমরা সব সময়ে ফ্র্যাঙ্ক…মনের সঙ্গে ছলনা করি না বলেই তো আমাদের আজ এমন পশার!

এই সব কথাবার্তার মধ্যে ব্রতীন্দ্রর সাজ-পোষাক হইয়া গেল। ব্রতীন্দ্র বলিল—এখন…? Yes?

চন্দ্রমুখী বলিল—লেকের ধারে যাওয়া যাক…for inspiration…

ব্রতীন্দ্র বলিল—বেশ…

পরের দিন বেলা বারোটা। মেট্রো।

ছবির গল্পে বেশ খানিকটা মোচড় ছিল। অর্থাৎ পাহাড়ের কোলে ছোট গ্রাম। সে গ্রামে আসিয়াছিল বিখ্যাত ধনী ব্রড্‌ব্যাক্ শীকার করিতে। শীকার করিতে আসিয়া সে দেখিল বনবাসী মাথুজ এবং তার রূপসী তরুণী স্ত্রী লিলিকে। লিলি যেন এ পাহাড়-বনের প্রাণ! সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায় লিলি কখনো পদ্ম-ফুলটির মতো পেলব দেহে ভাসিয়া চলিয়াছে, কখনো বনে-বনে উতল হাওয়ার মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে… তার মাথার খোলা চুল চামরের মতো পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে…

ব্রড্‌ব্যাক্ তাকে দেখিয়া সব ভুলিল; এবং বিলাস-সম্পদের মোহে লিলিকে সে ভুলাইল। কিন্তু মাথুজ? বুনো লোক! সে যেমন ভালো বাসিতে জানে, তেমনি তার দুর্জয় হিংসা!…লিলিকে ব্রড্‌ব্যাক্ বলিল—আমার সঙ্গে চলো লিলি আমার ঘরে!

নিরুপায় হতাশভাবে লিলি বলিল—মাথুজ?

ব্রড্‌ব্যাক্ বলিল—আমার ওখানে সে যাইতে পারিবে না।

লিলি বলিল—তুমি জানো না, মাথুজের গতি সর্বত্র…ঠিক এই বাতাসের মতো!

তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া ব্রড্‌ব্যাক বলিল—আমার দেউড়ীতে আছে শান্ত্রী-পাহারা।

লিলি বলিল—ভয় করে…

ব্রড্ব্যাক্ এ-ভয় মানিল না…লিলিকে লইয়া তাঁবু তুলিয়া একদা গভীর রাত্রে সে দেশে পলায়ন করিল…

তবু লিলির মনের ভয় আর যায় না!

দুমাস পরে একদিন রাত্রে বাড়ীতে পার্টির জটলা। নাচের পোষাকে লিলি সকলের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে…করতালি-বর্ষণের মধ্যে লিলি আসিল গৃহের সংলগ্ন বাগানে…কুঞ্জে বিশ্রাম করিতে। সহসা পাতায় জাগিল মৃদু মর্মর-ধ্বনি…সঙ্গে সঙ্গে সামনে কালো ছায়া! ছায়ার পানে চাহিয়া লিলি দেখে, সর্বনাশ! মাথুজ!

মাথুজের চোখে…দৃষ্টি নয়! যেন বাজের আগুন! মাথুজের হাতে ছোরা…

চমকিয়া লিলি আর্ত্ত রব তুলিল। সে পলাইয়া যাইতেছিল…

মাথুজ সবলে তার হাত চাপিয়া ধরিল…

ওদিকে লিলির চীৎকারে লিলির পিছনে আসিয়াছিল ব্রড্ব্যাক। সে আসিয়া দেখে…

বাঘের মতো লাফাইয়া সে পড়িল মাথুজের উপর। মাথুজ পড়িয়া গেল। হাতের ছোরা ফশকাইয়া গেল। ব্রড্ব্যাক সে-ছোরা তুলিয়া মাথুজের বুকে বসাইয়া দিল। বুনো লোকের বুক চিরিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিল…

ব্রড্ব্যাক…লিলি…দুজনে স্তম্ভিত! খুন? সর্বনাশ! যদি কেহ দেখিয়া ফেলে?

ব্রড্ব্যাক সভ্য জগতের মানুষ…বুদ্ধি-কৌশল আছে…তাড়াতাড়ি মাথুজের বেশভূষা বদল করিয়া তাকে বাহির করিয়া পথে ফেলিয়া দিল…

খুনের সব দায় হইতে মুক্তি পাইয়া ব্রড্ব্যাক বাঁচিল। লিলির বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া গেছে, তখন নিশ্চিন্ত মনে লিলিকে ব্রড্ব্যাক করিল বিবাহ…

ছবি দেখিয়া চন্দ্রমুখীর মনে একটিমাত্র চিন্তা…চ্যাটার্জীর সঙ্গে সারা জীবনের বন্ধন…এ-বন্ধন যদি টুটিতে পারিত…টুটিবার পর…মুক্তির কি নিশ্চিন্ত আরাম! বিবাহ-বন্ধনে কেন সে নিজেকে এমন করিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া ছিল? সে-কথা ভাবিয়া, এ বাঁধনের ব্যথা যাতনা আরো উগ্র হয়!

জগৎ চ্যাটার্জীর মধ্যে সে কি দেখিয়াছিল? কিসের আশায়?…সামান্য প্রোফেসর …চন্দ্রমুখীর এমন চাঁদের মতো রূপ…পুষ্পিত লতার মতো যৌবন-লালিত্য…কোনো দিন তার পানে প্রোফেসর চোখ তুলিয়া চাহিয়াছে? তাছাড়া চন্দ্রমুখীর সখ-সাধ…

সে স্ত্রী…

মা-বাপ গেজেট দেখিয়া জগৎ চাটুয্যের হাতে মেয়েকে দান করিয়াছিল…মানুষ দেখে নাই! কিন্তু মা-বাপের সে-দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিবে চন্দ্রমুখী…সারা জীবন? কি দোষে?

আজ যদি জগৎ চাটুয্যে মারা যায়?

চন্দ্রমুখীর মনে হইল, তার পর কোথাও অস্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে না! জগতের লাইফ্ ইনসিওরান্সের টাকা…এই বাড়ী ঘর…তার জীবনে শুধু আলো…মুক্তির আলো!

সিনেমা ভাঙ্গিলে বাহিরে আসিয়া দেখে, মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যখন মেট্রোয় আসিয়াছিল, তখন আকাশ ছিল রৌদ্র-সমুজ্জ্বল। আকাশের কোথাও এক-টুকরা কালো মেঘের চিহ্ন দেখে নাই! সে আকাশে কখন মেঘ আসিয়া দেখা দিল এবং সে-মেঘ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ঐরাবতের শুঁড় ধরিয়া এমন অজস্র-ধারে জল ঝরাইয়া দিয়াছে···আশ্চর্য!

ব্রতীন্দ্র বলিল—ইঃ, ভয়ঙ্কর জল পড়ছে···উপায়?

চন্দ্রমুখীর মনে ছবির-গল্পে-দেখা ভালোবাসার অবাধ গতির রেখা! সে বলিল—অফিস যেতে হবে?

ব্রতীন্দ্র কহিল—নিশ্চয়। একখানা ট্যাক্সি নি···আমাকে অফিসে নামিয়ে তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে।

চন্দ্রমুখীর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা ছিল না। স্বামী আজ বাড়ীতে বসিয়া আছে। কলেজের ছুটী। বাহিরে এমন বর্ষা নামিয়াছে···এ বর্ষায় ঘরের কোণে ঢুকিলে বন্দিত্বের চাপে প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে! তার চেয়ে···

এলাহাবাদের প্রদোষ···তার ঠিকানা যদি জানিত? জানিলে তার ওখানে গিয়া তাকে চমকাইয়া দিত! চমৎকার হইত!

ব্রতীন্দ্র কহিল—বলো···নীরব থাকলে চলবে না। আমার সময়ের খুব দাম! কখন্ বেরিয়েছি! বলে এসেছি, দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছেন···তাঁকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিতে হবে।

চন্দ্রমুখী বলিল—তুমি তাহলে যাও···

ব্রতীন্দ্র বলিল—আর তুমি?

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি তোমার লগেজ নই যে আমার জন্য এতখানি ব্যাকুল হবার প্রয়োজন আছে!···আমার হাত-পা আছে···একটু দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি···তারপর বৃষ্টি থামে, ভালো! না থামে, ট্যাক্সি ডেকে বাড়ী যেতে পারবো'খন···

ব্রতীন্দ্র বলিল—মেজাজ ভালো নয়, দেখছি।···কারণ?

চন্দ্রমুখী বলিল—আমার মেজাজ বোঝবার শক্তি যদি থাকতো, তাহলে আজ তুমি কলম পিষে ব্যাঙ্কে কেরাণীগিরি করতে না!

ব্রতীন্দ্র কহিল—কি করতুম তাহলে?

চন্দ্রমুখী কহিল—সে-বুদ্ধি থাকলে তুমি আজ ব্যাঙ্কার হতে!

স্থির নেত্রে ব্রতীন্দ্র ক্ষণকাল চন্দ্রমুখীর পানে তাকাইয়া রহিল, কহিল,—মান-ভঞ্জনের সময় এখন নেই। পরে সে চেষ্টা করবো। এখন তাহলে পালাই···ইঃ, বেলা দুটো বাজে। না, আর নয়। ওবেলায় দেখা হবে···

কথাটা বলিয়া এক-পা অগ্রসর হইয়া ব্রতীন্দ্র ট্যাক্সি ডাকিতে যাইতেছে, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল। ফিরিয়া চন্দ্রমুখীর পানে চাহিল, বলিল—ভুলে গিয়েছিলুম···আজ বিদেশী বঁধু আসছেন সন্ধ্যায় চায়ের আসর জমাতে! ওবেলায় দেখা হবে না, বোধ হয়?

চন্দ্রমুখী বলিল—না···

ব্রতীন্দ্র বুঝিল, বীণার তার যেন কোথায় ছিঁড়িয়াছে! নহিলে এ বীণা ব্রতীন্দ্রর হাতে খাশা বাজিয়াছে চিরদিন! ভাবিল, এখন সময় নাই···এ-তার ছেঁড়ায় কতখানি নিগ্রহ···চন্দ্রাকে সে পরে বুঝাইয়া দিবে!

ব্রতীন্দ্র আর দাঁড়াইল না···ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত-মাত্রে খালি ট্যাক্সি আসিয়া গেটের সামনে দাঁড়াইল। ব্রতীন্দ্র ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। ট্যাক্সি চলিল।

চন্দ্রমুখীর চোখের সামনে দিয়া ট্যাক্সি চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী দাঁড়াইয়া রহিল··· নিস্পন্দ!···বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল···

বৃষ্টির ধারা ইতিমধ্যে শ্রান্তি-ভরে থামিয়া আসিতেছিল।

চন্দ্রমুখী ভাবিল, কোথায় যাওয়া যায়?···

পিছনে হঠাৎ কার মৃদু কর-স্পর্শ! ফিরিয়া চন্দ্রমুখী দেখে, মন্দা।

মন্দা বলিল,—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কার প্রতীক্ষা-রত?

চন্দ্রমুখী বলিল—মেট্রোয় গিয়েছিলুম···

—এ সময় মেট্রো?

—ট্রেডশো ছিল।

—একলা?

—না। ব্রতী এসেছিল···সে অফিসে গেল।···তুমি?

মন্দা বলিল—মার্কেটে এসেছি। ওঁর সঙ্গে খুব তর্ক হয়েছে···আজই সকালে। কতকগুলো পয়সা দিয়ে কাল ফলমুল কিনে নিয়ে গেছেন···সব শুক্‌নো! আমি বললুম, পয়সা দিয়ে মানুষ এই সব ফল কেনে? বললেন, এর চেয়ে ভালো ফল মার্কেটে নেই! আমি বললুম—আমি যদি আনতে পারি? তাতে বললেন—পারো, পাঁচ টাকা দেবো তোমায়···সিনেমা দেখো।···তাই এসেছি।

চন্দ্রমুখী শুনিল। কথা বলিবার সময় মন্দার মুখে-চোখে বিজয়িনীর ভঙ্গী! তাও চন্দ্রমুখীর চোখে পড়িল! ভাবিল, এত লেখাপড়া শিখিয়া মন্দা ভয়ানক কুনো হইয়া আছে! তুচ্ছ ফল-মুল লইয়া স্বামীর সঙ্গে এমন বাকযুদ্ধ এবং বাজি জিতিবার এমন আগ্রহ···স্বামীকে লইয়া ভালোবাসার কি অভিনয় না করে! এ-অভিনয়ে কি আরাম পায়? স্বামী···সে তো বহুবার-পড়া বইয়ের মতো···তার কোনো খানে না আছে এতটুকু বৈচিত্র্য, না এতটুকু নূতনত্ব!

মন্দা বলিল—কাজ আছে?

চন্দ্রমুখী বলিল—না···

মন্দা কহিল,—আমার সঙ্গে আসবে? এসো না চন্দ্রা···

চন্দ্রমুখী বলিল—চলো···

দুজনে আসিল মার্কেটে। মন্দা ফল কিনিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর মনে হইল, কিছু কিনিলে ভালো হয়···এলাহাবাদের অতিথি আসিবে···চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছে··· আতিথ্যের নমুনা ভালো করিয়া দেখাইবে না?

চন্দ্রমুখী বলিল—আমিও কিছু কিনি···

মন্দা বলিল—প্রোফেসর চ্যাটার্জী কৃতার্থ হবেন'খন! সত্যি ভাই, জানি তো, ওঁরা খুব খুশী হন আমরা যদি কর্তৃত্বের ভার নি···না? কৃতার্থ হয়ে যায়। আমাদের খুশী করবার জন্য কি করবে, চাঁদ পেড়ে দিতে যেন আকুল হয়! ওরা ভাই এমন যে নিজেদের জামা-কাপড় পর্যন্ত দেখে নিয়ে পরতে পারে না! ওদের এই অসহায় ভাব আমার ভারী ভালো লাগে! এমন মায়া হয়!

এ-কথা চন্দ্রমুখীর কাণে গেল কি না, সন্দেহ! সে বলিল—চাকর-বাকর নেই, মন্দা?

—তার মানে?

চন্দ্রমুখী বলিল—নিজের হাতে জামা-কাপড় ঠিক করে দাও?

মন্দা বলিল—হেসো না চন্দ্রা···ওঁর কোনো কাজ আর কাউকে দিয়ে যদি উনি করান, আমার খুব অভিমান হয়। আমি কি চাই, জানো?

—কি?

মন্দা বলিল—উনি যেন আমাকে অসামান্য ভাবেন আর নিজেকে খুব অসহায় বেচারা মনে করেন!···আমি না হলে নিজেকে যেন উনি অচল ভাবেন!

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—You want to mother him···

হাসিয়া মন্দা বলিল—তাই···

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি কিন্তু পারি না। স্বামী স্বামীই! তা বলে এত দাম! ওতে নিজেদের মান-ইজ্জৎ থাকে না। স্বামীরা ভাবে, ওরা না হলে আমাদের গতি হতো না! Why give such indulgence? (এ প্রশ্রয় কেন দিবে?)

এমনি কথায়-কথায় কতকগুলো টিনের ফল, কেক, বিস্কুটের টিন, জ্যাম, পিক্‌ল্‌স্‌, জেলি কিনিয়া চন্দ্রমুখী বাহিরে আসিয়া একখানা ফিটন ভাড়া করিল; তারপর মন্দার কাছে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। এত দেরী হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারে নাই।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিলে ভিতর হইতে জগৎ চাটুয্যের প্রাণ-খোলা হাসির ঝাপটা আসিয়া কাণে লাগিল। চন্দ্রমুখী বুঝিল, ভিতরে আসর জমিয়াছে! ইহারি মধ্যে এলাহাবাদ আসিয়া উদয় হইল না কি? এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন লোহার মতো কঠিন হইয়া উঠিল! আসিবে বৈ কি! এখানে আছে কনক···পরের গৃহে আশ্রিতা হইলে কি হয়···আত্মীয়-বন্ধুহীন রূপসী তরুণী!···

ভৃত্য আসিয়া জিনিষ-পত্র নামাইল। গাড়োয়ানকে গাড়ীর ভাড়া বারো আনা চুকাইয়া দিয়া চন্দ্রমুখী ভিতরে আসিল···

সামনে বসিবার ঘর। সে ঘরে জগৎ চাটুয্যে, কনক আর প্রদোষ।

চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া প্রদোষ উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্যে দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিল—নমস্কার!

চন্দ্রমুখী বলিল—নমস্কার! আমার সৌভাগ্য!···কখন এসেছেন?

প্রদোষ বলিল—আধ ঘণ্টা···

চন্দ্রমুখী চকিতের জন্য একবার কনকের পানে চাহিল···কনকের দু' চোখে যেন বিজলি-বাতি জ্বলিতেছে···যাকে বলে পুলক-রশ্মি !

চন্দ্রমুখী বলিল—এত আগে আসবেন, ভাবিনি···

প্রদোষ বলিল—কাজ যা ছিল, চুকে গেল। তারপর একলা বিদেশী মানুষ··· চুপচাপ কোথায় বসে থাকবো···কাজেই চলে এলুম। চায়ের নেমন্তন্ন সন্ধ্যায় হলেও ভাবলুম, বিদেশী বুনো মানুষ বলে আমার এত আগে আসা হয়তো আপনারা ক্ষমা করবেন !

কথাগুলি বেশ সরল···

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি একটু বেরিয়েছিলুম। ক্ষমা করবেন···মুখ-হাত ধুয়ে এখনি আমি আসছি। আপনারা গল্প করুন···

প্রদোষ বলিল—হ্যাঁ, প্রোফেসর চ্যাটার্জী খুব জমিয়ে দেছেন। ওঁর কলেজের ছেলেদের বুদ্ধি-চাতুর্যের যে-সব কাহিনী বলছেন···আমার কাছে entirely a new world (সম্পূর্ণ নূতন জগৎ)! আমরা ওখানকার কলেজে পড়েছি···আমাদের লাইফে কোনোদিন কোনো রকম উত্তেজনা ঘটেনি কি না···তাই খুব মজা লাগছে !

হাসিয়া চন্দ্রমুখী গমনোদ্যতা হইল। কনক বলিল—আমি যাবো বৌদি ?

চন্দ্রমুখীর মনে অভিমানের কাঁটা ! ন্যাকামি পাইয়াছ, বটে ! এতক্ষণে ক'জনে বসিয়া মন খুলিয়া এমন হাসি-গল্প···আমাকে দেখিবামাত্র সে-সব থামিয়া গেল !···চন্দ্রমুখী ভাবিল, এই সহজ হাসি-খুশীর উপর যদি তেমন আঘাত দিতে পারে অলক্ষ্য আঘাত··· যে-আঘাত মর্মে গিয়া বাজিবে···

চন্দ্রমুখী বলিল—না। তোমাকে আমার কি দরকার ?

কথাটা বলিয়া চন্দ্রমুখী সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল।

মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে টয়লেট সারিয়া চন্দ্রমুখী আবার যখন ফিরিল, জগৎ চাটুয্যে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিলেন—আমার একটু কাজ আছে···একটা নোট লিখেছি···ছাপা হচ্ছে। তার একতাড়া প্রুফ এসেছে। আমাকে যদি একটু ছুটী দেন প্রদোষ বাবু···

প্রদোষ বলিল—আমার জন্য কাজের ক্ষতি করবেন, এমন কথা বলবো না প্রোফেসর চ্যাটার্জী···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তাছাড়া I leave you to better hands···(আরো ভালো হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি)।

কথাটা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জগৎ চাটুয্যে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রমুখী বলিল,—আশ্চর্য শক্তি আপনার ! ওঁর মতো Book-worm (গ্রন্থ বিষয়) ···তাঁকে আপনি এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন !

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—উনি চমৎকার কথা বলতে পারেন। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি অমায়িকতা···

চন্দ্রমুখী সামনের সোফায় বসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হ্যাঁ···সকলেই ঐ কথা বলেন। শুনে ভাবি, ভালো! গুণী লোক না হলে কেউ জহর চিনতে পারে না। তা যাক···ক'টায় চা খাবেন, বলুন?···আমি আবার কতকগুলো জিনিষ নিয়ে এলুম। বাড়ীতে ছিল না···পছন্দ করবেন কি না!

প্রদোষ বলিল—খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে আমার ডিস-লাইক কিছুতে বড়-একটা নেই মিসেস চ্যাটার্জী···

চন্দ্রমুখী ভ্যানিটি-ব্যাগ হইতে ছোট আয়না বাহির করিল; বাহির করিয়া কপালের উপর হইতে নিজের বিস্রস্ত চুলগুলো ঈষৎ নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ভালো! তাহলে আমার জানা দু-একটা ফেভারিট ডিশ···

কনক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—কি কি তৈরী করবো বৌদি?

প্রদোষ বলিল—ইনি ভারী ব্যস্তবাগীশ···এসে অবধি আমি দেখছি, আপনি বাড়ী নেই বলে অস্থির! বলছিলেন, কি কি তৈরী হবে, বৌদি কিছু বলে যান্‌নি···

চন্দ্রমুখী বলিল—না বলে গিয়ে ভালো করেছি।···বলে গেলে আপনি ওকে পেতেন না!···পেয়েছেন বলে she could entertain you so well (ভালো রকম আপনাকে আনন্দ দিয়াছেন), এমনিতে ও বড় লাজুক। আমি না থাকলে দেখি, পুরুষ-মানুষদের সামনে বেশ free আর cosy থাকে। She seems to forget her shyness (লজ্জা-সঙ্কোচ যেন ভুলিয়া যায়)! আপনার প্রোফেসর চ্যাটার্জী···অমন গম্ভীর পণ্ডিত-মানুষ···কনকের সঙ্গেই ওঁর যা-কিছু হাসি-গল্প···দুজনে রাজ্যের কত কথা হয়! আমি থাকলে প্রোফেসর-মানুষ একেবারে প্রোফেসরি-গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসেন! ···সেজন্য কনককে উনি একদণ্ড ছাড়তে চান্ না! আমিও ওঁকে কনকের হাতে রেখে পাঁচটা সোশ্যাল ফাংশনে যোগ দিতে পারি!···কনকের কি দোষ, জানেন প্রদোষ বাবু? মাঝে-মাঝে কনক এমন করে, যেন এখানে আশ্রয় পেয়ে ও কৃতার্থ! যত বলি, তুমি আমাদেরই একজন···আশ্রিতা নও···তবু থেকে থেকে নিজেকে ও এত ছোট মনে করে ···আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন তো···এ সঙ্কোচ ওর কেন?

এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুল, সে-হুল কনকের মনে বিঁধিল। কনক বুঝিল, এ-গৃহে আজ ইনি চন্দ্রমুখীর অতিথি হইয়া আসিয়াছেন! উর্মিলার হ্যাণ্ডর বলিয়া ওঁর সঙ্গে কনকের এতখানি অন্তরঙ্গতা···চন্দ্রমুখীর ভালো লাগে নাই! এ তো অতি ছোট কথা···ইহার চেয়ে কত বড় বড় শ্লেষের বাণে কনককে চন্দ্রমুখী নিত্য বিদ্ধ-জর্জরিত করে···কনক তা জানে! কতবার কনকের মনে হইয়াছে, এখান হইতে কোথাও চলিয়া যাইবে···পরের বাড়ীতে যে-কোনো একটা চাকরি লইয়া দিনাতিপাত করিবে! পারে না শুধু জগৎদার জন্য! জগৎ তাকে বলিয়াছে, তোমার বৌদির কথার বিষ গ্রাহ্য করিয়ো না কনক···ও বিষ পান করিয়া আমি যেমন নীলকণ্ঠ হইয়াছি, তুমি আমার বোন···দাদার মতো তুমিও তেমনি নীলকণ্ঠ হও!···

সে-কথা কনক ভোলে নাই। সে-কথা শিরোধার্য করিয়াই এ কথায় কনক আর যাতনা অনুভব করে না!

যাতনা অনুভব না করিলেও সে যেন এখন নড়িতে পারিল না···স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরঝি? বসো। তোমার বন্ধু···তুমিই তো আলাপ করিয়ে দেবে···

কনক বলিলেন,—আমি যাই বৌদি···গিয়ে চায়ের জলটা অন্ততঃ চড়িয়ে দিই···

এ কথা বলিয়া কনক সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রমুখী মুখে যাই বলুক, তার সামনে কনক চেয়ারে বসিয়া থাকিলে সে-স্পর্দ্ধার জন্য পরে তাকে বহু বাক্যবাণে জর্জরিত হইতে হইবে, কনক জানে।

কনক চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী উঠিয়া প্রদোষের কাছাকাছি চেয়ারে আসিয়া বসিল।···

মৃদু স্বরে চন্দ্রমুখী বলিল—কলকাতায় আপনি এই প্রথম এসেছেন? না, আগে অনেকবার এসেছেন-গেছেন?

প্রদোষ বলিল,—ঠিক প্রথম নয়···আগে অনেকবার এসেছি। তবে সে-আসা··· চোখ বুজে আসা। এবারের আসা সে-রকম নয়!···

চন্দ্রমুখী বলিল—এবারের আসা কি-রকম, শুনতে পাই?

প্রদোষ বলিল—কাজ-কর্ম করতে এসেছি।···আগে আসতুম হলিডে-মুডে!···এবার যাকে বলে, কর্ম্ম-জীবন সুরু হলো···

চন্দ্রমুখী একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আপনাদের এত হিংসা করি···পুরুষ-মানুষ···এক-জায়গায় চিরদিন বন্দী থাকতে হয় না। যখন যা-খুশী করছেন, যেখানে-খুশী যাচ্ছেন!···আর আমরা? খাঁচার পাখী···খাঁচার মধ্যে ছটফট করেই জীবন কাটে।

আরো অনেক কথা হইল···কথায়-সুরে নানা-ভাবের তরঙ্গ-দোলা···সে-স্বর কখনো বিহ্বল, কখনো তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ, কখনো স্বপ্নাতুর, আবার কখনো বা নিশ্বাস-বাষ্পে আর্ত্ত-আতুর!···এবং এ স্বর-বৈচিত্র্যে চন্দ্রমুখীর প্রয়াস চলিয়াছিল এই প্রবাসী তরুণকে মোহপাশে আচ্ছন্ন করিতে! এই তরুণ ভদ্রলোক যেন বুঝিতে পারে, কনককে যত আত্মীয় ভাবো···কনক বয়সে চন্দ্রমুখীর চেয়ে ছোট হইলে কি হইবে, চন্দ্রমুখী এমন মন্ত্র জানে, যে-মন্ত্রে মানুষ দুনিয়া ভুলিয়া যায়! এবং এমনি কথাবার্ত্তার মধ্যে কনক আনিল চা, নিমকী, কাটা ফল, পুডিং, কাষ্টার্ড···

এ-সবের জন্য কোন ফরমাশ করে নাই। তবে চন্দ্রমুখীর অতিথি-পরিচর্য্যার বিধি কনক জানে···এ পরিচর্য্যা তার কাছে নূতন নয়! কাজেই আতিথ্যের আয়োজন তার জানা ছিল।

প্রদোষ দেখিল···বুঝিল, এ-গৃহে কনক কি করিয়া থাকে! এবং তার এখানকার বিধাতা এই চন্দ্রমুখী! কেন না, জগৎ চাটুয্যের সামনে যে-কনককে একান্ত সহজ মানুষটির মতো দেখিয়াছে, সে-কনক···চন্দ্রমুখী আসিবামাত্র সে সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া একেবারে দাসী-বাঁদীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে!

মনে মনে চন্দ্রমুখী হাসিল। হাসিয়া মনে মনে বলিল, আমি থাকিতে এমন লোকটিকে তুমি বাঁধিবে মায়ার ডোরে···স্পর্দ্ধা বটে, মায়াবিনীর!

আপদ

কথায়-কথায় এ ঘরে আসর আবার জমিয়া উঠিল। প্রদোষ দু'একটা কথা কয়··· চন্দ্রমুখী সে-কথার জবাবে প্রদোষের তাক্ লাগাইয়া দেয়! নানা ছাঁদে যে-সব কথা বলিল তার মর্ম, এখানে গরীব স্বামীর ঘরে দিন কাটিলেও সোসাইটিতে তার কতখানি আদর! সে যোগ না দিলে এদিককার কোনো ফাংশন সাক্সেশফুল্ হয় না! তার কি এক-নিমেষ অবসর আছে! এখানকার ঐ "সবুজ-সমিতি"···মনোহরপুকুরের "বাটারফ্লাই ক্লাব"···পার্ক-সার্কাসের "জিপ্সী বয়েজ এণ্ড গার্লস্"···তাকেই এগুলোর নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে! ভাগ্যে কনক আছে, সংসার দেখাশুনা করে। এবং লোকে যে প্রোফেসর চ্যাটার্জীর নাম জানে, সে তাঁর ইউনিভার্সিটির ছাপের জন্য নয়, তাঁর লেখা নোট্ বা প্রোফেসরির জোরে নয়···সে নাম শুধু এই চন্দ্রমুখী চ্যাটার্জীর তিনি স্বামী—এই জন্য!

প্রগতি-তীর্থ কলিকাতার বাহিরে সুদূর এলাহাবাদে থাকিলেও প্রদোষ বুঝিল, চন্দ্রমুখী রীতিমত একজন স্নব্। রূপ ও নাচ-গান এবং কথাবার্তা কহিবার শক্তির গর্বে মাতিয়া আছে!

তার বিশ্রী লাগিল! ভদ্র ঘরের মহিলা···এগুলাতেই এমন তন্ময় যে বেচারা স্বামীর দিকে চাহিবার সময় নাই! চলিয়া যাইবার জন্য প্রতি-ক্ষণে তার মন ব্যাকুল! চন্দ্রমুখী গান গাহিল। চন্দ্রমুখী গায় ভালো! তবু তার গান শুনিতে শুনিতে প্রদোষের মনে হইতেছিল, কনকের পাশে চন্দ্রমুখী? কনক যেন বাঙালীর ঘরের চিরদিনকার সেই স্নিগ্ধ প্রদীপের আলো! আর চন্দ্রমুখী যেন ড্যাজ্লিং বিজলীবাতি! তার ড্যাজ্লে চোখ ঝলশিয়া জ্বলিয়া যায়···তাকে ছুঁইলে তীব্র শক্ লাগে!

দুজনের কথাবার্তার মধ্যে কনক আসিয়া মাঝে-মাঝে ঘরে দাঁড়াইয়াছে···বিনয়-নম্র-ভারে বিজড়িতা···কুণ্ঠিত অপরাধীর মতো! দেখিবামাত্র প্রদোষের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কনক যেন ঐ দীন মূর্তিতে বলিতে চায়, আপনার অভ্যর্থনায় যোগ দিতে পারিতেছি না···শুধু উঁহার ভয়ে! পাছে উনি ভাবেন, আমার বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে···

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ন'টা বাজিল। চমকিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া প্রদোষ বলিল,—ইঃ, নটা! বড্ড জ্বালাতন করলুম আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে। এবার উঠি···

কথাটা বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল···

আকাশে-ওড়া ঘুড়ির সুতা কাটিয়া গেলে যেমন হয়···চন্দ্রমুখীর ঠিক তেমনি হইল। প্রদোষের এ কথায় তার মনে হইল, আকাশে যে-ঘুড়ি তুলিয়াছিল, সে-ঘুড়ির সুতা যেন সহসা ছিঁড়িয়া গেছে!

সে বলিল,—না, না, আমার কষ্ট নয়। খুব ভালো লাগছে! বাড়ীতে কারো সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পাই না। কে আমার কথা বুঝবে? কাজেই বাইরে পাঁচজন কাল্‌চার্ড লোকের কাছে যেতে হয়। আজ আপনার সঙ্গে কথা কয়ে মনটা যেন খাঁচা-ছাড়া পাখীর মতো আরাম পেয়ে বেঁচেছে!

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—আমাকে এমন করে মাথায় তুলবেন না···আমি অতি অপদার্থ···যাকে আপনারা বলেন, গেঁয়ো!

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রমুখী সোচ্ছ্বাসে বলিল—গেঁয়ো! আপনার মতো দু'চারজন গেঁয়ো বন্ধু পেলে জীবনটাকে বন্দীশালায় বন্দী বলে' মনে হতো না!

প্রদোষ গমনোদ্যত হইল। মন বলিল, কনক? মনকে প্রদোষ রুখিয়া রুখিয়া রাখিতে পারিল না, মুখে বলিল—এঁর সঙ্গে একবার···মানে, দয়া করে কনক দেবীকে যদি একবার ডেকে দ্যান···

চন্দ্রমুখীর মনের গহনে আবার সেই আক্রোশের অগ্নিশিখা হুঁ···আমার কথায় খুশী নও? কনকের উপর ভারী দরদ দেখিতেছি!

মুখে চন্দ্রমুখী বলিল—ও···নিশ্চয়!···ডাকিল,—ঠাকুরঝি···

কনক ছিল দ্বারের ওদিকে···পর্দার অন্তরালে। এ-ডাকে চকিতে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখী বুঝিল, ঘরে না থাকিলেও কনকের মন ছিল এই ঘরে···

চন্দ্রমুখী বলিল,—আড়ালেই ছিলে!···কেন, ঘরে আসতে কি হয়েছিল?

এ-কথায় কনকের মুখ নিমেষে পাংশু হইল···

চন্দ্রমুখী তাহা লক্ষ্য করিল। বলিল—তোমার বন্ধু চলে যাচ্ছেন···তাই বিদায়-সম্ভাষণের জন্য খুঁজছিলেন···

এই অপ্রীতির উচ্ছেদ-কল্পে প্রদোষ তাড়াতাড়ি বলিল—আমি আজ আসি···

একান্ত-বিনয়ে আনত হইয়া কনক মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

চন্দ্রমুখীর পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদোষ বলিল—নমস্কার···

—নমস্কার! বলিয়া চন্দ্রমুখী কহিল—আবার কবে দেখা হবে, বলুন? একদিন আসুন না আমাদের বাটারফ্লাই ক্লাবে। রিহার্শাল চলেছে। ব্রজকিশোরী গীতি-নাট্যের অভিনয় হবে। চ্যারিটি-শো···

প্রদোষ বলিল—কাজে বড্ড ব্যস্ত। দেখি, সময় করে যাবো···

এ কথায় যেন প্রাণের যোগ নাই! তবু চন্দ্রমুখী বলিল,—গেলে আগে একটু খপর দেবেন, কেমন?

—দেবো খপর···বলিয়া প্রদোষ আর দাঁড়াইল না···বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল।

প্রদোষ চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী চাহিল কনকের পানে। খোলা জানলা দিয়া বাহিরে পথের পানে চাহিয়া কনক দাঁড়াইয়াছিল···কাঠের পুতুল!

চন্দ্রমুখী দেখিল। দেখিয়া বলিল—ভালো করছো না ঠাকুরঝি!···রবিবাবুর সেই

কবিতা জানো তো···গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে-বা। যদি ভেবে থাকো, তোমার জীবনে এলো বসন্ত-দূত...ভুল করবে! কেন-না, আমাদের সমাজে যে-মেয়ে একবার বিধবা হলো, তার সে-জন্মটাই একেবারে গেল! তার আর কারো পানে, মানে, কোনো পুরুষ-মানুষের পানে চাইতে নেই! গোড়া থেকে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। বেচারী কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথ বিয়ে করেছিল, কিন্তু কুন্দ এক-মুহূর্তের জন্য সুখী হয়নি!

কনকের মনের কোথাও কোনো বাসনা ছিল না···তবু এ কথায় তার বুক যেন আকাশের গুরুগম্ভীর ঘন মেঘের মতো ফাঁশিয়া বাদল-ধারায় ভরিয়া উঠিল···

তারপর কনক কি করিয়া সেখান হইতে কখন চলিয়া গেছে, সে তা জানিতে পারিল না!

দু'তিন দিন পরের কথা।

রিহার্শালে যাইবার মুখে চন্দ্রমুখী একবার গেল জহুরীমলের দোকানে। কাল রিহার্শালে নমিতার কাণে দু'টি কাণপাশা দেখিয়াছে। ভারী সৌখীন-গড়নের কাণপাশা। দাম বেশী নয়···পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।

আজ বাড়ীর বাহির হইয়া অবধি তেমনি এক-জোড়া কাণপাশার জন্য মন একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! তাই সে সোজা আসিল রাসবিহারী এভেনিউর মোড়ে জহুরীমলের দোকানে।

পাঁচ-সাত প্যাটার্ণের কাণপাশা দেখিয়া এক-জোড়া পছন্দ হইল। দাম শুনিল, সাতান্ন টাকা। ম্যানেজার তারামলকে বলিল—এইটে আমি নেবো তারাবাবু··· আপনার বইখানা দিন···নাম সই করে দিয়ে যাই···

তারামল বাবুর মুখখানা ঘোরালো হইয়া উঠিল। তারামল বলিল,—মাপ করবেন মেম-সাহেব, ক্যাশ-টাকা না পেলে জিনিস দেবার জো নেই।

তারামলবাবুর কথা ধারালো ছুরির ফলার মতো চন্দ্রমুখীর বুকখানাকে যেন চিরিয়া দিল! সারা বুক একেবারে ব্যথায়-বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

কোনমতে চন্দ্রমুখী বলিল—তার মানে? বরাবর আমি জিনিষ নিচ্ছি···নাম সই করে!···মিষ্টার চ্যাটার্জী কি কখনো আপনাদের তার দাম দ্যাননি যে এ-কথা বলছেন?

কুণ্ঠিত স্বরে তারামলবাবু বলিল—বহুৎ sorry মেম-সাব···মিষ্টার চ্যাটার্জী নিজে এসে বলে গেছেন, ধারে যেন কোনো জিনিষ আর না দেওয়া হয়···দিলে তার দামের জন্য তিনি দায়ী হবেন না!···একখানা চিঠিও লিখে দিয়ে গেছেন!···পুরোনো হিসেবে আপনার জিনিষের জন্য যা পাওনা ছিল, দু দিন আগে মিষ্টার চ্যাটার্জী এসে সে-দাম শোধ করে দিয়ে গেছেন। বলেন তো, সে-চিঠি আপনাকে দেখাই···

এ কথায় চন্দ্রমুখী জবাব দিল না···মুখ নীল! বেত্রাহতার মতো বেদনাতুর মন লইয়া চন্দ্রমুখী দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এত বড় অপমান!

মনের মধ্যে যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি-স্রাব…তার আঁচে সে যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে !…

মন বলিল, এ অপমানের শোধ যদি দিতে পারো…পণ্ডিত প্রোফেসরের ঐ স্বামিত্বের গর্ব চূর্ণ করিয়া যদি তাকে লোক-লাঞ্ছনার ধূলি-জঞ্জালে ফেলিয়া দিতে পারো… তবেই বুঝি এ-জ্বালা কতক জুড়ায় !

মনে পড়িল চন্দ্রশেখরের কথা ! বুড়া ব্রাহ্মণ…পুঁথিপত্র লইয়া বিভোর থাকিত ! আর বেচারী শৈবলিনী…

কিন্তু শৈবলিনীর ছিল প্রতাপ। চন্দ্রমুখীর তেমন বন্ধু কে আছে ?

ব্রতীন্দ্র ?…

তার পয়সা-কড়ি নেহাৎ সীমাবদ্ধ ! তার সঙ্গে চন্দ্রমুখী যে-খেলা খেলিতেছে,… ফ্লার্টেশন…ব্রতীন্দ্রর সাধ্য নাই, চন্দ্রমুখীর এ-প্রতিশোধের আগুনে ইন্ধন জোগাইবে !

মনে পড়িল, প্রদোষ ! টাকার কুমীর ! তরুণ বয়স…মায়া-জালে তাকে বন্দী করিতে পারিবে না ?…চন্দ্রমুখীর এই রূপ-যৌবন…

তপস্যা-রত বুড়া বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভাঙ্গিয়াছিল উর্বশী !…চন্দ্রমুখীর চেয়ে উর্বশীর রূপের মোহ এত বেশী ছিল ? না, প্রদোষের মন বুড়া-তপস্বী বিশ্বামিত্রের মনের চেয়েও কুলিশ-কঠোর ?

চন্দ্রমুখী আসিয়া ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়াছিল…অদূরে সহসা একখানা মোটর আসিয়া ঘ্যাঁচ করিয়া থামিল। সে-শব্দ লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রমুখী সেদিকে চাহিল। দেখে, টু-শীটার গাড়ী। গাড়ীতে বসিয়া বিনোদ দত্ত।

বিনোদ দত্ত তরুণ ব্যারিষ্টার। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অশোক দত্তর একমাত্র পুত্র। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিলেও কোর্টে বড় একটা বাহির হয় না…টু-শীটার গাড়ীতে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যায় কখনো ঘোরে ডালহৌসি স্কোয়ারে…টেলিফোন-অফিসের কাছে; কখনো এস্প্লানেডে সিনেমাগুলোর সামনে, কখনো টালিগঞ্জের দিকে। এ-সব জায়গা পরম-তীর্থ…ভদ্র ঘরের কোন্ তরুণী আসিয়া কোন্ আসরে যোগ দিতেছে, তাদের সন্ধান লইয়া তাদের চাঙ্গোয়ায় আনিয়া আপ্যায়িত করিয়াই বিনোদ দত্তর দিন কাটে !

গাড়ী হইতে বিনোদ নামিয়া আসিল, কহিল—কোথায় যাবেন মিসেস চ্যাটার্জী ?

চন্দ্রমুখী বলিল—রিহার্শালে।

—কোথায় ?

—আজ আমাদের রিহার্শাল হবার কথা ডালহাউসি স্কোয়ারে…হীরালাল আগরওয়ালা নতুন অফিস খুলেছে ষ্টীফেন্-হাউসের চার-তলায়; সেইখানে যাবো।

বিনোদ দত্ত বলিল—আমি পৌছে দিতে পারি ?

—আপনার অসুবিধা হবে না ?

—না। আমার কাজ নেই, যাচ্ছিলুম লালদীঘির দিকে চক্কর দিতে !…আপনাদের

রিহার্শালে গিয়ে না হয় বসা যাক···it would be so charming (খুব মনোমুগ্ধকর হইবে)!

চন্দ্রমুখী টু-শীটারে উঠিয়া বসিল; বিনোদ দত্ত বসিল পাশে। বসিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী চলিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—এদিক থেকে আসছিলেন এ সময়ে? কোথায় গেছলেন?

বিনোদ দত্ত বলিল—পিকচার-মেকার্স ষ্টুডিয়োয়।

চন্দ্রমুখী বলিল—ফিল্মে নামছেন না কি?

বিনোদ দত্ত বলিল—না, না···মানে, অপ্সরী ভটচাযি্য ফিল্মে নামছেন। তাঁকে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

চন্দ্রমুখী চলিল—অপ্সরী ভটচাযি্য! কে, বলুন তো? নাম শুনেছি। কিন্তু চিনি না।

বিনোদ দত্ত বলিল—ডক্টর বীরেশ্বর ভটচাযি্য···শিকাগোর এম-ডি। তাঁর মেয়ে। এঁর আসল নাম হলো শীকরিণী ভটচাযি্য···বিয়ে হয়েছে···স্বামীর নাম নিবারণ চক্রবর্তী···পাড়াগাঁর জমিদার। স্বামীর সঙ্গে ইনি থাকেন না। ফিল্ম কেরিয়ার নিয়েছেন। ফিল্মে নাম নিয়েছেন অপ্সরী!

—ও···

আর বড় কথা হইল না। মাঠের মধ্য দিয়া শর্ট-কাট্ করিয়া টু-শীটার আসিয়া পৌঁছিল ষ্টীফেন-হাউসের সামনে।

বিনোদ দত্ত বলিল—আমি আসতে পারি?

—নিশ্চয়।

—কারো আপত্তি হবে না?

—নিশ্চয় নয়···

দুজনে আসিল চার-তলায় হীরালাল আগরওয়ালার অফিস-হলে।

নামেই অফিস। বাড়ীর লোককে ধাপ্পা দিবার জন্য অফিস খোলা হইয়াছে। কমিশন-এজেন্টের অফিস। পৈত্রিক কারবারের প্রায় সবটাই গিয়াছে পিতার মৃত্যুর পর; দু'চারিটা বড় কোম্পানি এখনো হাতে আছে, তাদের লইয়া টিম্‌টিম্ করিয়া অফিস চলে; এবং এই অফিসের আবছায়ায় এখানে চলে বন্ধু-বান্ধবীদের লইয়া আড্ডা।

সকলে মহানন্দে বিনোদ দত্তকে লুফিয়া লইল। পয়সাওয়ালা সৌখীন তরুণ ভদ্রলোক! বিনোদ দত্তর টেষ্ট্ আছে! পিতার জন্য প্রগতির পথে তার গতি এখনো দ্রুত না হইলেও এটুকু সকলে বুঝিয়াছে, পিতা সরিয়া পড়িলে বিনোদ দত্ত এ-পথে একেবারে মার্বেলের মতো গড়াইয়া চলিবে!

রিহার্শাল চলিতেছিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—আপনার বন্ধু অপ্সরী ভট্‌চাযি্যকে এখানে আনুন না মিষ্টার ডট্‌।

ফিল্মে নামলেও ষ্টেজে নামতে দোষ কি? ষ্টেজে যদি একবার নাম বেরিয়ে যায়, তাহলে শুধু বাঙলা দেশের ফিল্মে নয়, বোম্বাই, ম্যাড্রাশের* ষ্টুডিয়ো থেকে কল্ আসবে!

হাস্য-মুখে বিনোদ দত্ত বলিল—বলবো···

নমিতা বলিল—অপ্সরী ভটচাযি্য আপনার কে হন?

বিনোদ বলিল,—ফ্রেণ্ড।···মানে, ওঁর এক দাদা আমার সঙ্গে এখানকার কলেজে পড়তো। সে এখন বিলেতে···

নমিতা বলিল—চিনি না। তবে ছবি দেখেছি···ঐ যে থিয়েটারী সব বাঙলা উইক্‌লি-কাগজ বেরোয়, সেই সব কাগজে···

—ও···

রিহার্শাল ভাঙ্গিল···রাত্রি তখন দশটা।

বাহিরে দারুণ দুর্যোগ। মেঘে-ঝড়ে মিশিয়া পৃথিবীকে যেন এ-রাত্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সাগরে ভাসাইয়া দিবে, এমনি দুর্জয় গোঁ লইয়া তাদের মাতন চলিয়াছে!

মেয়েরা কলরব তুলিল। বলিল—এ জলে বেরুবো কি করে'? গাড়ী চাই!

সিভালরিক্-মনের প্রমোদ-পিয়াসীরা তাদের গাড়ীতে সকলকে তুলিল···

বিনোদ বলিল চন্দ্রমুখীকে—আপনি আমার গাড়ীতে যেতে পারেন···আপনাকে নামিয়ে আমি টালিগঞ্জ যাবো···

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ···

তাহাই হইল···

গৃহে আসিয়া চন্দ্রমুখী দেখে, বাড়ীতে জগৎ চাটুয্যে নাই, কনকও নাই!

ভৃত্য বলিল, সন্ধ্যার সময় ঢাকুরিয়া হইতে বাবুর কে পিশিমা আসিয়াছিলেন; তাঁর ওখানে সত্যনারায়ণ পূজা···সেখানে লইয়া গিয়াছেন।

বিনোদ দত্ত বলিল—বৃষ্টিতে আসতে পারছেন না।···একলাটি আপনি এখন কি করবেন?

চন্দ্রমুখী বলিল—তাই ভাবছি···

বিনোদ দত্ত বলিল—বলেন যদি, একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসতে পারি! আমাকে ষ্টুডিয়োয় যেতে হবে বারোটায়। বারোটায় ওদের শূটিং শেষ হবে। আমিও ভাবছিলুম, এতক্ষণ···

চন্দ্রমুখী বলিল—বেড়াতে যাবেন?

—মন্দ কি!

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ হবে। চলুন। ওয়াটারি টাউন! ওরা বলছিল, গাড়ী, না, গণ্ডোলা! তাই করা যাক···আপনার যদি অসুবিধা না হয়···

বিনোদ দত্ত বলিল—অসুবিধা হবে না। বেশ আমোদ হবে'খন···তাছাড়া এক্সকিউজ্ মী···আপনাকে ভারী ভালো লাগছে, সত্যি! You are jolly···

(আপনি বেশ আমুদে)…একেই বলে, লাইফ !…I appreciate you (আপনাকে আমি তারিফ করিতেছি)।

টু-শীটার চলিল গড়িয়া-হাটের দক্ষিণ-দিকে…

ঝড়-জলের তেমনি মাতন…ওদিকে প্রান্তরের বুকে বড় বড় গাছগুলা ঝড়ের আক্রমণে মাথা নাড়িয়া যেন প্রবল আর্ত্ত রব তুলিয়াছে ! তারা যেন আর পারে না ! বয়স হইয়াছে, দুরন্ত ঝড়ের যৌবন-মত্ততা সহিতে পারিবে কেন ? কোথাও মড়-মড় শব্দে বড় বড় গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে…কোথাও ছোট গাছের ডালপালা ঝড়ের যৌবন-মত্ততায় আশ্রয়-তরুর বুক হইতে ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িতেছে যেন অবুঝ তরুণ-তরুণীর দল মা-বাপের শাসন-বন্ধ ছিঁড়িয়া দুনিয়ার বুকে ঝাঁপ দিতেছে !…

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়ের মাতন থামিল। বৃষ্টির বেগ কমিল। পথ কিন্তু জলের নীচে গভীর গহন-তলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

জল ঠেলিয়া কোনো মতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল আরাম-বাগের গলির সামনে। গলির মুখে আপাদ-মস্তক আবৃত এক রমণী-মূর্তি…

গাড়ীর হেড-লাইটের তীব্র আলোর ঝলকে মূর্তি হকচকিয়া গেল…এবং সেই হকচকানো-ভাব লইয়া বিভ্রান্তের মতো সে একেবারে চলন্ত গাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িল…

একটা অস্ফুট আর্তনাদ…তার পর সব চুপ !

বিনোদ ভয়ে গাড়ী থামাইল…চন্দ্রমুখী-বিনোদ দুজনেই হতভম্ব…

আশে-পাশে ভেকের রব…গভীর-গম্ভীর…অশ্রান্ত।

বিনোদ বলিল—মারা গেল না কি ?

চন্দ্রমুখী বলিল—না…বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বিনোদ বলিল—তুলে আপনার ওখানে একবার দেখা যাক। পথে যদি চৌকিদার আসে, ফ্যাসাদ হবে।

চন্দ্রমুখী বলিল—হুঁ…

দুজনে গাড়ী হইতে নামিল। তারপর ধরাধরি করিয়া রমণীকে লইয়া আরাম-বাগে আনিল।…

ভৃত্যকে ডাকিল। সাড়া নাই! জগৎ? কনক?…বাড়ীতে কেহ নাই।

চন্দ্রমুখীর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রোমাঞ্চ-রেখা !

রমণীকে সামনের বারান্দায় শোয়ানো হইল…

বিনোদ দত্ত বলিল—এক-গ্লাস জল আনতে পারেন ?

না আনিলে উপায় নাই ! চন্দ্রমুখী জল আনিতে গেল !

জগৎ এবং কনক এখনো ফেরে নাই। চন্দ্রমুখী ভাবিল, ভালোই হইয়াছে। থাকিলে নানা কৈফিয়ৎ…হয়তো বিনোদ দত্তর সামনে যা-তা বলিয়া স্বামিত্বের আস্ফালন ফলাইত !

গ্লাসে জল আনিয়া চন্দ্রমুখী দেখে, বিনোদ দত্ত নাই…

চলিয়া গেছে?…

বাহিরে পথে মোটরে ষ্টার্ট দিবার শব্দ…সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড রব…গাড়ী চলিল।

চন্দ্রমুখী ভাবিল, কাওয়ার্ড! ধাপ্পা দিয়া এই রাত্রে একা আমায় ইহার পরিচর্যায় রাখিয়া পলায়ন করিল! হাসপাতাল ছিল না?

ও আবার ভদ্রলোক? বিলাত গিয়াছিল?…

রাগে-আক্রোশে চন্দ্রমুখীর দু'চোখে আগুন জ্বলিল!

কিন্তু মিথ্যা এ আগুন! গাড়ী চালাইয়া বিনোদ দত্ত চলিয়াছে টালিগঞ্জ-ষ্টুডিয়োতে …চন্দ্রমুখীর চোখের এ-আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গও বিনোদ দত্তকে স্পর্শ করিবে না!

চন্দ্রমুখী চাহিল মূর্ছিতা রমণীর পানে…

তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা…

নিস্তব্ধ রাত্রি। অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া আছে। সুর-সঙ্গীতের অমন কল্পলোক হইতে মনে কি গভীর মায়া-বিভ্রমের স্বপ্ন ভরিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে…

যেমন গৃহে পদার্পণ, অমনি এ কি দুগ্র্হ!

রমণীর মুখে-মাথায় চন্দ্রমুখী জল দিল।…তার দেহ ধরিয়া নাড়া দিল। দু'বার …দশ বার ডাকিল—শুনছো…শুনছো…

সাড়া নাই!

বেশী ডাকিতে পারিল না। ঘুমন্ত চাকরটা যদি সে-ডাকে উঠিয়া পড়ে? এবং উঠিয়া আসিয়া যদি দেখে…

দেহে প্রাণ নাই…সত্য?

পুলিশের কলরব কাণের কাছে যেন দামামা-নাদ তুলিল। চোখের সামনে স্বপ্ন-ছায়ায় চন্দ্রমুখী দেখিল…সকাল হইয়াছে…চারিদিকে জীবনের কলরব…বাড়ীতে লোকারণ্য…পুলিশ গিশ্‌গিশ্‌ করিতেছে…আর অত লোকের দৃষ্টি হইতে লাঞ্ছনার কালি যেন পিচকারীর ধারায় তার অঙ্গে বর্ষিত হইতেছে…

চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি গিয়া সদরের ফটক বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সন্তর্পণে পরীক্ষা করিয়া দেখে, রমণীর নাসায় নিশ্বাস-বায়ুর সংস্পর্শ নাই! দেহ যেন কাঠ!…

ভয়ে চন্দ্রমুখীর বুকে যেন কামান দাগিল! মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। যদি মরিয়া গিয়া থাকে? এ লাশ…সে একা মেয়ে-মানুষ…

তার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কাঠ হইয়া চন্দ্রমুখী বসিয়া রহিল…দু' চোখে জলের ধারা…

বহুক্ষণ বসিয়া রহিল নিঝুম নিশ্চেতনের মতো!

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দু'টা বাজিল। সে-শব্দে চন্দ্রমুখীর চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে চন্দ্রমুখী অনুভব করিল, কি একটা হইয়াছে! এবং সেজন্য কি যেন করা প্রয়োজন…এবং এখনি!

কাছেই কোন্ গাছের ডালে একটা পেচক কর্কশ রব তুলিল।

তারপর চন্দ্রমুখী যা করিল···

হয়তো অনেকে সে-কথা বিশ্বাস করিবেন না ! বাঙালীর ঘরের মেয়ে চন্দ্রমুখী ! লেখাপড়া শিখিয়াছে···আর্টে তার রুচি আছে···সে এমন কাজ করিতে পারে···করা দূরের কথা, এমন কাজের কল্পনা মানুষ করিতে পারে···বিশ্বাস করিবার নয় !

কি করিয়া চন্দ্রমুখী এমন কাজ করিল ?

সনাতনীর দল হয়তো বলিবেন, বিলাতী-চাল যারা মজ্জাগত করিয়াছে, দেশের ধর্ম দেশের রীতি···এ-সবে যাদের দারুণ বিরূপতা, তারা এমন কাজ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইতেছ কেন বাপু !···নিজেদের যাঁরা অতি-প্রগতিশীল ভাবিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখেন এবং তাঁদের মতে যারা সায় দিতে পারে না, তাদের বলেন বেকুব,···সে-দলের লোক হয়তো বলিবেন, মন, না, মতি ! কিন্তু আমরা জানি, মানুষের এ-মনকে চিনিয়া কবি মিল্‌টন্ সত্য কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এ-মন নরককে যেমন স্বর্গ বানাইতে পারে, তেমনি আবার স্বর্গকেও পুরাপুরি নরক বানাইতে ওস্তাদ ! আমরাও বলি, কোনো কাজ কারো পক্ষে করা অসম্ভব নয় ! ঘটনাচক্র মানুষের মনকে পিষিয়া দুমড়াইয়া কবে কোন্ ছাঁচে কি গড়িয়া তুলিবে, ঠিক নাই ! মন লইয়া কাহারো অহঙ্কার করা সাজে না ! বিশ্বামিত্রেরও চিত্ত-বিকার ঘটিয়াছিল,···দেবরাজ ইন্দ্রও একদিন গুরু গৌতমের গৃহে···কিন্তু ও-সব কথা থাক্ ! আমরা চন্দ্রমুখীর কথা বলিতেছি। চন্দ্রমুখী যদি এ-কাজ না করিত, তাহা হইলে আজ আরাম-বাগের এ কাহিনী লিখিয়া বই ছাপাইবার প্রয়োজন ঘটিত না ! চন্দ্রমুখী এ-কাজ করিয়াছিল বলিয়াই আমরা আজ এ-কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি।

অর্থাৎ চন্দ্রমুখীর বুকে দুর্জয়ময়ী দানবী আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। এ-দানবী পৃথিবীর বুকে সর্বক্ষণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ! একবার লেডি ম্যাকবেথের বুকে এ-দানবী আশ্রয় লইয়াছিল, তারপর কিং-লীয়ারের দুই মেয়ের বুকে ! তারপর···

কিন্তু না, আমরা দানবীর জীবন-কথা লিখিতেছি না···কাজেই অত ইতি-কথা টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই ! তবে সে-দানবী আজ এই ঝড়-বাদলের রাত্রে এই চন্দ্রমুখীর বুকে আবার আসন পাতিয়া বসিল ! সেই যে ম্যাকবেথের প্রত্যাবর্তন-কালে তিন-দানবী বলিয়াছিল,—আমরা আবার কখন্ মিলিব দিদি ? বড় দানবী বলিয়াছিল, ঝড়-বাদলের রাতে মিলিব বোন্ ! এমনি ঝড়-বাদলের রাতেই সে-দানবী চন্দ্রমুখীর বুকের দ্বার খোলা পাইয়া তার বুকে আসিয়া জাঁকাইয়া বসিল !

এবং চন্দ্রমুখীর মনে অকস্মাৎ তাই বিদ্যুৎ-রশ্মির মতো একটি চিন্তার চকিত-উন্মেষ···

উন্মেষ-মাত্রে সে গিয়া দেখিয়া আসিল, ভৃত্য কোথায় ! দেখিল, রান্না-বাড়ীর ওদিকে তার ঘরে দ্বার ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তার ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া চন্দ্রমুখী উঠানে নামিল।

উঠানের এক কোণে একটা বড় খানা। খানার মুখে লম্বা কাঠ পাতিয়া সেটা বন্ধ করা হইয়াছে। এ খানার ব্যবহার ছিল বহু পূর্বে···তখন এ-খানায় কয়লা রাখা হইত।

এখন চন্দ্রমুখীর সৌখীন গৃহিণীপণার গুণে খানার মুখে কাঠের আগল।. এ খানার আজ কোনো প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রমুখী আসিয়া কাদা-জল মাখিয়া সেই কাঠের আগল টানিয়া সরাইল···তার পর মৃত দেহটাকে টানিয়া উঠানে আনিল; এবং অতি দ্রুত সে-নারীর শাড়ী খুলিয়া তার গায়ে নিজের শাড়ী জড়াইয়া দিল···রঙীন সিল্কের শাড়ী জড়াইয়া দেহটাকে সেই খানার মধ্যে ফেলিয়া খানার মুখে তক্তা আঁটিয়া যথা-পূর্ব ব্যবস্থা করিল। তার পর রমণীর শাড়ীখানা হাতে লইয়া চন্দ্রমুখী পথে আসিল···

দূরে চৌকিদার তার রাতের প্রহরা-ডাক হাঁকিয়া চলিয়াছে। এ পথে সে আসে নাই। শাড়ীখানা লইয়া চন্দ্রমুখী আসিল গলির মোড়ে। আসিয়া বড় নালার মুখে শাড়ী ফেলিয়া দ্রুত-পায়ে বাড়ী ফিরিল। ফিরিয়া স্থইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে, নিজের কাপড়ে, হাতে-পায়ে এবং মেঝেয় রক্তের দাগ···

ন্যাতা ভিজাইয়া রক্তের দাগ মুছিল। তার পর সাবান দিয়া কাপড় কাচিল; সাবান মাখিয়া স্নান করিল; স্নানান্তে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুক্‌নো কাপড় পরিয়া বেশভূষা-সম্পাদনান্তে চকিতে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল···

আকাশে তখন মেঘের পর্দা ঠেলিয়া বাঁকা এক-টুকরা চাঁদ দেখা দিয়াছে। চাঁদের পানে চাহিয়া চন্দ্রমুখীর মনে হইল, চাঁদের মুখে যেন হাসির বক্র রেখা!

বাড়ীর বাহিরে পাশাপাশি দুটা দীর্ঘ তাল গাছ। তাল গাছের পাতায় বাতাস ঢুকিয়া খেলা করিতেছে···সে খেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া তাল-গাছের পাতা মর্মর-স্বরে যেন প্রতিবাদ তুলিতেছে!

চন্দ্রমুখী ভাবিল, পৃথিবীতে সকলে এখন নিশ্চিন্ত-ঘুমে অচেতন···সকলে বেশ আরামে ঘুমাইতেছে। যারা দুঃখী, তারাও হয়তো সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে! জাগিয়া আছে শুধু সে একা···

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছিল···

ঘরেও নহে পারেও নহে,
যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে যায় তারে?

তার দশা ঠিক ঐ কবিতার সে-জনের মতোই! ঘরে তার কেহ নাই···পারেও কেহ নাই! সন্ধ্যাবেলায় কে তাকে ডাকিবে? কার ডাকে সে কোথায় যাইবে?

ভাবিতে ভাবিতে আক্রোশের আগুনে মন সহসা তাতিয়া উঠিল···সে ঝাঁজ মনকে যেন ছ্যাঁকা দিতে লাগিল! চন্দ্রমুখীর মনে হইল, এ-ঝাঁজে পারিত যদি স্বামী জগৎ চাটুয্যেকে আজ দগ্ধ করিতে···

শুধু স্বামী কেন, কনকও বাদ যাইত না!

দুজনে ভারী ভাব! ব্রতীন্দ্রর সঙ্গে সে বেড়াইতে গেলে ঐ স্বামী কথার কি-বাণে না তাকে বিদ্ধ করে! আর তোমরা দুটিতে সেই যে সন্ধ্যার আগে বাহির হইয়া

গিয়াছ, রাত্রি দু'টা বাজিয়া গেল, এখনো ফিরিবার নাম নাই, ইহার বেলায় কথা উঠিতে পারে না ?···

মন বলিল, পুরুষ-মানুষ আর কিশোর-বয়সের নারী···লোকে বলে, দুজনে ঘৃত-অনলের সম্পর্ক !···কাওয়ার্ডস্ !···

চন্দ্রমুখী ভাবিল, কি সুখে সে গৃহে থাকিবে ! কিসের লোভে ? কিসের মায়ায় ?

স্বামীর ভালোবাসা ?

যে-স্বামী স্ত্রীর বেশভূষায় বিদ্রূপ করে···নিষেধ তোলে···

গহনার দোকানে আজ কি লাঞ্ছনা না পাইয়া আসিয়াছে !

এমন স্বামীর মুখ দেখিতে নাই ! শাস্ত্র বলে, পাপ হইবে ! হোক্ পাপ ! চন্দ্রমুখী পাপ-পুণ্য মানে না। মনকে উপবাসী রাখিয়া চায় না সে পাপ-পুণ্যের হিসাব কষিতে ! না···সে তা করিবে না···কখনো না !

চন্দ্রমুখী স্থির করিয়া ফেলিল···

এ-গৃহে আর নয় !

কিন্তু কোথায় যাইবে ?

সিনেমা আছে···থিয়েটার আছে···ব্রতীন্দ্র আছে···প্রদোষ আছে।···তাদের না পায়, এত-বড় পৃথিবী পড়িয়া আছে···এই বয়স লইয়া চন্দ্রমুখী কোথাও একটা ছোট রাজ্য গড়িতে পারিবে না ?

চাবির রিঙে একগোছা চাবি। চাবি ঘুরাইয়া চন্দ্রমুখী স্বামীর দেরাজ খুলিল। সামনে ড্রয়ার। ড্রয়ারে এক-তাড়া নোট। গণিল। তিনশো টাকা। বুঝিল, মাস-কাবারে স্বামী কলেজের মাহিনা পাইয়াছে সদ্য।

চন্দ্রমুখী নোটগুলা লইল···তার পর ছোট একটা সুটকেশ···তার মধ্যে কখানা শাড়ী-ব্লাউশ···নিজের গহনা লইয়া সুটকেশে ভরিল···

ভরিয়া সুটকেশ-হাতে চন্দ্রমুখী বাড়ী হইতে বাহির হইল···

কোথায় যাইবে ? কি করিয়া যাইবে ?

···ব্রতীন্দ্র ?···না···

তার চেয়ে ট্রেণে চড়িয়া যতদূর পারে ! তার পর···

তারপর সিনেমার ছবিতে যেমন···যা কখনো ভাবে নাই, সিনেমায় নায়ক-নায়িকারা এমন কত কি যে করিয়া বসে ! সম্ভব-অসম্ভব কত কি !···তেমনি তার জীবনেও হয়তো ঐ বাঙলা ছবির প্লটের মতো···

চন্দ্রমুখী আসিল বালিগঞ্জ রেলোয়ে-ষ্টেশনের সামনে···

পথে দু'-চারখানা ট্যাক্সি···

আশ্চর্য হইল ! এত রাত্রে ট্যাক্সি ! এখনো এত রাত্রি জাগিয়া কার প্রতীক্ষায় এরা থাকে ? তার মতো কেহ যদি সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া ঘর-সংসারে আগুন লাগাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পাড়ি দিবার বাসনায় পথে আসিয়া দাঁড়ায়···তাদের জন্য ?

কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক আর আছে না কি···চন্দ্রমুখী ছাড়া ?

সব-কজন ট্যাক্সিওয়ালা এক-সঙ্গে ট্যাক্সির হর্ণ বাজাইল···বাজাইয়া সব-ক'খানাই একেবারে যাত্রামুখী···

চন্দ্রমুখী সামনের ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। বসিয়া বলিল,—হাওড়া ষ্টেশন···

ট্যাক্সি চলিল।

পাশে সাত-আটখানা বাড়ীতে পর-পর ঘড়ি বাজিল···ঢং···ঢং ঢং···রাত্রি তিনটা !

হাওড়ায় নামিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া চন্দ্রমুখী প্ল্যাটফর্মে ঢুকিল। ষ্টেশনের টাইম-টেবলের উপর দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল···প্রথমেই যে ট্রেণ পাওয়া যায় !

কিন্তু কোথায় যাইবে ? সম্বল তো মোটে তিনশো টাকা !

তার পর ?

রেলোয়ে-লাইনের দিকে চাহিল। প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া লাইন সোজা ঐদিকে গিয়াছে ! তারপর বাঁক···বাঁকের পরে লাইন আর দেখা যায় না ! চন্দ্রমুখীর মনে হইল, তার জীবনেও ভবিষ্যতের লাইন ওমনি খানিকটা মাত্র দেখা যায়···তারপর সে-লাইন বাঁকিয়া মনের নাগালের বাহিরে গিয়া কি-ভাবে শেষ হইয়াছে, কিছু জানিবার উপায় নাই !

না জানুক···প্রথম-ট্রেণে চড়িয়া যতদুর যাওয়া যায় !

যেখানে যাইবে, সেখানে অনেক দিন থাকিবে। আর এখানে ?

ঐ লাশ পচিয়া একদিন দারুণ দুর্গন্ধ···পাঁচজনে তখন সন্ধান করিবে। এবং সন্ধান করিতে গিয়া তখন পাইবে গলিত শব···মুখ দেখিয়া চেনা যাইবে না···কে !···পরণে যে-শাড়ী, তা চন্দ্রমুখীর ! নিশ্চয় সকলে বলিবে চন্দ্রমুখী ! চন্দ্রমুখী নিরুদ্দেশ···তখন চন্দ্রমুখীকে হত্যা করার অভিযোগে কনক আর জগৎ চাটুয্যে···

এদিককার আকাশ সাফ হইয়া যাইবে !

এবং চন্দ্রমুখী তখন নিঃশব্দে অন্য-নামে আবার আসিয়া উদয় হইবে ! আসিয়া জগৎ চাটুয্যের লাইফ-ইন্সিওরেন্সের টাকা···তার ঐ বাড়ী-ঘর···

এ-কথা চন্দ্রমুখীর মনে পূর্বে উদয় হয় নাই। সিনেমায় অনেক ছবি দেখিয়াছে··· ছ' পেনি দামের অনেক থ্রিলার-নভেল পড়িয়াছে···সে সব উপন্যাসের ছেঁড়া পাতাগুলা উড়িয়া জুড়িয়া মনের মুদ্রাযন্ত্রে ধীরে ধীরে যে নূতন প্লট গড়িয়া তুলিতেছিল··· ক্রমে-ক্রমে···মাসিক পত্রিকার ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের মতো সে প্লটের আব্ছা-আভাসে···

চন্দ্রমুখীর মনে যে-প্লট জাগিল, চন্দ্রমুখী তাহাতে চমৎকৃত হইল !···চমৎকার উপন্যাস এ ! বাঃ !

টাইম-টেব্‌ল্ দেখিয়া হিসাব কষিল। প্রথম ট্রেণ ছাড়িবে ছ'টার পর। বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের ট্রেণ। এ ট্রেণে করিয়া যদি গোমো যায় ? সেখানে গিয়া আত্মগোপন করিবে। তারপর এখানে ঘটনাচক্র ঘুরিয়া কোথায় দাঁড়ায়, খবরের কাগজে শুধু চোখ রাখা,···ব্যস্ ! তার পর···

ভোরের আলো দেখা দিল। লোকজনের চলাচলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল।

চন্দ্রমুখী টিকিট করিয়া গোমো-প্যাসেঞ্জারের একখানা ইণ্টার-কামরায় চড়িয়া বসিল…

ট্রেণ ছাড়িল। মনের উপর দিয়া আতঙ্ক-ছায়ার রেখায় ছবির পর ছবি চলিতেছিল !…

সব ছাড়িয়া সে চলিয়াছে…ব্রতীন্দ্র…প্রদোষ…নাচ-গান…আসর…

কিন্তু ঐ বিনোদ দত্ত ?

সকালে যদি সন্ধান লইতে আসে ?

আসে, প্রশ্ন করিবে—মিসেস চ্যাটার্জী ? জবাব শুনিবে, বাড়ী নাই !

তারপর এই মেয়েটার সংবাদ ?…

বিনোদের বুদ্ধি আছে ! গায়ে পড়িয়া সে-দায় কেন লইবে ?

হয়তো আর আসিবে না !

যে-সব লোক টু-শীটারের তীর লইয়া রমণী-মৃগয়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, রমণীকে তারা দেখে খাদ্য-সামগ্রীর মতো ! শীকার ! শীকারের উপর কার কবে মমতা হয় ? ব্রুট ! সন্ধ্যার আগে পথে চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল,…টু-শীটারের একটি তীরে যদি তাকে গাঁথিতে পারে !

জানে না, চন্দ্রমুখী স্নাইপ নয়…পার্টরিজ নয়…অত সহজে তাকে গাঁথা যায় না !

মনের উপর এমনি নানা কথার উদ্‌ভ্রান্ত চলিল…জলের বুকে যেন তরঙ্গ-মালা !

ওদিকে ভোরের আলো ফুটিলে কনককে সঙ্গে করিয়া জগৎ চাটুয্যে গৃহে ফিরিলেন। কাল রাত্রে ঐ দুর্যোগে পিশিমা আসিতে দেন নাই ! বলিয়াছিলেন—জলে পড়োনি তো বাবা, দুজনে সকাল হলে বাড়ী যেয়ো…

বাড়ী আসিয়া দেখে, চারিদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা !

ঘরে-বাহিরে সব কেমন উলট-পালট…

কনকের মনে পড়িল, কাল রাত্রে পিশিমার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছিল …ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধার বনে !

দুজনেই ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল—তোর মা-জী ?

ভৃত্য কিছু জানে না ! সে বলিল,—বাড়ী আসেন নি…

বাড়ী আসে নাই ! ঘরে এমন বিশৃঙ্খল ভাব ! দেখিলে মনে হয়, কি যেন একটা ঘটিয়া গিয়াছে ! আতঙ্কে ভয়ে ঘর যেন স্তম্ভিত নীরব হইয়া আছে !…চুরি নয় তো ?

তাই !…আলমারির কপাট খোলা কেন ?…

কনক বলিল—আলমারি বন্ধ করো নি জগৎ-দা ?

জগৎ বলিলেন,—এমন ভুল কখনো হতে পারে কনক ?

আলমারি খুলিলেন…ড্রয়ার…সর্বনাশ ! সামনে ছিল নোটের তাড়া…নাই !

নিশ্চয় চোর আসিয়াছিল !

জগৎ চাটুয্যে ডাকিলেন—ভিখন…

ভৃত্য বলিল—বাবু…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—দোর খোলা ছিল ?

ভৃত্য কহিল—হ্যাঁ…

কনক কহিল,—তাহলে চোর…নিশ্চয় ! কি করবে, জগৎদা ? পুলিশে খপর দেবে ?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—পাগল ! শুধু নোট নিয়েছে !…চোর ধরা পড়লেও সে-নোট তো সনাক্ত হবে না !

কনক চারিদিক দেখিল। দেখিয়া বলিল,—বৌদির গয়না ? ছোট সে সুটকেশটাও দেখতে পাচ্ছি না…নিয়ে গেছে। পুলিশে খপর দাও জগৎদা…সত্যি।

জগৎ চাটুয্যে নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন,—না…

—বৌদির গয়না ?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—যাঁর গয়না, তিনি এসে যা বলবেন, তাই করা হবে…

তারপর দু'জনেই চুপ…

কনক বলিল—তোমার চা নিয়ে আসি জগৎদা…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—আনো…

কনক একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কিন্তু সত্যি, বৌদির খপর কি ? এখনো এলো না ?

উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া জগৎ বাবু বলিলেন—তাঁর জন্য ভেবো না কনক। কলকাতা-সহরে তাঁর আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের অভাব আছে ? না, আশ্রয়ের অভাব আছে ?

পাষাণ টলে

মাস-খানেক কাটিয়া গিয়াছে…চন্দ্রমুখীর কোনো সংবাদ নাই।

জগৎ চাটুয্যে নির্বিকার-ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—চলো, দিন দশ-পনেরো কোথাও বেড়িয়ে আসি, কনক !

চন্দ্রমুখীর জন্য উদ্বেগে কনকের মন যা হইয়া আছে…দারুণ বিপদের আশঙ্কায় এমন হইয়া আছে যে চন্দ্রমুখীর সম্বন্ধে কেহ ছোট একটা প্রশ্ন করিলে মেঘ-বর্ষণের মতো তার দু' চোখে জল আসিয়া জমে !

জগতের কথায় কনক বলিল—কিন্তু জগৎদা…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বুঝেচি, তোমার বৌদির জন্য তুমি ভাবনায় অস্থির হয়ে আছো !

কনকের বুকে যেন সপ্ত-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল ! সে-সিন্ধুর বুকে জগৎ চাটুয্যের এই নির্বিকার-ভাব…সিন্ধুর বুকে যেন পাষাণ-গিরি !

কনক বলিল—তুমি কী, জগৎদা! জলজ্যান্ত মানুষ···তার কোনো খপর নেই··· কোথাও একবার সন্ধান করা দরকার মনে করচো না!

একটা বড় নিশ্বাস সবলে নিরুদ্ধ করিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—এ এত বড় ব্যথা কনক যে নিশ্বাস ফেলবার উপায় নেই! নিশ্বাস আবার চেপে রাখাও দায়!

কনকের রাগ হইল। কনক বলিল—তোমার হেঁয়ালি আমার ভালো লাগে না, জগৎদা। সত্যি ভালো না বাসো, বৌদিকে মন্তর পড়ে বিয়ে করে এনেছো তো!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—সেজন্য দুঃখ করো কেন? এই মন্ত্রে একদিন আমার কি অখণ্ড বিশ্বাসই ছিল! বিশ্বাসের দিক দিয়ে এ মন্ত্রের শক্তি আমি অনেকের কাছে বড় গলায় প্রচার করেছি! কিন্তু কি কুগ্রহ কোথা থেকে উদয় হয়ে এ-মন্ত্রের সব শক্তি খর্ব করে দিলে, ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই, কনক!···ভালোবাসা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে love at first sight···আগে ভাবতুম, ঐ ফার্ষ্ট সাইটেই যারা বিয়ে করে, তাদের সেকেণ্ড-সাইট উদয় হলে লভের যে-মূর্তি তাদের চোখে প্রকটিত হয়, তার জন্য তাদের বিয়ের বন্ধন শিথিল কিংবা বিচ্ছিন্ন হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়! কিন্তু দেবতাকে সামনে রেখে মন্ত্র পড়ে যে-বিয়ে, সে-বিয়ে সকল অবস্থাতেই শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকবে, ভাবতুম! আমার সে-বিশ্বাস কতখানি ভুল, তোমার বৌদির সঙ্গে আমার এই মন্ত্র-পড়া বিয়ে থেকে আমি তা মর্মে-মর্মে বুঝতে পারছি···

এখনো সেই হেঁয়ালি! সজল চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া কনক বলিল,—কি তুমি বলতে চাও, বুঝি না! এ কি ভালো হচ্ছে? বৌদির কোনো খপর নিচ্ছ না!··· যদি কোনো বিপদই ঘটে থাকে?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বিপদ যে হয়নি, তা আমি বেশ জানি। কেন না, তাঁর কোনো বিপদ হলে আর-কারো মুখে সে-বিপদের খপর না পেলেও খপরের কাগজের মারফৎ তিনি নিজে সে-বিপদের খপর দিকে-দিকে প্রচারিত করে বাঙলা-দেশ জুড়ে খ্যাতি সংগ্রহ করতেন!

কনক বলিল—তুমি ভাবছো, আমি কোনো এ্যাক্‌সিডেণ্টের কথা বলছি? মোটর-এ্যাকসিডেণ্ট, কিংবা···

জগৎ চাটুয্যে কোনো জবাব দিলেন না।

কনক বলিল—তা নয়। তার চেয়ে বড় কোনো বিপদ যদি হয়ে থাকে? ধরো, এমন বিপদ···মেয়ে-মানুষ যে-বিপদের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না···

জগৎ চাটুয্যে নীরব রহিলেন। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বুকের মধ্য হইতে অনেকখানি বেদনা বাহিরের বাতাসে মিশাইয়া দিয়া বলিলেন—সে-ভয় আমার হয় না, কনক···

কনক বলিল—না হলেও স্ত্রী···বাড়ীর চাকর বা গলগ্রহ নয়···বাড়ীর গিন্নী! এতদিন বাড়ী-ছাড়া নিরুদ্দেশ···তার একটা খপর···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—কোথায় সে খপর নেবো, তুমি বলতে পারো? যেখানে যেতেন, ওঁর বন্ধুদের কাছে খপর নেবো?

মাথা নাড়িয়া কনক জানাইল, হাঁ···

জগৎ চাটুয্যে মৃদু হাস্য করিলেন···মলিন হাস্য! তারপর বলিলেন—তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বা সন্ধান নিতে গেলে তারা ব্যঙ্গ করবে। হেসে বলবে, নিজের স্ত্রীর খপর নিতে এসেছো তুমি আমাদের কাছে!···কোন্ মুখে লোকের কাছে সন্ধান নিতে যাবো? কি কথা বলে সন্ধান নেবো, বলতে পারো, কনক? বলবো যে, আমার স্ত্রীকে আমি ঘরে রাখতে পারি নি, বশে রাখতে পারিনি···আমাকে তিনি মোটে কেয়ার করেন না···কোথায় তিনি আছেন, কোথায় গেছেন, আপনারা বলতে পারেন?

একাগ্র মনোযোগে কনক এ কথা শুনিল। মনে-মনে বুঝিল, কথাটা সত্য। জগতে এমন বিপদ আছে, যে-বিপদ নীরবে সহিতে হয়! বিপদ ঘটিয়াছে, পরে না বুঝিতে পারে! ভাবিল, নিরুপায়ে সহিবার মতো বিপদও আছে!···যত অসহ্য বিপদ হোক, হাসি-মুখে নীরবে সে-বিপদ সহিবার মতো বিপদ···সে আরো কত অসহ্য! জগৎদা সেই বিপদের আঘাতে আজ পলে-পলে চূর্ণ হইয়া যাইতেছেন!

অনুকম্পায় মমতায় তার মন গলিয়া গেল। জগৎদার শান্ত অবিচল মুখের পানে চাহিয়া কনকের অন্তরাত্মা শুধু বলিল, বেচারা জগৎদা!

ভাবিল, স্বামী হইয়া স্ত্রীর এতখানি ঔদ্ধত্য কি বলিয়া জগৎদা এতকাল সহিয়া আসিতেছেন? কাপুরুষের মতো এমন অন্ধ দাস্য? পরক্ষণেই মন বলিল, কাপুরুষতা নয়···অন্ধ মোহও নয়! শিক্ষিত ভদ্রলোক! স্ত্রীর সম্বন্ধে এ সব সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় মন স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হয়! এ আলোচনায় কতখানি ইতর ইঙ্গিত যে প্রচ্ছন্ন থাকে···নিজের অসহায়তার কি নিগূঢ় গ্লানি···

কনক বলিল,—আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না! কি-আরামে ছিলুম বলো তো জগৎদা!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তোমার আরাম?

কনক বলিল,—যা গেছে, যা পাবার নয়, সে-সবের জন্য আমার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, জগৎদা। তোমার এখানে যে-স্নেহে তুমি আমায় আশ্রয় দেছ, সত্যি, আমি আরামে আছি···আমার কোনো দুঃখ নেই, তুমি বিশ্বাস করো। কিন্তু তোমার এ কষ্ট, এ লাঞ্ছনা···বুকের মধ্যে চিতা জেলে কি আশ্চর্য সহিষ্ণু হয়ে তুমি এ-জ্বালা সহ্য করছো, সে-কথা মনে হলে···

কথা শেষ হইল না। বাতাস লাগিলে হাল্‌কা পেঁজা মেঘের টুকরাগুলা যেমন বারি-ধারায় বর্ষিত হয়, কনকের কথার শেষটুকু তেমনি নিশ্বাসের বাষ্পে অশ্রু-ধারায় ঝরিয়া পড়িল!

জগৎ চাটুয্যে সস্নেহে কনকের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন,—কেঁদো না কনক ···আমার কোনো দুঃখ নেই। তার কারণ, তোমার বৌদি আমায় এমন সুখ স্থাননি যে তাঁর অদর্শনে আমি দুঃখ ভোগ করবো!···তাছাড়া দুঃখ যদি পেয়েই থাকি, আমি ভাবি, তোমার এই বয়স···এ-বয়সে তুমি যদি দুঃখের পাহাড় মাথায়

নিয়ে আমাদের পরিচর্যা মাত্র সম্বল করে হাসি-মুখে খুশী-মনে দিন কাটাতে পারো··· দিনের পর দিন তাচ্ছল্য, অবজ্ঞা, শাসন, লাঞ্ছনা সয়ে থাকতে পারো···আমি তাহলে হাসি-মুখে কেন থাকতে পারবো না, বলো ?···এই কথা ভেবে মনে আমি যে-জোর পেয়েছি···তোমার বৌদির সাধ্য নেই, কোনো আঘাতে আমার সে-মনকে জখম করবেন !···কিন্তু ও-কথা থাক্ ! তুমি তো জানো, তোমার বৌদির এ-বাড়ীর উপর আর এ-বাড়ীর লোক-জনের উপর কত মায়া-মমতা ! এখানে তিনি থাকেন, তার কারণ, মাথা গোঁজবার একটা আশ্রয়···এমন আশ্রয় যদি আর-কোথাও মেলে··· এ-আশ্রয় ত্যাগ করতে তাঁর এতটুকু বাধবে না !

ছুঁচের ডগার মতো এ-কথাটা কনকের মনে বিঁধিল ! জগৎদাকে সে কত ভক্তি করে, ভালোবাসে···সত্যকার পণ্ডিত-লোক···জগৎদার দরাজ মন···তাই প্রতিবাদ তুলিতে মন তার কণ্ঠ চাপিল ! রুখিয়া সে ডাকিল,—জগৎদা···

জগৎ চাটুয্যে হাসিলেন। আবার তেমনি মলিন মৃদু হাসি। হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—সেই শাস্ত্র-বাক্য জানো তো কনক, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়···মানে, তোমার বৌদির জীবনের মুল-মন্ত্র যাকে বলে life's philosophy···সেটা তিনি ভালো বোঝেন। জীবনকে তিনি শুধু ভোগ করতে চান্। জীবনে আমাদের দায়িত্ব আছে, পরের মুখ চেয়ে আমাদের ছোট-খাটো স্বার্থ-সুখ ত্যাগ করতে হয়, সে ত্যাগে মঙ্গল হয়, এ সব কথা তিনি মানেন না। না মানার কারণ, অত্যন্ত frivolityর (হালকা) মধ্যে মানুষ হয়েছেন। নাচ-গান, হাসি-গল্প, আমোদ-আহ্লাদ,—শুধু এই দেখেছেন। আর বুঝেছেন, এইগুলো নিয়েই মানুষের জীবন ! দুঃখ হয়, এই frivolity ছেড়ে উঠতে পারলেন না ! কবি বলে গেছেন,

I slept and dreamt that life was beauty.
I woke and found that life was duty.

অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে আমরা ভাবি, জীবনটা শুধু সৌন্দর্য-সুষমা···এ ঘুমঘোর ত্যাগ করে যে-মানুষ সত্যি-সত্যি জাগে, সে-ই শুধু বোঝে, জীবন শুধু স্বপ্ন-সুষমা নয়, জীবনে মানুষের বহু কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে।

কনক বলিল—ও-সব তত্ত্ব-কথা রাখো জগৎদা। সত্যি, তুমি বৌদির খপর নাও··· বুঝলে !···তোমার কাছে যত-দোষে দোষী হোক, তোমায় ভালো না বাসুক, তবু লোকতঃ-ধর্মতঃ তোমার স্ত্রী ! না হলে লোকে কি বলবে ?

কনক বলিল—বলবে, লোকটা দয়া-মায়াহীন পাষাণ···নিজের স্ত্রীর খপর নেয় না !

তার কথা বাধিয়া গেল। জগৎ চাটুয্যে বুঝিলেন। বলিলেন,—আর···কি ? বলো···

কনক জবাব দিল না, মাথা নত করিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তুমি বলতে পারলে না দিদি, কিন্তু আমি বুঝি। লোকে বলবে, হাই-ক্লাস সোসাইটি-উওম্যান্ স্ত্রী···স্বামীর তোয়াক্কা রাখে

না! এ সোসাইটিতে স্বামী যেমন স্ত্রীর কেউ নয়…স্ত্রীও তেমনি স্বামীর কেউ নয়…এই তো কথা?

দু' চোখের সজল মলিন দৃষ্টি জগৎ চাটুয্যের মুখে নিবদ্ধ করিয়া কনক নিস্পন্দ বসিয়া রহিল।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার স্ত্রী সোসাইটি-উওম্যান্…আমি ধনী নই, গরীব। সোসাইটি-উওম্যান্ স্ত্রীকে comforts দিতে পারি নি, স্ত্রী তাই…

রুদ্ধ বেদনার ভারে জগৎ চাটুয্যের স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

কনক বুঝিল, জলের স্রোত যদি তেমন প্রখর হয়, তাহা হইলে কঠিন পাষাণ-পর্বতের সাধ্য কি, মাথা তুলিয়া অটল সুদৃঢ় থাকিবে! জগৎদার কি বিপুল বেদনা…বৌদির এ-ব্যবহারে পাহাড়ের মতো তাঁর কঠিন মনও আর অটল থাকিতে পারিল না!

সহসা বাহিরে প্রদোষের কণ্ঠ,—জগৎদা…

কনক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল—প্রদোষ বাবু…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ডেকে নিয়ে এসো।…বাঁচা গেল! দুজনে একসঙ্গে বসে শুধু ঐ এক কথা!…যাও কনক…

কনক গেল ঘরের বাহিরে; এবং প্রদোষকে লইয়া তখনি ফিরিয়া আসিল।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আসুন প্রদোষ বাবু…

হাসিয়া প্রদোষ কহিল—এসে অন্যায় করেছি, বুঝতে পারিনি!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তার মানে?

প্রদোষ কহিল—প্রেফেসর মানুষ…তাঁকেও মানে বুঝিয়ে দিতে হবে?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—প্রোফেসরদের মস্ত মূঢ়তা কি, জানেন প্রদোষ বাবু?

—কি?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—খেই ধরিয়ে না দিলে তারা কোনো-কিছুর অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। Always context refer করতে হয়…নাহলে চোখে তারা মরুভূমি দেখে।

হাসিয়া প্রদোষ কহিল—আমি আপনার স্নেহ পাবার জন্য জগৎদা বলে ছুটে যত কাছে আসি, আপনি আমাকে তত 'আপনি'-'মশায়' বলে দূরে সরিয়ে দেন!

হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ও…ঠিক বলেছো ভাই! আজ থেকে আর দূরে নয়! বসো প্রদোষ এই আমার সামনে।

মেঘ-ঝঞ্ঝা

কথায়-কথায় চন্দ্রমুখীর কথা উঠিল।

প্রদোষ বলিল—মিসেস্ চ্যাটার্জী কবে ফির্‌বেন?

জগৎ চ্যাটার্জী বলিলেন—তিনিই জানেন!

প্রদোষের দু' চোখে বিস্ময়! প্রদোষ চাহিল কনকের পানে।

কনক আনতমুখী। জগৎ চাটুয্যে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রদোষ বলিল—সত্যি, এ আমার কি রকম লাগছে!…আপনাকে দেখলে মনে হয় না কিন্তু, আপনার বাড়ীতে এতখানি স্ত্রী-স্বাধীনতা…

মৃদু-হাস্যে জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—মেয়েদের অন্দরের অন্ধকূপে আটকে রাখো বলে' কোনোদিন আমি প্রবন্ধ লিখিনি, প্রদোষ। আর কোনোদিন এমন কথা তোমার কাছে বলিনি, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা করতে পারো যে আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী!

কথাটা বলিয়াই প্রদোষ কেমন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। কোনো ভদ্রলোকের গৃহে সস্নেহ-প্রবেশাধিকার পাইয়া তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে মন্তব্য-প্রকাশ…শুধু অনুচিত নয়, তাহা অভদ্রোচিত…এ কথাটা মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করিতেছিল। এখন জগৎ চাটুয্যের কথায় কোনো মতে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য প্রদোষ বলিল—আমি তা mean করিনি স্যর…আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আপনার সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার ধারণা, সব-বিষয়ে আপনার মত খুব সমুদার হলেও পশ্চিমী-জাতের মতো আপনি এতখানি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী যে আপনার স্ত্রী যতদিন-খুশী বাইরে থাকবেন, সে সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত থাকবে না!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার কাছে সব-চেয়ে বড় সমস্যা কি জানো প্রদোষ? মেয়ে-মানুষ, আত্মীয়-বন্ধু, দাসী-চাকর—কাকেও হীন ভাবা উচিত নয়! কারো মনের উপর শাসন আর প্রভুত্ব ফলিয়ে তাদের স্বাধীন-ইচ্ছাকে খর্ব করা বা ধরে-বেঁধে মানুষকে নিজের অধীনে চালানো, এতে শুধু তাদের উপর জুলুম করা হয়, তা নয়! এ-ব্যবহারে আমরা আমাদের নিজেদের মনুষ্যত্বের অপমান করি! কাজেই মেয়েরা বন্দিনী হয়ে থাকবেন না, তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁরা পূরণ করবেন…এই আমার মত! কিন্তু এ ব্যাপারে মস্ত একটা অসুবিধা আমি লক্ষ্য করছি…সব ঘরে নয় অবশ্য, তবে শতকরা নব্বইটা সংসারে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি…

এই পর্যন্ত বলিয়া জগৎ চাটুয্যে চুপ করিলেন। প্রদোষ মনের সমস্ত কৌতূহল দুই চোখের দৃষ্টিতে পুঞ্জিত করিয়া জগৎ চাটুয্যের পানে চাহিয়া রহিল। আর কনক…

কনকের দু' চোখে বিস্ময়, বেদনা…কি যে না ছিল! সেও অবিচল একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল জগৎ চাটুয্যের পানে…জগৎ চাটুয্যের বাহিরটাই শুধু সে দেখিতেছিল তা, নয়! সে তার দু' চোখের সন্ধানী দৃষ্টিটুকু জগৎ চাটুয্যের মনের মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছিল!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমাদের স্ত্রী-পুরুষের এই সাম্য আর স্বাধীনতা—এতে সব ক্ষেত্রে আমরা ঠিক সামঞ্জস্য রাখতে পারছি না! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বে-দরদের ভাব—অর্থাৎ সহানুভূতির অভাব দেখতে পাচ্ছি। স্বামী ভাবেন, স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়ে মস্ত কর্তব্য পালন করছেন…আর স্ত্রী এ-স্বাধীনতা পেয়ে শুধু বাইরে নেচে-গেয়ে বেড়াচ্ছেন! বাইরের লোকজনের সুখ-দুঃখের পরিচয় নেওয়া, আর বাইরের লোকজনের সঙ্গে ভদ্রতা-লৌকিকতা এবং সামাজিক কর্তব্য রক্ষা করতে গিয়ে সংসার-সম্বন্ধে হচ্ছেন দারুণ উদাসীন! স্বামীকে অনেকে মনে করেন, সংসারে পড়ে আছে

একটা জড় অথচ প্রয়োজনীয় আসবাব বা মেশিন! স্বামীর সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামত সম্বন্ধে অনেক স্ত্রীকে দেখি সম্পূর্ণ উদাসীন, অনাসক্ত···সংসারে সে স্নেহের বাঁধন আর নেই! অনেকে সংসারকে ক্রমে এমন করে তুলছেন যে মনে হয়, সংসার আর সংসার নেই···শুধু দেনা-পাওনার হিসাব কষবার একটা হৃদয়হীন অফিস!

এ কথা শুনিয়া প্রদোষের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। কনক দেখিল, এ সব কথার পিছনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত সুগভীর বেদনা···অকথিত সে-বেদনা বিরাট হইয়া জগৎদার বুকে আজ যেন হিমালয়ের মতো তুঙ্গ গিরি রচিয়া তুলিয়াছে! এ পাহাড়ের নীচে পড়িয়া জগৎদা কি করিয়া যে বাঁচিয়া আছেন···

প্রদোষ কোনো কথা বলিল না···চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কনকও নীরব। ঘরে দারুণ স্তব্ধতা।

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভৃত্য আসিয়া বলিল—একজন বাবু এসেছেন···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বাবু! আচ্ছা, বসাগে যা। আমি আসছি···

ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রদোষকে উদ্দেশ করিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—পালিয়ো না প্রদোষ। দুজনে বসে গল্প করো ততক্ষণ—

জগৎ চাটুয্যে বাহিরের ঘরে আসিলেন···

একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পরণে ধুতি, গায়ে খাকী সার্ট···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—আপনি প্রোফেসর জগৎ চ্যাটার্জী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ···

ভদ্রলোক বলিলেন—গোপনীয় কথা আছে···

গোপনীয় কথা! জগৎ চাটুয্যে চমকিয়া উঠিলেন! তাঁর মনের উপর চন্দ্রমুখীর মূর্তি ভাসিয়া উঠিল!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বলুন···

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি আসছি লালবাজার পুলিশ-অফিস থেকে। আমি পুলিশ-অফিসার···

পুলিশ! চোখের সামনে চন্দ্রমুখীর সে-মূর্তি···জগৎ চাটুয্যে দেখিলেন, যেন কলিকাতার রাজপথে চলন্ত মোটরের তলায় চন্দ্রমুখী পড়িয়া আছে!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বলুন···

ভদ্রলোক বলিলেন—কমিশনার সাহেবের নামে এক-মাসের মধ্যে পাঁচখানি বেনামী চিঠি এসেছে···টাইপ-করা চিঠি···তাতে লেখা আছে, প্রোফেসর জগৎ চ্যাটার্জী তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবীকে খুন করিয়া বাড়ীর মধ্যে লাস পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আপনার থানা-অফিসার একটা তদন্ত করাও উচিত মনে করেন নাই! জগৎ চাটুয্যের মান-ইজ্জৎ আছে বলিয়া খুন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত সুখে বাস করিবেন? আপনাদের পেনাল কোড্‌খানা কি শুধু অসহায় দরিদ্রদের

পীড়নের জন্য লেখা হইয়াছে ?···এই দেখুন মশায়, শেষ চিঠিখানি আমি এনেছি। টাইপ-করা চিঠি। কমিশনার সাহেব ডি-ডির ডেপুটি কমিশনার সাহেবকে পাঠিয়েছেন ···এতে এই নোট্ দেখুন···পাঁচটা চিঠি আসিয়াছে···রিপোর্ট করুন।

কথাটা বলিয়া ভদ্রলোক ফুলস্কাপ-কাগজে টাইপ-করা চিঠি বাহির করিয়া দেখাইলেন।

স্পন্দিত বক্ষে জগৎ চাটুয্যে চিঠি পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন—এ চিঠি কোথা থেকে আসছে ?

ভদ্রলোক বলিলেন—পোস্ট-মার্ক নেই। অর্থাৎ লোক-মারফৎ এ-চিঠি পাঠিয়েছে লালবাজার পুলিশ-অফিসে।

জগৎ চাটুয্যের বুকের উপর যেন কারা হাতুড়ি পিটিতে লাগিল···তাঁর মুখ বিবর্ণ পাংশু···মুখে কথা নাই !

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমাকে ক্ষমা করবেন। মনিবের হুকুম···তবে পুলিশে চাকরি করলেও ভদ্রতা বিসর্জন দিতে পারিনি, মিষ্টার চ্যাটার্জী···তাই দায়ে পড়ে আপনাকে ক'টা প্রশ্ন করবো। দয়া করে আপনি সেগুলির জবাব দেবেন। জবাব পেলেই আমি বিদায় হয়ে যাবো।

একটা বড় নিশ্বাস···জগৎ চাটুয্যে কোনোমতে রোধ করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—বলুন···কি প্রশ্ন করবেন ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবী ?

—হ্যাঁ···

—তিনি এই বাড়ীতেই আছেন ?

—না।

—কোথা গেছেন ?

—জানি না। আমাকে বলে যান নি

—কত দিন গেছেন ?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—এক মাস সাত দিন···

—কোথায় আছেন, সন্ধান পান নি ?

—না।

—কেন ?

—কোথায় সন্ধান নেবো ? তাছাড়া বোঝেন তো, সন্ধান নিতে গেলে আমাদের পারিবারিক-প্রীতি কতখানি, সে কথা দশ-জনের সামনে প্রচার করতে হয়। সমাজে বাস করে কোন্ ভদ্রলোক এ-কথা প্রচার চায় বলুন যে স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল নেই··· স্বামীকে স্ত্রী মানে না ? তিনি যা ইচ্ছা, তাই করে বেড়ান ?

উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক ক্ষণেক নীরব রহিলেন। তারপর বলিলেন—আপনাদের দুজনের···মানে, মনের মিল···

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্বেই জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—আপনি পুলিশে কাজ

করেন,···জানিনা, আপনি আমাদের বাঙালীর সংসারের এতখানি পরিচয় জানেন কি না! জানেন কি, বাইরে থেকে দেখচেন, সংসার দিব্যি চলে যাচ্ছে···স্বামী খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, পয়সা রোজগার করছেন, হাসি-মুখে পাঁচ-জনের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন, লৌকিকতা রক্ষা করছেন—বাড়ীতে এতটুকু রাগারাগি বকাবকি বা তর্কাতর্কি নেই; অথচ মনের মধ্যে ব্যথার ফল্গু-নদী বয়ে চলেছে···বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে মানেন না···স্বামীকে পয়সা-রোজগারের যন্ত্রমাত্র জেনে রেখেছেন···এত-বড় ট্রাজেডি আপনি কল্পনা করতে পারেন?

ভদ্রলোক পুলিশে চাকরি করিলেও প্রাণটাকে পাথরে গাঁথিয়া তুলিতে পারেন নাই। ক্যালকাটা-পুলিশের এ-বৈশিষ্ট্যটুকু তিনি রক্ষা করিয়া চলিতেছেন! তিনি বলিলেন—ক্ষমা করবেন, মিষ্টার চ্যাটার্জী···আমাকে আপনি বিশ্বাস করে আপনার মনের গোপন বেদনার কথা বলছেন···সেইজন্যই আমার এ-কথা বলা···তাছাড়া it is a part of my duty (আমার কর্তব্য), এজন্য খুব একটা delicate (কুণ্ঠিত) প্রশ্ন করতে চাই···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বলুন, কি জানতে চান?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনার স্ত্রীর এমন বন্ধু-বান্ধব কেউ আছেন···যাঁর উপর আপনার এমন সন্দেহ···

কথা শেষ হইল না। কোনো ভদ্রলোক ইহার বেশী বলিতে পারেন না!

জগৎ চাটুয্যে কথাটা বুঝিলেন। বুঝিয়া সনিশ্বাসে তিনি বলিলেন,—ওঁর ব্যবহারে আমার মন এমন নির্লিপ্ত নির্বিকার হয়ে গেছে যে আমি শুধু জানতুম, স্ত্রী একজন মানুষ মাত্র এবং আমার গৃহে তাঁকে রাখা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নেই। এজন্য তাঁর গতিবিধি আচার-ব্যবহারের সম্বন্ধে দু-তিন বছর মনে আমি এতটুকু প্রশ্ন তুলিনি! ···কাজেই যে সন্দেহের কথা বলছেন, তার সঠিক জবাব দিতে হলে বলবো···ওঁর প্রত্যেকটি বন্ধুর উপর আমার সন্দেহ···আবার কারো উপর তেমন সন্দেহ নেই!··· আপনি ঠিক বুঝবেন না,···আপনার এ প্রশ্নে এখন আমার মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে সঠিক একটা ধারণা বা বিশ্বাস আমার থাকা উচিত ছিল। মানে, আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করা, না হয় বোঝা যে এ-সব সন্দেহের বহু উর্ধ্বে তাঁর আসন! ···সন্দেহ-ব্যাপারে আমার মনের অবস্থা কেমন, বলবো? অর্থাৎ মন যেন ত্রিশঙ্কু!—সে না আছে স্বর্গে, না মর্ত্যে!

এ কথার পর ভদ্রলোক পকেট হইতে আরো ক'খানা কাগজপত্র বাহির করিলেন। করিয়া সেগুলার উপর চোখ বুলাইলেন, বুলাইয়া বলিলেন,—আপনার বাড়ীতে কনকলতা দেবী বলে কেউ আছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—আছেন···

—আপনার কে হন?

—দূর সম্পর্কে আমার বোন্ হন্।

—বিধবা?

—হ্যাঁ···

—তাঁর বয়স ?

—কুড়ি-বাইশ বছর।

—সুন্দরী ?

—হ্যাঁ।···কিন্তু কেন বলুন তো, তাঁর সম্বন্ধে এত কথা ?

ভদ্রলোক বলিলেন—তৃতীয় বেনামী-চিঠিতে লিখেছে,—জগৎ চাটুয্যে এক নিঃসম্পর্কীয়া সুন্দরী যুবতীকে তাঁর বাড়ীতে এনে তার সঙ্গে গর্হিতভাবে বাস করছেন। চন্দ্রমুখী দেবীর পক্ষে সে-পাপ অসহ্য বোধ হওয়ায় বহুবার তিনি স্বামীকে সতর্ক করেছেন, ভৎর্সনা করেছেন। তাতে স্বামী জগৎ চাটুয্যে বলেছিলেন—তোমার সহ্য না হয়, সরে পড়ো। তাতে চন্দ্রমুখী দেবী বলেছিলেন, তিনি যাবেন না ; স্বামীর ঘর ছাড়া তাঁর যাবার আর স্থান নেই। তাতে জগৎ চাটুয্যে বলেন,—না যাও, তোমাকে সরিয়ে দেবো···যদি আমাদের সুখের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করো ! এই দেখুন সে চিঠি···

ভদ্রলোক চিঠি দিলেন। জগৎ চাটুয্যে সে-চিঠি পড়িলেন।

পড়িয়া রাগে সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল ! তিনি বলিলেন,—Blasphemous ! মিথ্যা কথা···জঘন্য মিথ্যা···এ কথা লেখা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ চিঠি আমার সেই স্ত্রীই লিখেছেন। আমার নামে কুৎসা প্রচার করবেন, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু এই কনক···আপনি জানেন না···She is an angel···(তিনি দেবী) —pure in body and mind···(দেহে-মনে তিনি পরম-পবিত্রা)···তাঁর নামে এ-সব কথা বলতে যার বাধে না, সে শয়তান···আমায় ক্ষমা করবেন···একজন পুণ্য-হৃদয়া সতীর নামে এত-বড় নিন্দা-অপবাদ আমার অসহ্য ঠেকেছে বলেই এ-কথা বলে ফেলেছি···

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন···

অনেক কথা ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন—বুঝেছি। খুব mysterious (রহস্য-জনক)! এ সব চিঠি মিথ্যা বলেই মনে হয়। কারণ এর মধ্যে এক-বিন্দু সত্য থাকলে এ চিঠির লেখক মেঘের আড়ালে থাকলেও নিজের নামটুকু প্রকাশ করতে পারতেন ! কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে···অর্থাৎ আপনার স্ত্রী আজ এক-মাসের উপর নিরুদ্দেশ···বাইরে হাবে-ভাবে আপনাদের দুজনের মনের অমিল কোথাও প্রকাশ পায়নি,—সেজন্য লোকে জানে, আপনাদের দুজনের সম্পর্ক happy as usual (স্বাভাবিকভাবে সুখময়)···অথচ এতদিন আপনার স্ত্রীর খপর না পেয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন···এটা একটু কেমন-তরো ! আপনি যদি থানায় এইটুকু জানিয়ে রাখতেন যে আপনার স্ত্রী নিরুদ্দিষ্টা, তাহলে কোনো কথা উঠতো না ! এখন···মানে···

এই পর্যন্ত বলিয়া ভদ্রলোক চাহিলেন জগৎ চাটুয্যের পানে।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তা করিনি বলে···আমার অপরাধ ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে তো!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আপনাকে যা-যা বলেছি, তা থেকে কি আমার কৈফিয়ৎ আপনি পর্যাপ্তভাবে পাননি? দুজনের এই আশ্চর্য নির্লিপ্তভাবে বাস...অর্থাৎ স্বাধীন ভাব!

ভদ্রলোক বলিলেন,—মাপ করবেন মিষ্টার চ্যাটার্জী সে নির্লিপ্ত ভাবের সাক্ষী?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—কনক সে-কথা জানে!

ভদ্রলোক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। কহিলেন,—কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দেখলেন তো যে-কথা লেখা হয়েছে...

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—উড়ো চিঠি...ও-চিঠিতে সে যা বলেছে, সেই কথাই মস্ত প্রমাণ হবে? আসল সত্যের চেয়েও উড়ো চিঠির দাম বেশী?...যে এ-চিঠি লিখেছে, সামনে এসে সে এ-কথা বলুক...তাকে জেরা করবার সুযোগ আমায় দিক্...

ভদ্রলোক বলিলেন—সেজন্য রীতিমত ট্রায়াল্ (trial) এবং প্রসকিউশনের এক্তিয়ার আছে একমাত্র শুধু ফৌজদারী-আদালতের।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—প্রয়োজন হয়, করুন আপনারা সেই ট্রায়ালের ব্যবস্থা! সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি এতটুকু কুণ্ঠিত নই...

ভদ্রলোক বলিলেন—কিন্তু এঁকে কোথায় পাই...যিনি এ-চিঠি লিখেছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তাঁকে না পেলেও তাঁর কথা বড় হয়ে থাকবে? আইন এমন কথা বলে?

ভদ্রলোক বলিলেন—সে কথা সত্য। উড়ো চিঠির উপর action নিলে পৃথিবীতে কোনো লোক নিরাপদ থাকতে পারেন না!

—তাহলে কি করবেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—ডেপুটি-সাহেবের কাছে আজকের রিপোর্ট দেবো।

—তারপর?

—তারপর তিনি যা বলেন...অর্থাৎ আমরা হুকুমের চাকর মাত্র...

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বেশ...এতদিন সত্য চুপ করেছিলুম...পারিবারিক কলঙ্ক পাছে প্রচারিত হয়! কলেজে আমাকে গুরুগিরি করতে হয়, সে জন্য আমাকে আদর্শ মেনে বড়-সাবধানে চলতে হয়। কিন্তু এ কলঙ্ক-মোচনের জন্য প্রয়োজন হলে আদালতে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত...সে-জন্য এ-বয়সে যদি চাকরি যায়, নিরুপায়!

কথাটা বলিয়া জগৎ চাটুয্যে নিশ্বাস ফেলিলেন—বেশ বড় নিশ্বাস!

ভদ্রলোক বলিলেন—আজ তাহলে উঠি...নমস্কার!

ভদ্রলোক উঠিলেন।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—নমস্কার! একটা কথা...

ভদ্রলোক বলিলেন—বলুন...

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—মশায়ের নাম?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম হিমাংশু...

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—যদি প্রয়োজন হয়, আপনার ডেপুটি-সাহেবের কাছে গিয়ে আমি আমার জীবনের ট্রাজেডির কথা সবিস্তারে বলতে রাজী আছি···

হিমাংশু বাবু বলিলেন—বেশ···

রূপসী শ্যালিকা

তারপর চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে···

লালবাজার পুলিশ-অফিস হইতে কোনো চিঠি আসিল না···সেই হিমাংশু বাবু ভদ্রলোকটিরও আর দেখা নাই !

জগৎ চাটুয্যে স্থির করিলেন, যে বিষ-বাষ্প মনে উদয় হইয়াছে, বাহিরের নির্মল আব-হাওয়ার স্পর্শ মনে না লাগাইলে এ-বাষ্পভারে-মন সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে···তখন তাঁর পক্ষে সংসারের কর্তব্য সাধন বা দায়িত্ব-পালন অসম্ভব হইবে। তাই তিনি স্থির করিলেন, দশ বারো দিন আর কোথাও না হোক, পুরী ঘুরিয়া আসিবেন।

কনককে এ কথা বলিলেন। বুঝাইয়া দিলেন,—এ বাড়ীর বাতাস বিষিয়ে আছে কনক···ছুজনকে যখন বাঁচতে হবে, তখন ছুদিন পুরী গিয়ে মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা উচিত···

কনক বলিল—তুমি যখন বলছো জগৎদা, বেশ, তাই করো !

তখনি পুরী যাত্রার আয়োজন হইল। আয়োজনে সমারোহ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

যাইবার পূর্বে সেদিন ছুপুর-বেলায় জগৎ চাটুয্যে লালবাজারে গিয়া হিমাংশু বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

হিমাংশু বাবু বলিলেন—স্বচ্ছন্দে পুরী যান, মিষ্টার চ্যাটার্জী। সাহেব রিপোর্ট পড়ে বলেছেন, ও চিঠি নিশ্চয় কোনো ফন্দীবাজের লেখা। মিসেস্ চ্যাটার্জীর চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মনে নানা সন্দেহ···বোঝেন তো, পুলিশে চাকরি করে মন এমন হয়েছে, আগে থাকতেই মানুষকে 'কু' ভেবে বসি ! যতক্ষণ না কেউ নিজেকে 'সু' বলে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারে, ততক্ষণ কাকেও 'সু' বলে মন যেন গ্রহণ করতে চায় না !···ডেপুটি সাহেব সে-ব্যাপারটি ধামা-চাপা রেখেছেন। আপনার কোনো আশঙ্কা নেই। There will be no exposure (এ-কথা প্রকাশ হইবে না)। জানি তো, আমাদের দেশের খপরের কাগজওলাদের···লোক-হিত-ব্রত নিয়েছেন বলে' বড়াই করেন কি না···সে হিত-ব্রত-পালনে ওঁরা মেতে ওঠেন বড়-লোকের কুৎসা রটাতে পেলে···

জগৎ চাটুয্যে কোনো জবাব দিলেন না।

হিমাংশু বলিল—আপনি বাইরে যেতে চান, যান্ ! যতদিন খুশী, সেখানে থাকুন, আমরা আপনার এ ব্যাপারকে খুঁচিয়ে বড় করে তুলবো না, জানবেন···

এ-কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া জগৎ চাটুয্যে চলিয়া আসিলেন।

এবং সেই দিনই রাত্রে পুরী-এক্সপ্রেসে কনককে লইয়া তিনি পুরী যাত্রা করিলেন।

বাড়ীতে রহিল শুধু পুরাতন ভৃত্য ভিখন।

জগৎ চাটুয্যের পুরী যাইবার দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীর দ্বারে একখানা ভাড়াটে-ফিটন্ আসিয়া দাঁড়াইল। ফিটনের আরোহী একজন মহিলা…সঙ্গে লগেজের মধ্যে একটা পুরাতন সুটকেশ এবং বিছানা।

ফিটন হইতে নামিয়া মহিলা সদরের ফটকে আসিলেন। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল…

মহিলার কথায় কোচম্যান্ কোচবক্স হইতে নামিয়া ফটকে বোতাম টিপিল। ভিতরে রিনিরিন্ শব্দে বেল বাজিল; এবং পাঁচ মিনিট পরে ভিখন আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল।

মহিলা গাড়ী হইতে নামিল। ভিখনের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুই এই বাড়ীর বেয়ারা?

ভিখন কহিল—হ্যাঁ…

মহিলা বলিল—তোমার বাবুর নাম জগৎ চাটুয্যে?

ভিখন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ…

মহিলা বলিল—তিনি বাড়ী আছেন?

ভিখন বলিল—আজ্ঞে না। হাওয়া খেতে তিনি আজ দু'দিন হলো পুরী গেছেন।

—একলা?

ভিখন বলিল—না। দিদিমণি সঙ্গে গেছেন।

মহিলার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল…মহিলা বলিল—বাবুর স্ত্রী?

ভিখন বলিল—আজ্ঞে, তিনি তো আজ এক মাসেরও উপর এখানে নেই।

বিস্ময়ে রুদ্ধ-প্রায় স্বরে মহিলা কহিল—এখানে নেই?

—আজ্ঞে, না…

—কোথায় গেছেন?.

ভিখন বলিল—তা বলতে পারি না।

এ কথা শুনিয়া মহিলা ক্ষণেক নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বলিল—হুঁ…আমি জানতুম না। জানলে আসতুম না! তা…তোমার নাম কি?

ভিখন কহিল—আজ্ঞে, আমার নাম ভিখন।

মহিলা বলিল,—আমাকে তুমি চেনো না। কখনো দ্যাখোনি তো! আমি হলুম তোমাদের গিন্নীমার বোন। মায়ের পেটের বোন। তোমাদের গিন্নীমা আমার দিদি হন। আমি পশ্চিমে থাকি। সেখান থেকে কলকাতায় এসেছি চিকিৎসার জন্য। চোখের চিকিৎসা। থাকবার অন্য জায়গা নেই বলে দিদির এখানে এলুম। তা দিদি এখানে নেই…জামাই-বাবু নেই…তুমিই এখন বাড়ীর মালিক…এখানে যদি থাকি, তোমার আপত্তি হবে?

পথের বাতি হইতে আলো আসিয়া ফটকের সামনে মহিলার মুখে পড়িয়াছে। মহিলার বয়স বেশী নয়। সুশ্রী চেহারা। চোখের উপর মোটা-ডাঁটির কালো-চশমা।

এ কথার পর মহিলার মুখ দেখিয়া মনে হয়, চন্দ্রমুখীর চেহারার সহিত কিছু যেন সাদৃশ্য আছে! তা ছাড়া বাঙালী ভদ্র মহিলা…সন্ধ্যার সময় ফিটনে চড়িয়া আসিয়া এ-কথা বলিয়া আশ্রয় চাহিতেছেন…তাঁকে অবিশ্বাস করিবার কি-বা হেতু থাকিতে পারে!

ভিখন বলিল,—নিশ্চয় আসবেন। আপনার লোক এসেছো তুমি…মাসিমা হও… তেনারা নেই বলে চলে যাবেন, তা কি হয়! তবে কষ্ট হবে…

মহিলা বলিল—কষ্ট নয়…ভিখন, তাঁরা নেই, সেজন্য অসুবিধা হবে।…জামাই-বাবু …মানে, তোমার বাবু পুরীতে গেছেন, ঠিকানা দিয়ে গেছেন তো?

ভিখন বলিল—তা রেখে গেছেন বৈ কি…

মহিলা বলিল—তা হলেই হলো। কাল সকালে তাঁকে চিঠি লিখে দেবো।

এ কথা বলিয়া মহিলা আবার গাড়ীর দিকে তাকাইল, তাকাইয়া বলিল,—আমার জিনিষগুলো তাহলে নামিয়ে নাও, ভিখন…আর তোমার হাতে দিচ্ছি দেড় টাকা… জিনিষগুলো নামিয়ে গাড়ীর ভাড়া দেড় টাকা মিটিয়ে দিয়ো…

ভিখনের হাতে দেড়টা টাকা দিয়া মহিলা ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল…কহিল— সোজা গেলেই তোমাদের ঘর?

ভিখন বলিল,—হ্যাঁ…

আধ ঘণ্টা পরে।

মুখ-হাত ধুইয়া বেশভূষা সারিয়া মহিলা ডাকিল—ভিখন…

ভিখন আসিল।

মহিলা কহিল—কি করছিলে?

ভিখন কহিল—আজ্ঞে, বাজার থেকে ঘী-ময়দা কিনে আনলুম।

মৃদু হাস্যে মহিলা বলিল—ঘী-ময়দার কি দরকার, ভিখন? তার চেয়ে এই টাকা দিচ্ছি, নাও…নিয়ে কাছের কোনো দোকান থেকে খাবার কিনে আনো।…কাছে কোনো হোটেল নেই?

ভিখন কহিল—আছে।

মহিলা বলিল—লিখে দিচ্ছি…হোটেল থেকে আমার লেখা-মতো খাবার নিয়ে এসো। দোয়াত-কলম দিতে পারো?

—পারি…বলিয়া ভিখন কাগজ ও দোয়াত-কলম লইয়া আসিল। সে-কাগজে খাবারের ফর্দ লিখিয়া মহিলা ভিখনের হাতে দিল। সেই সঙ্গে একটা টাকা দিয়া বলিল—যাও…খাবার কিনে আনো। আমার জন্য মিছিমিছি কেন আবার রান্নার জোগাড় করবে! বুঝলে?

ভিখন খুশী হইল…এই রাত্রে আবার রান্নাবান্নার হাঙ্গামা…

টাকা ও ফর্দ লইয়া ভিখন চলিয়া যাইতেছিল…

মহিলা ডাকিল—ভিখন…

ভিখন ফিরিল।

মহিলা বলিল—আমি তাহলে তোমার মাসিমা হলুম···আমাকে তুমি মাসিমা বলে ডাকবে···কেমন?

মাথা নাড়িয়া মহিলার কথায় সায় দিয়া ভিখন গেল খাবার কিনিতে।

পরের দিন সকালে ভিখনের হাতের চা ও টোষ্ট-রুটী মুখে দিয়া মহিলা আসিয়া বসিল জগৎ চাটুয্যের বসিবার ঘরে। ভিখনকে টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইল···হোটেল হইতে খাবার কিনিয়া আনিলে খরচে পোষায় না!

ভিখন চলিয়া গেলে মহিলা উঠিয়া সারা বাড়ী ঘুরিয়া পদচারণা করিতে লাগিল··· কেমন যেন দ্বিধা-সংশয়ে বিজড়িত ভাব! কেহ ছিল না···তাই! থাকিলে মনে করিত, মহিলা যেন এখানে কি হারাইয়াছে···সেই হারা-জিনিষের সন্ধান করিতেছে!

এমনি সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া প্রায় এক-ঘণ্টা পরিভ্রমণ-কার্য চলিল···তারপর ভিখন ফিরিল বাজার হইতে।

মহিলা বলিল—তুমি রাঁধতে পারবে? না, আমায় রাঁধতে হবে?

ভিখন রান্নার কাজ জানিত না, এমন নয়। বলিল,—না মাসিমা···আপনি রাঁধবেন কি! আমি রাঁধবো। রাঁধতে আমি জানি। বাবুকে কতদিন নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছি···

মাসিমা বলিল—ও···বটে! তুমি কতদিন আছো ভিখন তোমার বাবুর কাছে?

ভিখন বলিল—তা বারো বছরের উপর।

মাসিমা বলিল—ও···তাহলে তুমি বাড়ীর লোকের মতো হয়ে গেছ!

এ-কথায় ভিখন যেন কৃতার্থ হইয়া গেল! বলিল,—এ বাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ী আমি জানি না, মাসিমা।

মাসিমা বলিল—হুঁ···

সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা নিশ্বাস···

ভিখন চলিয়া যাইতেছিল···মাসিমা ডাকিল—ভিখন···

ভিখন বলিল—ডাকছো মাসিমা?

—হ্যাঁ···

আদেশের প্রতীক্ষায় ভিখন চাহিয়া রহিল মাসিমার পানে।

মাসিমা বলিল—আচ্ছা ভিখন, তোমাদের মা-ঠাকরুণ যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন··· তুমি বলছো এক মাসের উপর···তা তোমার বাবু তাঁর কোনো সন্ধান নিলেন না?

ভিখন মাসিমার পানে চাহিয়া রহিল···কোনো জবাব দিল না।

মাসিমা বলিল—ধরো, তাঁর যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়ে থাকে? যদি মারা গিয়ে থাকেন? এমনও তো হয়···

ভিখন বলিল,—সে-কথা বাবু জানেন, মাসিমা···

মাসিমা বলিল,—আচ্ছা ভিখন, তোমার বাবুর সঙ্গে তোমার মা-ঠাকরুণের বনিবনা ছিল কেমন?

কুণ্ঠিত স্বরে ভিখন বলিল—কোনোদিন ঝগড়া-ঝাঁটি দেখিনি তো। তাছাড়া বাবু মাটীর মানুষ···নিজের কাজ-কর্ম নিয়ে আছেন···কোনো কথায় তিনি থাকেন না।

—আর তোমার মা-ঠাকরুণ?

ভিখন দ্বিধা বোধ করিল। মা-ঠাকরুণের বোন···এক-মায়ের পেটে জন্মিয়াছেন! তাঁর কাছে···

মাসিমা বলিল,—বলো···ভয় কি! আমি তো জানি আমার দিদিকে···ভয়ঙ্কর কড়া মেজাজের মানুষ, আর ভারী একরোখা···যেটি ধরবে, না করে ছাড়বে না। সে স্বভাব এখনো যায়নি···না?

কতক যেন আশ্বাস পাইয়া ভিখন বলিল,—মা-ঠাকরুণের মেজাজটা একটু কড়া, মাসিমা···তাছাড়া তিনি সংসারের কোনো-কিছুতে হাত দিতেন না···তাঁর পার্টি-টার্টি, বন্ধু-বান্ধব···এই নিয়েই তিনি থাকতেন। সংসারের রান্নাবান্না সব-কিছু দেখাশুনা করতো দিদিমণি···

মাসিমার দু'চোখে একটু যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ! মাসিমা বলিল—ও···যে-দিদিমণি তোমার বাবুর সঙ্গে পুরী গেছেন?

ভিখন বলিল,—হ্যাঁ···

মাসিমা বলিল—তোমার দিদিমণি শুনেছি দেখতে পরমাসুন্দরী···আর তার বয়স খুব কম···

ভিখন বলিল,—ঠিক শুনেছেন।

ঈষৎ ভ্রূ-ভঙ্গী-সহকারে মাসিমা বলিল—আরো শুনেছি, তোমাদের বাবুটি এই দিদিমণির সঙ্গে···মানে, একটা বিশ্রী সম্পর্ক···

জিভ্ কাটিয়া ভিখন বলিল—ও কথা মুখে আনবেন না মাসিমা। দিদিমণির মতো মানুষ আমি দেখিনি! একালে দেখছি তো আরো পাঁচজনকে···দিদিমণি সতীলক্ষ্মী··· কম-বয়সে বিধবা হয়েছেন···তা কত ভালো, সে আর কি বলবো মাসিমা! আর আমার বাবু? তিনি দেব-চরিত্র। তাঁর নামে যে কলঙ্ক দেয়, সে বেহদ্দ বেহায়া··· বুঝলেন মাসিমা···

মাসিমা মন দিয়া ভিখনের কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল—হুঁ···

নৃমুণ্ড

মাসিমা সদাই মৌন-মুখী···যেন কি গভীর চিন্তা তাঁর মনকে কালো মেঘের মতো ছাইয়া রহিয়াছে! সে-মেঘ মুখের উপরেও মলিন ছায়া বিছাইয়া দিয়াছে।

ভিখন বিস্ময়-বোধ করিল! ভাবিল, দু'তিন দিন কথা কহিয়াই মাসিমার সব কথা শেষ হইয়া গেল? বলিয়াছিলেন, বাবুকে চিঠি লিখিবেন···পুরীর···ঠিকানা চাহিবেন! কিন্তু ক'দিন কাটিয়া গেল, সে-কথা মাসিমা ভুলিয়া গেল না-কি?

তাছাড়া তার কাছে আর-একটি বিষয় ভারী আশ্চর্য লাগিতেছিল···মাসিমা সব-সময় ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন! চোখে কালো চশমা···সে-চশমা এক-নিমেষের জন্য

খুলিতে চান্ না! চোখের অসুখ, সেজন্য কালো চশমা খুলিবার জো নাই! কিন্তু কৈ, এক দিনেও চোখ দেখিতে না আসিল কোনো ডাক্তার···না মাসিমা নিজে গেলেন কোনো ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাইতে···

মা-ঠাকরুণের জন্য ভিখন কখনো মাথা ঘামায় নাই। আজ মা-ঠাকরুণ এখানে নাই, তাঁর ছোট বোনের জন্য মাথা-ঘামানো সে অত্যাবশ্যক মনে করিল না! তার উপর মুস্কিল হইয়াছে এই যে রান্নাবান্নার কাজ বহু দিন ছাড়িয়া দিয়াছিল। আজ আবার মাসিমার জন্য রান্নাবান্নার কাজে নূতন করিয়া লাগিতে হইয়াছে, এ কি কম দুর্ভোগ! অন্য কেহ আসিলে এতখানি দুর্ভোগ হয়তো হইত না! কিন্তু মেজাজী মা-ঠাকরুণ···ইনি তাঁর বোন্! কে জানে, বোনের মেজাজ দিদির মতো কি না!

বৈকালের দিকে ভিখন চা আর টোষ্ট তৈরী করিয়া মাসিমার পরিচর্যার উদ্দেশ্যে মাসিমার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসিমা আসিয়া মা-ঠাকরুণের ঘর ও শয্যাদি অধিকার করিয়াছেন।

দ্বারের সামনে পর্দা। পর্দার এদিক হইতে ভিখন ডাকিল,—মাসিমা···

গাঢ় স্বরে উত্তর আসিল—ভিখন?

ভিখন কহিল—চা আর টোষ্ট এনেছি···

মাসিমা বলিল—ও···আচ্ছা, ভিতরে দিয়ে যাও।

ভিখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মাসিমা চোখের উপর চশমা আঁটিতেছেন ···ভিখন দেখিল, দেখিয়া বুঝিল। মাসিমা চশমা খুলিয়া শুইয়াছিলেন; এখন আবার চোখে চশমা আঁটিতেছেন···

পশ্চিম-দিককার খোলা খড়খড়ি দিয়া খানিকটা উজ্জ্বল রৌদ্র আসিয়া ঘরে পড়িয়াছে···সে-রৌদ্রে ঘরে বেশ আলো ছিল···ভিখন মাসিমার পানে চাহিল। চাহিবামাত্র মনে হইল, মাসিমার মুখের সঙ্গে মা-ঠাকরুণ চন্দ্রমুখী দেবীর মুখের আশ্চর্য রকম মিল আছে! মুখের গড়ন ও ছাঁচ, নাকের গড়ন···মাথার চুলগুলা পর্যন্ত মা-ঠাকরুণের মতো···তেমনি কোঁকড়ান কালো! গায়ের রঙও চম্পক-গৌর···তবে মাসিমাকে দেখিলে মা-ঠাকরুণের চেয়ে বয়সে ছোট মনে না হইয়া বড় বলিয়া মনে হয়!

নিঃসঙ্গ একা এমন করিয়া পড়িয়া থাকা···মাসিমা ভাবিতেছিল, সহ্য হইবে না! মাসিমা ডাকিল—ভিখন···

ভিখন জবাব দিল—মাসিমা···

মাসিমা বলিল—এমন করে থাকা যাবে না। তাছাড়া আমার এই চোখের অসুখের জন্য দু-একজন লোক না পেলে কার সঙ্গে কথা কবো? খোলা চোখ হলে তোমার বাবুর এত বই রয়েছে, পড়া যেতো! কিন্তু এ-চোখে যখন বই পড়া যাবে না, ভাবছিলুম, তোমার মা-ঠাকরুণের বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই···যারা তোমার মা-ঠাকরুণের কাছে আসতো? তাহলে তাদের হাতে-পায়ে ধরে একটু ভাব-সাব করি।

ভিখন বলিল—আমি তো তেনাদের সকলকে চিনি না···তবে ঐ ব্রতীন বাবু বটে ·হামেশা তিনি আসতেন···

মাসিমা বলিল—ও, ব্রতীন বাবু! তা তুমি জানো সেই ব্রতীন বাবুর বাড়ী?

ভিখন বলিল—জানি···

মাসিমা বলিল—পারো সে-বাড়ীতে চিঠি নিয়ে যেতে···আমি যদি চিঠি লিখে দি?

ভিখন বলিল,—যাবো···

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ভিখন বাড়ী নাই, চিঠি লইয়া ব্রতীন্দ্রর বাড়ী গিয়াছে···বাহিরের ফটক বন্ধ···

মাসিমা? তাঁর মাথা খারাপ হইল না কি? মাসিমা অন্দরের উঠানে চারিদিককার আবর্জনা ঠেলিয়া-ঠ্যাঙাইয়া বেড়াইতেছেন কেন?

সেই গহ্বর···তার উপর মাটী জমিয়া জায়গাটা দেখাইতেছে যেন মানুষের পিঠের কুঁজের মতো!

মাসিমা সেই কুঁজের মতো ঢিপিটাকে খোঁচাইতে লাগিল···মাটীর জমাট স্তূপ খসিয়া ভিতরে গহ্বর দেখা দিল···সঙ্গে সঙ্গে একটা গলিত পচা দুর্গন্ধ···

মাসিমা নাক সিঁটকাইয়া সরিয়া আসিল!

প্রথমে গেল বাথ-রুমে···সাবান মাখিয়া মুখ-হাত ধুইয়া মাসিমা বেশ-ভূষায় প্রসাধন সারিল। তারপর আয়নার সামনে আসিয়া···

আয়নার সামনে মাসিমার চশমা-খোলা মূর্তি যদি ভিখন দেখিত···

সে-মূর্তি দেখিয়া কি করিত জানিনা···কিন্তু সে-মূর্তি দেখিয়া মাসিমা মৃদু হাস্য করিল। সরল মৃদু হাসি নয়, বক্র হাসি। এ-হাসিতে মনের মধ্যকার কালি ঝরিয়া পড়ে!

ওদিকে ফটকে বেল বাজিল···

মাসিমা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল···ভিখন ফিরিয়াছে? ইহার মধ্যে?

মাসিমা তাড়াতাড়ি বেশভূষা সারিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া ফটকের কাছে আসিল। ফটক খুলিয়া দেখে, ফটকের বাহিরে এক তরুণ যুবা···

মাসিমা বলিল—আসুন···

তরুণ ভিতরে আসিল।

সেই বসিবার ঘর। বিস্ময়ে তরুণ যেন স্তম্ভিত!

মৃদু হাস্যে মাসিমা কহিল—আমায় দেখে অবাক হয়েছেন খুব, না? কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই! জগৎ বাবু আমার ভগ্নীপতি! তিনি পুরী গেছেন সুয়ো-রাণী কনকলতাকে নিয়ে। আমি হলুম জগৎ বাবুর শ্যালী। মানে···তাঁর স্ত্রী চন্দ্রমুখী আমার দিদি···মায়ের পেটের বোন। আমি ছোট। আমার নাম কমলমুখী।

আলাপ-পরিচয় হইল। তরুণের নাম প্রদোষ। প্রদোষ বলিল, এ বাড়ীর সঙ্গে

তার খুব বন্ধুত্ব। এ বাড়ীর এই প্রোফেসর চাটুয্যে এবং কনকলতা দেবী ভিন্ন এত-বড় এই কলিকাতা-সহরে তার পরিচিত জন আর কেহ নাই। এখানে সে যে প্রীতি-স্নেহ লাভ করিয়াছে…

কমলমুখী মন দিয়া তরুণ প্রদোষের কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল—তরুণী বন্ধুটি শুনেছি মায়া-বিদ্যা জানে। আমার দিদি অনেকদিন আগে আমায় লিখেছিল—অনেক দুঃখের কথা !…আপনাদের এই কনকলতার নাম আমার অজানা নয়। দিদি এই কনকের কথাই লিখেছিল।

কথাগুলো প্রদোষের বিশ্রী লাগিল। সে জানিত, কনককে সঙ্গে করিয়া জগৎ চাটুয্যে বাহিরে যাইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন পুরী যাইবেন! কিন্তু হঠাৎ এলাহাবাদ হইতে টেলিগ্রাম আসে। সে টেলিগ্রাম পাইয়া প্রদোষকে তখনি এলাহাবাদে যাইতে হয়…এ-বাড়ীতে খপর পাঠাইতে সময় পায় নাই! আজ সে এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়াছে এবং ফিরিয়া এখানকার খপর লইতে আসিয়াছে…

কমলমুখীর কথা শুনিয়া প্রদোষের মনে হইল, এ-ঘর এখনি ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচে! প্রদোষ বলিল,—আমি তাহলে আসি…

কমলমুখী যেন রুখিয়া উঠিল! কহিল—না। আমার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার সে-ইচ্ছা আছে। আমি এখানে এসেছি চোখের চিকিৎসা করাতে…এসে এখানকার অবস্থা যা দেখলুম আর শুনলুম, …আমার দিদি নিরুদ্দেশ…সঙ্গে সঙ্গে জামাই বাবুকে দেখছি না, আপনাদের মায়াময়ী কনকলতাকেও দেখছি না…

এ-সব কথার পিছনে যে কদর্য ইঙ্গিত…প্রদোষ বিরক্ত হইল! এ বয়সের কোনো ভদ্র মহিলা এ যুগে এমন ইতর কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা ছিল তার ধারণার অতীত। কমলমুখী যদি কমলমুখী না হইয়া কমলবাবু হইত, তাহা হইলে এ-কথার সমুচিত উত্তর দিতে তার বাধিত না! কিন্তু এ তো কমলবাবু নয়—এ যে কমলমুখী!

প্রদোষ বলিল—আমি বাইরের লোক…আমার কাছে এ-সব কথা বলছেন…

কমলমুখী বলিল—এখন আপনার কাছে বলছি, কাল হয়তো দেশের সকলকে ডেকে বলতে হবে। এসে আমি চোখে যা দেখছি আর কাণে যা শুনছি…একটু ধৈর্য ধরুন প্রদোষবাবু…এখানে স্বামী-স্ত্রীর মনোবৃত্তি নিয়ে করুণ ঘটনা সাজিয়ে পারিবারিক উপন্যাস তৈরী হয়নি…আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, এখানে একেবারে যাকে বলে, মার্ডার-ড্রামা…(হত্যামূলক নাটক) তাই ঘটে গেছে।

এ কথার পর প্রদোষ আর বসিতে পারিল না…চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলমুখী তখন নারী-সুলভ বিনয়-লজ্জা-ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রদোষের দুই হাত ধরিয়া তাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল। বলিল,—একটু বসুন…আপনারা বন্ধু-লোক …আপনারা যদি দিদির দুঃখ না মোচন করেন, পাপের প্রশ্রয় দ্যান যদি, তাহলে মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা করছেন বলে যত বড়াই করুন, অবলা মেয়ে-জাতের প্রাণগুলো বাঁচবে কি করে? মনগুল্লো সুস্থ অটুট থাকে কি করে?…

অপরিচিতা মহিলা জোর করিয়া বসাইয়া দিয়াছে, প্রদোষ বিস্ময়ে কাঠ! তার চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়াছে···

এবং তার নিশ্চেতন মূর্তির সামনে দিয়া কমলমুখী এ-ঘর হইতে চলিয়া গেল; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল···চোখে এ-দৃশ্য প্রদোষ দেখিল—স্বপ্নাভিভূতের মতো···

কমলমুখী ফিরিয়া আসিল, তার হাতে একতাড়া চিঠি···

প্রদোষের সামনে চিঠির তাড়া ধরিয়া কমলমুখী বলিল—সব আমার দিদির হাতের লেখা···আপনি হয়তো চেনেন না! কিন্তু আমি চিনি। দয়া করে চিঠিগুলো পড়ুন। আপনাকে পড়তেই হবে।···আচ্ছা, সব চিঠি যদি না পড়েন, অন্ততঃ শেষের চিঠিখানা পড়ুন। এ চিঠি দিদি লিখেছিল। আমি তখন পুনায়। সেখানকার লছমী দেবী কন্যা-বিদ্যালয়ে আমি হেড্ মিষ্ট্রেস্। এ চিঠি যখন পাই, তখন আমার চোখের অসুখ খুব বেশী···চোখ একটু সারবামাত্র ওখানকার ডাক্তাররা বললেন, কলকাতার মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভালো রকম চিকিৎসা করাতে হবে, না হলে এ জন্মের মতো অন্ধ হয়ে থাকতে হবে!···সেজন্য বটে, তার উপর দিদির ঐ চিঠি···না এসে পারলুম না! তবু আসবার সময় ভাবিনি, এসে দেখবো এখানে এমন কাণ্ড হয়ে গেছে!

কথাটা বলিয়া তাড়া হইতে একখানি চিঠি লইয়া কমলমুখী দিল প্রদোষের হাতে। চিঠি না পড়িয়া চলিয়া যাইবে উপায় নাই, কমলমুখী কি রকম ইম্‌পালশিভ, এটুকু সময়ের মধ্যে প্রদোষের তাহা বুঝিতে বাকী নাই!

দায়ে পড়িয়া সে চিঠি পড়িল···

এ কি ভাষা! প্রদোষের মনে হইতেছিল কলেজে পড়া ম্যাকবেথ নাটক···সে নাটকে সেই লেডি ম্যাকবেথ···

নানা কথার সঙ্গে চন্দ্রমুখী লিখিয়াছে,

> চোখের উপর নিজের ঘরে এ অভিসার-লীলা আর দেখা যায় না কমল। বললে তুই বিশ্বাস করতে পারবি, দুজনে একসঙ্গে আছেন সব সময়ে? তোমার ভগ্নীপতির শয়ন এখন কনক-মন্দিরে! আমি স্ত্রী, আমার মান-মর্যাদা এমন করে লুটিয়ে দেবেন—সহ্য করার কথা নয়। তবু পাঁচজনে পাছে হাসে, এই জন্য আমি সব দেখে-শুনেও নীরবে সহ্য করছি!···
>
> পরশু দিন ওঁদের অনাচার আর নির্লজ্জতা আমার অসহ্য হয়! কেঁদে আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম—এতে তোর পণ্ডিত এবং প্রোফেসর ভগ্নীপতি কি করলেন, জানিস্? আমার চুলের মুটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরের কোণে মুখ গুঁজড়ে ফেললেন; আমার বুকে-পিঠে সজোরে জুতা-শুদ্ধ লাথি মারলেন। তারপর ওঁর পেয়ারের কনকলতা আমাকে চিম্‌টে রক্তাক্ত করে দিলে। আমি বললুম—ছেড়ে দাও···আমি পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকের দোরে ভিক্ষে করে খাবো তবু এখানে থাকতে পারবো না! এ কথায় তোমার ভগ্নীপতি বললেন,—কেটে কুচিকুচি করে ফেলবো! আর কনক বললে—কেটে উঠোনে মাটীর নীচে পুঁতে রাতারাতি তোমায় গোর দেবো।

প্রদোষ শিহরিয়া উঠিল! লেখা দেখিয়া অবাক হইল! এ কি লেখা!…যেন বিষধর সর্প ছত্রে-ছত্রে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে! প্রদোষের মাথা ঘুরিল…সে একেবারে স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, চেতনাহীন…

সহসা কমলমুখীর স্বর কাণে গেল। কমলমুখী বলিল,—একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন প্রদোষ-বাবু? বিশ্রী দুর্গন্ধ? কুকুর-বেরাল পচে গেলে যেমন দুর্গন্ধ বেরোয়…তেমনি?

প্রদোষ নিশ্বাস-বায়ু নিয়ন্ত্রিত করিল! দুর্গন্ধ বটে…গলিত শবের দুর্গন্ধ…

কমলমুখী বলিল—এসে অবধি এ দুর্গন্ধ পাচ্ছি। একটু বসুন দয়া করে। আমি দেখি, কোথায় কি পচলো…

কথাটা বলিয়া কমলমুখী বাহির হইয়া গেল।

প্রদোষ ক'বার ভাবিল, এই অবসরে সরিয়া পড়িবে! কিন্তু পারিল না। কে যেন তাকে পেরেক মারিয়া চেয়ারের সঙ্গে আঁটিয়া বসাইয়া দিয়াছে!…

কমলমুখী ফিরিল, ফিরিয়া প্রদোষের পানে চাহিয়া বলিল,—একবার আসবেন আমার সঙ্গে ভিতরের উঠোনে?

যন্ত্র-চালিতের মতো প্রদোষ আসিল কমলমুখীর সঙ্গে ভিতরের উঠানে।

তারপর…যেন একটা দুঃস্বপ্ন!

সে স্বপ্ন ভাঙ্গিলে প্রদোষ দেখিল, উঠানের এক জায়গায় মাটীর মধ্য হইতে উপরে-তোলা শাড়ী-ব্লাউশ-জড়ানো গলিত শব…অস্থিগুলা কোনো মতে টিঁকিয়া আছে… গায়ে মাংস ব্যাজ্‌ব্যাজ্ করিতেছে!…মাথার খুলি…তার সঙ্গে দীর্ঘ কালো কেশের গুচ্ছ।

শিহরিয়া প্রদোষ চক্ষু মুদিল। বীভৎস দৃশ্য! তেমনি দুর্গন্ধ! এ গন্ধে প্রাণ বাহির হইয়া যায়!

পুরাতন প্রসঙ্গ

ঝড় উঠিলে পৃথিবীর বুকে চকিতে যেমন বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যায়—ঠিক তেমনি ঘটিল। থানা, পুলিশ, নালিশ, এজেহার, গ্রেফ্‌তার…

জগৎ চাটুয্যে এবং কনকলতা—পুরীর পুলিশ দুজনকে কলিকাতা-পুলিশের কথামতো গ্রেফ্‌তার করিয়া কলিকাতায় পাঠাইল।

বাড়ীর উঠানের মধ্য হইতে যে-লাশ পাওয়া গিয়াছে, সে-লাশ দেখিয়া মানুষ চেনা অসম্ভব! তার মাথার কেশ প্রভৃতি দেখিয়া পুলিশ-সার্জন বলিলেন, স্ত্রীলোকের দেহ। বয়স তিনি বলিলেন, আনুমানিক পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। লাশের অঙ্গে যে-শাড়ী-ব্লাউশ পাওয়া গিয়াছে, সে শাড়ী-ব্লাউশ চন্দ্রমুখীর। জগৎ চাটুয্যে তাহা স্বীকার করিলেন, কনকলতাও স্বীকার করিল…

তার উপর কমলমুখীর কাছে চিঠি ছিল…চন্দ্রমুখীর লেখা চিঠি। জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—চিঠির হস্তাক্ষর চন্দ্রমুখীর, তাহাতে সন্দেহ নাই!

—তবে চিঠিতে যে-সব কথা লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা! শুধু মিথ্যা নয়,

ফন্দী-প্রসূত! কনককে তিনি জানেন, তাঁর বোন! কনকের মতো নিরীহ সরল ও ভালো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না! বেচারী নিঃসহায় নিঃসম্বল! জগৎ চাটুয্যে মমতা-বশে তাকে আশ্রয় দিয়াছেন! সে আশ্রয়ের বিনিময়ে জগৎ চাটুয্যের সংসারকে বাসুকির মতো বেচারী মাথায় বহিতেছে! সে-কাজে তার ক্রটি নাই, শৈথিল্য নাই! অথচ চন্দ্রমুখীর কাছে সে পাইয়াছে শুধু গঞ্জনা, ভৎর্সনা আর কুবাক্য···সে যেন বাঁদী··· অথচ এখানে দাসীবৃত্তি করিয়া কনক কখনো একটা পয়সা চাহে নাই!

কনক কাঁদিল। কাঁদিয়া সে কহিল, জগৎ চাটুয্যেকে সে জানে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো···বড় ভাই! তার সম্বন্ধে যে-সব কথা রটিয়াছে···শুনিয়া তার বাঁচিবার বাসনা নাই এক বিন্দু! যদি খুনের দায়ে ফাঁশি-কাঠে তাকে প্রাণ দিতে হয়, মরিয়া কনক সব যাতনা, সব অপমান ভুলিয়া বর্তাইয়া যাইবে!

এদিকে লাশ পাওয়া গিয়াছে···লাশের গায়ে চন্দ্রমুখীর শাড়ী-ব্লাউশ এবং চন্দ্রমুখী নিরুদ্দেশ···স্বামী জগৎ চাটুয্যে তাঁর কোনো সন্ধান করেন নাই, কোনো তত্ত্ব লন নাই··· স্বামী হইয়া এমন নির্বিকার ভাব···

বিশেষ পুলিশ কমিশনারের নামে আগেকার সেই সব বেনামী চিঠি! ঘটনাচক্র যেভাবে ঘুরিল, ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, কোর্টে এ ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন!

এ মকর্দমার বৃত্তান্ত লইয়া কলিকাতা সহরে একেবারে হুলস্থূল বাধিয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে জামিন মিলিল। পয়সা খরচ করিয়া প্রদোষ বড় কৌশুলী নিয়োগ করিল! কৌশুলী জামিনের প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, জগৎ চাটুয্যে শুধু নিরীহ প্রোফেসর নন, তাঁর সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে ঘুণাক্ষরে কেহ কখনো একটি কথা উচ্চারণ করিতে পারে না! তিনি বিচারে বাধা দিবেন না। তাছাড়া শুধু উড়ো চিঠি আর শাড়ী-ব্লাউশের উপর নির্ভর করিয়া খুনী সাব্যস্ত করা উচিত হইবে না। যেহেতু লাশও সনাক্ত হয় নাই। সবটা শুধু অনুমান!

ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনে খালাশ দিলেন—জগৎ চাটুয্যে এবং কনকলতাকে।

দুজনকে লইয়া প্রদোষ আরাম-বাগে ফিরিল।

কমলমুখী কিন্তু গৃহে নাই···কোথায় গেল?

ভিখন বলিল,—তিনি আজ পাঁচ-সাতদিন হলো চলে গেছেন। বললেন, যে-বাড়ীতে আমার দিদি খুন হয়েছে, সে-বাড়ী নরক! এই কথা বলে চলে গেছেন।

প্রদোষ বলিল—আপদ গেছে! মহিলা নন্···বাঘিনী!

তারপর প্রদোষের সঙ্গে বাসে একদিন হিমাংশুর দেখা। ডি, ডি, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর হিমাংশু···উড়ো চিঠি লইয়া যে-হিমাংশু গিয়াছিল প্রথম-তদারকে।

হিমাংশু বলিল—ব্যাপারটা দারুণ সন্দেহ-জনক। আপনারা একবার ডিটেকটিভ

সমর মিত্তিরের সঙ্গে দেখা করুন। সময় আছে। তিনি আমাকে বলছিলেন, ব্যাপারটা সাজানো বলে মনে হয়···এবং এ গল্প যে সাজিয়েছে, সে যদি সুযোগ পায়, তাহলে ক্রাইম-ড্রামার রাজ্যে যুগান্তর আনতে পারবে···

প্রদোষ বলিল—সাজানো, তা আমরা বুঝছি···কিন্তু কোথা দিয়ে এ-গল্পের গ্রন্থি খুলবো, বুঝতে পারছি না, মশায়।

হিমাংশু বলিল—আপনি আজই সমর বাবুর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি ম্যাটারটা টেক্-আপ্ করেন, তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দিয়ে এনকোয়ারি করান্।

প্রদোষ গিয়া সমর মিত্রের সঙ্গে দেখা করিল। সব কথা তাঁকে খুলিয়া বলিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—জগৎ বাবুর শ্বশুর-বাড়ীর দিকে এই একটি চতুরা শ্যালিকা ছাড়া আর কেঁউ বেঁচে নেই?

প্রদোষ বলিল—তা আমি জানিনা স্যর। আমার সঙ্গে কদিনের বা আলাপ! তবু এটুকু আলাপ থেকে বলতে পারি, অমন মানুষ পূর্বে আমি আর দেখিনি! আর ওঁর ঐ ভগ্নী কনক দেবী···she is an angel (দেবী)···so selfless (স্বার্থ-লেশ-হীনা)!

কথাটা বলিবার সময় মায়ায় মমতায় প্রদোষের কণ্ঠ বিগলিত হইল।

সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রদোষের পানে চাহিলেন ···চাহিয়া একটু হাসিলেন। তারপর বলিলেন—জগৎ বাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আমার নেই···কিন্তু তাঁর কথা আমি লোক-মুখে শুনেছি। শুনেছি ভদ্রলোক যেমন পণ্ডিত, তেমনি সরল অমায়িক···বহু দুঃস্থ ছাত্রকেও নাকি প্রচুর সাহায্য করেন!

প্রদোষ কহিল—আমিও সে-কথা শুনেছি···

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বেশ বুঝতে পারছি···এর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা শয়তানী অভিসন্ধি আছে! এবং সে-অভিসন্ধির মূলে···

প্রদোষ বলিল,—কে ওঁর এমন শত্রু থাকতে পারে, স্যর? তাছাড়া ওঁকে এ বিপদে ফেলে তার কি লাভ হবে?

সমর মিত্র বলিলেন,—আপনাদের তরুণ সমাজে একটা কথা আছে Art for Art's sake···তেমনি জানবেন, সংসার-ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর লোক আছে তারা বদমায়েসী করে for বদমায়েসীর sake! এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস, ফন্দীবাজের মনে প্রচণ্ড আক্রোশ আছে। তাছাড়া জগৎ বাবু নিঃস্ব নন···বিষয়-সম্পত্তি আছে···লাইফ-ইন্সিওরেন্সও আছে নিশ্চয়···

প্রদোষ বলিল,—মানলুম, তাই! কিন্তু ওঁর ছেলেপুলে নেই···স্ত্রী নিরুদ্দেশ··· আপনি বলতে চান, ওঁর যিনি ওয়ারিশন হবেন, তিনি এ-কীর্তি করেছেন?

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—না। আমি এমন কোনো কথা বলিনি। তবে একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি, পারেন তার জবাব দিতে?

প্রদোষ বলিল,—করুন, কি প্রশ্ন করবেন···

সমর মিত্র বলিলেন,—এই যে রহস্যময়ী মহিলাটি এলেন···আসবামাত্র লাশ আবিষ্কার হলো···এঁর এই হঠাৎ আসা এবং আসবামাত্র উনি একেবারে কলম্বাশকে টেক্কা দিলেন···এ মহিলাটি কে, খপর নেছেন ?

প্রদোষ বলিল,—উনি জগৎ বাবুর শ্যালী···অর্থাৎ চন্দ্রমুখীর বোন···ছোট বোন··· নাম কমলমুখী···

সমর মিত্র কোনো জবাব দিলেন না···মৃদু হাস্যে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রদোষ বলিল,—আপনি বলতে চান···

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বলছি, তদারক যদি করতে হয় তো সে-তদারক হওয়া উচিত এই কমলমুখীর সম্বন্ধে···from start to finish···

পরের দিন সমর মিত্র আসিলেন জগৎ চাটুয্যের গৃহে···প্রদোষ সঙ্গে ছিল।

জগৎ চাটুয্যে চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন···নিস্পন্দ পুতুলের মতো !

প্রদোষ বলিল,—ইনি সমর বাবু···ক্যালকাটা পুলিশে ডিটেকটিভ বিভাগে খুব অভিজ্ঞ অফিসার···

জগৎ চাটুয্যের দুই চোখ শুধু সমর মিত্রের পানে ফিরিল···

সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন, নিভিবার পূর্বে প্রদীপের শিখায় যেমন দীপ্তি ফোটে··· জগৎ চাটুয্যের চোখের দৃষ্টি তেমনি ! বুঝিলেন, দুঃখে, অপমানে, ক্ষোভে, বেদনায় ভদ্রলোকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে !

সমর মিত্র বলিলেন—সব কথা আমি শুনেছি···পুলিশের ডায়েরিতে যা আছে, আমার তা অজানা নেই। আপনাকে এটুকু বলতে পারি, প্রমাণের উপর সেশন্সের বিচারে কোনদিন কারো সাজা হয়নি···simply on circumstantial evidence (শুধু এমন ঘটনাচক্রের সম্ভাব্যতা-প্রমাণের উপর)। পুলিশের এতে অপরাধ নেই। পুলিশের কর্তব্য, প্রমাণ বাছাই করা···দু পক্ষেরই ! কিন্তু সে সব ঘটনা-প্রমাণের উপর বিচার-নিষ্পত্তি করবার ভার পুলিশের নয়, সে ভার সরকার দিয়েছেন হাকিমদের হাতে।···আপনি সব জানেন···আমার বলা হয়তো প্রগল্ভতা···তবু যে বললুম, তার কারণ, নিজের বিপদে মানুষ এত বেশী কাতর হয়ে পড়ে যে, সে-বিপদের গুরুত্ব বা লঘুত্ব সম্বন্ধে তার কোনো চেতনা থাকে না। ডাক্তারের বাড়ীতে কারো রোগ হলে যেমন বাইরের ডাক্তারকে ডাকা হয় সে-রোগীর চিকিৎসার জন্য,··· ঘরের ডাক্তার সে-রোগীর চিকিৎসার ভার পরের হাতে দেন···

এ-কথার পরেও জগৎ চাটুয্যে কোনো জবাব দিলেন না···চিত্র-করা চোখের দৃষ্টি লইয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। অবিচল দৃষ্টি !

প্রদোষ কহিল,—আপনারা কথা কন্ সমর বাবু···কনক বেচারী ভিতরে আছেন। তাঁর অবস্থাটা আমি একবার দেখে আসি···

সমর মিত্র বলিলেন—যান্…

প্রদোষ চলিয়া গেল।

প্রদোষ চলিয়া গেলে সমর মিত্র বলিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্…মামলায় কিছু হবে না! তবে মান-ইজ্জৎ? আমার বিশ্বাস, আদালতের বিচারে এ কলঙ্ক যখন কেটে যাবে, তখন রাহুমুক্ত শশীর মতো আপনার ইজ্জতের দীপ্তি ঢের-বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! দেশের লোক আপনাকে আরো বেশী সন্মান করবে, দেখবেন! অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা দেবীর সম্মান বেড়েছিল, কমেনি!

কথাগুলি জগৎ চাটুয্যের বেদনা-তপ্ত মনের উপর প্রলেপের মতো স্নিগ্ধ মনে হইল।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে ছোট-খাট ক'টী কথা জিজ্ঞাসা করবো…দয়া করে তার জবাব দেবেন?

মস্ত একটা নিশ্বাস জগৎ চাটুয্যের বুকখানাকে চূর্ণ করিয়া বাহির হইল…জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বলুন…

তাঁর স্বর অস্ফুট মৃদু।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার শ্বশুর-বাড়ীর কেউ বেঁচে আছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ শুধু বেঁচে আছেন…

—তিনি কোথায় আছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তিনি থাকেন হরিদ্বারে। তাঁর গুরুদেব আছেন…সেই গুরুদেবের আশ্রমে। আমি তাঁকে মাসে মাসে দশটি করে টাকা পাঠাই…

সমর মিত্র বলিলেন—কমলমুখী আপনার শ্যালী, সত্য?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তা আমি জানি না।

সমর মিত্র বিস্মিত হইলেন! কহিলেন—জানেন না! আপনার স্ত্রীর কটি ভাই? কটি বোন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমি তা জানি না। সত্যি, কথাটা হেঁয়ালির মতো। কিন্তু হেঁয়ালি কেন, তা বুঝবেন যদি আমি আমার বিবাহের ইতিহাস আপনাকে বলি…

সমর মিত্র বলিলেন—যদি আপত্তি না থাকে, ভাবেন বললে ভালো হবে…এ-কথা অবশ্য কোনোদিন প্রকাশ পাবে না…

জগৎ চাটুয্যে চুপ করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—এম-এ পাশ করে প্রথমে আমি চাকরি পাই মফঃস্বলে শ্রীর‍্যার্স কলেজে। সেখানে চার বছর কাজ করবার পর বেটার্ প্রসপেক্টর…আমি এলুম কলকাতার কলেজে…। এ কলেজে আসবার পর আমার এই বাড়ীতে আস্তানা নিলুম। এ বাড়ী ছিল জয়েণ্ট…জ্ঞাতিদের টাকা-কড়ি দিয়ে এ-বাড়ী আমি কিনলুম; সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে টুইশনি জুটলো। এক-বাড়ীতে দুটি মেয়েকে পড়াতুম। তার একটি মেয়ের নাম মধুমতী। আমার স্ত্রী চন্দ্রমুখী ছিলেন এই মধুমতীর বন্ধু। চন্দ্রমুখী বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করতেন!… একদিন কেঁদে চন্দ্রমুখী আমার বাড়ীতে এসে পড়লেন। বললেন, বিবাহের ঠিক হয়েছিল …কিন্তু ছুটি হলে উনি কলেজের যে-দু-চারজন ছাত্রের সঙ্গে খুব মেলামেশা করে তাদের

চিঠি লিখেছিলেন···বিয়ের কথা শুনে সে-বন্ধুরা সেই চিঠি দেখায় তাঁর ভাবী স্বামীকে। ভাবী-স্বামী বিদেশ থেকে পাশ করে এখানকার বি এন্ রেলে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। চিঠি পড়ে সে ভদ্রলোক সরে দাঁড়ালেন। সেই দুটি বন্ধু না কি চিঠি দেখিয়ে বলেছিল··· সে সব বিশ্রী কথা···মানে, বন্ধু দুজন চন্দ্রমুখীকে বিয়ে করতে নারাজ···তারা চায় বিয়ে না করে বিয়ের আরাম-আনন্দ উপভোগ করতে। অর্থাৎ সকলেই স্ত্রী থাকবেন—মনে করলেই সরে পড়া! চন্দ্রমুখী তাতে রাজী নন। তিনি চান্ বিবাহ করে ঘর-সংসার পাততে···অথচ সে দুটি বন্ধুর মধ্যে কেউ ওঁর লোভ ছাড়বেন না!···এ অবস্থায় আমি যদি রক্ষা করি! অর্থাৎ এমনি দায়ে পড়ে চন্দ্রমুখীকে বিয়ে করি! একজন মহিলা ভেসে বেড়াবেন···শুধু এই considerationএ বিয়ে করি। বিয়ের সময় চন্দ্রমুখীর মা শুধু এসেছিলেন। তিনি সংসার থেকে সরে গিয়েছিলেন—এসেছিলেন শুধু মেয়ের বিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।···বিয়ের দু বছর পরে আর-একবার তিনি আসেন···দু দিনের জন্য। এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে থাকলে যতদিন তিনি বাঁচবেন, মাসে-মাসে আমি দশটি করে টাকা যদি পাঠাই···

সমর মিত্র বলিলেন,—আপনি শাশুড়ী-ঠাকরুণকে ঐটুকুই জানেন···তাঁর আর ছেলে-মেয়ে আছেন কি না···কে আপনার শ্বশুর ছিলেন, কি করতেন···এ সব খপরও জানেন না?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—না···আসল কথা বিবাহ করবো এমন কথা আমার মনে জাগেনি। অল্প-বয়সে আমার মা-বাপ মারা যান্···লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে হবে, এইদিকেই ছিল আমার মন।···এই বাড়ীটি ছিল পাঁচ-সাতজন সরিকের। এধারে তখন বন-জঙ্গল ছিল···মানুষ আসতো না। এই বাড়ীতে থেকে লেখা-পড়া করেছি···এণ্ট্রান্স পাশ করেছি টুইশনি করতে করতে। বাড়ীতে ছিলেন এক বুড়ী পিসিমা···খাই-খরচের দরুণ তাঁকে দিতুম টাকা···খেতে পেতুম···ব্যস! এইটুকু ছিল বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক। তারপর সরিকদের হলো দেনা। পয়সার দরকার! তাঁদের অংশ তাঁরা বেচে দিলেন··· সকলে মিলে এক হাজার টাকা দাম নিলে। পৈত্রিক ভিটে বলে আমি বাড়ী কিনলুম··· মর্টগেজ করে সাতশো টাকা জোগাড় করি···বাকী টাকা ছিল আমার সঞ্চয়।···রোজগার করে ক্রমে মর্টগেজের দেনা শোধ করি। তারপর বিয়ে···অকস্মাৎ···শুধু একজন ভদ্র মহিলার ইজ্জৎ রক্ষার জন্য···

সমর মিত্র বলিলেন—And there was no love? (এ বিবাহে প্রেমের নাম-গন্ধ ছিল না)?

—না। মনে বিশ্বাস ছিল, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা হওয়া অনিবার্য···

সমর মিত্র আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—সে-কালে কুল-পরিচয় নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা ছিল! তাতে একটা সুবিধা ছিল এই যে আর-একটা বংশের tradition পেতুম। Heredity, environment—এগুলো বাজে কথা নয়।

কিন্তু আপনি প্রোফেসর-মানুষ···আমার চেয়ে এ-সব তত্ত্ব আপনি ঢের ভালো বোঝেন···ও-কথা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।···আমি এখন চাই আপনার শাশুড়ী-ঠাকরুণকে। এই কমলমুখীর সম্বন্ধে আমার মনে দারুণ সন্দেহ আছে। আজ-কাল মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমাদের সমাজ অনেক বেশী সুখের হয়েছে, শান্তির হয়েছে···স্ত্রীদের মানুষ বলে মনে হয়···তাঁরা মাটীর পুতুল নন্ যে খেলা করবো···এ যেমন মস্ত লাভ হয়েছে, তেমনি পুরুষ-সমাজে যেমন অতি-বুদ্ধির ফন্দীবাজী···মেয়ে-সমাজও শিক্ষার দোষে তা থেকে মুক্ত নয়, প্রোফেসর চ্যাটার্জী···পুলিশ-লাইনের অভিজ্ঞতায় দেখে আসছি···দারুণ ক্ষোভের হলেও কথাটা সত্য···

জগৎ চাটুয্যে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার মনে একটু দুর্বলতা আছে সমর বাবু···স্ত্রীজাতিকে আমি শ্রদ্ধা করি বড়-বেশী···আমার মনে তাঁরা সীজারের স্ত্রীর মতো above reproach (সব সন্দেহের উর্দ্ধে)···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—কুশিক্ষার ফলে ভদ্র-ঘরের মেয়ে যদি বেগড়ায়, তাহলে তাঁর সে বেগড়ানো উত্তাল রকমের হয়···সাধারণ-বেগড়ানোর চেয়ে অনেক বেশী and shameful (এবং লজ্জার ব্যাপার)। কিন্তু ও কথা যাক···আচ্ছা, আপনার কি বিশ্বাস···আপনার স্ত্রী চন্দ্রমুখী বেঁচে নেই ?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার মনের এখন যে-অবস্থা, তাতে কোনো বিশ্বাস আর মনে স্থান পায় না সমর বাবু···সবই সম্ভব মনে হয়।

সংক্ষেপে সমর মিত্র শুধু বলিলেন—হুঁ···

খপরের কাগজের রিপোর্ট

১৭ই আশ্বিন তারিখের আনন্দ-বাজারে আইন-আদালত কলমে এই সংবাদটি ছাপিয়া বাহির হইয়াছিল,—

সুশিক্ষিত বিচক্ষণ এবং শ্রদ্ধেয় প্রোফেসর জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কদর্য মামলা রুজু হইয়াছিল, কাল তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রোফেসর-মহাশয়ের সহিত তাঁহার এক বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী কনকলতা দেবীর নাম বিজড়িত করিয়া যে শয়তানীর ফাঁদ পাতা হইয়াছিল, সে ফাঁদ ফাঁশিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। প্রোফেসর মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী কনকলতা দেবীর পুণ্য পবিত্র চিত্ত আজ কলঙ্কমুক্ত হইয়া আরও অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ আমাদের কাগজে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণনার প্রয়োজন আর নাই। বিচারে জানা গিয়াছে, শ্রীমতী কমলমুখী নামে যে-মহিলা প্রোফেসর মহাশয়ের পুরী-গমনের অব্যবহিত পরে শ্যালিকা-পরিচয়ে তাঁহার গৃহে আসিয়া উদয় হন, তিনি কমলমুখী নন—তিনি চন্দ্রমুখী !

পাঠকগণ জানেন, এ মকর্দমার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে চন্দ্রমুখী সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যান। নিরুদ্দেশ হইবার কারণ, তাঁর বিলাস-ব্যয়বাহুল্যাদির জন্য প্রোফেসর মহাশয়

তাঁকে নিষেধ করিয়া বলেন, সৌখীনতার এত খরচ তিনি জোগাইতে পারিবেন না। যে-সব দোকান হইতে চন্দ্রমুখী কাপড়-চোপড় জুয়েলারী প্রভৃতি ধারে কিনিয়া আনিতেন, সে-সব দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের প্রোফেসর মহাশয় নোটিশ দিয়াছিলেন যে তাঁহার অনুমতি-ব্যতিরেকে তাঁহার স্ত্রীকে ধারে জিনিষ-পত্র দিলে সে-সব জিনিষ-পত্রের দামের জন্য তিনি আদৌ দায়ী হইবেন না। চন্দ্রমুখী দোকানে গিয়া এ চিঠি দেখিয়া দারুণ অপমানিত বোধ করেন। এবং সে অপমানে তিনি গৃহ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান। নিরুদ্দেশ হইবার সময় তিনি নিজের অলঙ্কার-পত্র এবং টাকাকড়ি লইয়া যান। শুধু স্ত্রীর ও নিজের ইজ্জৎ রাখিবার জন্য পুলিশ বা আত্মীয়-বন্ধু-সমাজে প্রোফেসর এ সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। তারপর কমলমুখীর আবির্ভাব, চন্দ্রমুখী নিরুদ্দেশ, বাড়ীর উঠান হইতে চন্দ্রমুখীর শাড়ী-ব্লাউশ-সমেত এক রমণীর গলিত নিশ্চিহ্নপ্রায় কঙ্কাল,—এ-সব ঘটনায় জগৎ চাটুয্যেকে সন্দেহ-বশে পুলিশ স্ত্রী-হত্যার দায়ে আদালতে সোপর্দ করে। কমলমুখী পুলিশের কাছে চন্দ্রমুখীর লিখিত কয়েকখানি পত্র দিয়া বলে, পত্রগুলি তার ভগ্নীর লেখা। সে চিঠি-পত্রের কথা আমাদের পাঠকবর্গ জানেন।

ঘটনাচক্র যখন প্রোফেসর চাটুয্যে ও শ্রীমতী কনকলতা দেবীর বিরোধী, তখন শ্রীযুত সমর মিত্র এ-ব্যাপারের তদন্ত-ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রোফেসরের হরিদ্বার-বাসিনী শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে আনয়ন করেন। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নাম শ্রীমতী মনমোহিনী দেবী। তিনি বলেন, চন্দ্রমুখী ব্যতীত তাঁর আর সন্তান নাই—ছিল না। কমলমুখী বলিয়া চন্দ্রমুখীর সহোদরা বলিয়া যে পরিচয় দিতেছে, সে কে, জানেন না।

এই ঘটনার পর শ্রীযুক্ত সমর মিত্র নানা সন্দেহ-বশে কমলমুখীর গতিবিধি লক্ষ্য করেন। কমলমুখীর ফ্ল্যাটে সৌখীন সাজিয়া কিছুকাল বাস করেন; সে সময় কমলমুখীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন। তাঁকে প্রায় সিনেমায় লইয়া যাইতেন। কমলমুখী চোখের অসুখ বলিয়া চোখে সর্বদা কালো চশমা পরিতেন। সৌখীন বন্ধু-বেশী সমর মিত্র একবার কমলমুখীকে লইয়া চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে যান···সেখানে চক্ষু-পরীক্ষার জন্য তিনি চোখের চশমা খোলেন, সেই অবসরে সমর বাবু অলক্ষ্যে তাঁর ফটোগ্রাফ তোলেন। এবং সে-ফটো দেখিয়া জগৎ বাবু, কনকলতা, এবং চন্দ্রমুখীর মা, বন্ধু ব্রতীন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বলেন, এ ছবি চন্দ্রমুখীর।

তখন সমর বাবু চন্দ্রমুখীকে গ্রেপ্তার করেন। চন্দ্রমুখী সকল কথা স্বীকার করেন। বলেন, অভিমান-ভরে এ কাজ করিয়াছেন। যে লাশ পচিয়া গিয়াছে, সে লাশ নাকি একজন দরিদ্র-ভিখারিণীর। তাকে চন্দ্রমুখীর বন্ধু বিনোদ দত্ত মোটর-চাপা দেন। মোটর চাপা পড়িয়া রমণীটি তখনি মারা যায়। বিনোদ দত্ত চাপা-পড়া রমণীকে চন্দ্রমুখীর ঘাড়ে চাপাইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশের ধর-পাকড়ের ভয়ে রমণীর দেহ বাড়ীর উঠানে পুঁতিয়া রাখিয়া চন্দ্রমুখী এই নব লীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন।

* * * *

বৃত্তান্তের শেষে ছাপা আছে,—

চন্দ্রমুখীকে কিন্তু এখানকার বিচারালয়ের শাস্তি পাইতে হয় নাই। গলায় আঁচলের ফাঁশ্ টানিয়া চন্দ্রমুখী হাজতে আত্মহত্যা করিয়াছে। আজ প্রাতে তাকে মৃত-অবস্থায় দেখা গিয়াছে।

খবরের কাগজের রিপোর্টের উপর আমাদের শুধু একটা কথা বলিবার আছে।

হরিদ্বারে গিয়া সমর মিত্র দেখা করিলেন চন্দ্রমুখীর মা মনমোহিনী দেবীর সঙ্গে। এখনকার সংবাদ শুনিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন—আমার মেয়ে কমলমুখী! কিন্তু চন্দর ছাড়া আমার আর ছেলে-মেয়ে নেই, বাবা··· ভগবান ঐ একটি কাঁটা দিয়ে আমাকে দয়া করেছিলেন! আর বেশী ছেলে-মেয়ে দিলে ভগবান কাঁটায় আমায় জর্জরিত করতেন!

এ কথার পর তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

তিনি আসিলে তাঁকে লইয়া সমর মিত্র চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দেখা করান্···

মনমোহিনী দেবীকে দেখিয়া চন্দ্রমুখী চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল!

মনমোহিনী বলিলেন—কমলমুখী হয়ে আমার পেটে কবে জন্মালে বাছা?

নিরুপায় আক্রোশে চন্দ্রমুখীর চোখে শুধু আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল···চন্দ্রমুখী কোনো জবাব দেয় নাই।

জালিয়াতী ফন্দী আঁটিয়া, মিথ্যা মানুষ সাজা, জুয়াচুরি···এমনি নানা অভিযোগে চন্দ্রমুখীকে পুলিশ গ্রেফতার করিল।

তারপর সমর মিত্র বলিলেন,—এ কার লাশ, সন্ধান নিতে হবে···

এবং সে-সন্ধান বাকী রহিল না!

লাশের আঙুলে ছিল একটি আংটি···

এ ব্যাপারের সব বৃত্তান্ত কাগজে-কলমে ছাপিয়া বাহির হইতেছিল। পুলিশের তরফ হইতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া বাহির হইল—লাশের আঙুলে একটি আংটি পাওয়া গিয়াছে। আংটির দাম বেশী নয়, তবে সে-আংটির উপর মীনা-করা বাঙলা হরফে লেখা আছে, বেলা। যদি কেহ এ-সম্বন্ধে সন্ধান দিতে পারেন, পুরস্কার পাইবেন···

বিজ্ঞাপন পড়িয়া ও-পাড়ার সেই সুরেশ আসিল লালবাজারে আংটি দেখিতে। আংটি দেখিয়া তার দু'চোখে জল···

সুরেশ বলিল,—জামাইয়ের অত্যাচারে আমার মেয়ে বেলা একদিন চিঠি লিখে বাড়ী থেকে চলে যায়। সে রাত্রে কি ঝড়-বাদল,···চিঠি লিখে গিয়েছিল, লেকের জলে ডুবে মরবে। তারপর তার কোনো সন্ধান পাইনি!···হৈ-চৈ করিনি। তার কারণ, বুঝেছিলুম এ জন্মে কিছু দিয়ে মেয়েটাকে শান্তিতে রাখতে পারবো না··· জলে এ-জন্মটা বিসর্জন দিয়ে আর কিছু না হোক্, হতভাগা-জামাইয়ের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবে···এই সান্ত্বনা বুকে নিয়ে পড়ে আছি!

সমর। মিত্র বলিলেন,—পেনাল কোডের গ্রন্থকার এই সব অত্যাচারী স্বামীগুলোর কথা লিখতে ভুলে গেছেন। এদের জন্য পেনাল-কোডে একটা সেক্‌সন্ থাকলে সমাজে বহু নারী শান্তি পেতেন। এই সব দুর্বৃত্তের সঙ্গে নর-ঘাতকের কোনো প্রভেদ নেই!···

তারপর চন্দ্রমুখী যা করিয়াছিল, খপরের কাগজের রিপোর্টে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি।

তারপর আর একটা কথা···

এই বিপদে প্রদোষ নানা দিক দিয়া জগৎ চাটুয্যের মনে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গেল যে তাকে এক-মিনিটের জন্য নয়নান্তরালবর্তী করা চলে না···

এ বিপদে জগৎ চাটুয্যের বয়স যেন বিশ-বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে···কাজে-কর্মে মন নাই! বলেন,—আর কেন? মুখে এ-কালি মেখে লোকালয়ে কার সঙ্গে মিশবো, প্রদোষ?

প্রদোষ বলিল,—মেশবার কি দরকার, দাদা?···আমার গার্জেন হয়ে আমার মাথার উপর আপনি বসে থাকুন···আমি কৃতার্থ হবো।

জগৎ চাটুয্যে আবেগ-বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রদোষের পানে চাহিয়া রহিলেন···মুখে কথা নাই।

প্রদোষ কহিল—আর একটা নিবেদন আছে···

জগৎ চাটুয্যে কহিলেন,—অমন মিনতির ভঙ্গী কেন? বলো, যা বলবে···

বলিতে গিয়া প্রদোষ বলিতে পারিল না···কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল!

জগৎ চাটুয্যে তাহা লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন,—বলো···

প্রদোষ কহিল,—মানে, কনক···ও এমন মন-মরা হয়ে রয়েছে···ওর বাঁচা দরকার তো···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—নিশ্চয়···

প্রদোষ কহিল,—তাই মানে, ওর ভার যদি আমায় নিতে ছান···

জগৎ চাটুয্যের বুকের উপর হইতে যেন একখানা পাহাড় নামিয়া গেল···তিনি বলিলেন,—কনকের মত হবে?

প্রদোষ কহিল,—উনি কিছু বলেন না! আমি খুব কুণ্ঠিতভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলুম কথায়-কথায়···তাতে চুপ করে থাকেন···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—জীবনে কিছুই পায় নি···মানুষের শাসনে একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে?···আমার মনে হয়, যোগ্য পাত্রে যদি ওর বিবাহ হয়···আচ্ছা, কনককে আমি এ-কথা বলবো! আমার কাছে মনের কথা গোপন করবে না···কোনো দিন করেনি!···এমন মেয়ে···সত্যি, আমার মনে হয় প্রদোষ, এ-জন্মে আমরা এক মায়ের পেটে জন্মাই নি বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর-জন্মে আমরা দু'জনে এক-মায়ের পেটে জন্মেছিলুম···

প্রদোষের সঙ্গে কনকের বিবাহ হইয়া গেছে।

বিবাহে সমর মিত্র সাজিয়াছিলেন বর-কর্তা।

হাসিয়া প্রদোষ কহিল,—আমাদের পুলিশ-বন্ধু! শাস্ত্রে বলে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। রাজদ্বার আর শ্মশান—দু-জায়গাতেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম! আর সে দু-জায়গাতে ওঁর মতো বন্ধু পেয়েছিলুম বলেই রক্ষা পেয়েছি। উনি না থাকলে মকর্দমায় খালাশ পেলেও ভিতরকার এত-বড় রহস্য উদ্ঘাটিত হতো না··· মান-সম্ভ্রম ফিরে পাওয়া হয়তো দুষ্কর হতো!

প্রেয়সী

বৈশাখের প্রভাতে রৌদ্র-হিল্লোলে কঙ্কণা নদীর স্বচ্ছ শান্ত বারিরাশি রূপালি-পাতের মত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল। নদীটি খুব বড় নয়, তবে তাকে ছোটও বলা যায় না। নদীর দুই তীরে যতদূর দেখা যায়, কোথাও গাছপালার ঘন ঝোপ, কোথাও-বা খোলা জমি। খোলা জমির উপর খুঁটির মাচা, সেই মাচায় জেলেরা জাল মেলিয়া রাখিয়াছে। কয়েকখানা নৌকা উপুড় হইয়া ডাঙার উপর পড়িয়াছে, তলায় কাজ হইতেছে, আঠা মাখানো হইতেছে। এই সকালেই পারঘাটায় মৃদু কোলাহল সুরু হইয়াছে—লোক-জন পারে যাইবে। কেহ-বা নৌকা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, নদীতে মাছ ধরিতে যাইবে।

ইহারই একধারে ঘাটের কোলের কাছে প্রকাণ্ড একটা বাবলা-ঝোপ। তাহারি নীচে একখানি পান্সী, সদ্য রঙ্‌-করা,—রাজহংসের মতো জলে ভাসিতেছে। পান্সীতে লাল নিশান উড়িতেছে। পান্সীর উপর দুই-চারিজন লোক বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে। আটখানা দাঁড়ে পান্সী সুসজ্জিত। দাঁড়ি-মাঝির গায়ে রঙ্‌-করা জামা—দূর হইতে দেখিলে ভুল হয়, বুঝি-বা কলিকাতা হইতে কোনো ফুটবল-টীম ও-পারে খেলিতে যাইবে বলিয়া পান্সীতে আসিয়া বসিয়াছে।

পান্সীখানি গ্রামের তরুণ জমিদার রজনীনাথ দত্তর। পান্সীর লাল নিশানে ইংরাজী হরফে নাম লেখা—R. Dutta.

রজনীনাথ দত্ত জমিদারের ছেলে। কলেজে পড়িবার অছিলায় সেই যে সে কলিকাতায় গিয়াছিল, তারপর পাঁচ বৎসর আর দেশে ফেরে নাই। বুড়া বাপের বহু মিনতি তার কলিকাতার বাড়ীর দ্বারে আছড়াইয়া গিয়া পড়িয়াছে, তবু তার টনক নড়ে নাই। ইয়ার-দলের রঙীন পরামর্শে সমস্ত পৃথিবীকে সে এই প্রথম-যৌবনে এমন সোনার বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল যে, বাকী জগৎটায় কালো কালি পড়িয়া সেটা একেবারে তার চোখের সামনে হইতে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল!

কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, কাছাকাছি আর-এক গ্রামের জমিদারের মেয়ের সহিত। পাড়াগাঁয়ের জমিদার, না আছে তার মোটর, না জানে সে ভালো করিয়া দুইটা ইংরাজী কথা একত্র করিয়া কহিতে, মেয়েও তার তেমনি তৈরী হইয়াছিল।

বিবাহের পর রজনী যে-কয়দিন বাড়ী ছিল এবং বধূর সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছিল, সে কয়দিনে তার সঙ্গে ভাব যে একটুও হয় নাই, এমন নয়; তবে সে ভাবটা স্থায়ী প্রণয়ে পরিণত হইবার পূর্বেই দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বধূ যে ইহাতে প্রাণে তেমন বেদনা পাইল, তাহা ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল না। বরং বন্দিত্ব ঘুচিলে

বাপের বাড়ী গিয়া সে মা'র কোল পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, পিসিমার কাছে রূপকথা শুনিয়া, মাথার ঘোমটা খুলিয়া হুটোপাটি করিয়া আরামে বর্তাইয়া গেল। যেদিন কোন উৎসবের আহ্বানে প্রায় দু'শ ভরির সোনার গহনায় সে গা ঢাকিত, সেদিন বুঝিত, বিবাহ একটা লাভের বস্তু, তার উপর সে গয়নাগুলো যখন এমন আয়ত্তের মধ্যে! স্বামীর বিরহে স্ত্রীর দুঃখ করিবার কোথাও কিছু আছে, এ চিন্তাও তার মনে উদয় হইত না।

রজনী কলিকাতায় আসিয়া প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়েছিল। এই বিপুল জন-তরঙ্গ, এই যে কেহ কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, কেহ কাহারো খাতির করে না, মেসের পাচক ভৃত্য হইতে পথের কুলি অবধি ধমক খাইলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ওঠে—এ ব্যাপার তার কাছে এমনি বিসদৃশ ঠেকিল যে, দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী ক্ষুদ্র জমিদারের ইহাতে 'থ' হইয়া যাইবার কথাই বটে!

তারপর ধীরে-ধীরে একটি-একটি করিয়া বন্ধু আসিয়া যখন দেখা দিতে সুরু করিল, তখন মন এই গল্প-কৌতুককে অবলম্বন করিয়া আবার আপনাকে প্রসারিত করিয়া মেলিবার প্রয়াস পাইল। ইয়ারেরা এই পল্লীর জীবটিকে পাইয়া বর্তাইয়া গিয়াছিল। রজনীর খরচে তাহাদের নিত্যকার চা ও জলখাবার চলিত; তার উপর থিয়েটারে, বায়োস্কোপে রজনীর টাকায় আমোদ-উপভোগ প্রভৃতি সবগুলাই যদি নির্বিবাদে চলিতে থাকে, তবে দুইদণ্ড ফুরসৎ পাইলে সঙ্গ দিয়া খোস-গল্পে তাহাকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতে আর কি এমন অসুবিধা! এই ইয়ার-দলে রজনীনাথ শীঘ্রই রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, আর ইয়ারেরাও পাত্র-মিত্র সাজিয়া আসর জম্‌কাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না!

এমনি খোস-গল্প আর আমোদ-বিলাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়িলে যেমন হয়, রজনীরও তাই ঘটিল। কলেজে যে ঠাঁইটুকুতে সে আস্তানা পাতিয়া বসিয়াছিল, সেইখানেই সে আস্তানা মৌরুসি-রকম রহিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীর মন্দির-পথে গতি মন্থর হইল। সঙ্গীর দল টপাটপ্‌ ওদিকে টপ্‌কাইয়া গেলেও, সন্ধ্যায় ও প্রভাতে মিলন-সভা তেমনি জমজমাট থাকিত। উঁচু-নীচুর মর্যাদা-বোধ আসিয়া সরল সঙ্গসাহচর্যে এতটুকু ঘা দেয় নাই, এতটুকু অস্পৃশ্যতার ব্যবধান টানিতে পারে নাই।

এমনি করিয়া সহরের চাল-চলন ও আদব-কায়দায় রজনী নিজেকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিতেছিল থিয়েটারের ষ্টল হইতে বক্স এবং বক্স হইতে ক্রমে গ্রীণরুমে সে প্রমোশন পাইয়াছিল; এবং সেই গ্রীণরুমে পদার্পণ হইবামাত্র দুই-একজন করিয়া অভিনেত্রীর কৃপাদৃষ্টি-লাভেও সে বঞ্চিত রহিল না। টাকা তো চিঠি লিখিবামাত্র আসিয়া পড়ে। সুতরাং ওদিক্‌কার সুখস্বর্গে প্রবেশের টিকিট কিনিতে যেটা প্রধান অবলম্বন, সে পয়সার অভাব কোনদিনই ঘটে নাই। প্রবাসে ছেলের পাছে কোনো কষ্ট কি অস্বাচ্ছন্দ্য হয়, বৃদ্ধ পিতা সেদিকে যেমন প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তার কল্যাণের দিকে তেমনি তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই কল্যাণের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন-পথে রজনীনাথ এমন সবেগে গড়াইয়া চলিল যে, তাহাকে আটকায় এমন সাধ্য কোনো

মহাবীরের পক্ষেও সম্ভব ছিল না! সহরের সৌখীন-সম্প্রদায় অত্যন্ত মুগ্ধ নেত্রে ঘোড়দৌড়ের ছুটন্ত ঘোড়ার ন্যায় রজনীর গতির বেগ নিরীক্ষণ করিত।

বিলাসে আমোদে যখন সে খুব পোক্ত হইয়া কলিকাতায় দুই-চারিটা বিশিষ্ট সমাজে দস্তুরমতো নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে, কীর্তি অর্জন করিয়াছে, তখন বুড়ো বাপ তার সুখের পথে কাঁটা দিয়া একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। রজনী একটু ফাঁপরে পড়িল; কিন্তু সদ্বন্ধুর পরামর্শের অভাব ঘটিল না। তাহারা বুঝাইল, এই টাকাকড়ি ও জমিদারী প্রভৃতির বন্দোবস্ত যোগ্য লোকের হাতে অর্পণ করিয়া কলিকাতায় কায়েমীভাবে বাড়ী কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া দাও। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারী হইতে সুরু করিয়া কৌন্সিলে মাতনের অধিকার পর্যন্ত, টাকার জোরে তার হাতে চাঁদের মতো পাড়িয়া আনিয়া দিবে, এ-আশ্বাসও বন্ধুরা দিতে ছাড়িল না। রজনী এ-প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং টাকা-কড়ির ব্যবস্থা পাকা করিয়া, কলিকাতায় বাস করিবার বন্দোবস্ত কায়েমী করিবার উদ্দেশ্যে অচিরে গৃহযাত্রা করিল। দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহাকে সঙ্গ দিয়া কৃতার্থ করিতে ছাড়িল না।

দেখিতে-দেখিতে জমিদার-বাড়ী তাস-পাশা খেলার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গান-বাজনার বিচিত্র ঝঙ্কারে বাড়ীর ভিত্ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কর্তার মৃত্যুর পর হইতে যে-বাড়ীখানা শোকের আঁধার বুকে পুরিয়া অহর্নিশি গুমরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সে-বাড়ী গীতে-বাদ্যে প্রমোদ-হাস্যে ঝঙ্কৃত হইয়া রঙ্গিণীর মতো মাতিয়া উঠিল। শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণে হঠাৎ এক নিমেষে যেন একটা উচ্ছৃঙ্খলতার বান ডাকিয়া গেল! একান্ত কুণ্ঠিত পল্লী-গৃহ সহসা এই বিলাসিনীর মূর্তি ধরিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময় যে-পরিমাণে আকর্ষণ করিল, তেমনি ভবিষ্যতে এক মহা-দুর্দিনের আশঙ্কায় গ্রামের লোক শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কলিকাতা হইতে মোটর আসিল। বাগান-বাড়ীর সংস্কার হইয়া সে এক সম্পূর্ণ নূতন শ্রী ধারণ করিল। গ্রামের অদূরে নদী ছিল, পিয়ালী নদী। সেই নদীর জলে জমিদার বাবুদের মামুলি একখানা বজরা বাঁধা থাকিত,—জমিদারী-পরিদর্শনে কেহ কখনও বাহির হইলে, এই বজরায় করিয়া বাহির হইতেন। রজনীনাথ বজরার উপর একখানা পান্সী যোগ করিয়া দিল; তাহাতে আপাততঃ প্রত্যহ বেড়াইবার ধূমে নদীর বক্ষও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্থাৎ, নূতন কর্তা জলে-স্থলে চারিদিকে আপনার অমোঘ আধিপত্যের বিজয়-নিশান এমন সমারোহে উড়াইয়া দিল যে, গ্রামের নিরীহ লোকগুলা তন্দ্রাভঙ্গে জলে-স্থলে চারিদিকে প্রাণোন্মদনার এক জীবন্ত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিল।

কয়েকদিন পরে বাবুদের মাছ ধরার বাতিক চাগিল। চার, ছিপ, সুতা, বঁড়শী লইয়া বাবুরা একটা পুকুরকেও ছাড়িয়া দিল না। শেষে সখ মিটিলে বাতিক চাগিল—শিকারে যাইব। কোট ও খাকি-সার্ট পরিয়া রজনীনাথ বন্দুক লইয়া এ-বন ও-বন চষিয়া ফেলিল; সঙ্গে থাকিত কলিকাতার পারিষদবর্গ। প্রত্যেক ব্যাপারে পল্লী হইতেও সঙ্গি-সহচর মিলিয়াছিল বিস্তর।

গ্রামের কিছু দূরে একটা বিল ছিল। সঙ্গীরা পরামর্শ দিল, সেখানে পাখী মিলিবে। দেশের সঙ্গীর দল, আগের রাত্রি হইতে সেইখানে গিয়া আস্তানা পাতিল। বাবুরা মোটর হাঁকাইয়া সকালেই রওনা হইবে, কথা রহিল।

ভোর বেলায় পারিষদবর্গ-সমেত বাবু মোটর হাঁকাইয়া বহুদুর পথ অতিক্রম করিল। অঙ্গনা-গ্রামের শেষে মোটরের পথ নাই,—পায়ে হাঁটিয়া পাড়ি জমাইতে হইবে। কুছ্ পরোয়া নাই,—বাবুরা তখন গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিল।

দুইধারে আম-কাঁঠালের বাগান। ছায়া-করা পথ। মাঝে-মাঝে কুঁড়েঘর, পুকুর, ভাঙা কোঠা। দেখিতে, নিপুণ-পটুয়ার হাতে-আঁকা ছবির মতোই! সবুজ, হরিৎ, ধূসর রঙের পোঁচ্-লাগানো! প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া তাহারা বাগানের পথ ধরিয়া যাত্রা সংক্ষেপ করিয়া লইল!

বাগানের এক কোণে ছোট একটি পুকুর; পুকুরের পাড়ে একটা পুরানো জীর্ণ কোঠা-বাড়ী। অগ্রবর্তী একজন পারিষদ হঠাৎ একটা জামরুল গাছের পিছনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন হইতেই রজনীনাথ কহিল,—কি হে, থেমে গেলে যে!

অঙ্গুলি উঠাইয়া সঙ্গী সঙ্কেত করিল—চপ্।

সকলে অবাক হইল। আরো কাছে আসিলে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঘাটের দিকে দেখাইল। ঘাটে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী স্নান করিতেছিল। কতকগুলা তালগাছের গুঁড়ি ফেলিয়া ঘাটের ধাপ তৈয়ারী হইয়াছে। শেষ গুঁড়িটার ধারে কতকগুলি মাজা বাসন। ঘাটের একধারে রাশীকৃত পাঁশ গাদা হইয়া রহিয়াছে, অন্য-ধারে কচুর জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাপের মধ্য দিয়া পায়ে-চলা সরু পথ। পাড়ে সেই জীর্ণ বাড়ী, কতকালের প্রাচীন যখের মতো দাঁড়াইয়া। বাড়ীর দেওয়াল বহিয়া নানা লতাপাতা উঠিয়াছে। বাড়ীর মধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে।

রজনীনাথ তরুণীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—এ দেবকন্যা, না অপ্সরা?

একজন সঙ্গী বলিল,—জঙ্গলের মধ্যে বনদেবী!

আর-একজন বলিল,—এ-ফুল রাজোদ্যানেই শোভা পাওয়া উচিত!

রজনীনাথ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সঙ্গী বলিল,—হায়রে, হতভাগ্য রাজোদ্যান!

বলিয়া সে রজনীনাথের পানে চাহিল। রজনী নির্নিমেষ নেত্রে তরুণীকে দেখিতেছিল। তরুণী কিছুই জানিল না। কালো জলে সোনার অঙ্গ মেলিয়া নির্জনে জলের কোলে সে যেন রূপের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল! কালো জল তার রূপের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া উল্লাসে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

তরুণী স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিল, তীরে দাঁড়াইয়া ঘনকৃষ্ণ কেশের রাশি খুলিয়া আর্দ্র-কেশ মুছিল, তারপর কাপড়ের জল নিঙড়াইয়া বাসনের গোছা তুলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

রজনীনাথ তখন বাড়ীটার পানে সতৃষ্ণ নিরাশ-দৃষ্টিতে চাহিতে-চাহিতে বাগানের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

বাগানের পর বাগান,—রাশি-রাশি আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা-একটা ফলের গাছ—আম, জাম, কাঁঠাল, গাব, জামরুল। বাগান পার হইয়া সরু পথ; খানা ডোবা ঝোপের ধার দিয়া সেই পথ ধরিয়া নদীর কিনারায় আসিয়া সকলে পৌছিল। স্থির নদীবক্ষে যে-পান্সী ভাসিতেছিল, সকলে সেই পান্সীতে উঠিল। আট-দাঁড়ে পান্সী ছাড়িল।

তরুণীর নাম লক্ষ্মী। ওপারে পলাশডাঙা গ্রাম, সেখানে একটা মাইনর স্কুল আছে। লক্ষ্মীর স্বামী রঘুনাথ সেই স্কুলে মাষ্টারী করে। এককালে তার অবস্থা মন্দ ছিল না। বাড়ি ছিল, বর্ধমানের ওদিকে। দামোদর সেবারে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া তার বাড়ী ও ক্ষেত-খামার সব গ্রাস করিয়াছে। রঘুনাথ কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়া যায়। তারপর দুঃখে-কষ্টে কয়মাস এখানে-ওখানে ঘুরিয়া, খবর পাইয়া এই চাকরির পিছনে সে ছুটিয়া আসে। অজ-পাড়াগাঁয়ের স্কুল,—মাষ্টারী করিতে লোক জোটে না। কাজেই রঘুনাথকে এখানে চাকরি জুটাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। পলাশডাঙায় বাসের যোগ্য তেমন ঘর নাই। যা আছে, সেখানে ছোটলোকের ভিড়। এখানে নির্জন প্রান্তরে এই ভগ্ন কুটিরখানি তাই সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাড়া দিতে হইত না। বাড়ির মালিক এক বৃদ্ধা, দূর-সম্পর্কে তার পিসি। তাহাকে দেখিবার-শুনিবার কেহ ছিল না। রঘুনাথ তাহাকে খাইতে দিত এবং এই পরিচর্যার পরিবর্তে সে এখানে পরম সুখেই বাস করিতেছিল। রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর পরিচর্যায় বৃদ্ধা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল, এবং সে এমনও আশা দিত যে, তাহার ধূলা-গুঁড়া যেটুকু আছে, সব সে রঘুনাথের স্ত্রী লক্ষ্মীকেই দিয়া যাইবে। তার আর এ ত্রিভুবনে কে-বা আছে!

ছেলেপিলের মধ্যে রঘুনাথের একটি কন্যা—মন্টি। মন্টির বয়স পাঁচ বৎসর। দেখিতে ঠিক ফুলের কুঁড়ির মতো। এই দারিদ্র্য আর অবহেলার মধ্যে থাকিলেও মেয়েটি এমন যে, তার পানে একবার চোখ পড়িলে সে চোখ সহজে ফিরিতে চাহে না!

তার মা লক্ষ্মী রূপে যেমন লক্ষ্মী, গুণেও তেমনি। রঘুনাথ প্রায়ই বলিত,—এ রূপ রাজার ঘরেই মানায়, লক্ষ্মী। আমার মতো লক্ষ্মীছাড়ার ভাঙা-কুঁড়েয় জীবন কাটালে তুমি, এই কি ভগবানের বিচার!

লক্ষ্মী তার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিত,—থাক্ থাক্, এই কুঁড়েই আমার রাজার প্রাসাদ গো!

নিশ্বাস ফেলিয়া রঘুনাথ বলিত,—একগাছা কাঁচের চুড়িও তোমায় দিতে পারি না, লক্ষ্মী···

স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া লক্ষ্মী বলিত,—যাও, কি যে বলো! এই নোয়া আমার হীরে-মাণিকের চেয়েও ঢের বেশী দামী। এর দাম তুমি পুরুষমানুষ, তুমি কি বুঝবে!

এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন লইয়া লক্ষ্মী খুবই সন্তুষ্ট ছিল। একটি দিনের জন্যও তার মনে এতটুকু অতৃপ্তি উঁকি দেয় নাই। তার কারণ, যে-সম্পদ সে লাভ করিয়াছিল, তার কাছে রাজার ঐশ্বর্যও সে অতি তুচ্ছ মনে করিত। সে সম্পদ, স্বামীর প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা।

রঘুনাথ আপনাকে অকপটে লক্ষ্মীর কাছে ধরিয়া দিয়াছিল। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে সে লক্ষ্মীর পরামর্শ চাহিত। স্কুলে কোন্ ছেলে কবে কি দুষ্টামি করিল, কোন্ ছেলেটি বেশ ভালো পড়াশুনা করিতেছে, সে-খবর পর্যন্ত লক্ষ্মীর অজানা থাকিত না। এই নির্জন অরণ্য-প্রদেশের একটি কোণে বসিয়া আশ-পাশের প্রত্যেক লোকটির কথা সে ভালোই জানিত। স্কুলের অনেক ছেলেই যেন তার কাছে বহুকালের চেনা। ক্যাবলা—সে ঐ নারাণ চক্রবর্তীর ছেলে। ছেলেটি তোৎলা বলিয়া ক্লাশের ছেলেরা তাহাকে খ্যাপায়। গণেশ ছেলেটি ভারী ভালো; পড়াশুনায় সে সকলের উপরে। এমনি করিয়া প্রত্যেক ছেলেটি তার কত চেনা, যেন কত কালের জানা! অথচ সে কোনোদিন তাহাদের চক্ষেও দেখে নাই।

একদিন রঘুনাথ বলিল,—ছেলেদের নিয়ে একটা দল খুলেছি। তারা এমন তোয়ের হচ্ছে যে, কারো ঘরে আগুন লেগেছে শুনলে তখনি প্রাণের মায়া ছেড়ে আগুন নিবুতে ছুটবে,—তা সে রাত বারোটাই হোক্, আর বেলা পাঁচটাই হোক্। তারা সাঁতারে এমন দড় যে, কেউ জলে ডুবেছে দেখলে তখনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটবে। দলের নাম রেখেছি, তরুণ-সঙ্ঘ।

লক্ষ্মী বলিল,—বাঃ বেশ তো! আর কি করবে তারা? জলে ডোবা আর আগুন লাগার বিপত্তি, এ তো নিত্যি ঘটচে না···নিত্যিকার জন্যে কি কাজ শেখাচ্ছো?

রঘুনাথ বলিল,—তারা প্রতি-রবিবারে গাঁয়ের সবার দোরে-দোরে ভিক্ষা ক'রে চাল-ডাল-পয়সা নিয়ে আসে। যারা অনাথ-আতুর, খেতে পায় না, তাদের সেই চাল-ডাল হপ্তায়-হপ্তায় ভাগ ক'রে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মী বলিল,—আর যাদের অসুখ-বিসুখ হয়, তাদের দেখা শোনার, কি ভার নেবার··· ?

রঘুনাথ একটু চিন্তিতভাবে কহিল, সেইটেই ভাবনার কথা। সে তো পয়সা না হ'লে হয় না। ওষুধ-পথ্যি জোগাড় করা, সে তো খালি গতর দিয়ে হয় না, লক্ষ্মী···

লক্ষ্মী বলিল,—সত্যি, তাদের কষ্ট আগে দূর করা উচিত। রোগে ভুগে বিনা-চিকিৎসায় কত লোক যে মারা যাচ্ছে, আহা!

রঘুনাথ বলিল,—ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়ে সে-অভাবও ঘোচাবেন! একটু আশা দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—কেমন ক'রে?

রঘুনাথ বলিল—কলকাতায় থাকে একটি ছেলে, তার নাম, যতীশ। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে এবার। তার মামার বাড়ী পলাশডাঙায়। তাদের অবস্থা খুব ভালো। এক বিধবা মা আছেন, তা, ছেলেটি কখনো পাড়াগাঁ দেখেনি···সে এসেছে মা'র সঙ্গে

এবার এই ছুটিতে পাড়াগাঁ দেখতে। মাতামহর বেশ পয়সা-কড়ি আছে, অথচ ঐ ছেলেরই সব; মাতামহী ছাড়া তার এখানে কেউ নেইও। সেই ছেলেটি আমাদের তরুণ সঙ্ঘ দেখে তাতে যোগ দিয়েছে। ক'দিনে সে চমৎকার সাঁতার শিখেছে। সে বলেছে, তার মাকে ব'লে একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স আর কতকগুলো ওষুধের বই কিনে দেবে। হোমিওপ্যাথির বইগুলো পড়ে আমিই একটু-আধটু শিখবো। তারপর ছেলেদের কিছু শিখিয়ে দেবো। তাতে ছোটখাটো ব্যারামের চিকিৎসা এক রকম চলে যাবে'খন।

লক্ষ্মী বলিল,—দেখ, তোমার সঙ্ঘের ছেলেদের একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ালে হয় না?

রঘুনাথ সাগ্রহে বলিল,—খাওয়াবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী বলিল,—তুমি যদি বলো—

—বেশ তো···একটা সুবিধেও হয়েছে। তারা একদিন কোথাও বন-ভোজন করবে বলেছিল। তাদের বরং বলি, এই বাগানে এসে চড়িভাতি করো। জন-পনেরো ছেলে,—যারা বড়, তাদের নিয়েই চড়িভাতি হবে। তুমি গোছগাছ ক'রে তাদের সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ো।

লক্ষ্মী সহর্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

রঘুনাথ বলিল,—তুমি আমার লক্ষ্মী!

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল,—আমি তো লক্ষ্মীই—আর, তোমারই লক্ষ্মী এ আর নতুন কথা কি গো!

শিকারে গিয়া রজনীনাথের মন শিকারে ঠিক বসিতেছিল না। সেই যে পুকুরের কালো জলে রক্ত-কমলটি ফুটিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহারি বর্ণে-গন্ধে মন তার একেবারে দিশাহারা হইয়া উঠিল। ওপারে পাল্কী রাখিয়া রজনী সদলে একটা মাঠে গিয়া উঠিল,—মাঠ ভাঙিয়া, বাঁধ পার হইয়া জলা। জলার ধারে-ধারে চকাচকি, ছোট-ছোট স্নাইপ, গাংচিল—এমনি ক'টা পাখী মিলিল। তারপর সূর্য যখন আকাশের মাঝামাঝি দীপ্ত তেজে তার সাত ঘোড়ার রথ চালাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রথের চাকাগুলো দিয়া যেন আগুন ঝরিতে লাগিল! সান্-হ্যাট্ ফুঁড়িয়া তার তীব্র হল্‌কা মাথা জ্বালাইয়া দিতেছিল; তখন রৌদ্রে তাতিয়া ঘামিয়া শিকারীর দল আসিয়া পাল্কীতে উঠিল। সব কষ্ট ধীরে-ধীরে কোথায় যেন মিলাইয়া যাইতেছিল! সেই স্নিগ্ধ ছায়া-করা বাগানের বুকে সেই পুকুর পড়িবে, তখন তার কোলে সেই কমলের দেখা কি আর-একবার মেলে না?

পার হইয়া এপারে আসিলে একজন সঙ্গী বলিল,—এইবার সেই পরীস্তানে একবার উঁকি দিয়ে যেতে হবে।

কথাটা রজনীর ভালো লাগিল না। সে চায় সে-রূপ একা দেখিতে—তাহাতে ভাগিদার জুটিবে, এ চিন্তা কাঁটার মত তার বুকে বিঁধিল।

এইবার সেই বাগান। ঐ সেই গাছগুলা—ঐ সে পুকুর! আশার উল্লাসে মন মাতিয়া উঠিল। গাছের ডালে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল। তার সে করুণ সুর চারিধারে কেমন তন্দ্রালস ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল! নিঝুম পুরে চারিধার স্তব্ধ। সেই পরীর বাসভূমি ঐ সেই ভাঙা ঘরখানি—দারুণ স্তব্ধতার মধ্যে মৌন মূক দাঁড়াইয়া আছে! জলে এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই! শান্ত স্থির জল—শ্যাওলায় ভরা। ঠিক যেন কে একখানি সবুজ মখমল বিছাইয়া রাখিয়াছে; ঘাটের কাছে খানিকটা জায়গায় শুধু শ্যাওলা ছিল না, জলটুকু দেখাইতেছিল ভাঙা আরশির বুকে মলিন কাচখণ্ডটুকুর মতো।

একজন সঙ্গী মৃদু-স্বরে গান ধরিল :

ঐ দেখা যায় ঘরখানি!

আর একজন কহিল,—চুপ কর ইষ্টুপিড্।

এক-জায়গায় আসিয়া সকলের গতি মন্থর হইয়া গেল। পা আর কাহারো চলিতে চায় না! অথচ পুকুরে কেহ নাই! বাড়ীটার মধ্যে সকলে অধীর দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দিল—কেহ নাই! কোন বাতায়নে কাহারো চাঁদ-মুখ,…কৈ, চিহ্নও নাই তার! বাড়ীটা এমন স্তব্ধ যে ভিতরে কেহ আছে বলিয়াও মনে হয় না। পুকুরের এধারে পাঁশ-গাদায় একটা কুকুর শুইয়া ঘুমাইতেছে। খোলা দ্বার-পথে ঐ যে একটুখানি উঠান দেখা যাইতেছে, একটা তুলসীগাছ, মাথায় জলের ঝারি। তা ছাড়া, লোকের বাসের এতটুকু সাড়া নেই, কোনো লক্ষণও নাই তার।

সঙ্গীরা বলিল,—এসো, অতিথি হওয়া যাক্।

রজনী একটা নিশ্বাস ফিলিয়া বলিল,—বাড়ী চলো হে!

একজন সঙ্গী বলিল,—নিদেন এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে যাই—ভারী তেষ্টাও পেয়েছে।

সকলে অগ্রসর হইল। সঙ্গীরা ব্যাপারটাকে যতখানি তরল করিয়া দেখিতেছিল, রজনী ঠিক তেমন ভাবে দেখে নাই, তার মনে তরুণীর রূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে গৃহে চলিল, অত্যন্ত ভারী মন লইয়া নৈরাশ্যের একটা তীব্র জ্বালায় প্রাণটাকে পোড়াইতে-পোড়াইতে!

কিন্তু, কেন এ দাহ! যাহাকে পাইবার নয়, আয়ত্ত করিবার নয়, যে দুর্লভ, তার পানে চিত্ত এমন উধাও হইয়া ছুটিতেছে কি বলিয়া! শুধু যাতনা পাওয়া সার বৈ ত' নয়! আহা, তার চেয়ে সুখে থাক্, সুখে থাক্ ইহারা! সে হতভাগ্য, তার সব থাকিয়াও কিছু নাই! তরুণ মন থিতাইতে পায়, এমন একটু রূপের অবলম্বনও তার গৃহে নাই,—কোথাও কি আছে!

গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া সঙ্গীরা বাহিরের ঘরে শয্যায় আড় হইয়া পড়িল। রজনীও ক্লান্ত হইয়াছিল—দুই চোখ গাঢ় ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল। সে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। আজ মনে হইতেছিল, ঐ যে রূপসী তরুণীকে সে পুকুর-ঘাটে দেখিয়া আসিয়াছে, তার রূপ, তার অবয়ব, তার মাধুরীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিবে, স্ত্রী

জয়ন্তীর মধ্যে তার কিছু সে পায় কি না। এই জয়ন্তীকে দিয়া তার পরশ একটুও যদি অনুভব করা যায়! সেও তরুণী নারী, জয়ন্তীও তো তাই!

স্ত্রী জয়ন্তী আসিয়া কাছে বসিল। রজনী তার মধ্যে যদি এই অতৃপ্তি-পূরণের কিছু পায়, আজ তাই নূতন চোখ লইয়া, প্রাণের দরদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ-সহকারে জয়ন্তীকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।...না, না, কিছু না। এ একটা মাটির স্তূপ, মাংসের ঢিপি! এর না আছে সৌন্দর্য, না আছে মাধুর্য!...তার পাশে?...জয়ন্তী একটা কাঠের পুতুল, কাঠের পুতুল! না আছে তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, না আছে কোনো পারিপাট্য! একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রজনী ভাবিল, ক্যাডাভারাস্!

যে-পথে সে ছুটিয়াছিল, সে-পথটার উপরই ঘৃণা ধরিয়া গেল। কি নির্বোধ সে! রূপের বাসনা আরো তীব্র হইয়া বুকে ফুটিল। নাচ, গান, হাসি, তামাসা, সমস্তই একান্ত নিরর্থক, পাগলামি বলিয়া মনে হইল। রূপ! রূপ! রূপ! সারা ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! সেই তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া রূপের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর কেবলি তরঙ্গ ছুটিতেছে। পুকুরের তীরে বসিয়া সে ঐ তরঙ্গ দেখিয়াই দিন কাটাইবে! আর কিছু চায় না! সব ফেলিয়া, সব ছাড়িয়া ঐ রূপের তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে চায় শুধু! রূপের কাঙাল মন বুঝিয়াছে, কি ধনেই সে বঞ্চিত!

জয়ন্তী বলিল,—পাখীগুলো রান্না হবে তো?

রূপের হাওয়ায় রজনী ভাসিয়া চলিয়াছিল। জয়ন্তীর কথা সে-হাওয়ায় যেন ধূলি ছিটাইয়া দিল। বিরক্ত হইয়া সে বলিল,—হ্যাঁ।

জয়ন্তী বলিল,—তোমরাই রাঁধবে তো? বামুন-দিদি কি পাখী রাঁধতে রাজী হবে?

আবার! ঝাঁজ-মিশানো বিরক্তির সুরে রজনী বলিল,—যা হয় করোগে। আমায় বিরক্ত কোরো না।

জয়ন্তী বলিল,—ঘুমোবে? তা ঘুমোও, আমি বাতাস করি।

জয়ন্তী পাখার বাতাস করিতে লাগিল, রজনী রূপের ধ্যানে তন্ময় থাকিয়া কখন্ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল:

ঘর ছাড়িয়া, সব ছাড়িয়া যেন সে কোথায় কোন্ নির্জন বনে দারুণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, উঠিয়া জলের সন্ধান করিবে, সে শক্তিও নাই!—হঠাৎ...ও কে! আকাশ ফাটিয়া আলোর ঝর্ণা ঝরিয়া পড়িল! ...চারিধারে আলোয় আলো হইয়া গেল! বিস্মিত দুই চোখ তুলিয়া রজনী দেখে, তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই তরুণী! এ যে পরীর বেশ—প্রজাপতির বিচিত্র পাখার মতো দু'খানি হালকা পাখা বাতাসের ভরে মৃদু-মৃদু কাঁপিতেছে! কেশের রাশি শ্রাবণের মেঘের মতো নামিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে! পরীর হাতে ফুলের ছড়ি, কপালে তারা জ্বলিতেছে—দিনের এ প্রখর আলো, তাহার দীপ্তির পাশে একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে! সে রূপের হিল্লোল চোখে দেখিয়া তার সব

পিপাসা মিটিয়া গেল! সব ক্লান্তি ঘুচিয়া গেল! পরীর অধরে মৃদু হাসি—বিশ্ব-ভুবন-ভুলানো সব-দুঃখ-জুড়ানো মৃদু মধুর হাসি! রজনী সব ভুলিয়া দুই হাত তুলিল, পরীর ঐ যে আঁচলখানি ভুমে লুটাইয়া পড়িয়াছে···সেই আঁচলের একটু পরশ পাইতে! সে হাত তুলিতেই সব কোথায় মিলাইয়া গেল!···ছায়া, ছায়া—কিছু নাই।

রজনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল—চোখ মেলিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কোথায় বন, কোথায়-বা পরী!···এ তার ঘর, সে বিছানায় শুইয়া, আর তার পাশে বসিয়া—জয়ন্তী!···কি কুৎসিত!

বিরক্ত চিত্তে সে শুইয়া আবার চক্ষু মুদিল।

অসহ্য! অসহ্য এ পিপাসা! একি মরীচিকার পিছনে অধীর মন চঞ্চল হইয়া ক্ষ্যাপার মত ঘুরিয়া মরিতেছে! ওগো দুর্লভ, এ কি মায়ার পাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাকে কষিয়া বাঁধিতেছ! এ-বাঁধন যে গায়ের মাংস কাটিয়া হাড়গুলোকে অবধি চূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ঘুম আসে না, চিন্তাও ছাড়ে না! এমন তার কখনো হয় নাই! কলিকাতায় অমন কত রূপসীর রূপের মেলায় সে ঘুরিয়াছে—কত বেশে কত ভঙ্গীতে তারা তৃপ্তির পেয়ালা ভরিয়া আনিয়াছে—কিন্তু আজ এ অতৃপ্তির মাঝে যে নেশা প্রাণটাকে ভরপুর করিয়া দিয়াছে, এ নেশা এ বিহ্বলতা যে একেবারেই অজানা ছিল!

সে পরের—পরের ঘরে ফুটিয়াছে, পরের তৃপ্তির কামনার ধন সে—তবু···তার চিন্তাতেও এ কি সুখ! তাহাকে পাইবার নয়, তবু খেলাচ্ছলে মনের মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া পাইয়া তাহার চিন্তায় তাহারই ধ্যানে পড়িয়া থাকা—ইহাতেও কি সুখ, এ কি পরিতৃপ্তি! চোখ বুজিয়া রজনী ভাবিতে লাগিল, সে আমার—সে আমার—সে আমার গো! আলোয় তার কথা ভরিয়া রহিয়াছে, বাতাসে তার কথা মিশিয়া আছে। এ আলো, এ বাতাস আমাকেও ঘিরিয়া আছে, আমাকেও জড়াইয়া রহিয়াছে। নিত্যকার এই আলো-বাতাস বিচিত্র মোহে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মাঝে-মাঝে মোহের ঘোরে চোখের পাতা যেই খুলিয়া পড়ে, স্বপ্ন অমনি টুটিয়া যায়—কঠোর বাস্তবের ঘা খাইয়া চোখের সামনে অমনি জাগিয়া উঠে, জয়ন্তী। নাঃ! রমণীকে এমন কুৎসিত করিয়াও সৃষ্টি করিতে পারো ভগবান!

জয়ন্তীকে তার যে একেবারে ভালো লাগিত না, এমন নয়। তবে তার মধ্যে মাদকতার অভাব, ঝাঁজের অভাব। এইটুকুই চোখে পড়িত—কলিকাতার বিচিত্র সংসর্গে প্রাণের যে অবাধ লিপ্সার সে স্বাদ পাইয়া আসিয়াছে, তার তুলনায় এ নির্জীব, প্রাণহীন, তবু ইহার মধ্যেও কি যেন একটা সুর ছিল! আজ সে সুরও কাটিয়া গিয়াছে! একটিবারের জন্য দেখা দিয়া সে তরুণী প্রাণটাকে কি রঙেই রাঙাইয়া দিয়াছে—তার ফলে এখন সমস্তই আগাগোড়া ম্লান বলিয়া মনে হইতেছে। মন ঠাঁই পাইতেছে না কিছুতেই—ঠিকরাইয়া সরিয়া-সরিয়া যাইতেছে।

রজনী উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বাহিরের ঘরে গেল। সঙ্গীরা নিদ্রা যাইতেছে। সে আসিয়া তাহাদের তুলিয়া বলিল—পাখীগুলোর ব্যবস্থা করো।

সঙ্গীরা নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে কহিল,—হবে'খন! তাড়া কেন?

রজনী বলিল,—কাল আরো ভোরে বেরুবো শিকারে। ঐ জায়গাতেই—কেমন?

ঘুমের ঘোরে সঙ্গীরা বলিল,—আচ্ছা।

পরের দিন ভোরে আবার সেই শিকার-যাত্রা। সেই মোটর, সেই পথ, সেই বাগান, সেই পুকুর! পুকুরে তরুণী এখনো দেখা দেয় নাই। শিকারীদের দলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। রজনী আর অগ্রসর হইতে চায় না—নৈরাশ্যের ঘা খাইয়া পা দুইটা চকিতে অত্যন্ত ভারী ঠেকিল! চলার সব উৎসাহ নিমেষে যেন উবিয়া গেল। অথচ বাগানের মধ্যে জড়-ভরতের মতো দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। লোক চলাফেরা করিতেছে—এই সকালবেলায়! একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে!

উপায়? একজন সঙ্গী বলিল,—বাড়ীতে চলো,—আলাপ করা যাক।

আর একজন বলিল,—পাগল!

রজনী বলিল,—সে হয় না।

প্রথম সঙ্গী বলিল,—তা বলে তো চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না।

রজনী বলিল,—মোটর-গাড়ীতে গিয়ে বসা যাক, আবার ফিরে আসবো।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না, আমি অমন বাজে ঘোরার মধ্যে নেই। এতটা পথ—কি যে বলো!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—তবে চলো, সটান্ ঘাটে যাই। আজ না-হয় সকাল-সকাল ফিরবো'খন। আজ শিকার মিলবে ভালো। কাল একটু বেলা হয়ে গেছলো। একে গ্রীষ্মকাল, তায় চড়চড়ে রোদ—পাখী মিলবে কেন বেলায়?

রজনী বলিল—মিছে যাওয়া। কাল বন্দুকের আওয়াজে চারিধার ঝালাপালা হয়েছে। আজ আর পাখী ওখানে আসবে কি?

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—তবে শিকারে এলে কেন?

রজনী মৃদু হাসিল। প্রথম সঙ্গী বলিল,—রমণীর মন-শিকারে বেরিয়েচো বুঝি আজ তবে?

রজনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না ভাই, ও-পথে আমি নেই। ভদ্দর লোক,—একজনের স্ত্রী—লজ্জা ত্যাগ করা যায় না হয়,—কিন্তু ভয়,—সেটাকে ত্যাগ করতে পারছি না।

রজনী করুণভাবে তার পানে চাহিল। সে বলিল,—অভিপ্রায়টা খুলেই বলো দিকি!

রজনী বলিল,—শুধু একটু চোখের-দেখা দেখা—এই আর-কি!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না ভাই, ও দেখাতেও আশঙ্কা বিলক্ষণ!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—None but the brave···জানো তো?

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—একে bravery বলো? coward!

রজনী বলিল,—আমরা তো কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছি না! ভগবান একজোড়া চক্ষু দিয়েছেন, তারি সদ্ব্যবহার করছি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—দৈবাৎ চোখে কিছু পড়ে, দৃষ্টি চালাও। তা বলে' এমন খুঁজে-পেতে এসে চোখ দেওয়া। এ মতি ছাড়ো।

প্রথম সঙ্গী বলিল,—কিন্তু এ তো দুর্মতি নয়। লোভও করছি না, শুধু নিষ্কাম দর্শন-সুখ!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—ওসব তর্ক করতে চাই না। চলো,—এখন হয় এগোও, নয় পেছোও। এভাবে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক হবে না—সেটা ভালো দেখাচ্ছে না!

রজনী বলিল,—কেন, এ-বাগানে আমরা পাখী খুঁজচি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—এ-বাগানে পাখী!

রজনী বলিল,—কেন, ঘুঘু! ঘুঘু তো মারতে পারি!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—মারো ভাই, ঘুঘুই মারো! কিন্তু কথায় আছে, ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ ছাখোনি!

রজনী বলিল,—ফাঁদও নয় দেখলুম! দেখলুম কি, দেখেছি—

প্রথম সঙ্গী বলিল,—শুধু দেখেচো কি, ফাঁদে পড়েছো! বলিয়া মস্ত রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! তার সে হাসি একটা বিপুল প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া, নির্জন বনভূমি কম্পিত করিয়া তুলিল।

ঠিক সেই সময় সেই দ্বার-পথে তরুণীর ছায়া দেখা গেল! তরুণী ঘাটে আসিতেছিল,—তাহাদের হাস্যরবে অপরের সান্নিধ্য বুঝিয়া সরিয়া গেল।

রজনী বলিল,—ঐ হে—

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—চ'লে চলো, চ'লে চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বেচারী আসতে পারছে না।

এই কথা বলিয়া দ্বিতীয় সঙ্গী অগ্রসর হইল—রজনী ও প্রথম সঙ্গী তখন তার অনুসরণ করিল।

ঘাটে সেই পান্সী—তেমন সাজানো। সকলে পান্সীতে উঠিলে, পান্সী ছাড়িবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ রজনী বলিল,—যাঃ কার্টরিজগুলো মোটরে ফেলে এসেছি। তারপর প্রথম সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—মন্মথ, এসো না ভাই, নিয়ে আসি। নাহলে যাওয়াই মিছে! দ্বিতীয় সঙ্গীর পানে চাহিয়া বলিল,—তুমি আসবে, না নৌকোতেই অপেক্ষা করবে?

রজনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা অভিসন্ধি মাখানো ছিল,—দ্বিতীয় সঙ্গী হরেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তোমরা যাবেই তো, যাও। মোদ্দা শীগ্‌গির ফিরো। আমি নৌকাতেই থাকি। আবার এতটা পথ,—না ভাই, আমার অত সখ নেই, শক্তিও নেই।

মন্মথর মুখে একটা বিষাক্ত হাসির ঢেউ ছুটিয়া গেল। সে বলিল,—এসো রজনী, আমি বন্ধুকৃত্য করি তোমার সঙ্গ দিয়ে। বেচারী একলা যাবে—

রজনী মন্মথকে লইয়া তীরে নামিল ও নিমিষে দুইজনে বাব্‌লা ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন তখন জলে পা ডুবাইয়া গান ধরিল :

খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে—
এই বেলা খুলে দে!
খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা স্রোত বহে যায় রে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দুইজনে ফিরিয়া আসিল, দুইজনেরই মুখে হাসি। তাহারা নৌকায় ফিরিলে রজনী বলিল,—মন্মথটা গাড়োল। কার্টরিজ ঐ ব্যাগে আছে—তা বলেনি। মোটরে খুঁজে পাই না, শেষে বললে, 'ব্যাগে করে' নিয়েছি। মিছে এতটা সময় নষ্ট হলো, তাছাড়া এই পরিশ্রম!

হরেন ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে রজনীর পানে চাহিল, মৃদু-স্বরে কহিল,—এত কৈফিয়ৎ কেন?

মন্মথ মৃদু-স্বরে বলিল,—মাঝিদের কাছে ইজ্জৎ রাখতে হবে তো! খালি হাতে ফিরলুম। তারা বেকুব ভাববে যে!

হরেন বলিল,—মনে পাপ ঢুকেছে—নিষ্কাম দর্শনাকাঙ্ক্ষী আর নও তবে? আগে থাকতে দোর সামলাচ্ছো তাই!

আট দাঁড়ে পান্সী চলিয়াছে তরতর করিয়া। রজনী বলিল,—তুমি গেলে না,—ভারী miss করেছো! আহা, আজ যেন রূপের জ্যোৎস্না খুলেছিল আরো!

হরেন বলিল, আমি ওতে নেই। বাইরে আমার রঙ্গ চলে ভালো, ভদ্দর লোকের মেয়ে যেখানে, সেখানে আমি জড়ো-সড়ো।

মন্মথ বলিল,—কাল তো চোখ বোজোনি!

হরেন বলিল,—দৈবাৎ চোখে ভালো জিনিস পড়লো—চোখ ফিরলো না। তা বলে' সঙ্কল্প এঁটে কোমরে কাপড় বেঁধে আবার তার পিছু নেওয়া!

আজো যদি তখন দেখতে পেতুম, দেখতুম। ভালো বলেই দেখতুম,—অমন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে যেতুম না!

মন্মথ বলিল,—Scoundrel!

রজনী তন্ময়চিত্তে তখনো তরুণীর কথা ভাবিতেছিল! এমন রূপ কখনো সে চোখে দেখে নাই! গরীবের ঘরে ঐ ভাঙা কুঁড়েয় এ যে রাজার ঐশ্বর্য—তার চেয়েও বেশী; বিশ্ব-ভুবনের মণি-মঞ্জুষা কে যেন উজাড় করিয়া দিয়াছে!

তারপর আবার সেই কালিকার মতোই সব। সেই বিল, তবে পাখী বড় কম। দুই-চারিটা তাগ হইল, গুলি ছুটিল, দুই-চারিটা পাখীও মারিল, তারপরই রজনীর শিকারের সাধ মিটিয়া গেল। আর না—আজ একটু আগে ফেরা যাক! সে-পুকুরে যদি আর-একবার সে ভুবন-মনোমোহিনীর দেখা মেলে!

হায় রে নিরাশা! পুকুরের কালো জল,—সবুজ মখমল-বিছানো অপরূপ শয্যা! ...কিন্তু সে নাই, সে নাই! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রজনী থমকিয়া দাঁড়াইল।

হরেন বলিল,—এ-রকম শিকার যদি আবার চলে, তাহলে ছুটি দিয়ো, ভাই।

মন্মথ তামাসা করিয়া বলিল—An angel! An angel! জানো না তো ভাই,—'কোথায় সে মধু আছে বিনা পল্লীকুসুমে!' এ কথা কবি বলে' গেছেন।

হরেন একটু ঝাঁজালো-স্বরে বলিল,—মধুচক্রে মৌমাছিও আছে, আর তার হুলও আছে, সে-কথা কবি ভুলে যেতে পারেন, তোমরা ভুলো না। এখন এসো। সে অগ্রসর হইল।

—"নেহাৎ বেরসিক!" বলিয়া মন্মথ রজনীর পানে চাহিল এবং তাহারাও সঙ্গে-সঙ্গে চলিল।

হরেনের অসহ্য ঠেকিল! সমস্তক্ষণ রজনী আর মন্মথর কিসের এত ফিসির-ফিসির? সে বলিল,—আমি ভাই কাল কলকাতা যাবো!

রজনী বলিল,—হঠাৎ?

মন্মথ বলিল—একসঙ্গে গেলে হতো না?

হরেন বলিল,—না, যখন এক রমণী এসে মাঝে দাঁড়িয়েছেন, তখন এ-কথা ঠিক যে, বেশীদিন বন্ধুত্ব থাকবে বলে' মনে হয় না।

এরই মধ্যে আমায় একঘরে করে' তোমাদের নানা পরামর্শ চলেছে।

আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া রজনী বলিল,—না, কাল শিকারে বেরুবো কি না, সেই কথাই হচ্ছিলো আমাদের।

হরেন বলিল,—আবার শিকার! ঐ পথেই? ঐ জায়গাতেই?

হাসিয়া মন্মথ বলিল,—তাই যদি হয়, দোষ কি?

হরেন বলিল,—আমি তাহলে সরে' পড়লুম!···তাছাড়া মন্মথ, তুমি ভালো করছো না। যাক্, তুমি চাকরির চেষ্টায় আছো, তুমি থাকো, আমার তার ব্যবস্থা যে মোটে নেই, তা তো নয়। অতএব—

মন্মথ রাগিয়া বলিল,—আমায় তুমি মোসাহেব বলতে চাও? বন্ধুর সঙ্গে একমত হই যদি তো সেটা মোসাহেবি?

হাসিয়া হরেন বলিল,—চেপে যাও না!···মোদ্দা রজনী, ভগবান তোমায় পয়সা দিয়েছেন, শরীর দিয়েছেন, বয়সও দিয়েছেন,—অন্য নানা স্থানে তার জোরে মনে করলেই, নানা সুখ আয়ত্ত করতে পারো—আলেয়ার পিছনে কেন ছুটচো? পরের ঘরের রূপসীকে দেখে তাকে দেখার লোভ ছাড়তে পার না—এর মানে কি? তাকে পাবে না। আর পেতেই যদি চাও, তাহলে শয়তান হয়ে পেতে হবে। অতএব—

রজনী একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কি আশ্চর্য। ঠিক ঐ কথাটাই সারাক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বিষম পাগল করিয়া তুলিয়াছে···! সে কি সম্ভব! ভাবিতেই বুক দুরদুর করিয়া উঠিয়াছে। আবার জোর করিয়া প্রাণে কে সাহস দিয়াছে! পয়সায় কি না হয়! তাছাড়া সে যদি তাহাকে সুখী করিতে পারে, ঐ সোনার অঙ্গ হীরা-জহরতে মুড়িয়া দেয়, রত্ন-পালঙ্কে তাহাকে রাজ্যেশ্বরী করিয়া রাখে···কিন্তু মনের

অতি-গোপন এ-কথাটার প্রতি হরেন ইঙ্গিত করিল কি করিয়া। তবে কি তার মুখে-চোখে সে গূঢ় অভিসন্ধি, সে সঙ্কল্প এতখানি ছাপ মেলিয়া দিয়াছে যে···না, না—

রজনী বলিল,—কি বক্‌চো, তার ঠিক নেই! না, না, কাল আর শিকারে যাবো না। তাহলেই হলো তো!

হরেন বলিল,—না, ভাই, আমার এ-সব ভালো লাগে না। কি জানো, গান-বাজনা হাসি-খুসী গল্প-গুজব করো—কলকাতা থেকে রূপসী আনিয়ে বাগান সাজাও—সে-সবে আমায় তোমার পাশটিতে পাবে চিরদিন! তবে সে গণ্ডী এড়িয়ে যদি যেতে চাও, তাহলে আমি তাতে নেই! আমি ভীতু মানুষ, আমার ভয় হয়! তাছাড়া আমার প্রবৃত্তির একটা সীমা আছে। তোমরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে কথা কইছিলে, আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল।

মন্মথ বলিল,—শুধু দেখছিলুম, আমরা তার সঙ্গে হাসি-তামাসা করিনি, ইসারাও করিনি, তবে কিসের ভয়?

হরেন বলিল,—তবু সে ভদ্র-ঘরের মেয়ে! আমি মহিলাদের এ সম্মানটুকু দিয়ে থাকি।

মন্মথ বলিল,—সতী সাবিত্রী গো!

হরেনের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল,—আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, স্বীকার করচি, তাবলে' একেবারে শয়তান নই!

মন্মথ বলিল,—আমরা শয়তান—এই কথা বলতে চাও? কে না চেয়ে দেখেচে?

—যে দেখে, সে দেখুক। আমি দেখবো না, দেখতে চাই না। পৃথিবী প্রকাণ্ড ক্ষেত্র, দেখার বস্তুরও অভাব নেই।

রজনী বলিল,—থাক তর্ক। চলো একটু বেড়িয়ে আসিগে।···ও পথে যাবো না,—ভয় নেই হরেন।

পরের দিন হরেনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

মন্মথ বলিল,—যাক্‌গে···coward!

রজনী বলিল,—কিন্তু—

উৎসাহের ভঙ্গীতে মন্মথ বলিল,—এর আবার কিন্তু কি? বন্ধুর জন্যে বন্ধু কি না করতে পারে? হ্যাঁ, যদি প্রকৃত বন্ধু হয়—

রজনী বলিল,—ঘরে তার স্বামী আছে—

মন্মথ অত্যন্ত গর্ব-স্ফীত কণ্ঠে বলিল, কুছ পরোয়া নেই।···একটা গরীবের ঘরের মেয়ে—তাকে পাওয়ার জন্যে আবার ভাবনা। রূপেয়া—রূপেয়া কি কম চীজ, ভাই!

রজনী বলিল,—ভয় করে ভাই! এক-গাঁ লোক। নিজের গাঁয়ে—

মন্মথ বলিল,—তোমার উপর কারো সন্দেহ হবে না,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

রজনী বলিল,—যাক্, সে যা হবার পরে হবে। এখন চলো না একবার ওদিকে। একটু ঘুরে আসি।

মন্মথ বলিল—চলো!

দুইজনে তখনি আবার যাত্রা করিল। অদৃষ্ট ভালো—লক্ষ্মী তখন পুকুরে আসিয়াছিল, কলসীতে জল ভরিতে। সে কলসী ভরিয়া পুকুরপারে দাঁড়াইয়াছিল—মন্মথ ও রজনী আসিয়া একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। হঠাৎ ঝরা-পাতায় কার পাদস্পর্শে থড়-খড় শব্দ হইল। লক্ষ্মীর সেদিকে দৃষ্টি পড়িল,—চোরের মতো ও কারা! দুজনের দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিয়া লক্ষ্মীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাদের পানে নিমেষ মাত্র চাহিয়া সে ঘাটে কলসী রাখিয়াই দ্রুত গৃহ-মধ্যে পলায়ন করিল।

মন্মথর গা টিপিয়া রজনী বলিল,—ফেরো হে!

মন্মথ বলিল,—কেন, ভয় হচ্ছে না কি?

রজনী বলিল,—ছি-ছি, ভারী বেয়াদবি হলো! কি রকম কড়াচোখে চেয়ে গেল,—দেখলে না?

মন্মথ বলিল,—আরে আজ প্রথম, তাই। ও চোখের চাউনি দু'দিনে মিহি করে' তুলবো,—আমার নাম মন্মথ!

রজনী বলিল, না হে, চলে' এসো!

মন্মথ কহিল,—ভয়?

রজনী বলিল,—না, না, হাজার হোক্, আমায় সকলে চেনে,—শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে!

মন্মথরও যে ভয় না হইতেছিল, এমন নয়। বাড়ী গিয়া যদি কাহাকেও বলিয়া দেয়? পাড়ার লোক আসিয়া পড়ে যদি? সে বলিল,—চলো তবে।

দু'জনে চোরের মতো তখন সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

তরুণ-সঙ্ঘের চড়িভাতির আয়োজন ছিল সেদিন—রবিবার! বেলা ন'টার সময় পলাশডাঙ্গা হইতে দশ-বারোটি ছেলে আসিয়া নৌকা হইতে নামিয়া অঙ্গনায় পৌঁছিল! দলের সঙ্গে যতীশও আসিয়াছিল। এখানে জীবনের এই মুক্ত হিল্লোল, এই সরল প্রাণের অকপট সঙ্গ—এ-সব দেখিয়া সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, যা-কিছু বুদ্ধি, তা কলিকাতার ছেলেদের মাথাতেই খেলে,—নতুন কাজ, নতুন আইডিয়া,—সে-সব এ পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের মাথায় আসিবে কোথা হইতে? তাহারা জীবনের কি জানে? কিন্তু এই তরুণ-সঙ্ঘটিকে পাইয়া তাহার মত বদলাইয়া গেল। এমন আপশোষও জাগিল যে, অন্ততঃ দু-তিন বৎসরও যদি সে ইহাদের সঙ্গে কাটাইতে পারিত! শুধু ফুটবল খেলিয়া আর ডন করিয়াই মানুষ হওয়া যায় না। গোরাদের ম্যাচে হারানোতেই আনন্দের চরম নয়। এখানে এই যে পরের জন্য পরের ভাবিতে শেখা, কাজ করিতে শেখা, নিজের স্বার্থ বলি দিয়া নিজের পানে একটুও না চাহিয়া এই যে জীবন-তরঙ্গে ভাসিয়া চলা, ইহার নাম জীবন! নহিলে বাবুয়ানায় টেক্কা দেওয়া বা সাহেবকে গালি দিতে পারাটাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য নয়।

সে-সব যেন কৃত্রিম অভিনয়, প্রাণের সহিত প্রাণের আন্তরিক যোগ সেখানে কোথায়? তবে এখানে যে তার থাকিবারও উপায় নাই! পাশ করিয়া তাহাকে কলেজে ঢুকিতে হইবে, এখানে তো আর কলেজ নাই!

তারপর এই দলটি! চমৎকার দল! আশ্চর্য সকলের মনের মিল। আর ঐ মাস্টারমশায়টি,—রঘুনাথ বাবু। কি অনাড়ম্বর তাঁর জীবনযাত্রার প্রণালী! ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মেশার ভঙ্গীটিও কি সুন্দর! সকলকে সমান চক্ষে দেখা, সকলের উপর সমান দরদ,—কলিকাতার স্কুলে এ তো দেখাই যায় না। সেখানে একটা ভুল-চুক হইলে শুধুই তীব্র ভৎর্সনা আর শাস্তির ঘটা! আর, ইনি? সে তো স্কুলে গিয়াও দেখিয়াছে, যার ভুল হইল, তাকে বুকের কাছে টানিয়া কি ভাবেই না তাকে তা বুঝাইয়া দেন! এতটুকু বিরক্তি নাই, এতটুকু অধৈর্য নাই!

রঘুনাথের উপর তার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। আজ এ চড়িভাতির প্রস্তাবে তার আমোদ হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী। এ যে তার কল্পনার অতীত!

ছেলেরা আসিয়া নদীতে ঝাপাই জুড়িয়া নদীর জল একেবারে তোলপাড় করিয়া তুলিল। জলের ঢেউয়ে জলের গায়ে তরুণ প্রাণের চপল হিল্লোল লাগায়, জলও সঙ্গে-সঙ্গে উল্লাসে যেন নাচিয়া উঠিল। সঙ্গীত কলরবে জল—তটের কানে সে আনন্দ জানাইতে ছুটিল।

স্নান সারিয়া ঘণ্টাখানেক পরে ছেলের দল বাগানে আসিল। চড়িভাতির জন্য হাঁড়ি-কুড়ি চাল-ডাল সব সাজানো। একজন গিয়া শুক্‌নো পাতা কুড়াইয়া আনিল। দুই-তিন জন গাছে চড়িয়া শুষ্ক ডাল সংগ্রহে মন দিল,—টুকরা কাঠের স্তূপে তারা অমন ছোট-খাটো একটা পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তারপর মাটি খুঁড়িয়া ইঁট সাজাইয়া উনান তৈরী হইল। লক্ষ্মী আসিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া তাহাতে চাল ডাল ফেলিয়া দিল—খিচুড়ী হইবে।

যতীশ এধারে-ওধারে ঘুরিয়া পল্লীর এই বিজন কানন-ভূমিটিকে তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। সহরের শুষ্ক কঠোর পথ আর ইঁট-কাঠে-রচা প্রাচীরের শ্রেণী দেখিয়া চক্ষু যেমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এখানে বৃক্ষ-লতার অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য, পুকুর ও খড়ে-ছাওয়া বাঁশে-ঘেরা মাটির কুটীরগুলির মধ্যে এমন শান্তি ও শ্রী বিরাজ করিতেছে যে, তাহা দেখিয়া ক্লান্ত-দৃষ্টি স্বাস্থ্যে ভরপুর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। এই খোলা জায়গা···গাছের ডালে ডালে পাখীর ডাক, পাতায়-পাতায় বাতাসের কানাকানি তার প্রাণে এমন এক কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, সে এক সময়ে একটা পড়া-গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল, আর তার চোখের সামনে হইতে সমস্ত বহির্জগতের লোকজন—তাদের কল-কোলাহল সব কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হঠাৎ তার নজরে পড়িল, অদূরে একটা জামগাছের পানে। পুকুরের ধারে জামগাছ—তার একটা মস্ত ডাল পুকুরের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। ডালে থোলো-থোলো কালজাম—আর ছোট একটি মেয়ে একটা আঁকশি লইয়া জামগাছের ডালে লাগাইতেছে, সেই জাম পাড়িবার জন্য। ছোট মেয়ে, আঁকশিটাও ছোট,

জামের গোছায় নাগাল পাওয়া যায় না! কৌতুকের ভাবে যতীশ তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। অন্য ছেলেদের দল তখন চড়িভাতির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাদের কলরব, স্তব্ধ মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের মত কানে আসিয়া লাগিতেছিল; লক্ষ্মী রঘুনাথ তাদের কাছে দাঁড়াইয়া সব তদ্বির করিতেছিল।

হঠাৎ যতীশের চোখের সামনে সমস্ত শ্রী যেন উল্টাইয়া গেল। মেয়েটি ডালে আঁকশি লাগাইয়া এক-পা এক-পা আগাইয়া চলিয়াছিল, তবুও জামের নাগাল পাইতেছিল না। তাহার সে মৃদু-চঞ্চল গতিভঙ্গি যতীশের বুকের মাঝখানটায় কি যেন এক অজানা ভয়ের শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল! যতীশ তার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না! তার বুক কেমন দুরদুর করিতেছিল। তাই তো, মেয়েটি আনমনা-ভাবে ও কোথায় আগাইয়া-আগাইয়া চলে!

হঠাৎ ঝপ্ করিয়া একটা আওয়াজ আর সঙ্গে-সঙ্গে বালিকার ক্রন্দনে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। যতীশ ছুটিয়া পুকুরপাড়ে গেল—মেয়েটি গড়াইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছে। ঐ যে, ঐ সে! যতীশ অমনি টপ্ করিয়া ঝাঁপাইয়া পুকুরের জলে নামিয়া পড়িল। মেয়েটি জল খাইতেছে, চুলগুলা ছড়াইয়া মুখে পড়িয়াছে, এক-একবার সে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে! মুখ তার মৃত্যুর উদ্যত করস্পর্শে কেমন এক বিভীষিকায় ভরিয়া গিয়াছে!

যতীশ জলে সাঁতরাইয়া গিয়া বালিকার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টান দিল; টানিতে-টানিতে তাহাকে তীরে লইয়া আসিল।

বালিকা জল খাইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যতীশ তাহাকে কোলে করিয়া বহিয়া বাগানে উঠিল এবং সকলে যেখানে খিচুড়ী রাঁধিতে ব্যস্ত—সেখানে লইয়া আসিল। লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কি!

মেয়েটি মন্টি। কি করিয়া এমন হইল? যতীশ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তখন ছেলেদের দল তার গায়ের মাথার জল মুছাইয়া দিতে লাগিল—রঘুনাথ তার হাত ধরিয়া ঘুরাইয়া আরো নানা প্রক্রিয়ার পর পেটের জল বাহির করিয়া দিল। ঘণ্টা-খানেক পরে মেয়ে সুস্থ হইলে লক্ষ্মী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরে গেল; এবং হেফাজতে কিছুক্ষণ রাখিবার পর মেয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, ডাকিল,—মা—

লক্ষ্মী মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—পাজী মেয়ে! আর কখনো পুকুরের ধারে যাবে?

মন্টি বলিল,—না।

রঘুনাথ আসিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিল, বলিল—এই যে মন্টি বেশ কথা কইছে।··· তুমি তাহলে এদিকে এসো গো, খিচুড়ী তোয়ের; ভাজাও হয়ে গেছে।

এখন কতকগুলা পাতা কাটিয়া ছেলেদের খাওয়াইতে বসাইলেই হয়।

ঘরে দই পাতা ছিল; আচার সড়া-তেঁতুলও ঘরে ছিল।

লক্ষ্মী সে-সব লইয়া বাগানে আসিল। একটি ছেলে এক রাশ কলাপাতা কাটিয়া আনিল!

প্রকাণ্ড একটা আমগাছ ডাল-পালা মেলিয়া এক জায়গায় যেন চন্দ্রাতপ খাটাইয়া রাখিয়াছে। সেই ছায়ায় গাছতলায় ছেলেরা সার-সার বসিয়া গেল। লক্ষ্মী পরিবেশন করিতে লাগিল। মন্টিকে যতীশ তার পাশে বসাইয়াছিল। যতীশ বলিল,—ভাগ্যে আমি চড়িভাতির দলে না থেকে ঐ গাছতলায় বসেছিলুম!

কথাটা শুনিয়া লক্ষ্মীর সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমার জন্যেই ওকে ফিরে পেয়েছি। নৈলে কি ওর আজ বাঁচবার কথা!—বেঁচে থাকো বাবা, ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন, বড় করুন!

যতীশ বলিল,—তা কেন! আমাদের তরুণ-সঙ্ঘের জন্যেই ও বেঁচেছে। আমি আগে সাঁতার জানতুম? মোটেই না! এখানে এসেই-না মাস্টারমশায়ের কাছে সাঁতার শিখেছি।

রঘুনাথ বলিল,—তার জন্যে তোমার গুরু-দক্ষিণাও আজ যা দেওয়া হলো, এর আর তুলনা নেই!

গল্পে-গুজবে ছেলেদের কল-গুঞ্জনে এই নির্জন স্তব্ধ বনভূমিতে যেন আজ নন্দনের সুরভি ছিটাইয়া পড়িয়াছিল! লক্ষ্মী ভাবিতেছিল, এত সুখ,...তার ভাগ্যে এত সুখও ছিল!

ছেলেদের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কয় টুকরা মেঘ আসিয়া রৌদ্রের উপর একটা কালো পর্দা বিছাইয়া দিল; দেখিতে-দেখিতে সে-মেঘ চারিদিকে এমন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল যে, চরাচর আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মাথার উপর পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আকাশের কোল ঘেঁসিয়া কোন্ অনির্দিষ্ট গৃহ-কোণ লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছিল। বাগান হইতে গাছপালার ফাঁক দিয়া নদীর একটু অংশ দেখা যাইতেছিল—ঘোলাটে-জল স্থির স্তম্ভিত,—যেন কি এক ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেছে, ভয়ের বস্তুটাকে দেখিতে পাইলেই এখনি চঞ্চল হইয়া উঠিবে! তার কোলে ওপারে একটা ইঁটের পাঁজা হইতে বাষ্প-ধূম উঠিতেছিল...যেন দৈত্যদের প্রকাণ্ড উৎসব-ভোজ উপলক্ষে মস্ত উনানে তারা আগুন দিয়াছে।

দেখিতে-দেখিতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিল। রঘুনাথ বলিল,—ভয়ানক জল-ঝড় আসচে! তোমরা হাত চালিয়ে নাও।

কিন্তু ছেলেরা হাত চালাইবার পূর্বেই হু-হু শব্দে ঝড় আসিয়া পড়িল। রাজ্যের ধূলা-বালি উড়াইয়া, গাছের ডালে-পাতায় প্রচণ্ড আর্তনাদ জাগাইয়া জীর্ণ ডালের টুকরা ছিটাইয়া গুলি ছুঁড়িতে-ছুঁড়িতে ঝড় আসিয়া তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিল। তার হুঙ্কারের বেগে জলও নামিল তেমনি মুষলধারে, চকিতে।

ছেলেরা পাতা ফেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া রঘুনাথের বাড়ীর দাওয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইল। রঘুনাথ ও লক্ষ্মী যতখানি সম্ভব জিনিসপত্র বাঁচাইয়া ঘরে ছুটিল—ভিজিয়া একশা হইয়া।

যতীশ সিক্তকেশা সিক্তবেশা লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। লালপাড় শাড়ীখানি তার গৌর অঙ্গ বেড়িয়া আছে! শাড়ী ভিজিয়া

তার গায়ের সঙ্গে ল্যাপ্‌টাইয়া গিয়াছে—আর কাপড়ের সাদা রঙ ফুঁড়িয়া তার গায়ের সোনার বর্ণ—শাড়ীর লাল পাড়ের ধার দিয়া যেন সোনালি ঢেউ ছুটাইয়া দিয়াছে। তার মনে পড়িয়া গেল, বহুদিনকার একটা হারানো দিনের কথা!

তখন তার বাবা বাঁচিয়া। কলিকাতায় বাপের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ দেখিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল এমনি বৃষ্টিতে! কলিকাতা শহর সেদিন ভাসিয়া গিয়াছিল, একখানাও গাড়ী মেলে নাই! ভিজিয়া বাড়ী ঢুকিতেই মা সেই বৃষ্টিতে তাকে সদরের দ্বার উঠান পার করিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া যাইতে ভিজিয়া সারা হইয়া গিয়াছিলেন···সেদিন মা'র পরনে ছিল এমনি একখানি লাল-পাড় শাড়ী, আর সে শাড়ী তাঁর গৌর-অঙ্গে ভিজিয়া ল্যাপ্‌টাইয়া গিয়াছিল! আজ লক্ষ্মীর পানে চাহিতেই মা'র সেই অঙ্গ সৌষ্ঠব, মা'র সে লাবণ্য যেন বিদ্যুতের মতো তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্মীর মুখে মা'র সেই তখনকার সুন্দর মুখেরই ছবি যেন কে তুলিয়া লইয়াছে! মনের মধ্যে তার একটা ডাক উথলিয়া উঠিল—মা, মা······!

সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি ঝড়-বৃষ্টি থামিল। ছেলেরা কলরব তুলিয়া বাহিরে আসিল। জলে ভিজিয়া চারিধার কেমন স্নিগ্ধ শ্যামল রূপে ভরিয়া উঠিয়াছে, মেঘ-জলের অন্তরালে গোধূলির স্বর্ণরাগ সারা বিশ্বে এক অপরূপ লাবণ্য ছড়াইয়া দিয়াছিল! এতখানি মুক্ত প্রান্তরে এমন বিচিত্র বর্ণরাগের লীলা যতীশের চোখে একেবারে নূতন! সে এ দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইল। তারপর রঘুনাথ সকলকে লইয়া নৌকোয় গিয়া উঠিল। তীরের কাছে-কাছে কাদা-ধোয়া ঘোলা জলে সাদা ফেনার রাশ, নদীর ম্লান হাসির মতোই ফুটিয়া উবিয়া যাইতেছিল। ঝড়ের সঙ্গে লড়িয়া নদী যেন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার তরঙ্গ-কল্লোল ভারী শান্ত, ভারী করুণ!

দুই-চারিদিন ধরিয়া অলস জল্পনা করিবার পর লক্ষ্মীর সে রূপ রজনীর মন হইতে উবিয়া যাওয়া দূরের কথা, সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল। সেদিনকার সেই দুই চোখের ভর্ৎসনার দৃষ্টি বুকের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ শরের মত বিঁধিয়াছিল যে, সেদিক-পানে চাহিতে সাহসে কুলায় না! অথচ কয়দিনের অদর্শন তার পিপাসাকে এমন তীব্র করিয়া তুলিল যে, রজনীর থাকিয়া-থাকিয়া মনে হয়, বুঝি সে পাগল হইয়া যাইবে! কোন কাজে মন নাই, কিছুই ভালো লাগে না। শিকার, গান-বাজনা, এ-সবে কোনো সুখ নাই, ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা দুঃসাধ্য ঠেকে, অথচ বাহিরটাও নেহাৎ ফাঁকা, নেহাৎ নিরবলম্ব মনে হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, অথচ বাড়ীর বাহির হইতে গেলে পা দুইটা ভারী বোধ হয়! মনে হয়, যাই কোথায়—কোথায় গেলে একটু জুড়াইতে পাই? এমনি দ্বিধার মধ্যে মন যখন একটা জায়গার দিকে সংকেত করে, চলো সেইখানে—পা তখন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া পড়ে, বুকের মধ্যটা কি এক ভয়ে দুলিয়া ওঠে! রজনী সত্যই ভাবে, এবার সে পাগল হইবে!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রজনী বাহিরের ঘরে পড়িয়া অস্থির মন লইয়া ছটফট করিতেছিল,—মন্মথ কোথায় গিয়াছে, কে জানে! ঘর অন্ধকার। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিতে আসিলে রজনী মানা করিল।

হঠাৎ একটু পরে চোরের মত মন্মথ আসিয়া হাজির। সে ডাকিল—রজনী—

রজনী বলিল,—কি?

মন্মথ বলিল,—সব ঠিক হে। এই ত্যাখো, কে এসেছে।

আঁধার ভেদ করিয়া রজনী লক্ষ্য করিল, দ্বারের কাছে মন্মথর পিছনে এক রমণী-মূর্তি। সে একটু কৌতূহলের ভাবে বলিল,—কে?

মন্মথ রজনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—গুণীন! এ ঠিক এনে দিতে পারবে—বহুৎ সন্ধানে একে পেয়েছি।

রজনী উঠিয়া বসিল, রমণীকে কাছে ডাকিল। রমণী নিকটে আসিলে সে বলিল,—সব শুনেচো?

রমণী একগাল হাসিয়া বলিল,—শুনেচি বৈ কি। কাকে চাই বলো তো দাদাবাবু—কার ওপর সদয় হ'লে?

রজনী চারিদিকে চাহিয়া খুব চাপাগলায় খুলিয়া বলিল, কাহাকে পাইবার জন্য সে এমন অধীর, আকুল! বারবার কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছিল! চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল—একটি পরিচ্ছন্ন ঘরের কোণ—এবং সেই কোণে বসিয়া তরুণী রূপসী স্বামীর চিন্তায় মশ্‌গুল। স্বামীর মুখে তৃপ্তির কি হাসি!—সুখের ঘর। এ ঘর তার একটি ইঙ্গিতে চূর্ণ হইয়া যাইবে! আর সে? আহা, ···না, না।

রমণী বলিল—কাকে গা দাদাবাবু?

রজনীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কে যেন বুকে মুগুরের ঘা মারিল! রজনী ভাবিল, থাক্, কাজ নাই!···এ চিন্তা মনে হইতেও সে শিহরিয়া উঠিল! অসম্ভব! তাকে না পাইলে দিনগুলা যে অসহ্য ঠেকিতেছে! জীবন ভারী কর্কশ বোধ হইতেছে! কি লইয়া সে থাকিবে? সে ভাবিল, দোষ কি! বেচারী অত রূপ লইয়া অবহেলায় জঞ্জালের মাঝে পড়িয়া আছে—আর সে ও-রূপ মাথার মণি করিয়া রাখিবে যে!

ধীরে-ধীরে সে বলিল,—অর্থাৎ বুঝেচো, রঘু-মাস্টারের বৌ···ঐ কঙ্কণার কাছে বাড়ী—

রমণী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে অক্ষমতার সুরে নিরাশ কণ্ঠে বলিল,—ও হবে না বাবু—আর কাকেও ফরমাশ করো।

রজনী অধীরভাবে বলিল,—কেন হবে না?

রমণী কহিল,—বড় ভালো লোক দাদাবাবু, রঘু মাস্টার। বৌটিও বড় লক্ষ্মী। নামেও যা, কাজেও তাই। আর গরীব হলেও, সোয়ামী অন্ত-প্রাণ। সতী-লক্ষ্মী···ও বড় শক্ত কাজ···তা ছাড়া তার পানে চাইলে মন ভরে' ওঠে—ওকে হবে না!

রজনী রাগ করিল ; এবং রুষ্টস্বরে বলিল,—তবে কি করতে এসেছো এখানে ?

রমণী বলিল,—এ-কথা জানলে আসতুম না। ইনি তো বলতে পারলেন না, কাকে চাই।

রজনী ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মন্মথর পানে চাহিল। অন্ধকারের মধ্যে সে-দৃষ্টি মন্মথ দেখিতে পাইল না।

রজনী বলিল,—কেন একে নিয়ে এলে তবে ?

মন্মথ সে-কথার কোন জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল !

রজনী বলিল,—তুমি ফ্যাসাদ বাধালে ! মিছিমিছি একে জানান্ দিলে ! তার পর ? ছি-ছি, কাঁচা কাজ ছাখো দিকি, তোমার !

মন্মথ নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রজনী রমণীকে বলিল,—এই নাও দশ টাকা। কিন্তু সাবধান, যদি এ-কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায়, তাহলে তোমার হাড় এক জায়গায় মাস আর-এক জায়গায় হবে। মনে থাকে যেন। বলিয়া রজনী তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল।

রমণী নোটখানা আঁচলের প্রান্তে বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিল—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো দাদাবাবু—আমায় মেরে ফেললেও এ-কথা প্রকাশ হবে না। বিশেষ তোমার গাঁয়ে থাকি ! চাচা আপন বাঁচা। কথাটা বলিয়া সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

রজনী বলিল,—দাঁড়িয়ে রইলে যে ! যাও।

রমণী বলিল,—শুধু-শুধু পয়সা খাবো, দাদাবাবু ? আর-কাকেও এনে দি··· ঐ আমাদের পাঁচুগোপালের বৌ—চমৎকার সুন্দরী, সোয়ামীটে কলকাতায় থাকে—বৌটাকে নেয়ও না—যেন পরীটি। আর বেশ হাসি-হাসি মুখ—চট করেই পোষ মানবে'খন।

রজনী বিরক্ত-স্বরে বলিল,—না, না, কাকেও চাই না। আমার কি ঐ পেশা ! তুমি যাও।

রমণী অগত্যা চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে রজনী ডাকিল—মনু, বসো দিকি —কথা আছে।

মন্মথ বসিল। রজনী কহিল,—অনেক ভেবেচি। এক ব্যাটা আছে বিন্দে, সে চাঁড়াল। ষণ্ডা, গুণ্ডা। তার দলে দু'চারজন লোক আরো আছে। তাকে ডাকিয়েছিলুম—তাদের ক' বোতল মদ আর কিছু টাকা দিলে তাদের যা হুকুম করবো, তাই করবে। আমি বলি কি, তাদের বলি, তারা ঠিক এনে দেবে।··· ভাবচি, একটা রাত্রে তারাই এ কাজ করবে। আমার মোটরখানা আজই সরিয়ে দি, কলকাতায় ফিরবে মেরামতির জন্যে, এই কথা বলে। তারপর তিন ক্রোশ দূরে ঐ যে পোড়া-কালীর মন্দির আছে, তার ওধারে বড় রাস্তায় মোটর থাকবে, সন্ধ্যার পর ! ওধারে লোকের ভিড় নেই। এদিকে মাঝরাত্রে ওরা কাজ ফতে ক'রে তাকে এনে মোটরে চড়িয়ে দেবে। মোটর একেবারে দু'খানা গাঁয়ের পর একটা ভাঙা বাড়ী আছে জঙ্গলের মধ্যে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে ওকে তুলবে ! আমরাও পরের

দিন দুপুরবেলায় কলকাতায় যাচ্ছি বলে' বেরুবো। বেরিয়ে সেইখানেই যাবো। এতে লোকেরও কোন সন্দেহ হবে না আমাদের উপর···তারপর যেমন অবস্থা দেখবো, ব্যবস্থাও তেমনি করা যাবে।

মন্মথ বলিল,—বাঃ, এ যে চমৎকার প্ল্যান্! তুমি একখানা উপন্যাস বানিয়ে ফেললে একেবারে। খাসা!

রজনী বলিল,—একটা চাকরকে ডেকে এবার আলো জ্বাল্তে বলো। না, না, থাক্। চলো, একবার বিন্দের ওখানে ঘুরে আসি। সে বেটার এখানে এসে কাজ নেই—যদি কেউ দেখে ফ্যালে! তার চেয়ে ওর ওখান থেকেই বন্দোবস্ত পাকা ক'রে আসা যাক্!

বন্দোবস্ত পাকা করিয়া ফিরিতে রাত দশটা বাজিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া আহার সারিয়া রজনী বাহিরের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিল। সামনের গাছে লাল টকটকে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়া বর্ণে-গন্ধে দিক মাতাইয়া তুলিয়াছে। মাথার উপর দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চারিধার ঝলমল করিতেছে। রজনী ফুলটার পানে চাহিয়া ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতেছিল। জলের কোলে সেই যে পদ্মটি দেখিয়াছে, তার কাছে এ গোলাপ কত তুচ্ছ! ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্না কখন যে গোলাপের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। ফুলটাও সেইসঙ্গে তার পাপড়িগুলোকে বিস্তার করিয়া ধরিয়াছে—আর তার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে সেই সুন্দরীর সুন্দর মুখ। কি হাসি তার ঐ রক্তিম অধরে! ঐ কুঞ্চিত কৃষ্ণ ঘন কেশরাশির মধ্যে চাঁপাবরণ মুখখানি···যেন পাতার কোলে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। রজনী তার অধীর দুই বাহু বাড়াইল—ও ফুলটি বুকে চাই! অমনি চকিতে তার স্বপ্ন টুটিয়া গেল—কোথায় তার মুখখানি! এ যে একটা গোলাপ ফুল—নেহাৎ তুচ্ছ! রজনী একদৃষ্টে ফুলটার পানে চাহিল—মনে হইল, ফুলটা যেন তার পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে!

ওদিকে ঠিক সেই সময় রঘুনাথের জীর্ণ গৃহের মাটির দাওয়ায় লক্ষ্মী একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল, মন্টি গল্প শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—রঘুনাথ এখনো বাড়ি ফেরে নাই! চাঁদের আলোয় আলো-করা আকাশের পানে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, তার জীবনের কত কথা। বিবাহের রাত্রে তার কি ভয় হইয়াছিল —বর, স্বামী। সে তো দেখিয়াছে, ঐ পাশের বাড়ীর মামী, স্বামীর কাছে কি মারই না খায়! পান হইতে চূণ খসিলেই নিস্তার নাই! ভীষণ গর্জনে মামার তিরস্কার আর লাথি, চড়—কি সে প্রচণ্ড প্রহার! তাহা দেখিয়া বিবাহের নামে তার হৃৎকম্প হইত! কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় ভয়-ভরা কৌতুহলের মাঝে রঘুনাথের স্নিগ্ধ চোখের সরস দৃষ্টি কি পরশ যে বুলাইয়া দিল! কোথায় গেল তার যত দুর্ভাবনা, যত শঙ্কা। রঘুনাথ কি আদরেই তাকে রাখিয়াছে।···শুধু হাসি, শুধু আনন্দ! দারিদ্র্য সেখানে হানা দিতে পারে না! এমনি কত কথা ভাবিতে-ভাবিতে কখন্ এক-সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চাঁদের আলো তার মুখে জ্যোৎস্নার

ঝর্ণা ঝরাইয়া দিয়াছে! ঠোঁটের কোণে হাসির লহর! বুঝি, কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে!

হঠাৎ রঘুনাথ ধীরে-ধীরে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল; মুগ্ধ-বিস্ময়ে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিল। জ্যোৎস্নার ধারায় ধোওয়া মুখখানি—অপূর্ব সুষমায় ভরা! রঘুনাথ দেখিয়া-দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল—ভাবিল, হায়, এ রত্ন···এ যে রাজার ঘরের যোগ্য! এ রত্ন তার হাতে পড়িয়া কি অবহেলাই না ভোগ করিতেছে! বেচারী···বেচারী লক্ষ্মী···! কেন সে হতভাগা লক্ষ্মীর জীবন-পথে আসিয়া উদয় হইল! এই জীর্ণ ঘর, এই দারিদ্র্য···এ কি লক্ষ্মীকে মানায়! কিন্তু উপায় কি ?···উপায়··· ?

রঘুনাথ লক্ষ্মীর পাশে বসিল—তার মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া অধীর আবেগে লক্ষ্মীর মুখে চুম্বন করিল। লক্ষ্মী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব! উঠিয়া চোখ মুছিয়া লক্ষ্মী বলিল,—যাও, তুমি ভারী দুষ্ট···

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল,—বড্ড লোভ হলো, লক্ষ্মী!

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল,—যাও···বলিয়া স্বামীর গায়ের জামা খুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সে পা ধুইবার জল আনিতে ছুটিল। তার পানে চাহিয়া রঘুনাথ বলিল,—এত ব্যস্ত কেন, লক্ষ্মী? একটু বসো না···

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল,—এতখানি পথ হেঁটে এলে! মুখ-হাত ধোও, কিছু খাও আগে, তারপর সারা রাত তোমার কাছে বসে থাকবো'খন।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, হায়রে, এ লইয়াই লক্ষ্মী পরিতৃপ্ত! এ লইয়াই সে ভাবে, সে পরম সুখে আছে!

পরদিন সন্ধ্যার পরক্ষণ ঝড় উঠিল। পলাশডাঙ্গায় যতীশের গৃহে সেদিন কি একটা কাজে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। স্কুলের সব ছেলেগুলি সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই জড়ো হইয়াছে—রঘুনাথেরও ডাক পড়িয়াছিল। মন্টির নিমন্ত্রণও বাদ যায় নাই।

যতীশের মা মন্টিকে নূতন কাপড়-চোপড় পরাইয়া সাজাইয়া কোলে লইয়া আদর করিয়া এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে, সে নিজের মার অদর্শন বুঝিতে পারিল না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। যতীশ আসিয়া বলিল,—মন্টি ঘুমিয়ে পড়েচে। মা বললেন, এই রাত্রে তাকে নাই নিয়ে গেলেন। কাল সকালে আমি তাকে পৌছে দিয়ে আসবো।

রঘুনাথ বলিল,—মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে যদি কাঁদে? বিরক্ত করে?

যতীশ বলিল,—মা বললেন, তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন তিনি।

রঘুনাথ বলিল,—বেশ, থাক্ তবে···

তারপর বিদায় লইয়া রঘুনাথ পার-ঘাটার পানে চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি। পল্লীর শ্যাম প্রান্তর আলোয় আলো করিয়া আছে! ছাত্রের দল রঘুনাথকে আগাইয়া

দিতে সঙ্গে আসিল। যতীশও আসিতে ছাড়িল না। পার-ঘাটার দিকে যে পথটা গিয়াছে, সেই পথে পা দিবা মাত্র সকলের চোখ পড়িল, ও-পারের বাঁকের মুখে আকাশের পানে। ও কি, রুদ্রের রক্ত-আঁখি যে দৃষ্টিতে অনল বর্ষণ করিতেছে! চাঁদের শুভ্র আলোয় কে যেন আবীর মাথাইয়া দিয়াছে! আকাশ একেবারে লালে লাল!

যতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল—ও যে আগুন লেগেছে, মাস্টারমশায়।

তাইতো, আগুনই তো! ও যে, ও যে···রঘুনাথের ঘরের কাছে···রঘুনাথের বুকটা দুড়দুড় করিয়া উঠিল! ও-ঘরে তার লক্ষ্মী, তার সব···! কালিকার মতই লক্ষ্মী যদি ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকে! যদি বাহির হইতে না পারে··· ?

রঘুনাথ উন্মাদের মতো ছুটিল। ছাত্রের দলও ছুটিয়া তার অনুসরণ করিল। ঘাটে দুই-তিনখানা নৌকা ছিল; মাঝি নাই! সকলে মিলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গাছপালায় আগুন, ঘরে আগুন—চারিদিকে আগুনের কি ও লেলিহান শিখা; সমস্ত গ্রামটাকে গিলিয়া তবে বুঝি আগুনের এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটিবে!

তীরে আসিয়া সকলে দেখিল, তাই তো, এ যে রঘুনাথের ঘরই জ্বলিতেছে।—লক্ষ্মী···?

রঘুনাথ ছুটিল! হায়রে, ও আগুন নিবাইবার সাধ্য কি! কি দিয়া নিবানো যায়! দুই-চারিজন প্রতিবেশী কলসী লইয়া জল ঢালিতেছে—কিন্তু এ দারুণ অগ্নি-ক্রীড়ায় সে কতটুকু বাধা! আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, ফট্-ফট্ করিয়া বাঁশ ফাটিতেছে, চালার পর চালা জ্বলিয়া ছাই হইয়া বাতাসের মুখে উড়িয়া চলিয়াছে।

সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রঘুনাথ পাগলের মতো গিয়া ঝাঁপ দিল। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী··· কোথায় লক্ষ্মী? আগুনের চারিদিক উজ্জ্বল—কোথায় লক্ষ্মী! লক্ষ্মী নাই! সে তবে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে···?

রঘুনাথ পাগলের মতো বাহিরে আসিল। ছেলের দল আরো কয়টা কলসী ইতিমধ্যে জোগাড় করিয়া জল তুলিয়া ঘরের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল। রঘুনাথের হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সে একদিকে মূর্চ্ছিতের মতো বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ কখন আপনা হইতেই খোরাক না পাইয়া আগুন নিবিয়া আসিল। যতীশ আসিয়া রঘুনাথের গায়ে ঠেলা দিয়া ডাকিল,—মা··· ?

রঘুনাথ পাগলের মতো তার পানে চাহিল; তারপর আকাশের দিকে দেখাইল। গাঢ় স্বরে বলিল,—নেই।

যতীশ অধীর-কণ্ঠে বলিল, নেই কি! উঠুন, আসুন, দেখি।

ছেলেরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিল, বনে জঙ্গলে পাতি-পাতি খুঁজিল—লক্ষ্মীর কোনো চিহ্ন কোথাও নাই!

গ্রামের একজন বলিল, বনের পথে সে একটা পাল্কী চলিতে দেখিয়াছে, ঠিক ঐ

আগুন লাগার পূর্বক্ষণে! শুনিয়া রঘুনাথ বসিয়া পড়িল। ছেলেরা তাকে ঘিরিয়া বসিল অত্যন্ত নিরুপায়ের ভাবে।

এমনি ভাবেই বনের মধ্যে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোর হইতেই যতীশ আবার লক্ষ্মীর সন্ধানে বাহির হইল। চারিদিকে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন সে ফিরিল, রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—পেলে?

যতীশ গাঢ়স্বরে বলিল,—না—তারপর চোখে তার বান ডাকিল।

রঘুনাথ তখন উঠিল,—দগ্ধ গৃহের ভস্মস্তূপ ঘাঁটিয়া যদি তার দগ্ধ কঙ্কালখানার চিহ্নও পাওয়া যায়!···সন্ধান করিয়া কিছু পাইল না—সে তখন সেই ভস্মস্তূপের উপর মাথা গুঁজিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল!

কিছুক্ষণ পরে মূর্ছা ভাঙিতে রঘুনাথ দেখিল, যতীশ ও ছাত্রেরা তার মুখের পানে কি ভয়াকুল অধীর নেত্রে চাহিয়া আছে। প্রথমটা তার মুখে কোনো কথা সরিল না। যতীশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ম্লান দৃষ্টিতে ডাকিল,—মাস্টার মশায়···

রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া দুই হাত বাড়াইয়া যতীশকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। পরে বুকের মধ্যেই তার মাথা চাপিয়া ধীরে-ধীরে চাপড়াইতে লাগিল। মুখ তুলিয়া যতীশ বলিল,—মন্টি একলাটি আছে, মাস্টারমশায়···

মন্টি! ঐ এক মস্ত শিকল! রঘুনাথ একটু আগে ভাবিতেছিল, তার মাথার উপর হইতে সব দায়িত্বের বোঝা সরিয়াছে ও তার সব কাজ শেষ হইয়াছে—এখন সে মুক্ত, স্বাধীন। উদ্দাম গতিতে যেদিকে খুশি ছুটিয়া যাইতে তার আর কোনো বাধা নাই। এমনি ছুটিয়া জীবনের একেবারে প্রান্তে—সে প্রান্ত ছাড়াইয়াও দূরে, আরও দূরে—অবলীলায় নিশ্চিন্ত মনে সে ছুটিয়া যাইতে পারে! পিছনে চাহিবার কিছু নাই, তার প্রয়োজনও নাই। এই সব-হীন শুষ্ক জীবন-প্রান্তরে প্রাণ ভরিয়া ছুটিয়া সে এই প্রান্তরটা পার হইয়া এখন দেখিতে চায়, সেখানে কি আছে! কিন্তু মন্টি··· তাই তো, এ যে মস্ত গোল বাধিল!

পায়ে অমনি শিকল বাজিয়া উঠিল, ঝম্ ঝম্! হায়রে, এমন দুর্দ্দিনে তাকে মাথা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে—আবার কোন্ সুদিনের আশায় বুক রাঙাইয়া আকুল-নেত্রে ভবিষ্যতের পানে চাহিতে হইবে। এ দুর্ভাগ্যের যে আর সীমা নাই।

রঘুনাথ বলিল,—চলো, তোমাদের ওখানে যাই।

যতীশ বলিল,—আপনি চলুন! আমি মাকে গাঁ-ময় খুঁজে দেখি। হয়তো আগুন দেখে খুব দূরে কোথাও সরে গেছেন, কিংবা যদি নদী পেরিয়ে আমাদের ওখানেই গিয়ে থাকেন?

খুব অন্ধকার পথ হাতড়াইয়া পথিক যখন পথ চলিয়াছে, অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো, আশাহীন উৎসুক দৃষ্টিতে, লক্ষ্যহীন—সে-সময় সহসা বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিলে সে যেমন পথটা দেখিয়া তার সন্ধান পায়—তেমনি এই নিবিড় নৈরাশ্যে-ভরা আঁধার পথে এ-কথায় যেন বিদ্যুৎ ফুটিল! সঙ্গে-সঙ্গে আশার আলোয়-ভরা পথের প্রান্ত দেখা গেল—তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া। ঐ না লক্ষ্মী···

সকলেই আশার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তাও তো সম্ভব। সকলে রঘুনাথের পানে চাহিল। রঘুনাথ বলিল—চলো তবে দেখি।

ছেলের দল রঘুনাথকে লইয়া পার-ঘাটায় চলিল! নদীর জলে দুই-চারিজন লোক স্নান করিতেছে। কেহ-বা স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিতেছে। রঘুনাথের পানে সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। তাদের সে দৃষ্টি বেদনায় মাখা থাকিলেও রঘুনাথের বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মতোই বিঁধিল। বেদনা সহ্য হয়; কিন্তু যে-বেদনায় অপরের কৃপা-ভরা দৃষ্টি—তা একেবারেই অসহ্য।

নৌকায় নদী পার হইয়া তীরে নামিতে রঘুনাথের মনেও একবার চকিতে একটু আশার ঝলক বহিয়া গেল। উদ্দেশে ভগবানকে প্রণাম করিয়া মনে-মনে সে বলিল, তাই যেন হয় ঠাকুর, লক্ষ্মীকে যেন এখানে দেখতে পাই।

বাড়ীর মধ্যে সকলের আগে গিয়া ঢুকিল, যতীশ। রঘুনাথ দাঁড়াইয়া রহিল, সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করিয়া—দুই কানে সে প্রাণের শক্তি উজাড় করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল—ঘরের কোণে লক্ষ্মীর একটু স্বরও যদি জাগিয়া উঠে! কিন্তু একটু পরেই যতীশকে নিরাশ-মলিন মুখে ফিরিতে দেখিয়া রঘুনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এত-বড় মূর্খ সে, যে, এমন আশাও মনে জাগাইতে প্রয়াস পায়।

সমস্ত বাড়ীটা মুহূর্ত্তে তার নিরানন্দ কঠিন জমাট স্তব্ধতা ফুটাইয়া তুলিল। বাপকে দেখিয়া যতীশের মা'র কোল হইতে মন্টি নামিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল এবং বাপের এমন অস্বাভাবিক মলিন গম্ভীর মুখ আর ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাপের মুখ এমন তো সে কখনো দেখে নাই! রঘুনাথও মন্টিকে সামনে দেখিয়া এতটুকু হইয়া গেল! কি বলিয়া মন্টিকে সে প্রবোধ দিবে। মন্টি যখন বলিবে, বাবা, মা'র কাছে যাবো—তখন সে তাকে কি বলিয়া কোথায় কাহার কাছে লইয়া যাইবে।

বিপদ ঘটিল! মন্টি কথা কহিল, বলিল—বাবা, মা'র কাছে যাবো!

রঘুনাথের সব ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া কোন্ সাগরের অতল জল ঝর-ঝর করিয়া তার দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। মন্টিও কাঁদিয়া ফেলিল। যতীশের মা তখন আগাইয়া আসিয়া মন্টিকে কোলে লইলেন ও ভুলাইয়া রঘুনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন,—ছি বাবা, কেঁদো না। এ কাঁদবার সময় নয়। ধৈর্য ধরো, এটার পানে চেয়ে বুক বাঁধো। তারপর পুলিশে খবর দাও, খোঁজ করো। মন্টি আমার কাছেই থাকুক। তারপর ক্ষণেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—ঘরের মধ্যে বেশ দেখেছ তো? সর্বনাশ হয়ে যায়নি তো? তোমার পিসি?

রঘুনাথ একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না, ঘরে তার কোন চিহ্ন নেই। পিসি ক'দিন এখানে নেই।

…তবে…? যতীশের মা প্রশ্নটা করিয়াই থামিয়া গেলেন। এই 'তবে' কথাটির জবাব নাই! তবে…! তবে…কি?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া ঐ 'তবে' কথাটি ইহার মধ্যে এমন ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, সে ঘূর্ণী বন্ধ করার কোনো উপায় নাই, পথ নাই।

তবু চুপ করিয়া শোক বা দুঃখ করিলেও তো চলিবে না। যদি তেমন বিপদই ঘটিয়া থাকে তবে সেই বিপদেই তাকে ফেলিয়া রাখিয়া এখানে নিশ্চল বসিয়া হা-হুতাশ করিলে কি ফল হইবে? সে-বিপদ হইতে তাকে উদ্ধার করা চাই তো! তার উপায়! রঘুনাথ ভাবিল কি বিপদ্? কোথায় গেলেই-বা সে-বিপদ হইতে উদ্ধারের সন্ধান মেলে?

তবু যাইতেই হইবে। তৃষ্ণায় রঘুনাথের কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল। এক গ্লাস জল খাইয়া সে পথে বাহির হইল; মন্টিকে যতীশের মা'র কাছে রাখিয়া গেল। যতীশের মা বহু কষ্টে বলিলেন,—একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও—কিন্তু তার উত্তরে রঘুনাথ এমন মর্মভেদী কাতর দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া দেখিল যে, ও কথার পরে আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না।

রঘুনাথ চলিয়া যাইতেছিল; তিনি তার কাছে গিয়া বলিলেন,—মন্টিকে ভুলে থেকো না বাবা। খবর দিয়ো—একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ো না। তোমার মন্টিকে মনে ক'রে ফিরে এসো।

রঘুনাথ বলিতে যাইতেছিল, মন্টিকে তো বেশ নিরাপদ রাখিয়া চলিলাম, তার জন্য ভাবনা কি! কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে-কথা বলিতে পারিল না! যতীশের মা'র এই আকুল প্রাণের এমন খাঁটী দরদ, এই সহানুভূতি—সে-কথায় প্রচণ্ড ঘা খাইবে! সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

বাড়ীর বাহির হইয়া বহুক্ষণ সে নিরুদ্দেশের মতো ঘুরিয়া বেড়াইল। হঠাৎ মনে হইল, থানা। থানায় যাইতে হইবে। কিন্তু তা হইলে ঐ লোক-জন-ভরা গ্রামের পথ মাড়াইয়া সেই তার চিরসুখের স্মৃতি-ঘেরা জীর্ণ গৃহের সামনে দিয়াই যাইতে হয়। কত লোকের প্রশ্ন-ভরা কৃপাদৃষ্টির ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া যাইতে হইবে। অমনি সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মনে হইল, যদি লক্ষ্মী ইহার মধ্যে ঐ কুটীরেই ফিরিয়া আসিয়া থাকে।...ভগবান কি সত্যই এমন করিবেন! তার প্রাণের এ করুণ আবেদন কি তাঁর প্রাণে পৌছায় নাই? তা ছাড়া মন্টি...! ভগবান কি এমন নিষ্ঠুর হইতে পারেন?

রঘুনাথ আবার আশা করিয়া নৌকায় উঠিল। পার হইয়া অতি সন্তর্পণে নিজের কুটীরের পানে চাহিল—শূন্য ঘর, শত স্মৃতির জীর্ণ কঙ্কাল বুকে লইয়া পড়িয়া আছে! শোকের জমাট স্তব্ধতা দগ্ধ গৃহখানার উপর কি করুণ নেত্র মেলিয়া চাহিয়া আছে! তবু রঘুনাথ একবার কম্পিত চরণে ঘরের ভেতরে ঢুকিল। উঠানে পোড়া বাঁশ আর খড়ের ছাইয়ে পাহাড় জমিয়া রহিয়াছে। সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—লক্ষ্মী...

নিজের স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। সে-স্বরে একটা শৃগাল ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর চারিদিকে

দৃষ্টি বুলাইয়া ধীরে-ধীরে গৃহ ত্যাগ করিল। এই গৃহ! যেখানে তার জীবনে যা-কিছু সুখ, যত আনন্দ একেবারে ভরপুর রহিয়াছে, যার স্মৃতি—একেবারে হিমালয়ের মতো সম্মুখে প্রকাণ্ড পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়া দুই চোখের সম্মুখে আড়াল তুলিয়া ধরিয়াছে!

রঘুনাথ পাগলের মতো টলিতে-টলিতে আসিয়া গ্রামের ফাঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। এবার ভাবিল, কি হইবে এখানে খবর দিয়া! যদি পাইবার হইত, লক্ষ্মীকে এমনিই পাওয়া যাইত! তাছাড়া, সুখ তো সে এতদিন অবাধে ভোগ করিয়াছে—অজস্র সুখ! এমন কি ভাগ্য সে করিয়াছে যে, এ সুখ আরো বহু-বহু কাল ধরিয়া ভোগ করিতে পাইবে! তবু যতীশের মা বলিয়াছিলেন, তাই তাঁর কথা রক্ষা করিবার জন্য সে ফাঁড়ির মধ্যে ঢুকিল।

একটি বাবু বসিয়া খাতায় কি-সব লিখিতেছিল—পাশে দুজন জমাদার দাঁড়াইয়া; এমন সময়ে রঘুনাথ তাহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাবু মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—কি চাই?

রঘুনাথ বলিল, আমার ঘরে কাল রাত্রে আগুন লাগে, আর আমার স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবুটি বলিল,—পুড়ে যায়নি তো?

রঘুনাথ বলিল,—না।

বাবুটি রঘুনাথের পানে কৌতূহল-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় গেল তবে? কার সঙ্গে গেল?

রঘুনাথ বলিল,—জানি না।

বাবুটি বলিল,—বয়স কত? নাবালক?

রঘুনাথ বলিল,—না। একটি মেয়ে আছে—

বাবু হাসিয়া বলিল,—কেমন আগুন হে? কারো সঙ্গে চলে যায়নি তো? স্ত্রীটিকে দেখতে কেমন?

এই অসম্মান-সূচক কথার ভঙ্গীতে রঘুনাথের প্রাণটা ফাটিয়া তীব্র ভৎর্সনা জাগিল। সে কঠোর রুক্ষ-দৃষ্টিতে বাবুর পানে চাহিল।

বাবু বলিল, কাউকে সন্দেহ হয়? বাবু হাসিল। জমাদার দুইজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

রঘুনাথ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—কাকেও নয়!

বাবুটি রঘুনাথের পানে চাহিল, পরে বলিল,—বেশ,—নালিশ লিখিয়ে যান, তারপর আদালতে গিয়ে দরখাস্ত দিন! হাকিম হুকুম দেয় যদি তো তদারক করবো। বলিয়া সে বহিতে রঘুনাথের নাম-ধাম ও লক্ষ্মীর নাম লিখিয়া লইয়া রঘুনাথকে বলিল,—নাম সই করুন। করুন।

রঘুনাথ যন্ত্র-চালিতের মতো বাবুটির লেখার পাশে সহি করিল; এবং তার অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া ফাঁড়ি হইতে বাহির হইল; যেদিকে দুই চোখ যায় সে চলিবে।

অনেকখানি পথ উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে বেড়াইল! বেড়াইতে বেড়াইতে পথ ঘুরিয়া যেখানে আবার নদীর ধারে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া বরাবর সেইধারে গেল। জনহীন দুই তীর—এপারে বাব্‌লা গাছের সার—মাঝে-মাঝে ঘোড়া-নিম আর খেজুর গাছ; ওপারে গাছপালার পর খানিকটা খোলা জায়গা—তারপরই দুইটা তালগাছ। তালগাছের নীচে দুইখানি গোলপাতার ঘর—মাটির দেওয়াল ঘেরা। ঘরের মধ্য হইতে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। গৃহস্থেরা রান্নাবান্না করিতেছে। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। হঠাৎ মনে হইল, আজ যদি এমন অসম্ভাবিতভাবে তার সব ওলট-পালট না হইত তো তাহারো ঘরে লক্ষ্মী এখন রান্নাঘরে বসিয়া তাহারি তৃপ্তির জন্য প্রাণের সমস্ত আবেগ লইয়া রন্ধনের কাজে নিজের কমল হাত দুইটি ব্যাপৃত রাখিত! কিন্তু, হায়রে, তার সে-সব আজ অতীতের স্মৃতির বস্তু!

অতৃপ্ত নেত্রে রঘুনাথ ঐ ঘরের পানে চাহিয়া রহিল—হয়তো ও-ঘরে তাহারি লক্ষ্মীর মতো ঘরের ঘরণী স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য অন্নপূর্ণার বেশে অন্ন তৈয়ার করিতেছে! আহা, ওদের সুখ অটুট থাকুক, ওদের হাসি অফুরান হোক···

এমনি সুখের কথা ভাবিতে-ভাবিতে মন কখন নিজের এই নিরুপায়তা ও অক্ষমতার চিন্তার উপর দিয়া ভাসিয়া দেশের নারীর অবস্থার মধ্যে চলিয়া গেল। সে ভাবিল, এই বাংলাদেশের নারী কতখানি অসহায়, কি নিরুপায় বেচারীর মতোই জীবনের পথে চলিয়াছে! স্বামীর জন্য রান্নাবান্না করিয়া, তার পদ-সেবায় সমস্ত মন নিঃশেষে ঢালিয়া এক কোণে পড়িয়া আছে! এত-বড় জগতের কোথায় কি আছে, কি বিপদ্‌, কি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, যে-চিন্তা তার মনের কোণে ঠাঁই পায় না। তা যদি পাইত, তাহা হইলে এমন করিয়া প্রাণহীন তৈজসপত্রের মতোই তার লক্ষ্মীকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে! লক্ষ্মী সে বিপদের মুখে এমন তেজে দাঁড়াইয়া উঠিত যে, প্রবলেরও সাহস হইত না তার কাছে ঘেঁষিতে! দুর্বল হইলেও ভিতরকার সে-শক্তি দেখিয়া প্রবল দস্যু-তস্করও কতক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত! অন্ততঃ বুদ্ধিটাও তার বাহিরের আবহাওয়ায় এমন পাকিতে পারিত যে, দুইটা কৌশলে বা তর্জনে হুঙ্কারে সে দস্যুকে হঠাইতে পারে। এই যে তস্করের দল ঘটী-বাটীর মতো একজন নারীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে, এ বুঝি এই বাংলা দেশেই শুধু সম্ভব! কেন এমন হয়? এ সাহস, এ মন, দুর্বৃত্ত কেমন করিয়া পায়? সে জানে, পাঁচিলে-ঘেরা নারী, ঘোমটায় ঢাকা নারী—স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও যে সরমে নত হইয়া পড়ে—বাহিরের লোকের একটা তীব্র দৃষ্টির সামনে দাঁড়ানো দূরের কথা—সে-দৃষ্টির পরশকে সে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতোই ভয় করে,—দুর্বৃত্তও তাই সাহস পাইয়া ভাবে যে, এই নারী তার সবল হাতের গ্রাস ছিনাইবার কথা মনেও করিবে না—লজ্জাবতী লতার মতো নির্জীব কুণ্ঠিত মূর্ছিত হইয়া ধরা দিবে! একটা জীবন্ত জীব—তাও অবোলা পশু নয়—তাকে কি মাটির ঢেলার মতোই বাঙালী তার সংসারে পাঁচিলের

গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে! অবোলা পশুও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত পা ছুড়িয়া, সে-আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে! আর বাঙালীর মেয়ে—কি অসহায়, কি নিরুপায় বেচারী সে!

ভাবিতে-ভাবিতে রঘুনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই যে খবরের কাগজে নারী-নিগ্রহের এত সংবাদ দিকে-দিকে ঘোষিত হইতেছে, এর জন্য বাঙালীর চরিত্রহীনতা, বাঙালীর অপদার্থতার চেয়ে নারীকে অবহেলা অবজ্ঞা, মানুষ বলিয়া মনে না করা, আর তাকে খেলার পুতুল করিয়া রাখাই তো বেশী দায়ী! ট্রেনে চড়িয়া ইংরাজ নারী এই যে একা কোথা হইতে কত দূরে চলিয়াছে—দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে, পথে-ঘাটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে—তাকে ধরিতে কোনো পরাক্রান্ত দস্যুর হাতও ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। আর বাঙালী মেয়ের উপর এ আক্রমণ, এ যে নিত্যকার ব্যাপার হইতে চলিয়াছে!···

রঘুনাথ তপ্ত চিত্তে জলের পানে চাহিল। তার সমস্ত বুক জুড়িয়া কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে, বুক এমনি তাতিয়া ছিল! সে ধীরে ধীরে জলে নামিল; প্রায় বুক-ভোর জলে গিয়া কতকগুলা ডুব দিল। তারপর ক্ষণেক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, এই জীবনটাকে জগতের পথে টানিয়া চলিয়া আর কি হইবে! এই শান্ত শীতল জলের কোলে সব জ্বালা জুড়াইতে দিলে মন্দ হয় না তো! এক-পা এক-পা করিয়া সে জলের কোলে আরো অগ্রসর হইল—চোখের সামনে এক অজানা-লোকের ছবি জাগিয়া উঠিল—ঐখানে, ঐ-লোকে হয়তো লক্ষ্মী ইহার মধ্যে আসিয়া তাহারি জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে! সে আর একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল! মনে হইল, একটু চাহিয়া থাকিলেই লক্ষ্মীকে বুঝি দেখিতে পাইবে! এমন সময় হঠাৎ একটা স্বর তার কানে আসিয়া বাজিল, মা,···

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল—এ তার মন্টির স্বর, না? তবে কি লক্ষ্মী আসিয়াছে? আসিয়া রঘুনাথকে ঘরে না দেখিয়া মন্টিকে সঙ্গে লইয়া তাহারি সন্ধানে পথে বাহির হইয়াছে! দুই চোখের উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সে তীরের পানে চাহিল। ওপারে ঘোমটায় মুখ-ঢাকা এক নারী কলসী কক্ষে নদীর জলে নামিয়াছে, আর তীরে দাঁড়াইয়া তার ছোট মেয়েটি তাহাকে ডাকিতেছে! মেয়েটি···এ যেন তাহার মন্টির ছায়া! রঘুনাথ অপলক নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। কি শান্ত-মধুর ছবি ঐ জলের কোলে ফুটিয়াছে, আহা মরি!

রমণী জল লইয়া গেল; বালিকা তার অনুসরণ করিল। তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে গেলে রঘুনাথ সহসা শিহরিয়া উঠিল। তাই তো মন্টি—তাহাকে ফেলিয়া সে মরিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিয়াছে! তার মন্টি মা-হারা বাপ-হারা হইয়া কোথায় দাঁড়াইবে! কার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে সে! না, মরা তো হয় না। রঘুনাথ জল হইতে উঠিয়া পাগলের মতো পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তারপর যে-পথে আসিয়াছিল, আবার সেই পথে চলিল।

বহুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ সে দেখিল, এ যে তার সেই গৃহের দ্বার, সেই পথ,

সেই সব! দাঁড়াইয়া চোখ মেলিয়া সে ঘরের পানে চাহিয়া রহিল। ঘরের সম্মুখে ভস্মস্তূপ বিশৃঙ্খল ছড়ানো, পোড়া বাঁশ, কাঠ, ইঁট! বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ডাকিল,—লক্ষ্মী…

কোন উত্তর নাই। তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। রঘুনাথ বাড়ী হইতে বাহিরে আসিল। তারপর মাতালের মতো পা দুইটাকে টানিয়া পার-ঘাটায় আসিয়া একটা নৌকায় উঠিয়া বসিল, বসিয়া ওপারের দিকে ইঙ্গিত করিল। মাঝি নৌকা খুলিয়া তাহাকে লইয়া ওপারে পৌঁছাইয়া দিলে, রঘুনাথ নামিয়া যতীশদের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

যতীশের মা তখন সন্ধ্যা দীপ জ্বালিতেছেন, যতীশ মন্টিকে লইয়া গল্প বলিতেছিল। এই শান্তিব মধ্যে রঘুনাথ একটা অভিশাপের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গল্প থামাইয়া যতীশ তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মন্টি ঝাঁপ দিয়া কোলে পড়িল। রঘুনাথ পাগলের মতো দৃষ্টি মেলিযা মন্টির পানে চাহিয়া দেখিল।

যতীশের মা আসিযা বলিলেন,—পেলে বাবা?

উদাসভাবে ঘাড় নাড়িয়া রঘুনাথ জানাইল, না।

লক্ষ্মীকে লইয়া মোটর তীবেব মতো ছুটিল বড় বাস্তা ধরিয়া, সোজা—বাত্রির স্তব্ধতা ভেদ কবিয়া, ঘুমন্ত প্রকৃতিব বুক চিরিয়া! এই আকস্মিক বিপদে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় সংগ্রাম করিয়া লক্ষ্মী কেমন আচ্ছন্ন মূর্ছিতের মতো হইয়া পড়িযাছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভোবেব পূর্বক্ষণে গাড়ী একটা গলিব মধ্যে ঢুকিল। সেই গলিতে খানিকটা পথ চলিয়া এক জীর্ণ বাগান—আলকাৎরা-মাখা কালো কাঠের ভাঙা ফটক। গাড়ী সেই বাগানেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার ফটক খুলিয়া ভিতরে গাড়ী লইয়া গেল। ভিতরে দোতলা বাড়ী; জীর্ণ। তার সামনে গাড়ী থামাইয়া ড্রাইভাব লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া দেখে, লক্ষ্মীর তখনো মূর্ছা ভাঙে নাই।

ড্রাইভার মূর্ছিতা লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া ভাবিল, রূপের জ্যোৎস্নাই বটে! কিন্তু কি মেঘ এ জ্যোৎস্নায় কালির বেখা টানিয়া তাহাকে ঢালিয়া দিয়াছে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ড্রাইভার লক্ষ্মীকে কোলে করিয়া লইয়া দোতলায় উঠিল। দোতলায় চারধারে বারান্দা—বারান্দাব কোলে ঘর—সেই ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীকে একটা জীর্ণ কৌচের উপর শোয়াইয়া ঘরের সম্মুখে মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ধীরে-ধীরে সে নীচে নামিয়া আসিল; তারপর গাড়ীতে গিয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। সে আর কি কবিবে? হুকুমের চাকর বৈ তো নয়।

লক্ষ্মীর মূর্ছা ভাঙিল, তখন একটা জানলার ফাঁক দিয়া এক-ঝলক রৌদ্র আসিয়া ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে! লক্ষ্মী প্রথমটা কেমন আচ্ছন্নের মতো ছিল। হঠাৎ সে-ভাব কাটিলে উঠিয়া জানালার ধারে গেল। নীচে জঙ্গল, এককালে বাগান ছিল; অযত্নে আগাছায় ভরিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে! সে কিছুক্ষণ

জানালার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল—বাহির হইতে দ্বার তালাবদ্ধ। তার গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। ক্রমে আগাগোড়া ব্যাপারটা আগুনের হল্‌কার মতো সমস্ত মনের মধ্যে ফুটিবামাত্র সে আতঙ্কে শিহরিয়া মেঝের উপর মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

মেঝেয় কোন্‌ পুরাকালে একটা মোটা কার্পেট বিছানো হইয়াছিল; অযত্নে আজ সেটা ধূলায় ঢাকা, মাঝে-মাঝে ছেঁড়া।

মূর্ছার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল, ঘরে স্বামীর পাশে শুইয়া আছে, বুকের কাছে আছে মন্টি! স্বামী ঘুমাইতেছেন, মন্টিও ঘুমে অচেতন। জাগিয়া মাথার মধ্যে কত কি যে কুণ্ডলী পাকাইতেছিল,…কত সুখ, কত বেদনা, কত আশা, কত ভয়,…সে যেন হরেক রঙের ফুলঝুরি ফুটিতেছিল! হঠাৎ কি একটা শব্দ হইল,—তার মাথার মধ্যকার যত রঙের ফুল ঝড়ের মুখে পাপড়ির মতো অমনি ঝরিয়া পড়িল। সে দেখে, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দৈত্য দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া তার পানেই ছুটিয়া আসিতেছে! ভয়ে সে স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল, মন্টিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া লুকাইল। তবু দৈত্য ছাড়িল না; স্বামীর বুক হইতে হিঁচড়াইয়া টানিয়া তাহাকে বাতাসের মুখে উড়াইয়া লইয়া চলিল। হাত-পা ছুড়িয়া ভীষণ সংগ্রাম বাধাইয়া সে এমন বিপর্যয় কাণ্ড ঘটাইল যে, হঠাৎ দৈত্যের হাত ছাড়াইয়া আসিয়া পড়িল, নীচে এক পাহাড়ের গায়ে! অমনি পাথরে মাথা ঠুকিয়া গেল! একটা চীৎকার করিয়া সে চোখ মেলিল—আঃ…! স্বপ্ন! কিন্তু এ কি, অজানা ঘর, অজানা ঠাঁই! কোথায় ঘর—কোথায় স্বামী? এ যে সে স্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর কঠোর নির্মম সত্য! অমনি সব কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই গাছের ছায়ায় ছায়া-করা গ্রামের পথ…দস্যুর কোলে বন্দী সে নিষ্কৃতি লাভের জন্য প্রাণপণে যুঝিয়াও হার মানিয়াছে—তারপর সব ঝাপসা—আঁধারে ভরিয়া গেল! মাঝে-মাঝে চমক ফুটিতেছিল। মোটর গাড়ী, তাহাতে শুইয়া সে—মুখে কাপড় বাঁধা, মাথার উপর চাঁদের আলোয়-ভরা আকাশ সরিয়া-সরিয়া পিছনে চলিয়াছে! আকাশের এমন ছুটাছুটি সে আর কখনো দেখে নাই। তারপর মনে পড়িল, সে ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, হঠাৎ আগুন লাগিল! তারপর…? ভয়ে তার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। এ আর স্বপ্ন নয়, ভয় নয়—বিপদ যা ঘটিবার, তা ঘটিয়া গিয়াছে! হায়রে, কোথায় তারা—এখন তারা কি করিতেছে? তাকে না দেখিয়া কি ভাবিতেছে? কি করিয়া সন্ধান লইয়া-লইয়া এখানে আসিবে? প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না, তাই বা কে বলিয়া দিবে!…

তার চোখের সামনে দিনের আলো, সূর্যের ঐ রশ্মিচ্ছটা চকিতে ঘোলাটে হইয়া নিবিয়া আসিল। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে শুইয়া পড়িল। দুই চোখে অমনি রাজ্যের ঘুম আসিয়া বাসা বাঁধিল।

তারপর বহুক্ষণ এমনি পড়িয়া থাকার পর যখন ঘুম ভাঙিল, তখন চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে দেখে, সামনে কাঁচের বাসনে রাশীকৃত ফল, আর লুচি তরকারী সাজানো রহিয়াছে। দেখিয়া ঘৃণায় তার মন ভরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সেগুলার পানে তাকাইয়া থাকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে জানলায় আসিয়া বসিল। জানলার নীচেই

আগাছার ঘন ঝোপ, মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না। চারিধার স্তব্ধ। বহুদূর হইতে একটা কুকুরের চীৎকার সে স্তব্ধতার গায়ে আঘাত করিয়া স্তব্ধতাকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে! সে দুই চোখ মেলিয়া উদাস মনে নীচের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল। ঐ যে বহুদূরে ঝোপের ফাঁক দিয়া একটু জল দেখা যাইতেছে—বুঝি,—একটা পুকুর ওখানে আছে। তারপর খুব দূরে একটা স্বরও ঐ ভাসিয়া উঠিল—কে নাম ধরিয়া কাহাকে ডাকিতেছে না? স্বরটা শুধু প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলিল, তারপর আবার সব স্তব্ধ! লক্ষ্মী ভাবিল, জায়গাটা তবে একেবারে জন-মানবশূন্য নয়!···

সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তার তরঙ্গ ছুটিল, চারিদিককার বিরাট শূন্যতার উপর ভর করিয়া, তাহারি বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া কোথায় কোন অজানা কূল লক্ষ্য করিয়া! কিন্তু ঘুরিয়া কোথাও কূল না পাইয়া শ্রান্ত হইয়া আবার বুকের মাঝে নিরাপদ নিশ্চিন্ত বাসা বাঁধিবার জন্য ফিরিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী ভাবিল, হায়রে, কোথায় কে মানুষ আছে—কে তাহাকে এ কারাগার হইতে মুক্ত করিবে! বেচারা স্বামীর করুণ কাতর মুখও মনের কোণে ফুটিয়া উঠিল,—পাশে মন্টি, কাঁদিয়া শ্রান্ত আকুল নেত্রে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে!

আকাশের গায়ে বহু উর্দ্ধে কয়টা পাখী উড়িতেছিল—লক্ষ্মী ভাবিল, মানুষ না হইয়া যদি সে পাখী হইত! কি সুখী ঐ আকাশের পাখী! মুক্ত আকাশে কত উপরে খুসী হইলেই উঠিতে পারে—ওখান হইতে নীচে পৃথিবীর বুকে যেখানে যা আছে, সব চোখে পড়িতেছে! এমন করিয়া শূন্যতা ভেদ করিয়া চিন্তার তরঙ্গে মন ভাসাইয়া উহাদের দুরাশার স্বপ্ন বুনিতে হয় না! সে যদি মানুষ না হইয়া অমনি পাখী হইত!

কিন্তু না, পাখী হইলে স্বামীর প্রেম, মেয়ের ভালোবাসা—এ সব কি এমনি করিয়াই তার অদৃষ্টে ঘটিত! তার চেয়ে এখন সে পাখী হইতে পারিত যদি! পাখী হইলে এই জানলার ফাঁক দিয়া অনায়াসে এক নিমেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া ঐ আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইত—কত বন, কত পথ, কত মাঠ পার হইয়া সেই ঘরখানিতে গিয়া একেবারে রঘুনাথের বুকের মাঝে ধরা দিয়া বলিত, আমি এসেচি! হায়রে, এই পাখী হওয়ার বিদ্যাটা যদি তার জানা থাকিত। ঠাকুর, একবার আসিয়া তাকে মানুষ হইতে পাখী করিয়া দাও! না-হয় আর মানুষ করিয়ো না—স্বামীর প্রেম না পায়, তাও সে সহিতে রাজী আছে,—তবু তাঁর কাছে-কাছে সে থাকিতে পারিবে তো!

এমনি যা-তা ভাবিয়া ভাবনার পুঁজি ফুরাইয়া আসিলে সে একেবারে কাতর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুকের মধ্যে অমনি কি একটা বেদনা এমন ঠেলিয়া আসিল যে, তার চাপে নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া যায়! সে ভাবিল, মরণ···সে তো হাতেই আছে! ভাবিয়া কূল যখন পাওয়াই গেল না তখন মিছে আর কেন ভাবা! তার চেয়ে···

সে আঁচলটা টানিয়া বিছাইয়া ধরিল। এই তো মরণের ইঙ্গিত! আর কেন? আঁচলটা সে গলায় জড়াইল—তারপর একটা ফাঁস টানিল—ফাঁসটা গলায় আঁটিতেই চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল রঘুনাথের কাতর দুই চোখ, মন্টির অশ্রু-ভরা ছোট্ট মুখ! লক্ষ্মীর হাত কাঁপিল—না, মরা হইবে না—তাহা হইলে তাহাদের সব আশা একেবারে

সে নির্মূল করিয়া দিবে! তাহারা হয়তো এখনো আশা করিতেছে, লক্ষ্মী ফিরিবে! তার খোঁজ করিতেছে চারিধারে, কি ব্যাকুল আবেগে! আর সে···?

ফাঁস খুলিয়া অবসন্নের মতো সে বসিয়া পড়িল, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। আঁচল বিছাইয়া ধীরে-ধীরে সে শুইয়া পড়িল—চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিল।

এই ঘুম আর জাগা, তার ফাঁকে-ফাঁকে চিন্তার জাল বোনা—লক্ষ্মী ভাবিল, সে কি পাগল হইবে!

তখন বাহিরে দিনের আলোর উপর সন্ধ্যার আঁচল লুটাইয়া পড়িয়াছে—চারিধার আঁধারে ভরিয়া আসিতেছে। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ঝোপ-ঝাপ, ঐ গাছ-পালা—উহার মধ্য হইতে আলোটুকুকে হঠাইয়া আঁধার আসিয়া তার জায়গা জুড়িয়া বসিতেছে! বনের বুক চিরিয়া ঝিল্লীর রাগিণী উঠিতেছে—ওরা কি বলে, ও কি গান গায়! ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্···ও গানে মন ভয়ে ভরিয়া ওঠে যে! এতক্ষণ আলোর মাঝে লক্ষ্মী যে তাকে নির্ভর করিয়াই অজানা পথে-ঘাটে ঘুরিতে-ফিরিতে পারিয়াছিল—এ আঁধারে পা তো চলে না! লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল।—সে চুপ করিয়া জানলায় বসিয়া রহিল।

বাহিরে দ্বারে শব্দ হইল—কে তালা খুলিতেছে! তার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল—অধীরতায় মন যেন ফুঁসিতেছিল! কে জানে, এ দৈত্যপুরীর মাঝে হয়তো কে মানুষ আছে, যে আসিয়া বলিবে, লক্ষ্মী, তুমি মুক্ত! না, এ হয়তো দৈত্যের প্রহরী, মমতায় গলিয়া তাহাকে আসিয়া বলিবে, যাও লক্ষ্মী, দ্বার খোলা—পালাও তুমি···না, এ দৈত্য নিজে, কোনো উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আসিতেছে! উঠিয়া নিজেকে সম্বৃত করিয়া সে একেবারে তৈয়ার হইয়া বসিল। যদি উপদ্রব আসে, তবে যে-শক্তিটুকু তার এখনো বাকী আছে, সেটুকু লইয়াই একবার প্রাণপণে লড়িবে! প্রাণটাকে ছেঁচিয়া হত্যা করিয়াও সে একবার জীবন-পণ লড়িয়া দেখিবে। তার দুই চোখ হইতে যেন আগুনের শিখা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে ফুঁসিতেছিল।

দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে আসিল একটা মালী, হাতে তার আলো। সেই আলোয় মালীর মুখখানা এমন ভীষণ দেখাইল যে, ভয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজিল। তারপর চোখ খুলিয়া সে দেখে, মালী আলো রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিল—ওগো, আমায় ছেড়ে দাও গো, বাঁচাও তুমি!

মালী তার পানে ফিরিয়া চাহিল। লক্ষ্মীও ঘাড় তুলিয়া তার পানে চাহিল—কি করুণ কাতর সে দৃষ্টি! মালী তার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল—তার চোখে নিরুপায়তার ম্লান দৃষ্টি!

লক্ষ্মী বলিল,—আমায় ছেড়ে দাও—ঘরে আমার মেয়ে, আমার স্বামী ভেবে মরে যাচ্ছে!

মালী কথা না কহিয়া পা ছাড়াইয়া লইল, তারপর লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া ধীরে-ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

দ্বারে তালা লাগানোর শব্দে লক্ষ্মীর হুঁস হইল। সে উঠিয়া দ্বার নাড়িল। দ্বার তখন বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী ভাবিল, হায়রে, কেন সে ঐ খোলা দ্বার-পথে পলাইবার চেষ্টাও একবার করিল না! দ্বার ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর ভারী পা দুইটাকে টানিয়া আবার মেঝেয় আসিয়া বসিল! উপায় নাই! আর উপায় নাই! শেষ যে সুযোগটুকু মিলিয়াছিল, তাও সে এক দুর্বল অন্ধ-মুহূর্তে হেলায় বিসর্জন দিয়াছে!

অনেক রাত্রে আবার দ্বার খোলার শব্দ হইল। লক্ষ্মী ভাবিল, এবার সে চেষ্টা করিবেই···দ্বারের পাশে সে রুখিয়া দাঁড়াইল। বুকের মধ্যটা এমন সজোরে দুলিতেছিল যে, তার ধক্-ধক্ শব্দ তার কানে বাজের মতো বাজিতেছিল।

দ্বার খুলিতেই যে-মূর্তি সে চোখে দেখিল, তাহাতে তার হাত-পা অবশ হইয়া গেল, সমস্ত শক্তি চকিতে উবিয়া গেল। সে কেমন বিহ্বলের মতো পিছনে সরিয়া আসিল। এ সে! মোটরে তাকে যে তুলিয়া দিয়াছিল—মুখে বিশ্রী হাসি! এ সে, যাকে পুকুরধারে গাছের আড়ালে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি!

যে আসিয়াছিল, সে রজনী। রজনী আসিয়া হাসিয়া বলিল,—আমায় মাপ করো। ···কেমন আছো?

লক্ষ্মী ভয়ার্ত চোখে রজনীর পানে চাহিল—চাহিতেই তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে চোখ বুজিল।

রজনী কৌচে বসিয়া ডাকিল—প্রেয়সী···

কি বিশ্রী সে আহ্বান—কুৎসিত, বিকট! লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া আবার চাহিল। রজনী পকেট হইতে একটা কালো রঙের মখ্‌মলের বাক্স বাহির করিয়া খুলিল; খুলিয়া বলিল,—এই দ্যাখো···

লক্ষ্মী কোনো কথা বলিল না, চাহিয়া দেখিল, কালো বাক্সের মধ্য হইতে আগুনের মতো কি একটা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

চুনী-হীরা-পান্না জড়ানো একছড়া হার বাক্স হইতে বাহির করিয়া রজনী হাসিয়া বলিল,—তোমার রূপের পূজায় আমার এই পাদ্য-অর্ঘ্য নাও তুমি।

বলিয়া সে উঠিয়া হারছড়া লক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিতে গেল। লক্ষ্মী জড়সড় হইয়া নিজেকে আঁটিয়া এমন ভাবে বসিল, যেন সে পাথরের মূর্তি! চেতনা কিছুমাত্র নাই।

তার সে আড়ষ্ট মূর্তি দেখিয়া রজনী বলিল,—তোমায় রাণী করে' রাখবো। এত রূপ নিয়ে তুমি পুকুর-ঘাটে এক ভিখিরীর এঁটো বাসন মেজে দিন কাটাবে,—তাও কি হয়? আমার যে তাতে বুকে বাজে। আমার এই বুকের মাঝে সিংহাসন পেতে তোমায় তাতে বসিয়ে রাখবো—দিন-রাত।···মুখ তোলো, চেয়ে দ্যাখো, প্রেয়সী!··· তোমায় প্রেয়সী বলেই ডাকবো আমি,—ঐ একটি নামই তোমায় সাজে, শুধু।

লক্ষ্মী সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিল—এ কি, এ যে সত্যই একটা লোক আসিয়া এমনি

সব জঘন্য কথা তাহাকে ডাকিয়া অনায়াসে শুনাইতেছে! এও কি সম্ভব!—না, সে এ একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! লক্ষ্মী কিছুই বুঝিতে পারিল না! তার দেহ, তার মন যেন একটা হাল্‌কা সূতার ভরে হাওয়ায় দুলিতেছিল—পায়ের নীচে কোনো অবলম্বন নাই, ভূঁই নাই, কিছুই নাই।

হঠাৎ একটা জ্বলন্ত স্পর্শে তার মন নাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভালো করিয়া চাহিয়া সে দেখে, একি, এ কার দুই হাতের বাঁধন তার অঙ্গে এমন আঁটিয়া বসিয়াছে!··· অত্যন্ত নোংরা জিনিসের মতোই সে হাত দুইটাকে ঠেলিয়া ছাড়াইতে গেল। লোহার শিকলের মতো শক্ত বাঁধন—তাও খুলিল। রজনী তখন দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, —আমার হাতের বাঁধন কেটে কোথায় যাবে প্রেয়সী?

লক্ষ্মী ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল; উঠিয়া এক কোণে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রজনীও বিহ্বলভাবে তার পিছনে চলিল। লক্ষ্মী আর-এক কোণে সরিয়া গেল, তারপর আর-এক কোণ—যেখানে যায়, সেখানেই ঐ হাত দুইটা তার পিছনে। উপায় নাই! মাগো—বলিয়া লক্ষ্মী মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল।

মূর্ছা ভাঙিতে লক্ষ্মী দেখে, সে রজনীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছে। একবার মনে হইল, এ তার সেই ঘর—আর সেই ঘরে রঘুনাথের কোলেই মাথা রাখিয়াছে, ঘুমাইতেছে। রঘুনাথ কখন্ আসিল তার যে এখনো কাপড়-চোপড় ছাড়া হয় নাই! পা ধুইবার জল? ধড়মড়িয়া লক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই চোখ পড়িল এই কারাগারের বদ্ধ প্রাচীরে। না, এ সেই অজানা ঘর—অমনি দৃষ্টি পড়িল রজনীর দিকে —এ তো স্বপ্ন নয়, ঐ সে দুর্বৃত্ত···উঃ!

লক্ষ্মী অসহায়, একান্ত নিরুপায়। কি করিবে, সে কি করিবে?

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো একটা চিন্তা তার মনের আঁধার চিরিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে একেবারে রজনীর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল,— আমায় ছেড়ে দিন, দয়া করে' ছেড়ে দিন্!

রজনী দুই হাতে পায়ের উপর হইতে লক্ষ্মীকে সরাইয়া দিল, দিয়া বলিল,— তোমায় ছাড়ার জন্যেই কি এত আয়োজন করেছি, প্রেয়সী! তোমায় ছাড়তে গেলে, প্রাণটাকেও ছাড়তে হয় যে! তোমায় ছাড়বো না তো! তুমি যে আমার মাথার মণি—

বলিয়া রজনী আবার লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য দুই হাত বাড়াইল। লক্ষ্মী তার হাত দুইটাকে ঠেলিয়া সরিয়া গেল, অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিল,—আপনি আমার বাপ···আমি মেয়ে—

এ-কথার উত্তরে রজনী এমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল যে, তার শব্দে চারিধার কাঁপিয়া উঠিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, এই ঘরটাও বুঝি ও-শব্দে এখনি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

লক্ষ্মীর আর কিছু বলিবার নাই। নারীর এ কাতরতায় যে-পুরুষ এমন পরিহাসের হাসি হাসিতে পারে, তার কাছেও সে মুক্তির আশা রাখে? নিজের

উপর রাগ ধরিল। কিছুক্ষণ পূর্বে এই যে তার মরিবার সাধ হইয়াছিল, কেন সে তখন মরিল না? এই দুর্বৃত্তের হাতে পড়িয়া এমন লাঞ্ছনা তো তাহা হইলে সহিতে হইত না।

রজনী বলিল,—শোনো প্রেয়সী, তোমার সোনার অঙ্গে কঠিন হাত দেবো, এত বড় বর্বর আমি নই। আমি রূপের পূজারী। এ রূপ আমি বুকে ধরে' পূজা করবো, তাই তোমায় এনেচি। আজ না হয়, কাল; কাল না হয়, পরশু—তোমায় একদিন আমি পাবোই। তবে জোর করে' পাওয়া নয়...তাতে সুখ নেই।

লক্ষ্মী দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া রজনীর পানে চাহিয়া রহিল।

রজনী আবার বলিল,—এই যে হার দেখচো, এ কিছুই নয়—তোমার ঐ সোনার অঙ্গ এমনি হারে ভরিয়ে দেবো। আমার যা-কিছু আছে, সব তোমার পায়ে সঁপে দেবো—সর্বস্ব তোমায় দেবো। তোমার স্বামী, তোমার মেয়ে—তাদেরও খুব সুখে রাখবো—শুধু তুমি আমার হও!

তারপর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া রজনী আবার বলিল,—তুমি ভেবে ছাখো প্রেয়সী, তোমার এ রূপ, এ যৌবন নিয়ে, তুমি সর্বময়ী হয়ে থাকবে আমার কাছে। তোমার কথায় আমি উঠবো-বসবো। আজ আমি যাচ্ছি···তোমায় জ্বালাতন করবো না···আজ প্রথম দিন। অসময়ে এসেচি,···জানি, ভয়ে তোমার মন এখন ভরে' আছে। কিন্তু ভয় নেই···তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হাত দেবো না। তবে সময় দিলুম।—তুমিও ভেবে-ভেবে দেখো···যদি একান্ত না পাই তোমায়, তাহলে—

রজনী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল,—তারপর আবার বলিল,—যেথান থেকে এনেচি, আবার সেইখানেই তোমায় রেখে আসবো।

লক্ষ্মী কাঠ হইয়া সব কথা শুনিল। কথাগুলো যেন হাওয়ায় ঘুরিয়া কোন্ সুদূর কোণ হইতে ভাসিয়া তার কানে আসিয়া লাগিতেছে! ঐ শেষের দিকের কথাটা—'যেথান থেকে এনেচি, আবার সেইখানেই তোমায় রেখে আসবো'—, তা কি হইবে? ভগবান্, ভগবান্···এ কি সে সত্যই শুনিয়াছে, না, স্বপ্নের আর-এক ছলনা!

রজনী বলিল,—তোমায় আর বিরক্ত করবো না। চললুম। তুমি ভেবে দেখো সব। আমার এ ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলো না। আমি তোমার ভালোবাসার ভিখারী—বলিয়া রজনী লক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া তার মুখের দিকে আকুল-চোখে চাহিল। লক্ষ্মী তবু অসাড়, মূক, নিস্পন্দ! রজনী বলিল,—কি পাষাণ তুমি, প্রেয়সী! আচ্ছা, দেখি, আমার বুক-ফাটা চোখের জলে ও পাষাণ গলে কি না একদিন! আজ-পর্যন্ত কখনো আমি ভালোবাসা ভিক্ষা চেয়ে নিরাশ হইনি···!

রজনী উঠিয়া কৌচে বসিল। লক্ষ্মী তার পানে চাহিয়া তেমনি নিঝুম দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ এমনি থাকিয়া রজনী উঠিল, বলিল,—আমি চললুম। মোদ্দা আমার কথাটা তুমি ভেবো প্রেয়সী। এতখানি ভালোবাসা কি মিছে হবে?—আর, খাওনি-দাওনি কেন? ছিঃ, ওতে শরীর ভেঙে যাবে যে!

কথাটা বলিয়া রজনী ঘুরিয়া দ্বারের কাছে গেল; তারপর আর একবার লক্ষ্মীর পানে তৃষিত নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল। দ্বারে তালা পড়িল এবং লক্ষ্মী যে বন্দী সেই বন্দীই রহিয়া গেল!

রজনী চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আবার সেই জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। এইমাত্র যে-সব কুৎসিত কথা শুনিয়াছে, তার দূষিত বাষ্পে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। নীচে তখন গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে, আর সেই ঘন ঘোর আঁধারে জোনাকির ঝিকিমিকি—তার আঁধার ভবিষ্যতের পথে যেন একটু আলোর রশ্মি উঁকি দিতেছে! সে ভাবিল, সে মরিবে না। এখানে এই পরের ঘরে পরের আশ্রয়ে এমন ভাবে মরার কথা মনে হইলে ঘৃণায় সর্বশরীর শিহরিয়া ওঠে! মরিতে যদি হয় তো সেই শত সুখের স্মৃতি-ঘেরা জীর্ণ ঘরের মাঝে গিয়া মরিবে! স্বামীর সামনে নাও যদি মরিতে পায়, তবু সেই ঘরেই তার মরণ-শয্যা বিছানো চাই! তাঁর পায়ের ধূলায়-ভরা ঘর, তাঁর হাসিতে, তাঁর প্রেমের আলোয় আলো-করা ঘর—মরিবার মতো অমন ঠাঁই এ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে!

কিন্তু সব দ্বার যে বন্ধ! সে কেমন করিয়া এ বাঁধন কাটিয়া বাহির হইবে! এ সে কত দূরে কোন দেশে আসিয়া পড়িয়াছে—কোন্ পথ ধরিয়াই-বা যাইবে! সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কোনো দিশাই যখন পাওয়া গেল না, তখন এ বিপদের মধ্যেও তার হাসি আসিল। এই ছোট ঘরখানার ভিতর হইতে সে বাহির হইবার পথ পাইতেছে না,—ইহার মধ্যে সে বাহিরের পথের কথা ভাবিয়া আকুল! হায়রে, অদৃষ্টের এমন বিড়ম্বনায় কি কোনো মানুষ পড়িয়াছে কোনো দিন!

সেদিন সারা রাত্রি ভাবিয়া রঘুনাথ স্থির করিল, লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া সে বাহির করিবেই। এই তার পণ। এই পণ লইয়াই সে বাড়ীর বাহির হইবে! তার প্রাণের লক্ষ্মী···তার উপর মস্ত নির্ভর রাখিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত মন লইয়া ঘরের কোণে বসিয়া ছিল—নিজেকে রক্ষার কোনো উপায় যে কোনোদিন তার সেবার মধ্যে মনে করিবারও সময় পায় নাই···সেই লক্ষ্মীকে এমন বিপদে ফেলিয়া সে চুপ করিয়া থাকিবে,—মরিয়া দায়িত্বের হাত এড়াইবে? এ বিষম স্বার্থ-চিন্তাও যে ক্ষণেকের জন্যে তার মনে জাগিয়াছিল, সেজন্য নিজের উপর রাগ হইল। এই তার ভালোবাসা, এই তার স্বামীত্ব! আদায় করিবার বেলা ষোল-আনা, দিবার বেলা কিছু না! তা হইতেই পারে না!

কিন্তু, মন্টি? মন্টিকে লইয়া কি করা যায়! ইঁহাদের বাড়ী ফেলিয়া গেলে দেখাশুনার বা যত্নের ত্রুটি হইবে না—কিন্তু তার আব্দার আছে, বায়না আছে। বিশেষ মা-বাপ দুইজনকে চোখের আড়াল করিয়া তার মন যখন মুইয়া পড়িবে! তাছাড়া অসুখ-বিসুখ হইলে এতখানি ঝক্কি কি ইঁহাদের ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে? বলিলে ইঁহারা রাজী হইবেন নিশ্চয়—কিন্তু ভালো লোক বলিয়াই কি তাঁদের দরদের উপর এতখানি ভার চাপাইয়া সে বেশ হাল্‌কা হইয়া বাহির

হইবে! যদি লক্ষ্মী বলে, তাকে কেমন করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ? আমি যে তাকে তোমার কাছে রাখিয়াই নিশ্চিন্ত আছি—

রঘুনাথের মন বলিয়া উঠিল,—না, না, মন্টিকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না! এতখানি বেদনা সহিয়া যাইতেছে, আর একটা ছোট মেয়ের ভার,—এ আর সহা যাইবে না? তা-ছাড়া নৈরাশ্যের মুহূর্তে দুর্বল মন যখন অবলম্বন না পাইয়া দিগ্বিদিকে ছুটিতে চাহিবে, মরণের কোল খুঁজিবে, তখন মন্টি পাশে থাকিলে অনেকখানি শক্তি মিলিবে, সাহসও—! তাছাড়া আশাও একেবারে তাহা হইলে তাঁর মন হইতে সরিয়া যাইবে না। মন্টিকে সঙ্গে লইয়াই নূতন পথে চলিতে হইবে!

কিন্তু কোথায় খোঁজ করা যায়? কোন্ দিকে, কোন্ পথে? মানুষ এমন নিশ্চিন্ত হইয়াও উবিয়া যাইতে পারে যে, একটা লোকও সন্ধান দিতে পারে না!

হঠাৎ মনে হইল, সেই যে ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়াছিল, তাকে মোটরে দেখিয়াছে।—কার মোটর? মোটরে সে গেল কি করিয়া? তবে—তবে কি—কোনো দুর্বৃত্ত তার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে!

ভাবিতে-ভাবিতে পুরাকালের সেই মর্মভেদী কাহিনী তার মনে পড়িল। বনের মধ্যে বাকল-পরা রাজার ছেলে পাতার কুঁড়ের আশ্রয় লইয়াছিলেন, দুঃখের আর সীমা ছিল না! সেই বনমধ্যে একমাত্র অবলম্বন সীতাদেবীকে হারাইয়া তিনি, রাজার ছেলে, ত্রিভুবনের মালিক হইয়াও ধৈর্য হারান নাই! সেই সীতাকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প লইয়া বনে-বনে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরিয়া, কত নদী পার হইয়া, কোন্ সাগরে সেতু বাঁধিয়া গিয়া তাঁর উদ্ধার করেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি দীর্ঘ চিন্তার জাল বুনিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন—অমন কত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া! আর সে এই একটুতেই ধৈর্য হারাইয়া মরিতে চাহিতেছিল!

না—ভিতর হইতে কে যেন জোর করিয়া বলিল, তাকে পাবে! তবে?

রঘুনাথ ভাবিল, নামটাতেও তো ভারী আশ্চর্য মিল! রঘুনাথ! সেকালে ভগবান্ রঘুনাথ তাঁর লক্ষ্মীকে হারাইয়া কাতর হইলেও শক্তি হারান নাই—সেও অত-বড় নামের মালিক হইয়া তার লক্ষ্মীকে হারাইয়া শক্তি হারাইবে···—না।

* * * *

পরদিন ভোরে উঠিয়া রঘুনাথ অধীরভাবে বাড়ীর সামনের পথে পায়চারি করিতেছিল। যতীশ আসিয়া ডাকিল, মাষ্টারমশাই—

রঘুনাথ যতীশকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন, বলিলেন—তোমার মা উঠেচেন?

রঘুনাথ বাড়ীর মধ্যে গেল। যতীশের মা রোয়াকে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া তিনি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন, বলিলেন,—মন্টি এখনো ওঠেনি।

রঘুনাথ বলিল,—আজ একটু সকাল-সকাল তাকে খাইয়ে দেবেন।

যতীশের মা দুই চোখে প্রশ্ন করিয়া রঘুনাথের পানে চাহিলেন। রঘুনাথ

বলিল,—আজ আমি বেরুবো ওকে নিয়ে। তার পর সে তার সঙ্কল্পের কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া যতীশের মা বলিলেন,—ফিরবে কবে?

রঘুনাথ বলিল,—তাকে পেলে।

যতীশের মা বলিলেন,—মন্টি আমার কাছেই থাক্ না! পথে ভারী কষ্ট হবে ওর, বাবা।

রঘুনাথ বলিল,—না, না, আমি ওকে আগে দেখবো, যাতে কোনো কষ্ট না হয়।

যতীশের মা বলিলেন,—আমরা যে দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকবো এখানে।

রঘুনাথ বলিল,—আপনাকে মাঝে-মাঝে খবর দেবো।

যতীশের মা বলিলেন,—কোথায় যাবে?

রঘুনাথ এ-কথার জবাব দিতে পারিল না। কি জবাব দিবে? সে নিজে জানেও না যে, কোথায় কোন্ দিক দিয়া সে সন্ধান সুরু করিবে! ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—দেখি, যেতে-যেতে যে পথ সাম্‌নে পড়ে, তাই ধরেই যাবো।

যতীশের মা বলিলেন,—যা শুনচি, তাতে আমার মনে হয়, কলকাতার দিকে খোঁজ নেওয়া দরকার। তা, যে মস্ত সহর—সে কি সহজ কথা! আমার ভয় হয়, প্রাণেই কি আছে সে?

রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ ভয় তার প্রাণেও যে বাজিতেছে নিশিদিন! কিন্তু তবু মনে হইল, তার লক্ষ্মী—সে জগৎ-সংসারের কিছুই জানে না! মরিবার কথা মানুষ ভাবিতে পারে, এমন কথাও যে তার মনে পড়িবে না। তাছাড়া মরা—সে যে বড় শক্ত কাজ। লক্ষ্মী মরিতে জানে না, মরার কোনো উপায়ও জানে না তো!

রঘুনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যতীশের মা বলিলেন,—বেশ, চুপ করে' বসে' থাকাও তো যায় না। তাই করো। থানার উপর যে কোনো বিশ্বাস নেই! না হ'লে ওরা মনে করলে কি সন্ধান নিয়ে বার করতে পারে না!

থানা! থানার কথায় রঘুনাথের মনে পড়িল সেই ভাবহীন মমতা-হীন দুই চোখ, আর সেই দুই হাত—কলের মতো খাতার পিঠে শুধু কলম চালাইয়া চলিয়াছে—কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ প্রাণীটি! প্রাণ গেলেও তাদের দ্বারে সে দাঁড়াইতে পারিবে না! শুধু তাদের কাছে কেন, কাহারো কাছে মুখ ফুটিয়া তার এ সর্বনাশের কথা কখনো সে খুলিয়া বলিতে পারিবে না। অন্তরের এই গূঢ়তম গাঢ় বেদনা, পরের প্রশ্ন আর পরিহাস-ভরা দৃষ্টির সামনে খুলিয়া ধরিয়া তার অপমান করিবে, এত বড় দরাজ ছাতি তার নাই!

রঘুনাথ বলিল,—নিজেই খুঁজবো।

এমন সময় যতীশ বলিয়া উঠিল,—ঐ যে মন্টি উঠেছে···

সঙ্গে-সঙ্গে মন্টি একখানি ডুরে কাপড় গায়ে জড়াইয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, কহিল,—মাকে এনেচো বাবা?

এ-কথায় স্থানটা এমন বেদনার সুরে ভরিয়া উঠিল যে, সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। যতীশের মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া মন্টিকে বুকে লইলেন, তার মুখে মুখ দিয়া বলিলেন,—এসো তো মা, মুখ ধুইয়ে দি। তারপর বাবার সঙ্গে মা'র কাছে যাবে।

—"মা আসেনি এখানে?" বলিয়া মন্টি বাপের পানে চাহিল। রঘুনাথ মুখ নত করিয়া ছিল, সে-কথার জবাব দিবার কোনো চেষ্টাও করিল না। মনকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল—এমন কথা প্রতি নিমেষেই এখন শুনিতে হইবে—উহাতে মনকে দমিতে দেওয়া হইবে না।

আহারে বসিয়া মন্টি বিষম বায়না লইল, বাবা খাইলে তবে সে খাইবে, নইলে নয়।

রঘুনাথকে তখন ভাতের কাছে বসিতে হইল এবং মন্টি তার মুখে এক মুঠা অন্ন গুঁজিয়া দিল। রঘুনাথ বলিল,—তুমি খাও মা।

মন্টি বলিল,—তুমি না খেলে আমি খাব না তো—ককৃখনো খাবো না।

রঘুনাথকে তখন খাইতে হইল। দুজনের আহার শেষ হইলে রঘুনাথ উঠিল; মুখ-হাত ধুইয়া যতীশের মা'র পায়ের কাছে প্রণাম করিল; তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল,—আশীর্বাদ করুন, যেন হাসি-মুখে আপনার পায়ে তাকে এনে পৌঁছে দিতে পারি!

যতীশ আসিয়া রঘুনাথকে প্রণাম করিলে রঘুনাথ কোনো কথা বলিতে পারিল না, শুধু উদাস অশ্রুময় দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল।

যতীশের মা বলিলেন,—আমাদের কলকাতার ঠিকানাটা লিখে দাও যতী। চিঠি দিও, বাবা—আর পেলেই তাকে নিয়ে আমার ওখানে গিয়ে উঠো। আমি দু'চারদিন পরে চলে যাচ্ছি।

যতীশ মা'র কথায় একটা কাগজে তাদের কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া আনিয়া রঘুনাথের হাতে দিল। রঘুনাথ কাগজটুকু জামার পকেটে রাখিয়া মন্টিকে কোলে লইয়া পথে বাহির হইল।

পথে আসিয়া মন্টি বলিল,—আমায় নামিয়ে দাও, আমি হাঁটবো। হাঁটতে আমি পারি তো।

রঘুনাথ তাহাকে নামাইয়া দিল, দিয়া ভাবিল, এই তো হাঁটার সুরু—কতদিন হাঁটিতে হইবে, তার কি কোন ঠিকানা রাখিস মা!

গ্রামের বুক—দুইধারে তাল-নারিকেল, আম-কাঁঠালের বাগান, মাঝে ধূলা-ভরা পথ। আশে-পাশে চালা-ঘর। কাহারো চালে নানা লতা-পাতা গজাইয়া চালের খড় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! রঘুনাথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ঘাটের পথে আসিল। তারপর ভাবিল, বাড়ীর পথে নয়। এখনি মন্টি সহস্র প্রশ্ন তুলিয়া এমন আকুল করিয়া দিবে, জবাব তো তার দিতেই পারিবে না—মাঝে হইতে বেদনার ঘা-গুলো খোঁচা খাইয়া বিষম জ্বালায় টন্‌টন্ করিতে থাকিবে।

ঘাটে আসিয়া মাঝিকে সে ও-পারে অনেকটা দূরে নামাইয়া দিতে বলিল। নৌকা চলিল। জলের ছোট-ছোট ঢেউ ভাঙিয়া নৌকার দুইধারে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কি বেদনার সুর ও কি দরদে-ভরা কল-কল্লোল!

রঘুনাথ আকাশের পানে চাহিল। ঐ আকাশ,—দুই দিন পূর্বে যে আকাশ উপর হইতেই তার ছোট্ট গণ্ডীঘেরা বিপুল সুখ চোখ মেলিয়া দেখিয়াছে—আর এ-ও সেই বাতাস, যার পরশ তার অঙ্গে অমৃত ছিটাইয়াছে! আজ···?

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। মন্টি বলিল,—আমাদের বাড়ী কৈ, বাবা? এবং তার জবাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিল,—মা কোথায় গেছে, বাবা? কেন গেছে? কার সঙ্গে গেল? আমায় কেন নিয়ে গেল না? রোসো, আমি মা'র সঙ্গে কথা কবো না তো! আমায় ফেলে একলা চলে যাওয়া—ভারী দুষ্টু মেয়ে হয়েছে—আচ্ছা, আমিও মজা দেখাবো'খন।

রঘুনাথ বলিল,—চেয়ে ত্যাখো মন্টি, কেমন ছোট-ছোট ঢেউ, কেমন নৌকো চলেছে—

মন্টি সে-কথায় কান না দিয়া প্রশ্নের ঝড় বহাইয়া চলিল।

পাড়ে আসিয়া রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া একটা পথে চলিল। এ-পথে লোকের ভিড় নাই। পথটা গিয়া মাঠের মধ্য দিয়া বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। রঘুনাথ আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, আঃ, এ-পথে আসিয়া লোকের প্রশ্নগুলোকে খুব ফাঁকি দেওয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ হাঁটিয়া মাঠ পার হইয়া একটা জলার ধারে আসিয়া রঘুনাথ বসিল। মন্টি বলিল,—বসলে কেন বাবা? চলো না···রাত্তির হয়ে যাবে যে নৈলে—

রঘুনাথ বলিল—একটু জিরোও মা। এমন কতদিন হাঁটতে হবে, তা তো জানো না!

মন্টি রঘুনাথের পানে চাহিল। তার অর্থ···এ-কথার মানে?

রঘুনাথ চাদরের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি মুড়ি ও কিছু মিষ্টান্ন মন্টির সামনে ধরিয়া বলিল,—খাও, একটু খেয়ে নাও, আবার হাঁটবো।

মন্টি বলিল,—তুমি খাও, তবে খাবো।

তর্ক করার ইচ্ছা রঘুনাথের হইল না। কি জানি আবার মন্টি কি প্রশ্ন করিয়া বসিবে! সেও মেয়ের সঙ্গে মিলিয়া মুড়ি মুখে দিল।

সাত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা মালী একটু আগে লক্ষ্মীর ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মী এ সাত দিন সহস্রবার ভাবিয়াছে, মরিবে—মরণের জন্য প্রস্তুতও হইয়াছে, তবু মরিতে পারে নাই। মরিব মনে করা যত সহজ, মরা তেমন নয়। বিশেষ বাঙালীর ঘরে, দুঃখী বাঙালীর ঘরে মরণ বড় চট্ করিয়া মেয়েদের স্পর্শ করিতে চায় না! অতি দুঃখে পড়িয়া আশার শেষ খেই হারাইয়াও বাঙালীর মেয়ে পড়িয়া-পড়িয়া দুঃখ সয়—এই তো, লক্ষ্মী এখনো আশা ছাড়িতে পারে নাই! স্বামী, মেয়ে, স্বামীর ঘর—কোথা

হইতে এ দুর্দিনেও তাকে এমন বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, লক্ষ্মী বারবার মরিতে গিয়াও শুধু তাদের মুখ চাহিয়া মাটিতে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া রহিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার পরেই চাঁদের জ্যোৎস্না ঘরের মেঝেয় পড়িয়া লুকোচুরি খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। এ-কয়দিন রজনী আসিয়া বাহির হইতেই চলিয়া গিয়াছে; দ্বারের অন্তরাল হইতে লক্ষ্মীর খোঁজ করিয়াছে; ঘরে সে আসে নাই। লক্ষ্মীও কতকটা ভয়ের হাত হইতে নিজেকে তাই মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে।

আজ রাত্রে চাঁদের এই রূপালি আলোয় তার প্রাণের মধ্যে রূপালি তারে দুলিয়া আশা আসিয়া উঁকি দিল। লক্ষ্মী ভাবিল, তবে বোধহয় তার দুর্গ্রহ কাটিয়া গেল! এবার সে ছুটি পাইবে—ছুটি! বাহিরের মুক্ত অবাধ বাতাসের পরশে এ দুর্দিনের স্মৃতি ভুলিয়া আবার তার সেই চিরকালের চেনা সহজ পুরাতনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে! দ্বার খুলিয়া মালী ভিতরে আসিল; হাতে জল-খাবারের ঠোঙা। খাবারের ঠোঙা লক্ষ্মীর পায়ের কাছে রাখিয়া অত্যন্ত বিনীতস্বরে সে বলিল,—খাও মা।

লক্ষ্মী কাতর চোখে মালীর পানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, আবার কেন জ্বালাস্ রে? কিন্তু মূর্খ মালী সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না। সে শুধু লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী তখন কথা কহিল, একটু ঝাঁজালো-সুরেই বলিল,—কেন বারবার আমায় ত্যক্ত করো তোমরা? এখানকার কোনো জিনিস আমি ছোঁবো না। মরে গেলেও নয়!

মালী এ-কথায় ব্যথা পাইল। সে বলিল,—এ আমার পয়সায় এনেচি মা—বাবুর পয়সায় নয়।

লক্ষ্মী অবাক হইয়া গেল। এই মূর্খ ছোটলোক মালী—এর প্রাণে এত মমতা, এমন দরদ!

মালী বলিল,—ক'দিন মুখে কিছু দাওনি যে মা—একটু খাও।—আজ তোমায় আমি বার করে' দেবোই। আর একটু রাত হোক্। তোমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটি বাবুদের বাড়ী রেখে আস্‌বো—সে আমি ঠিক করেচি—

লক্ষ্মী আরো বিস্মিত হইয়া ভাবিল,—এ আর-একটা চাতুরীর জাল বুনিতেছে না তো? কিন্তু মালীর মুখের ভাব দেখিয়া এ সন্দেহ নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

লক্ষ্মী বলিল,—তারপর তোমার—

কথাটা সে শেষ করিবার পূর্বেই মালী বলিল—চাকরির কথা বলচো মা! তোমার আশীর্বাদে গতর থাকলে চাকরি ঢের মিলবে!

মালী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপর মিনতি-ভরা স্বরে বলিল,—তুমি খাও এবার —না খেলে রাস্তা চল্‌তে পারবে কেন?

এ ব্যাকুল নিবেদন উপেক্ষা করা চলে না—করিবার মতো প্রাণও লক্ষ্মীর নয়। লক্ষ্মী মুখ ধুইয়া খাবার মুখে তুলিল।

মালী বলিল,—আরো দুইজন মেয়েকে সে এমনি পাহারা দিয়াছে, এমনি তালা-

দেওয়া ঘরে কড়া তদারকে রাখিয়াছে, কিন্তু তারা তো মানুষ নয়! দুই দিন পরেই বাবুর সঙ্গে বেশ বনাইয়া হাসি-খুশি করিয়াছে। এবারেও সে ভাবিয়াছিল, তাহাই হইবে। কিন্তু সে ভুল! তাছাড়া লক্ষ্মীর চোখের ঐ কাতর দৃষ্টিতে সে বুনো মালী; তারও প্রাণ টলিয়াছে!

লক্ষ্মী কথা শুনিতে-শুনিতে আহার করিতেছিল—হঠাৎ নীচে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। মালী বলিল,—বাবু এলো যে! বলিয়াই একটু ব্যাকুল দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চাহিল, বলিল,—কোনো ভয় নেই, মা—বলিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দ্বারে তালা আঁটিয়া দিল।

লক্ষ্মীর হাতের মিষ্টান্ন হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে ভয়ে একেবারে থ হইয়া রহিল। কি আশ্চর্য—যে মুহূর্তে সে ভয় ভুলিয়া মনটাকে আশ্বাসে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক সেই সময়—

বাহিরে রজনীর মত্ত কণ্ঠের স্বর শুনা গেল। রজনী মালীকে ডাকিতেছিল। যেন দৈত্যের হুঙ্কার জাগিয়াছে—এতদিন পরে আবার—

লক্ষ্মী নিজেকে সম্বৃত করিয়া উন্নত হইয়া বসিল—এখনি বুঝি পাহাড়ের মতো বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে! সঙ্গে-সঙ্গে দ্বারের তালা খুলিয়া রজনী ঘরে ঢুকিল, ডাকিল,—প্রেয়সী—

লক্ষ্মী ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে রক্তটা ভয়ের দোলায় ছলাৎ-ছলাৎ করিয়া দুলিতেছিল।

রজনী বলিল,—সাত দিন সময় দিয়েছি! আজ তৈরী—কি বলো, প্রেয়সী?—কথা কচ্ছো না যে?

বলিয়াই রজনী আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিল। লক্ষী হাত ছাড়াইয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। রজনী তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া সবলে লক্ষ্মীর অধরে চুম্বন করিল, বলিল,—আঃ কি মধুর অধর-সুধাপান—

লক্ষ্মী প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। শরীরে কোথা হইতে এমন শক্তি আসিয়া দেখা দিল! সে প্রাণপণে ডাকিতেছিল, হে মা কালী, হে ঠাকুর—

রজনী বাঘের মত বিক্রমে লক্ষ্মীকে জাপ্‌টাইয়া কৌচের উপর বসিয়া পড়িল।

লক্ষ্মীর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী একটা রক্ত-রাঙা গোলকের মত ঘুরপাক খাইতেছিল। এ গ্রাস হইতে কি করিয়া সে মুক্তি পাইবে! ঠাকুর, ঠাকুর—

হঠাৎ কে আসিয়া দুইজনের মাঝে পড়িয়া দুইজনকে সবলে দুপাশে হঠাইয়া দিল। রজনী মদ খাইয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছিল—সে ছিট্‌কাইয়া কৌচের নীচে গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী ছিট্‌কাইয়া দূরে আসিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখে, মালী। মালী বলিল,—পালাও, পালাও মা—এখনি পালাও তুমি—

লক্ষ্মী কেমন যেন হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। মালী তার হাতটা ধরিয়া সজোরে টানিল, বলিল,—পালিয়ে এসো, শীগ্‌গির—

লক্ষ্মী তখন বুঝিল, এ কি কাণ্ড চলিয়াছে—আর এ কি মস্ত সুযোগ তার সামনে!

সে ছুটিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। রজনীও ঠিক সেই মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার আগলাইল। মালী রজনীর হাত ধরিয়া সজোরে আবার ধাক্কা দিল—রজনী গিয়া পড়িল কৌচের পায়ার কাছে।

—তবে রে বেটা ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে—বলিয়া মালীকে আক্রমণ করিবার জন্য যেমন সে উঠিতে যাইবে, ঠিক সেই ফাঁকে মালী লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল। লক্ষ্মীর সমস্ত চেতনা অমনি নিমেষে জাগিয়া উঠিল; এবং সে আর কোনো দিকে না চাহিয়া একেবারে সিঁড়ি টপকাইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

রজনী উঠিয়া দেখে, লক্ষ্মী ঘরে নাই। মালীর উপর তার প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। কিন্তু লক্ষ্মী যে সরিয়া পলায়! মালীকে ছাড়িয়া সে তখন লক্ষ্মীর পিছনে ছুটিতে উদ্যত হইল।—মালী বাধা দিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল। তখন সমস্ত ক্রোধ এ-বাধায় নাড়া পাইয়া বিপুল বিক্রমে মালীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিল-চড় লাথিতে মালীকে বিপর্যস্ত করিয়া রজনী শেষে তাকে টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া সিঁড়ির উপর হইতে সজোরে এমন ধাক্কা দিল যে, মালী গড়াইতে-গড়াইতে গিয়া নীচে পড়িল। রজনীও মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া টলিতে-টলিতে নীচে নামিয়া আসিল এবং এধারে-ওধারে চাহিয়া একেবারে বাগানের ফটক অবধি চলিয়া গেল। ঐ পথ—জন-প্রাণীর সাড়া নাই, শব্দ নাই, এবং চাঁদের আলোয় মাতালের চোখেও যতদূর দেখা যায়, কাহারো কোনো চিহ্ন নাই! রজনী ফিরিয়া মোটরে গিয়া উঠিল। ড্রাইভারটা তখন চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিল; রজনী তাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল,—চালাও—আস্তে যাও—

ড্রাইভার ব্যাপার না বুঝিয়া মনিবের আদেশ পালন করিল।

সে গাড়ী ধীরে-ধীরে পথে বাহির করিয়া, ধীরে-ধীরে চালাইয়া চলিল। আর রজনী গাড়ীতে বসিয়া দুই চোখে ক্ষুধাতুর লোলুপ দৃষ্টি ভরিয়া পথের সামনে-পিছনে ডাইনে-বামে চারিধারে তাহা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোথায় গেল সে?··· কোথাও নাই!

বাহির হইয়া লক্ষ্মী পথে আসে নাই। পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে ফটকের ওদিকে যাইতে তার পা ওঠে নাই। সে ঐ পাতায়-ঢাকা আলো-মাখা ঝাপসা জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে যেদিকে দুই চোখ যায় অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছিল। বাগানের বেড়া টপ্‌কাইয়া, দুই হাতে জঙ্গল ঠেলিয়া সে চলিয়াছিল! পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, গায়ে গাছের ডালে ধাক্কা লাগিতেছিল—সেদিকে তার খেয়াল নাই—চলিয়াছে, সোজা চলিয়াছে, অতি সন্তর্পণে, গাছের শুক্‌নো পাতায় পায়ের শব্দ না ধ্বনিয়া ওঠে, সে শব্দ বাঁচাইয়া,—মাঝে-মাঝে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া। পিছন-পানেও সে চাহিয়া দেখিতেছিল, পিছনে কেহ ধাওয়া করিয়া আসিতেছে কি না!

এমনি করিয়া সারা রাত্রি সে চলিল। জঙ্গল ঠেলিয়া, খানা ডিঙাইয়া, গলি পার হইয়া, বেড়া টপ্‌কাইয়া—বাগানের পর বাগান ছাড়াইয়া; কেবল বড় রাস্তায় গেল না। কি জানি যদি কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যদি কেহ প্রশ্ন তোলে, 'তুমি কে?

কোথায় চলিয়াছ ?' পা ভারী হইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িতে চায়, দেহের ভার আর সে বহিতে পারে না—তবু লক্ষ্মী সমানে চলিয়াছে! চলার তার আর বিরাম নাই! মনের মধ্যে আশাও জাগিতেছিল, যদি ভোরের দিকে চোখে পড়ে, সেই তার চির-পরিচিত সোনার ঘরখানি···

চলিতে-চলিতে মাথার উপর জ্যোৎস্না ফিকা হইয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, তারপর কোথায় তা উবিয়া গিয়া চারিধার আঁধারে ভরিয়া উঠিল। সেই আঁধারেই লক্ষ্মী চলিয়াছে, লক্ষ্যহীন, দিক্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া, দম-খাওয়া পুতুলের মতো!

শেষে গাছের পাতার আড়ে ভোরের পাখীর গুঞ্জন জাগিয়া উঠিল···নানা পতঙ্গের বিচিত্র কোলাহল সুরু হইল—তবু লক্ষ্মী চলিয়াছে। পা দুইটা এমন টাটাইয়া উঠিয়াছে যে, আর চলে না। মনে হয়, এবার কোথাও পড়িয়া জন্মের মত এ-চলায় বিরাম দিতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়।

গাছের ডাল-পাতা ফুঁড়িয়া ক্রমে ভোরের দিকে গোলাপী আলো ঝরিয়া পড়িল। মাতালের মতো টলিতে-টলিতে লক্ষ্মী আসিয়া একটা পোড়ো-বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মাথা ঘুরিতেছিল—সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, সে যেন ঠিক স্নান করিয়া উঠিয়াছে! ঘুমে তার চোখ ঢুলিয়া আসিতেছিল! জোর করিয়া চাহিয়া সে দেখে, এ কি! রাত্রির অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যেও যে বড় রাস্তাটাকে দূরে রাখিয়া চলিয়াছে, ভোরের আলোয় সেই বড় রাস্তার ধারেই নিজেকে সে আনিয়া ফেলিল! উপায় ?

উপায় নাই! পাও আর চলে না! সেই পোড়ো-বাড়ীর সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, ভগবান!

হায়রে, ভগবানকে ডাকিয়া কোন ফল নাই! অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারে যদি তাঁর কোন হাত থাকিত, তাহা হইলে কি তাঁর পায়ের কাছে দুঃখীর বেদনার অশ্রু এমন ভাবে নিত্য পুঞ্জিত হইয়া প্রকাণ্ড মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়া তুলিত! দুঃখীর দুঃখ যদি তিনি তার মিনতির প্রার্থনায় ঘুচাইতেন, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে দুঃখ থাকিত না! তাহা হইলে কে তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া নিত্য এমন আকুল আবেদনে আকাশ-বাতাস ভারী করিয়া তুলিত! তাঁর নামই তাহা হইলে পৃথিবীর বুক হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত! দুঃখী ডাকিয়া নিরাশ হয়, তাঁর দুঃখও ঘোচে না, তবু লোকে কোনো দিকে আর কাহাকেও না পাইয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে—ভাগ্যের এ কি যে বিড়ম্বনা!

লক্ষ্মী নিরুপায় হইয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিল। তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সেইখানে পড়িয়াই সে চোখ বুজিল।

একটু বেলা ফুটিতেই সে-পথে প্রথম আসিয়া দেখা দিল, হরকান্ত। সর্বরকম নেশার সাধনা করিয়া সে একেবারে দিগ্‌গজ বনিয়াছে। এই পোড়ো-বাড়ীটা তাদের

দলের আড্ডা। সন্ধ্যার সময় হইতে রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত এখানে মস্ত ভিড় জমে এবং সেই ভিড়ের সভায় দেশের লাটসাহেবের সফরে বাহির হওয়ার খরচ হইতে সুরু করিয়া মায় আজকালের বাজারের চড়া দর অবধি কোনো আলোচনাই বাদ যায় না! এমন কি, সঙ্গে-সঙ্গে মানব-দেহকে সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে আপ্যায়িত করিতে কোথায় কি সরঞ্জাম সজ্জিত বা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কারান্তে তাহা সংগ্রহ—এ সমস্তের কিছুই বকেয়া পড়িয়া থাকে না। এই দলের হুঙ্কারে পোড়ো-বাড়ীটা পাড়ায় রমণীবৃন্দের কাছে একটা আতঙ্কের জায়গা বলিয়া এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, সন্ধ্যার পর একলা এধার মাড়াইতে তাহাদের কাহারো ভরসা হয় না!

কোন্ পুকুরে মাছ ধরিয়া সে-দিনটা সুখে অতিবাহিত করা যায় হরকান্ত তাহারি সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ আড্ডা-ঘরের সামনে মূর্চ্ছিতা নারী-মূর্তি দেখিয়া সে কৌতুহলী হইয়া কাছে আসিল এবং যখন দেখিল, মূর্তিখানি শুধু নারীর নয়, তরুণীর এবং অপূর্ব সুন্দরীর, তখন পরম উল্লাসে তার চিত্ত নাচিয়া উঠিল। সে সে-মূর্তির কাছে আসিল এবং কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্বাস অনুভব করিবার জন্য তার নাকের কাছে হাত লইয়া গেল। এই যে নিশ্বাস পড়িতেছে!

হরকান্ত তখন তরুণীকে একটু নাড়া দিল—সে নাড়ায় লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়াই এ মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল!—আবার! এখনো বিরাম নাই!

হরকান্ত তখন তাহাকে তুলিয়া ধরিতে গেল। বিপদ্ বুঝিয়া লক্ষ্মী অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আত্মরক্ষার জন্য ছুটিয়া পলাইতে গিয়া দেখিল, পা তার এমন ভারী আর টাটাইয়া রহিয়াছে, যে, নড়ার শক্তি নাই। তবু সে ছুটিবার চেষ্টা করিল। শিকার ফস্কায় দেখিয়া হরকান্ত তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল। লক্ষ্মী সে-আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যুঝিতে লাগিল—কিন্তু হায়, হাত-পা নিতান্তই অবশ, শরীরে এতটুকু সামর্থ্য নাই—সমস্ত শরীরটাকে কে যেন দুম্ড়াইয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। তার দুই চোখে জল আসিল। তার ক্ষুদ্র গৃহ-কোণ হইতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাকে এ কোন্ পথে আজ দাঁড় করাইলে ঠাকুর! চারিদিকে পুরুষের তীব্র লালসা-লোলুপ হাত বিস্তার করিয়া কেবলি নারীকে গ্রাস করিতে চায়! এ কি লজ্জা, কি দুর্ভাগ্য! পুরুষকে কি তুমি সৃষ্টি করো নাই, ভগবান!

ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সে লড়িতে লাগিল। তার হাত ফস্কাইয়া লক্ষ্মী একটু ছুটিবার চেষ্টা করে, ছুটিতে গিয়া অমনি হাঁপাইয়া পড়ে—হরকান্ত গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। লক্ষ্মী আশা হারাইয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল।

ওধারে একটা গলি বাঁকিয়া একখানা ভাড়াটে-গাড়ী বড় রাস্তায় দেখা দিল।

গাড়ীখানা এইদিকেই আসিতেছিল। লক্ষ্মী একবার চকিতের জন্য গাড়ীটা লক্ষ্য করিল—তারপর চোখের সামনে সব অন্ধকার! হরকান্ত তখন তাহাকে একেবারে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে।

গাড়ী কাছে আসিল। কাছে আসিতেই গাড়ির খোলা খিড়কির মধ্য দিয়া একমাত্র আরোহী এক তরুণী মুখ বাড়াইয়া পথে এই কাণ্ড দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া সেখানে আসিয়া বলিল,—এ কি এ!

হরকান্ত তার পানে চাহিল। তরুণী সুন্দরী, পরনে খদ্দরের শাড়ী, গায়ে খদ্দরের জামা, পায়ে নাগরা জুতা। তাহাকে দেখিয়া হরকান্ত থ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর তার শিকারের দিকে আবার মনঃসংযোগ করিল। লক্ষ্মী তখন আর-একবার ছুটিবার চেষ্টা করিল।

তরুণী ব্যাপার বুঝিয়া হরকান্তর হাত ধরিয়া ঝট্‌কা দিল, তীব্রস্বরে কহিল,—ছাড়ো।

হরকান্ত চোখ পাকাইয়া একটু তীব্র হাস্য করিল। তরুণী তখন চকিতে গিয়া গাড়োয়ানের হাত হইতে চাবুক আনিয়া সজোরে তার পিঠে সপাসপ বসাইয়া দিল।

আচমকা ছিপটি খাইয়া হরকান্ত ভড়্‌কাইয়া তরুণীর পানে চাহিল। চাহিতেই মুখের উপর সপাৎ করিয়া চাবুক পড়িল—চাবুকের পর চাবুক। তার গাল কাটিয়া রক্ত বহিল এবং প্রহারে জর্জরিত হরকান্ত বেত্রাহত কুকুরের মতো ত্রস্তে পলাইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিল।

তরুণী তখন লক্ষ্মীকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল,—এর মানে কি?

লক্ষ্মী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল,—অত্যাচার···

তার মুখে আর কথা ফুটিল না।···সে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তরুণী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া এক-রকম টানিয়াই তাহাকে আনিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিল। লক্ষ্মীর হাত-পা ঝিমঝিম করিতেছিল—সর্বাঙ্গ কাঁপিতে সুরু করিল। টলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়িল।

তরুণী গাড়োয়ানকে সঙ্কেত করিল, চালাও।

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইয়া তীব্রবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

অনেকখানি পথ চলিয়া আসিবার পর আতঙ্ক কাটিলে লক্ষ্মী আবার চোখ মেলিয়া চাহিল। তরুণী দুই হাতে ধরিয়া তার মুখখানি বুকের উপর তুলিয়া কহিল,—ভয় নেই! তুমি আমার কাছে আছো!

লক্ষ্মী উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া রহিল,—তার চোখের সামনে তখনো যেন একরাশ দৈত্যের কালো-কালো ভীষণ মূর্তি তাণ্ডবের তালে নৃত্য করিতেছে!

তরুণী বলিল,—আর ভয় কি! চাও, চোখ মেলে চাও···

এই কোমল দরদ-ভরা স্বরে লক্ষ্মীর বেদনাহত মনের উপর শান্ত শীতল বাতাসের পরশ ভাসিয়া আসিল। তার আরাম বোধ হইল।

তরুণী বলিল,—বেশ, আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও তুমি···

লক্ষ্মী বিস্মিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া শুধু প্রশ্ন করিল, তুমি মা ভগবতী?

তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল,—না, আমি কিরণ, তোমার দিদি হই।

এও এই পৃথিবী! এ পৃথিবীতে অত্যাচারের উদ্যত বাহু শত অস্ত্রে মানুষের বুক চিরিয়া তাকে রক্তাক্ত করিয়া তোলে…আবার এই পৃথিবীতেই মমতার স্নিগ্ধ নির্ঝর এমন ঝর-ঝর ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, যার একটি ঝলকের পরশে বুকের সে-রক্ত মুছিয়া যায়, সে-বেদনাও আরাম পায়। লক্ষ্মী ভাবিল, এ যদি না হইত, তা হইলে এ দুনিয়ায় মানুষ বাস করিতে পারিত কি, ঠাকুর!

কিরণ দেখিল, লক্ষ্মীর চোখে আশ্বাসের আভাস ফুটিলেও তার মন এখনো আতঙ্কের কাঁটাগুলোকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। তাকে ভুলাইবার জন্য সে তখন নিজের কথা পাড়িয়া বসিল। কিরণ বলিল—আমি এধারে এক ঠাকুর-বাড়ীতে এসেছিলুম কাল রাত্রে, পূজা দিতে। ট্যাক্সি খারাপ হয়ে গেল। ভোর অবধি তাই থাকতে হলো! ভোরেও ট্যাক্সি খারাপ দেখে এই গাড়ীটা ভাড়া ক'রে ফিরছি। আমি থাকি কলকাতায়,—ট্রেণে ভিড়ের মধ্যে যেতে ভালোবাসি না। এই গাড়ী ক'রে এগুনো যাবে তো—এ গাড়ী সবটা না পারে, পথে আর-একটা গাড়ী নিয়েও বাড়ী যেতে পারবো। আর খানিক গেলে পথে অন্য ট্যাক্সিও মিলতে পারে। নাহলে ঘোড়ার গাড়ীতে টানা যেতে গেলে, বাড়ী পৌছুতে সময় লাগবে ঢের বেশী! আজই দুপুরের আগে আমার ফেরা চাই। সেখানে পরের চাকরি করি, তাই! …যাক্, এখন তুমি কোথায় যাবে, বল দিকি! তোমার বাড়ী কোথায়?

এ-কথায় লক্ষ্মীর প্রাণটা ধক্ করিয়া উঠিল, বাড়ী! সে কোন দিকে, কতদূরে… তাছাড়া কার সঙ্গে যাইবে সেখানে! তার চেয়ে…

লক্ষ্মী বলিল,—আজকের মতো আমায় একটু আশ্রয় দেবেন, তারপর সন্ধান নিয়ে আমার বাড়ীতেই পৌছে দেবেন।…এই অবধি বলিয়া লক্ষ্মী একটু থামিল, পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—এ ক'দিনে আমার জীবনে কি যে হয়ে গেল… সবকথা আপনাকে বলবো দিদি! এমনও হয়! বলবো, আগে একটু নিশ্বাস নি।

এই কয়টা কথা বলিতে গিয়া লক্ষ্মী কেমন অবশ হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে এই কয়দিনের ঘটনাগুলা জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তার সমস্ত সজীবতা তার সমস্ত ভীষণতাকে আরো প্রচণ্ড তেজে দীপ্ত করিয়া। লক্ষ্মী কিরণের বুকে মাথা রাখিয়া আবার চোখ বুজিল।

গাড়ী আরো খানিক চলিয়া আসিলে পথেই ট্যাক্সি মিলিয়া গেল। যে ট্যাক্সিতে কিরণ আসিয়াছিল—সেখানাই নিজেকে সারাইয়া তুলিয়া পিছনে ছুটিয়া আসিয়া হাজির হইল। লক্ষ্মীকে ধরিয়া ট্যাক্সিতে উঠাইয়া কিরণ পাশে বসিল—ড্রাইভার গাড়ীর হুড্ তুলিয়া দিল। তারপর গাড়োয়ানটাকে ভাড়া চুকানো হইলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে ট্যাক্সি আসিয়া কলিকাতার এক পথে দোতলা একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। দাসী ও ভৃত্য ছুটিয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। ছুটন্ত গাড়ীতে বসিয়া সে দেখিতেছিল, পথে চলন্ত গাছ-পালা আর সহরের মত্ত জনস্রোত—বিদ্যুতের মতো তার চোখে পড়িয়া সরিয়া-সরিয়া চলিয়াছে! এ দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নাই। এই নূতন রকম আবহাওয়ায় তার প্রাণ আতঙ্কের পাশ কাটাইয়া সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। কিরণের বাড়ীতে গাড়ী থামিলে কিরণের সঙ্গে সেও নামিল এবং সকলে ভিতরে ঢুকিল।

বাড়ীতে পৌছিয়া কিরণ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিল,—ওপরে এসো। ঝিকে আদেশ দিল,—শীগ্‌গির দু'পেয়ালা চা তৈরী ক'রে আন্ দিকি, সদু।

কিরণ লক্ষ্মীকে আনিয়া দোতলায় তার বসিবার ঘরে বসাইল। পরিচ্ছন্ন ঘর—অল্প আসবাবে পরিপাটী সাজানো! চেয়ার, কৌচ···একধারে একখানি তক্তপোষ···কার্পেট-পাতা বিছানা! লক্ষ্মী আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। কিরণ বলিল,—আমি আসছি। বলিয়াই চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী তখন ঘরখানার চারিধারে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। অজানা ঘর—চারিদিকে তবু মুক্তির কি স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছে! আলো আর হাওয়া—এই দুইটা জিনিসের কথা এ কয়দিন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল! এই আলো আর মুক্ত হাওয়ার পরশ পাইয়া তার প্রাণের গোপন কোণে পুঞ্জিত যা-কিছু ভয় আতঙ্ক উদ্বেগ, সব ছিট্‌কাইয়া কোথায় সরিয়া গেল! লক্ষ্মীর মনে হইল, কে এ মানুষটি—চোখে-মুখে স্নেহের উজ্জ্বল দীপ্তি, গতিতে সহজ সারল্য—এ কি তার স্বপ্নের দেবী? ও-কয়দিন আঁধার কারাগৃহে পড়িয়া কেবলি সে ব্যাকুল নিবেদন জানাইয়াছে, তাই আজ এই বেশে দেখা দিয়া তিনিই কি তার সকল দুঃখের অবসান করিলেন! তার এক-একবার এখনো মনে হইতেছিল, এটা সত্য, না, আবার এ স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে! দুই চোখ রগড়াইয়া সাফ করিয়া সে চাহিল। না, সত্য—এ সব সত্য—ঐ আকাশ, ঐ আলো, এই শয্যা—এ স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়,—এ সত্য, সব সত্য!

এমনি ভাবে মনটা যখন দোল খাইতেছে, তখন কিরণ আসিয়া বলিল,—এসো দিকি, তোমার চুলগুলো ঠিক করে' দি—জট পাকিয়ে যেন দড়ি হয়েছে! আর মুখের এ কি শ্রী—

কিরণ লক্ষ্মীর চুল খুলিয়া চিরুণী লইয়া তার জট ছাড়াইতে বসিল।

লক্ষ্মী বলিল, থাক দিদি—

কিরণ বলিল—কেন থাকবে!

লক্ষ্মী কিছু বলিতে পারিল না—তার দুই চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। কার জন্যই-বা—সে নিশ্বাস ফেলিল।

দাসী চা আনিল। কিরণ বলিল,—খাও, শরীরে একটু জুৎ পাবে'খন।

লক্ষ্মীর মুখে কিরণ চায়ের পেয়ালা ধরিল। এ বস্তু একেবারে নূতন। তবু কিরণের কথা ঠেলিতে তার প্রাণে বাজিল। নিজের হাতে পেয়ালাটা লইয়া সে বলিল,—আর কেন দিদি, এ-সব? আমার এখন মলেই হয়।

কিরণ অত্যন্ত কাতর চোখে লক্ষ্মীর দিকে চাহিল। লক্ষ্মীর এই ফুটন্ত লাবণ্যের মাঝে অতি তীব্র বেদনার কাঁটা যে এমন ফুটিয়া আছে, কিরণ তা বুঝিল। বুঝিয়া সমস্ত ব্যাপারখানা আগাগোড়া জানিবার জন্য তার বড় কৌতুহল হইল—কিন্তু কৌতুহল তৃপ্তির এ সময় নয়। তাই সে নিজেকে দমন করিয়া বলিল,—খাও বোন···

লক্ষ্মী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। কিরণ চা খাইল; খাইয়া আবার লক্ষ্মীর কেশের রাশি হাতে লইল।

এই কালো কেশের ঘন তরঙ্গ—গোলাপী মুখখানি বেড়িয়া কি সুষমারই-না সৃষ্টি করিয়াছে!

কেশের জট ছাড়াইয়া সুগন্ধি তৈল আনিয়া কিরণ লক্ষ্মীর কেশে ভালো করিয়া মাখাইয়া দিল—তারপর নিজেও তেল মাখিল। তেল মাখাইয়া লক্ষ্মীকে লইয়া সে স্নান করিতে গেল। স্নানের পর লক্ষ্মীর সিঁথির আগায় ভালো করিয়া সিঁদুর পরাইয়া কিরণ বহুক্ষণ তার মুখখানি ধরিয়া-ধরিয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল, এ যে ভগবতীর মুখ, বোন! তা' বনের মাঝে ও বিপদের মাঝে পড়লে কি করে'?

লক্ষ্মী বলিল,—সব কথা তোমায় বলচি দিদি।

তারপর কিরণের বুকে মুখ রাখিয়া, কখনো থামিয়া, কখনো চোখের জল ফেলিয়া কোনরকমে লক্ষ্মী আপনার কাহিনী আগাগোড়া খুলিয়া বলিল। নদীর ধারে সুখের ঘর, সুখের ঘর-কন্না—স্বামীর প্রেম, মেয়ের ভালোবাসা—এই লইয়া স্বর্গ রচিয়া বসিয়াছিল সে। তারপর কি করিয়া এক দৈত্য আসিয়া দেখা দিল, কি করিয়া তাকে সে ঘর হইতে ছিনাইয়া আনিল, আনিয়া বন্দী করিল—তারপর অত্যাচারের প্রচণ্ড চেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে লক্ষ্মীর অবিরাম সংগ্রাম—শেষে এক ছোটলোক মালীর সাহায্যে কি করিয়া রক্ষা পাইল এবং রক্ষা পাইয়া পলায়ন করিল; অত রাত্রে বনে-জঙ্গলে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত দুই পা টানিয়া সেই পোড়ো-বাড়ীর সামনে পড়িয়াছিল—সেখানেও ঐ উপদ্রব! তারপর দেবী ভগবতীর মতোই কিরণ আসিয়া রক্ষা করিল—দৈত্যটাকে হঠাইয়া দিয়া নিজের বুকের নিরাপদ নীড়ে তাকে তুলিয়া লইয়াছে—সব কথাই সে খুলিয়া বলিল। কিরণ মনোযোগ দিয়া তার কথা শুনিল। শুনিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় পুলকে তার মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—তুমি একটু জিরোও, ভাই। আমি এখনি আসছি।

দুঃস্বপ্নের মতো এই রাজ্যের বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়া কিরণের আশ্রয় পাইয়া লক্ষ্মীর মন তখন নানা চিন্তার গহনে ঘুরিতে লাগিল। যে-মন কোনরূপ আশা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল, সহসা বিপদের আঁধার কাটাইয়া এই আলোর রাজ্যে আসিয়া আবার সে-মন আশার বীণায় মনের তার জুড়িয়া দিল। তার সব চেয়ে বিস্ময় লাগিয়াছিল এই রক্ষাকর্ত্রী আশ্রয়দাত্রীটিকে! বয়স অল্প, রূপে বিদ্যুৎ ঝরিতেছে, বাঙালীর মেয়ে—অথচ গতিতে ভঙ্গীতে কি স্বচ্ছতা, কি সরল শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে! কোথাও এতটুকু চাপল্য নাই, আর লজ্জার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া সঙের মত এ কোথাও চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট খাড়া থাকে না!

সেই যখন পথের মাঝে সে লোকটা বর্বরের মতো তাকে আক্রমণ করিল, তখন অন্য নারী হইলে কি করিত! ভয়ে হয়তো কোথাও পলাইয়া যাইত—আর এ··· ? দীপ্ত তেজে দেবী সিংহবাহিনীর মতোই অসুরটাকে কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া হঠাইয়া তাকে কত-বড় লজ্জা, কতখানি অপমান হইতে রক্ষা করিল! এও বাঙালী মেয়ে! সে-ও বাঙালীর মেয়ে! পুরুষের কুশ্রী ক্ষুধিত দৃষ্টি, জঘন্য কথার সামনে সে কুঁকড়াইয়া সরিয়া নিজেকে যেখানে আরো বিপন্ন করিয়া তোলে, এ সেখানে সে-সব দৃষ্টি আর কথাগুলাকে কি উপেক্ষার ভরেই না দুই পায়ে মাড়াইয়া চলে! ঘরে-বাহিরে নিজের সুন্দর কুণ্ঠাটুকু বজায় রাখিয়া নিজের নারীত্বের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া কিরণ এ কত-বড় বিপদে তাকে কি সহজেই-না রক্ষা করিয়াছে! কৃতজ্ঞতায় কিরণের পায়ে নিজের চিত্তকে সে একেবারে লুণ্ঠিত করিয়া দিল।

কিন্তু, এখন? এর পরে তার পথ কোথায়, গতি কোন্ দিকে ফিরিবে!···ঘরে? ঘরে কি তিনি আছেন? এতগুলা দিন কাটিয়া গেল। লক্ষ্মীকে ঘরে না পাইয়া মন্টি কাঁদিয়া হয়তো মরিয়াই গিয়াছে—আর তিনি?···দুই-দুইটা শোকের ঘায়ে হয় পাগল হইয়াছেন, নয়···

শেষের কথাটা ভাবিতে তার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। না, না, এ হইতেই পারে না! তা যদি হইত, এমন সর্বনাশ যদি ঘটিত, তাহা হইলে শেষকালে এমন আশ্চর্য উপায়ে নিজের নারীত্বকে সে রক্ষা করিয়া আজ এ আলোর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত কি?

কিন্তু এত দিন কাটাইয়া আজ যদি সে ঘরে ফেরে, পাড়ার লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়েছিলে, কার সঙ্গে···কোথায় ছিলে? তখন তাদের সে প্রশ্নের জবাবে···

লক্ষ্মীর গা ছমছম্ করিতে লাগিল। এত-বড় বিপদে এমন রক্ষা পাইবার কথা কে বিশ্বাস করিবে!—আবার পরক্ষণে মনে হইল, তারা না করুক, স্বামী বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু এটুকু সম্বল লইয়া স্বামীর বাহু-পাশে ফিরিয়া স্বামীকে কি সকলের চোখে ঠিক তেমনি ভাবেই তেমনি সম্মানেই সে রাখিতে পারিবে! আড়ালে তারা যদি এ লইয়া তাঁকে বিদ্রূপ করে, টিটকারী দেয়! সে কোন্ ছার,—মহালক্ষ্মী সীতা দেবীকেও রাজ্যের প্রজারা নিন্দা করিয়াছিল, এবং তার ফলে সীতার মতো সতীকেও ভগবান রামচন্দ্র গহন-বনে পাঠাইয়াছিলেন!

এ-সব কথা ভাবিতে গিয়া লক্ষ্মীর সমস্ত ভবিষ্যৎ আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তার জন্য স্বামী লাঞ্ছনা সহিবেন? না—না!—তার চেয়ে যেমন সে হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে সহসা সে-রাত্রে উবিয়া গিয়াছে—তেমনিই জগতের বুক হইতে উবিয়া যাক্!

এমনি চিন্তা করিতে-করিতে নিজেকে এই উবাইয়া দিবার কল্পনাটা তাকে এমন পাইয়া বসিল যে, তার সামনে হইতে আর-সব একেবারে মুছিয়া গেল! মরণ! মরণ! মরণ! চোখের সামনে মরণের কালো পাখা যেন সে মেলানো দেখিল!

কিরণ আসিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া তুলিল, বলিল,—ওঠো তো বোন্—ভাত দিয়েছে।

লক্ষ্মীর তখনো শ্রান্তি ঘোচে নাই! সে কিরণের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—এসো, খাবে এসো।

লক্ষ্মী তার মুখের উপর 'না' বলিতে পারিল না—ঐ স্নেহে ঢলঢল মুখ, ঐ দরদে-ভরা জলজ্বলে দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি! একটি কথাও না বলিয়া সে কিরণের সঙ্গে তার অনুগমন করিল।

উপরে ঘরের সামনেই পাথরে-বাঁধানো দালান। দালানে দু'খানি আসন পাতা, আসনের সাম্‌নে অন্নের পাত্র।

কিরণ বলিল,—হাত ধুয়ে খেতে বসো। খেয়ে-দেয়ে জিরোও। তোমার এখন সাতদিন ঘুমুলে তবে শরীরে জুৎ আসবে।

লক্ষ্মী ভাতের থালার সাম্‌নে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! কত দিন পরে···। এ অন্নের মুখ এ কয়দিন সে চোখেও দেখে নাই! সেই শেষের দিন রঘুনাথ খাইয়া স্কুলে চলিয়া গেল—মন্টি খাওয়া সারিয়া তুলসীতলার কাছে তার খেলার ঘরে বসিয়া খেলা করিতেছিল—দাওয়ায় বসিয়া রঘুনাথের পাতের অন্ন লক্ষ্মী খুঁটিয়া তুলিল; পরে ভাত খাইয়া বাসনের গোছা লইয়া পুকুর-ঘাটে গেল—বাসন মাজিয়া ভিজা এলোচুলের রাশ পিঠে ঝুলাইয়া পুকুর-পাড় ধরিয়া আসিতেছিল, পাশে নারিকেল গাছের সারি—পুকুরে জলের কোলে কচুরী-ঝোপ,—সেই ভুলো কুকুরটা—ছবির মতো সেদিনকার সে-দৃশ্য তার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল। দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল—

কিরণ লক্ষ্মীকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল, বলিল,—ও কি বোন্, কাঁদছো কেন? আর তো কোনো ভয় নেই—

লক্ষ্মী চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কিরণ আদর করিয়া নিজের আঁচলে তার চোখ মুছাইয়া দিল, বলিল,—ছি, কাঁদে কি! খাও—

লক্ষ্মী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—আমার সামনে এই মল্লিকা ফুলের মতো অন্নের রাশ, আর তারা···

কিরণ একটা নিশ্বাস ফেলিল; তারপর সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—তিনি পুরুষমানুষ, কখনই তিনি চুপ ক'রে ব'সে নেই। মেয়ে? তোমার একারই তো মেয়ে নয়, বোন্—তাঁরও তো বটে!···তাছাড়া ধরো, তুমি যদি মরেই যেতে···মেয়েকে তিনি দেখতেন না?

লক্ষ্মীর হাতের ভাত তবুও মুখে উঠিল না। কিরণ আবার বলিল—এমন করলে তো চলবে না, ভাই। বিপদে হা-হুতাশ করলে বিপদ কাটে না, তা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চাই তো! না খেয়ে দুর্বল শরীরে উপায়ই-বা ভাববে কি ক'রে! চোখে খালি ঘুম আসবে, মাথাও একেবারে তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মী কথা কহিল, বলিল,—আমার আর কি হবে আশায়, দিদি? সব মিছে। কোথাকার মানুষ, কোথায় এসে পড়েছি!···এখন মলেই আমি নিশ্চিন্ত হই! আর

কেন—! এ যতই ভাবছি, ততই দেখছি চারিদিকে জট পড়ছে! লক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কিরণ তার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—এতেই তুমি কাতর হয়ে মরতে চাইছো, বোন্! তবু তোমার সব আছে···। আর, আমি? নিজের পায়ে সব হঠিয়ে ঠেলে এখনো বেঁচে আছি! শুধু তাই নয়—বেশ আরামেই বাস করছি, দেখছো তো! এমন সাজানো ঘর, কেতাদুরস্ত সাজ-সজ্জা, বিলাস-ভূষণ···কোনোটাতেই ত্রুটি নেই!···আমার দশায় যদি পড়তে···

কিরণ কথাটা শেষ করিতে পারিল না—কণ্ঠ বাধিয়া গেল। বহু দিনকার হারানো-কথার রাশ আসিয়া প্রাণটার মধ্যে নিমেষে জড়ো হইল! একটু থামিয়া সে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

লক্ষ্মী একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। এত সহজ সরল মানুষটি—যাকে দেখিলে মনে হয়, দুঃখের মুখ ও কখনো দেখে নাই—তার প্রাণের মধ্যেও এত বেদনা লুকানো আছে! সহানুভূতিতে তার চিত্ত ভরিয়া গেল। সে কিরণের পানে চাহিয়া ডাকিল—দিদি···

কিরণ উদাসভাবে আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। অতীতের হারানো-কথাগুলা প্রাণের মধ্যে ঝড়ের রোল জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই ঘর, সেই ঘরে সেই স্নেহ, সেই প্রীতি—তারপর এক দুরাশার বশে কি আলেয়ার পিছনে ছুটিতে গিয়া সব চূরমার হইয়া গেল! নূতন জগতে এ এক নূতন জীবন···! এর কল্পনাও যে মনের কোণে কোনোদিন উঁকি দেয় নাই!

লক্ষ্মী জবাব না পাইয়া ডাকিল,—দিদি—

কিরণের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—ডাক্‌ছো?

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার দুঃখের কথা আমায় বলো, দিদি। আমি ছোট বোন্, তাছাড়া লোকের দুঃখের কথা শুনতে ইচ্ছা করে। আমিও দুঃখী, তাই বুঝি এ সাধ হয়। কথাটা বলিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আবেদনের প্রার্থনা ভরিয়া সে কিরণের পানে চাহিল।

কিরণ বলিল,—বলবো বৈকি, বোন্। স্রোতের মুখে কুটোর মতোই ভেসে বেড়াচ্ছিলুম—তুমি এসে স্নেহের সঙ্গ দিয়ে কাছে দাঁড়িয়েছো আজ! তোমায় বলবো বৈকি! কিন্তু আগে ভাত কটি মুখে দাও।···মরবে কেন? মানুষ হয়েছো, তায় মেয়েমানুষ, সইতে হবেই যে। কাতর হয়ে মরার চেয়ে বিপদের সঙ্গে যোঝায় বেদনার মধ্যেও একটা মস্ত আরাম আছে! সে আরাম আমি ভোগ করেছি—করছিও। আর তুমি মরতে চাইছো!···আজ-বাদে কাল, চলো তোমার দেশে খোঁজ করি—ঠিকানা জানো তো, গাঁয়ের নাম জানো তো—তবে? তুমি নিরাশ হও কোন্ দুঃখে বোন্?

এ-কথায় লক্ষ্মী যেন অকূলে কূল পাইল। তাই তো, সে এমন নিরাশ হইতেছিল কেন! গ্রামের নাম ধরিয়া সন্ধান লইলে সব তো আবার ফিরিয়া পাইবে। রাত্রি—সে তো কাটিয়া গিয়াছে! তা যদি কাটিল তো, এ দিনের আলোয় কি কাল্পনিক ভয়ের আভাস জাগাইয়া সে এমন মুষড়াইয়া পড়িতেছে!

লক্ষ্মী খাইতে বসিল। আহারের পর কিরণ তাহাকে লইয়া ঘরে গেল; বিছানা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল,—একটু ঘুমোও।

লক্ষ্মী বলিল,—না, তোমার কথা বলো দিদি—

কিরণ বলিল,—বলবো'খন। আমি তো পালাচ্ছি না কোথাও!

লক্ষ্মী বলিল,—না, দিদি, বলো—আমায় আরো তোমার বুকের কাছে টেনে নাও।

কিরণ ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—বেশ, তবে শোনো:

এই সহরের বুকেই একটা গলির মধ্যে কিরণের বাপের বাড়ী। এখনো আছে কি না, কে জানে! সেদিকে পা বাড়াইবার কথা মনে হইলে তার সর্ব-শরীর শিহরিয়া ওঠে! তাছাড়া সেখানকার সম্পর্ক···সে তা নিজের হাতে কাটিয়া দিয়া আসিয়াছে!

স্বামীর কথা মনেও পড়ে না! বয়স তখন দশ বৎসর। বাপ গরীব,—দোজবরে বর পাইয়া তার হাতেই কিরণকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়াছে। সেজন্য বাপের উপর রাগ করিবার কিছু নাই, রাগও সে করে নাই কোনোদিন। বেচারা বাপ···কি করেন! ত্রিশের নীচের পাত্রেরা এত বেশী টাকা চাহিয়াছিল যে, ভিটার সঙ্গে হাড় কয়খানা বেচিলেও বাপের পক্ষে তার যোগান দেওয়া অসম্ভব ছিল! কাজেই···কিন্তু সে-কথা যাক্!

বিবাহের পর দুই-তিনবার সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। স্বামীর পাঁচ-ছয়টি ছেলে-মেয়ে—তিনটি তার চেয়েও ডাগর। কাজেই সেখানে থাপ খাইতে দুই-চারি বৎসর সময় লাগিবে,—এমনি আভাস মনে জাগাইয়া স্বামী তাহাকে বাপের ঘরেই ফেলিয়া রাখিলেন! আর সে-দুই-চারি বৎসর কাটিবার পূর্বেই ইহলোকে স্বামীর জীবনের মেয়াদ ফুরাইল—এবং বিবাহের দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই কিরণের সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন।

তার জন্য যে কিরণের মনে কোনো বেদনা জাগিয়াছিল, এ-কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বুঝি, সেই পাপেই আজ—সেই কথাই পরে বলিব।

স্বামী চলিয়া গেলেও যৌবন তার দাবী ছাড়িয়া সরিয়া রহিল না তো! মা-বাপের আদরের মাঝে বৈধব্যের আচার ঠেলিয়া যৌবনের লাবণ্য আসিয়া কিরণকে অপূর্ব ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। সেদিকে কিরণের চোখেও পড়ে নাই। একদিন পড়াইল একজন—তাকে কেন্দ্র করিয়া কিরণের এই নূতন জীবনের সূত্রপাত।

বাপের বাড়ীর ঠিক গায়েই ছিল একটা মাঝারি-গোছ বাড়ী। বাড়ীটা মেরামত হইয়া নবকলেবরে বিদ্যুতের আলোর মালা গলায় দুলাইয়া পাড়ার মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এবং সেই বাড়ীতে বাস করিতে আসিল, কোথাকার এক জমিদারের তরুণ পুত্র, তার কয়জন ভৃত্য লইয়া। জমিদার-পুত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল কলেজে লেখাপড়া করিবার জন্য।

কিন্তু লেখাপড়ার কেতাবে তার চোখের দৃষ্টি কতখানি ঝুঁকিত, কে তার খোঁজ রাখে! জমিদারের তরুণ ক্ষুধিত দৃষ্টি লইয়া পাশের এই জীর্ণ গৃহে কিসের সন্ধান

করিত, তার খবর কিরণ হাড়ে-হাড়ে বুঝিল। তার বয়স তখন ষোল বৎসর। ষোড়শী রূপসীর অঙ্গ বেড়িয়া যে লাবণ্য ঝরিতেছিল, তরুণ নায়ক গোপন অন্তরালে বসিয়া নয়ন দিয়া তাহা পান করিত।

সে-দৃষ্টি তীরের মতো যেদিন কিরণের গায়ে বিঁধিল, সেদিন সে শিহরিয়া সরিয়া গিয়াছিল। সে দৃষ্টির অর্থও সে ঠিক বোঝে নাই; তবে তার মধ্যে কাঁটার মতো কি একটা ছিল, তারি আঘাতে কিরণ বেদনায় কেমন শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর চলিতে-ফিরিতে সে সতর্ক দৃষ্টিতে অন্তরাল হইতে সন্ধান করিত, সে চোখের দৃষ্টি আরও শরনিক্ষেপের জন্য ব্যাধের মতো ওত পাতিয়া কোথাও আছে কি না।

এমনি সতর্ক সন্ধানের মাঝ দিয়া চোখে-চোখে মিলিয়া যে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত, সেই বিদ্যুৎই ক্রমে তার পরশে-শিহরণে অন্তরের বিরাগটাকে মাজিয়া-ঘষিয়া একদিন এমনি পুলক-ছটায় রূপান্তরিত করিল যে, কিরণ তার পরশে মরিল। অর্থাৎ যে দৃষ্টি-পরশকে সে ভয় করিত, যে-দৃষ্টিকে বিরক্ত আর উপেক্ষায় সে জর্জরিত করিয়া দিতে ছাড়ে নাই, সেই দৃষ্টিই একদিন এমন সরস মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিল যে, ওই দৃষ্টিটুকুর জন্য তার প্রাণ অধীর উন্মুখ হইয়া থাকিত। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া সে ভাবিত, কখন আবার দিনের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে ও-বাড়ীর বাতায়নে সেই চোখের দৃষ্টিতে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া তার শুষ্ক মরুর মতো নির্জীব প্রাণে বসন্তের গন্ধ বহিয়া আনিবে! সে-দৃষ্টিতে কি অনুরাগ, কি বেদনা, কি মিনতি যে ঝরিয়া পড়িত!

শেষে একদিন চোখের ভাষা চিঠির গায়ে ভাসিয়া তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আদর-ভরা সোহাগ-ভরা ঠিক যেন গানের মালা! এমন সুরও চিঠির ভাষায় বাজিতে জানে! কিরণের প্রাণটা গন্ধে-বর্ণে ভরিয়া একেবারে মাতাল হইয়া উঠিল! রোজ চিঠি আসিতে লাগিল—হাতের একটা অক্ষর চাহিয়া, একটু স্মৃতি, একটু লেখার পরশ মাগিয়া সে কি আকুল মিনতি! সমস্ত পৃথিবীখানা কিরণের সামনে হইতে উবিয়া গিয়া ঐ এক মিনতির সুরে পাক খাইয়া ফিরিতেছিল। তার মনে হইত, এ পৃথিবীতে মা নাই, বাপ নাই, কেহই নাই, কিছু নাই,—আছে শুধু ঐ প্রাণ-মাতানো সোহাগের সুর! কিরণের মনে হইত, বিশ্বের বাসনা-কামনা তার পায়ে নূপুরের মতো আঁটিয়া শুধু ঐ একটি সুরই বাজাইয়া চলিয়াছে!

কিরণ চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারিল না! রাত্রে সকলে শয়ন করিলে গোপনে উঠিয়া সে কত সতর্ক হইয়া চিঠির জবাব লিখিত! তারপর রাত্রেই—ও-বাড়ির জানালা দিয়া ঝুলানো সুতায় চিঠিখানি গিয়া গোপনে বাঁধিয়া দিত আর ভোরে উঠিয়া দেখিত উঠানের কোণে শিশির-ভেজা দুর্বা-বনে জবাব তার পড়িয়া আছে! সে তার ভোরের পাখী আবার কি বহিয়া আনিল, শুনিবার জন্য কিরণ চিঠি লইয়া অন্তরালে চলিয়া যাইত! একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার চিঠি পড়িয়া বুকের আঁচলে সেটা লুকাইয়া রাখিত—ওরে আমার ভোরের পাখী, এই বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাক্...দিনের আলোয় লোকের ভিড়...কাজের মাঝে অবসর-মত থাকিয়া-থাকিয়া তার সুরে প্রাণ

ভরপুর করিয়া তুলিত! তারপর সেই রাত্রির নিশুতি হওয়ার অপেক্ষায় কি অধৈর্যেই যে কাল কাটিত—কতক্ষণে জবাব লিখিবে! তা মনে হইলে আজো প্রাণটা বেদনায় ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়ে।

একদিন ভোরের পাখী আসিয়া বলিল,—তুমি এসো,—কাছে এসো, বুকে এসো, আমার নিখিল জুড়িয়া বসিবে, এসো—নইলে এ প্রাণ আর রাখিতে পারি না!

এ-সুরে সারাদিন মন এমন আচ্ছন্ন রহিল! না গেলে…সর্বনাশ—সব সুখ জন্মের মতো খোয়াইয়া বসিবে। তার কাছে ঘর-সংসার, বাপ-মা, স্নেহ-মায়া সব মিথ্যা বলিয়া মনে হইল, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই সমস্ত সংসার ছিট্‌কাইয়া সরিয়া গেল। কিরণ জবাব দিল—লইয়া চলো গো!

দুনিয়ায় তখন শুধু প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে—আর সব কোথায় হারাইয়া গিয়াছে! জগতে শুধু এই দুটি প্রাণী, দুইজনের প্রেমে নির্ভর করিয়া কোন্ নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিতে চায়! লোকালয় ছাড়িয়া, সব ছাড়িয়া প্রেমের দায়ে দুইজনে বৈরাগ্য মাগিতে চলিয়াছে!

কিন্তু দুর্যোগ নামিল সেদিন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে! যেমন জল, তেমনি ঝড়। বিদ্যুতের রোষ-রাঙা আঁখির চক্‌মকানি, সঙ্গে-সঙ্গে বাজের তেমনি ভীষণ হুঙ্কার আর গর্জন! ধরণী বুঝি প্রলয়ের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে! সারাক্ষণ কিরণ কি আতঙ্কে কাটাইয়াছিল, সে কেবলই ঠাকুরকে ডাকিয়াছিল,—হে ঠাকুর, আজিকার মতো তোমার প্রলয় থামাইয়া রাখো গো! একবার দুইজনে পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়া হাতে হাত রাখি—তারপর আনো তোমার বিরাট আঁধার, বজ্রের হুঙ্কার, বিদ্যুতের চমক, মৃত্যুর করাল মূর্তি—কোনো ক্ষোভ থাকিবে না প্রভু!

হায়রে, এ তো দুঃখীর দুঃখ-মোচন নয়, অত্যাচারের প্রতিকার নয়—তাই ঠাকুর সে-প্রার্থনা তখনি শুনিলেন! মেঘ-জল দেখিতে-দেখিতে থামিয়া শান্ত হইল—স্নান-সারা পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার শুভ্র হাসি ঝরিয়া পড়িল—আকাশ-বাতাসে এমন একটি স্নিগ্ধ শান্তির দীপ্তি ফুটিল যে, দেখিয়া কিরণের প্রাণ একেবারে বিভোর মুগ্ধ হইয়া গেল!

তারপর আরো রাত্রি হইলে, চারিধার যখন ঘুমের কোলে নিঝুম স্তব্ধ, কিরণ তখন ধীরে-ধীরে আসিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া পথে দাঁড়াইল। জনহীন পথ—শুধু মাঝে-মাঝে আলোর থামগুলা কি একভাবে স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া! কিরণের পা কাঁপিল, গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল—ভয়ে সে আকাশের পানে চাহিল—চাঁদের মুখে কি ও হাসি, যেন বিদ্রূপে-ভরা! সমস্ত নিশীথ-আকাশ তার এ নির্লজ্জ অভিসার-যাত্রা দেখিয়া একটা টিটকারীর হাসি হাসিতেছে যেন! কিরণের মনে হইল, এ কি করিতেছে সে? এই যে গৃহের দ্বার মাড়াইয়া বাহিরে আসিল, এ দ্বার যদি চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া যায়। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—না, ফিরি…

ফিরিবার জন্য পা উঠাইয়াছে, এমন সময় সে আসিয়া হাত ধরিল, ডাকিল,—এসো!

অমনি তার সব চিন্তা সে-সুরের তলায় কোথায় যে মুছিয়া গেল! সে স্পর্শে জড়

বাহিরের বিশ্ব ঢাকিয়া গেল,—কিরণ চেতনা হারাইয়া তার হাতে হাত রাখিয়া খানিকটা পথ গিয়া একখানা গাড়ীতে উঠিল। প্রাণের মধ্যে একটা কাঁপন চলিয়াছিল, তারি দোলায় একটা কথা ভাসিতেছিল, ও-দ্বার যদি বন্ধ হয়? যদি··· ? কিন্তু এই হাতের পরশ হইতে তার স্বর্গ নামিয়া আসিতেছে! সে ভাবিল, ও-ঘর বন্ধ হয়···হোক! তারপর গাড়ী যখন রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া পথ সচকিত করিয়া সশব্দে ছুট দিল, তখন কিরণের হঠাৎ মনে হইল, যেন তার সে স্তব্ধ বাড়ীটা বুক ফাটাইয়া তীব্র আর্তনাদ তুলিয়া তাকে ডাকিতেছে,—ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়!

হায়রে, সে-সোহাগ, সে-আদর ঠেলিয়া ফেরা কি যায়! কিরণ ফিরিতে পারিল না গাড়ী গিয়া একটা বাগানে ঢুকিল। বাগানের মধ্যে বাড়ী। তারি পাথর-বাঁধানো সিঁড়ির নীচে গাড়ী থামিতে সে আদর করিয়া কিরণকে নামাইল; তাকে বুকে করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেল। তারপর অধরে অনুরাগের প্রথম পরশ—কিরণ বিহ্বল বিবশ হইয়া চোখ বুজিল!

কি স্বপ্নের মাঝ দিয়াই তারপর কাটিল যে তার দিন আর রাত্রিগুলো! বাড়ীর কথা এক-একবার মনে হইত, কি কান্না, কি শোক সেখানটাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! অমনি সে নিশ্বাস চাপিয়া সেদিক হইতে মনকে সরাইয়া আনিত! এই আলো, হাসি, গান আর সুর, জীবনে আর কিছু নাই! মর্ত্যে নন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে যে!

কিন্তু এ-স্বপ্নও ভাঙিল। ছয়মাস না কাটিতে তরুণ প্রমোদ-কুঞ্জে দুর্লভ হইয়া উঠিল। অধীর প্রাণে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কিরণের কয়দিন কয়রাত্রি কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল! জ্যোৎস্না রাতে বাতায়নে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে সে প্রতীক্ষায় থাকিত, কখন আসিবে সে···জ্যোৎস্না সারারাত্রি আকাশের আসরে বিচিত্র তালে নাচিয়া রাত্রিশেষে ম্লান চোখে শ্রান্ত দেহ এলাইয়া সরিয়া যাইত—তার তখন চমক ভাঙিত, তাই তো, সারা রাত্রি বাতায়নে জাগিয়া কাটিল! সে তো আসিল না! ···শেষে খবর আসিল, তরুণের নেশা কাটিয়াছে, এখন নূতন ফুলে নূতন মধুপানে বিভোর সে।

নিমেষে কিরণ বুঝিল, সে কি বেশে এখানে আসিয়া তার সর্বস্ব দিয়া কি ভাবেই না নিজেকে রিক্ত নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে! নারীর নারীত্ব···একটা ইতরের ছলনায় ভুলিয়া এমন হেলায় সে হারাইয়া বসিয়াছে! নেশায় মাতিয়া সে এ কি করিয়াছে! প্রাণের মধ্যে আলো জ্বালিতে গিয়া তারি তীব্র শিখায় প্রাণটাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছে! ফুল বলিয়া যাকে সে মাথায় তুলিয়াছিল, সে তো ফুল নয়—সাপ, বিষধর সাপ! নিজের সর্বনাশ সে নিজে করিয়াছে, প্রাণ দিয়া, সর্বস্ব দিয়া! আজ সে জগতের বুকে পড়িয়া আছে, দীন, রিক্ত, সর্বহারা! শুধু তাই নয়, মাথায় যে পশরা ধরিয়াছে আজ···

ক্ষোভে অনুশোচনায় কিরণ পাগল হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই দুই চোখ উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলি! এই রূপ, এই যৌবন, এই দেহ—যারা অমন চক্রান্ত করিয়া তার নারীত্বটাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া থেঁৎলাইয়া চুরমার করিয়া দিল, সেই রূপ, সেই যৌবন,

সেই দেহটাকে ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে! নিজের উপর এমন রাগ ধরিল যে, সে মরিবে বলিয়া ছাদে উঠিল। তখন সন্ধ্যার আকাশ অপূর্ব রক্তরাগে উজ্জ্বল! ঝাঁপ দিবে, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, সে-ই তো গেল—কিন্তু যে তার এ সর্বনাশ করিল, সেই ঠক, প্রতারক, ভণ্ড, তার তো কিছু হইল না! সে পরম আরামে নিশ্চিন্ত সুখে তার সেই চিরদিনকার জগতের বুকে তেমনি অনায়াসে, তেমনি নিঃসঙ্কোচে ঘুরিয়া বেড়াইবে!···তাকে যদি আজ সামনে পাওয়া যাইত, ওঃ!

কিন্তু না,—মিছা এ রাগ। সে তো হাত ধরিয়া এ-পথে তাকে টানিয়া আনে নাই! কিরণ নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে চিঠি লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল? বলুক—কেন কিরণ তখন তার মুখের উপর ঘৃণার চাবুক মারিয়া বলে নাই, কে তুমি ভুলাইতে চাও আমায় এমন ছলনায়! কথার কুহকে ভুলাইয়া বাহিরে ডাকো! যখন সে হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, এসো, কেন সে তখন তার মুখের উপর তীব্র হুঙ্কারে বলিয়া উঠিল না,—যে, না, আমি যাইব না। ইচ্ছা করিয়া বিপথে আসিয়া পরকে আজ চোখ রাঙানো? এ শুধু নিজেকে প্রতারণা করা। তার মনে এ সাধ জাগিয়াছিল। বাহিরের ডাকের জন্য সে উন্মুখ অধীর ছিল, তাই তো আজ ঘর-ছাড়া, সব-ছাড়া পথের মানুষ সে! যেদিন প্রথম সে চোখের দৃষ্টি তার গায়ে তীরের মতো বিঁধিয়াছিল, সেই দিনই কেন সে তাকে দুইহাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিয়া দূর করিয়া দেয় নাই? আজ সে ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া নিজেকে সব দোষে খালাস রাখিয়া, যত দোষ তার ঘাড়েই চাপাইতে চলিয়াছে—বটে!

কিরণ মরিবে না। সে স্থির করিল, মরা হইবে না। যে-মন অমন পরের ছলনায় ভুলাইয়া তার নারীত্বের অপমান করিয়াছে, সমস্ত জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, সেই মনটাকে মাজিয়া সাফ করিয়া ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিবে সে!

কাজের মাঝে ভুলাইয়া খাটাইয়া তাকে দিয়া এ আরাম, এ বিলাসের প্রায়শ্চিত্ত করাইবে সে।

গহনা-পত্র ও টাকাকড়ি তরুণ নায়ক তার পায়ে রাশীকৃত জমা করিয়াছিল। স্যাকরা ডাকাইয়া কিরণ সে-সব বিক্রয় করিল। টাকা খরচ করিয়া বহু তীর্থে সে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু প্রাণের মধ্যে স্মৃতির জ্বালা আর থামিতে চায় না! ঠাকুর দেখিয়াও থামে না, সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলা গায়ে মাখিয়াও সে-জ্বালা জুড়াইতে চায় না! বিষাক্ত হইয়া সে আবার সহরে আসিল। মনকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে, তবু সেই স্মৃতির জ্বালা! শেষে সে ঠিক করিল, সে থিয়েটারে ঢুকিবে, অভিনেত্রী হইবে। ঐ পথেই শুধু নিজেকে ভোলা যায়! আজ রাণী সাজিয়া, কাল দাসী সাজিয়া সেই রাণী-দাসীর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সে ডুবাইয়া দিবে। নানা চরিত্রের ভূমিকার মাঝে আপনাকে যদি ভোলা যায়।

কিরণ থিয়েটারে ঢুকিল। অল্প দিনেই তার খ্যাতি চারিদিকে রটিয়া গেল। বাপের-দেওয়া নামটা সে চিরকালের জন্য ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়াছে—সে আদরের

নামটার অপমান আর না হয়! সে-নামের কথা মনে হইলে কিরণ ভাবে, সে মরিয়াছে। কিরণ······সে এক সম্পূর্ণ নূতন লোক।

পয়সার এখন তার অভাব নাই! সে-পয়সায় নিজে সে ভদ্রভাবেই বাস করিতে চায়। তার এ পয়সা শুধু নিজের পিছনেই ব্যয় করে না। কেহ আসিয়া দুঃখ জানাইলে কিরণ তাহা ঘুচাইতে সাধ্য-মতো প্রয়াস পায়। তবে উৎপাতও যে না ঘটে, এমন নয়! থিয়েটারে ঢুকিবার পর সেখানকার ম্যানেজার হইতে ছোট এ্যাক্টররা অবধি তার ভালোবাসার কাঙাল হইয়া পায়ের কাছে কতবার নতজানু হইয়া পড়িয়াছে! কঠিন দৃষ্টি আর তীব্র ভর্ৎসনায় তাদের সে সাফ বুঝাইয়া দিয়াছে, এ শক্ত কাঠ, এখানে রসের আশায় হাত পাতিলে কোনোদিন সে-আশা মিটিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল দুঃখ পাওয়া সার হইবে। কত তরুণ আসিয়া ভিখারীর সুরে বলিয়াছে,—একটু ভালোবাসা দাও, কিরণ—!

কিরণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাদের মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, পুরুষমানুষ ভালোবাসার ধারও ধারে না, আর, পুরুষমানুষকে সে চিরদিন ঘৃণা করে। তাদের ভালোবাসার কথা মনে হইলে তার সমস্ত গা ঘৃণায় ভরিয়া ওঠে! একটা পথের কুকুরকেও সে ভালোবাসিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরুষমানুষ?···কুকুরের অধম, ভণ্ড, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ···।

কিরণ বলিল—আজ এই অবধি থাক্—আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! সে-সব কথা মনে হলে' আজো আমার বুকের মধ্যে রক্ত যেন নেচে ওঠে!

লক্ষ্মী বলিল,—থাক্ দিদি। তোমার কথা শুনে আমি শুধু অবাক হয়ে গেছি; এত ঝড় তোমার মাথার ওপ্র দিয়ে গেছে—আর তুমি এমন হাসি-মুখে আছো!

কিরণ বলিল,—কি করবো বোন্! যা গেছে, তা তো গেছেই, তার জন্য হা-হুতাশ ক'রে ফল কি! বরং তা থেকে যা শিক্ষা হয়েছে, সেটুকু মাথায় রেখে যা বাকী আছে, সেইটুকুর মধ্যে যাতে বিষের ছোঁয়াচ না লাগে, বাচিয়ে চলাই ভালো নয় কি?

লক্ষ্মী বলিল,—আমার কি মনে হচ্ছে, জানো দিদি?

কিরণ বলিল,—কি?

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার মা-বাপ, ভাই-বোন, তাঁরা কেমন আছেন—তাঁদের দেখা দাও···

কিরণ চুপ করিয়া রহিল, পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তাঁদের কাছে গিয়ে দাড়াবার উপায় যে নেই, ভাই! তাঁদের দোরে সমাজ কড়া পাহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমায় সে-ধারের কানাচে দেখতে পেলে সে অমনি তার প্রচণ্ড লাঠি আমার গরীব বাপ-মা'র মাথায় বসিয়ে দেবে! তারপর একটু হাসিয়া আবার বলিল,—তাছাড়া বাপ আমার এমন তেজী যে, অনাহারে পরের দোরে ভিক্ষাও যদি করতে হয় তা করবেন, তবু আমার আছে সে-কষ্ট কখনো জানাতে আসবেন না! তাই ভাবি, বোন, কি বরাত আমাদের, এ বাঙলা দেশে, মেয়েমানুষের! একটা ভুল, ভুল বৈকি—দৈবাৎ

যদি ক'রে ফেলি তো তার যত-বড় প্রায়শ্চিত্তই করতে চাই না—সে-ভুলের মার্জনাও নেই আমাদের সমাজে!

কিরণের দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলিতেছিল। লক্ষ্মী তার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ উদাসভাবে চাহিয়া থাকিবার পর কিরণ কহিল,—ভাবছি, এই তো একটা মস্ত সুযোগ হাতে এসেছে। তোমায় যদি তোমার স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারি, তাতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না! সতী-সাধ্বী তুমি, তোমার সুখের ঘরে যদি তোমায় বসিয়ে দিতে পারি তোমার স্বামীর পাশে, তোমার মেয়ের পাশে···

বলিতে-বলিতে কিরণের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এক ফুলে-ভরা কুঞ্জ! সেই কুঞ্জে ছায়া-করা গাছের তলায় বেদীর উপর বসিয়া লক্ষ্মী একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে তার হৃদয়-দেবতার জন্য···মুখে উৎকণ্ঠার ভাব—আশার রঙীন ছাপটুকু তবু লাগিয়া আছে! তারপর রঘুনাথ আসিল মেয়ের হাত ধরিয়া! দুইজনের চোখে-চোখে মিলিল। কিরণ দুইজনের হাতে হাত মিলাইয়া দিল! লক্ষ্মীর হাতে-গাঁথা মালা স্বামীকে মেয়েকে কি নিবিড় ডোরে বাঁধিয়া ফেলিল! অমনি ওদিকে আকাশ হইতে ঝর-ঝর পুষ্পবৃষ্টি হইল! এ দৃশ্যের উজ্জ্বলতায় তার মনের মধ্যটা অবধি আলোয় আলো হইয়া গেল—দুই চোখে তার দীপ্তি প্রতিবিম্বিত হইল। লক্ষ্মী তখনো তেমনি মূক নির্বাক দৃষ্টিতে কিরণের পানে চাহিয়া!

হঠাৎ কিরণ লক্ষ্মীকে বুকের কাছে টানিয়া তার মুখে চুম্বন করিল। আদরে সোহাগে তাকে ডুবাইয়া দিয়া বলিল,—সতী-লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, তোমার পায়ের ধুলোয় আমার মন পরিষ্কার ক'রে দাও···বলিয়া তীব্র উচ্ছ্বাসের ভরে সে একেবারে লক্ষ্মীর পায়ে হাত দিয়া সে-হাত নিজের মাথায় ছোঁয়াইল।

লক্ষ্মী তার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল,—ও কি করো দিদি! আমি তোমার ছোট বোন্ যে—ওতে আমার অকল্যাণ হবে!

—না, না, না,—কিরণ অধীর উচ্ছ্বাসে বলিল,—না, বয়সের উপরেও যার আসন চিরদিন, নারীর মন, নারীর দেহ—তা যে কি উঁচুতে রেখেছো এত বিপদের মাঝেও, সে তুমি বুঝছো না তো! এ যে বড় পবিত্র জিনিস, ভাই,—এই নারীর মন! কারো ছোঁয়াচ লাগাতে নেই এতে···বাহিরে নয়, চিন্তাতেও নয়!···একে তুমি নির্মল রেখেছো ···তোমার ঐ দীনতা ভেদ ক'রে কি মহিমা জাগিয়ে রেখেছো—

কিরণ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। তাকে লইয়া এ কি ছেলেমানুষি কিরণের! সে বলিল,—তোমার কোনো দোষ নেই, দিদি। তুমি যে কিছুই পাওনি। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হলো, তাঁকে মনের মধ্যে বরণ ক'রে নেবার সময় হলো কৈ!···তারপর যাকে মনের আসনে দেবতা ক'রে বসালে, সে যদি ছলনা ক'রে চলে যায়, তাতে তোমার দোষ কি!···তাকেই তো তুমি তোমার এক, তোমার সর্বস্ব বুঝেছিলে, তাই তো তাকে নারীর মনের আসনে বসিয়েছিলে আদর ক'রে! তবে···?

হঠাৎ এত-বড় কথাগুলা তার মুখ দিয়া বাহির হইতে লক্ষ্মী নিজেই অবাক হইয়া

গেল। এ-সব কথা এমন ভাবেও যে তার মুখে ফুটিতে পারে, এ তার কোনো দিনই মনে হয় নাই। অমনি তার মনে হইল, ঘর-ছাড়া এই বিপদের মাঝে তার মন এতখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, সে অতি-ছোট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরের অনেকখানিকে আমল দিবার অধিকার পাইয়াছে!

কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না; দাসী আসিয়া খবর দিল, ভুলো পলাশডাঙায় যাইবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছে—কোনো চিঠি যদি দিবার থাকে তো দাও।

কিরণ তখন লক্ষ্মীকে লইয়া চিঠি লেখাইতে বসিল। পাঁচখানা ছিঁড়িয়া ছয়ের খানা একরকম পছন্দ-সই হইল। কিরণের কথায় লক্ষ্মী লিখিল:

শ্রীচরণেষু—

নানা বিপদ কাটাইয়া এখানে দিদির আশ্রয়ে পৌঁছিয়াছি। চিঠি পাইয়া তুমি এই লোকের সঙ্গে মন্টিকে লইয়া আসিবে। দেখা হইলে সব কথা বলিব। আমার জন্য ভাবিও না। ইতি—

তোমার চরণাশ্রিতা লক্ষ্মী।

তারপর চিঠির তলায় কিরণ তার বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিল।

লেখা হইলে খামে রঘুনাথের নাম লিখিয়া ভুলো-ভৃত্যকে লক্ষ্মী সাধ্যমত গ্রামের ঠিকানা বুঝাইয়া দিলে, কিরণ তাকে বলিল,—তুই একখানা ট্যাক্সি নিয়েই যা! লোককে জিজ্ঞাসা করলে গাঁয়ের খোঁজ পাওয়া শক্ত হবে না।

ভুলো দরদী ভৃত্য, বিশ্বাসী; এবং পশ্চিমী হইলেও বেকুব নয়। সে চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। কিরণ বলিল,—এসো বোন, আমায় একটু লেখাপড়া করতে হবে এখন! থিয়েটার আছে—যেটা সাজতে হবে, সেটা একবার দেখে-শুনে নিই।

কিরণ উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। এইটা তার লেখাপড়া করিবার ঘর। এইখানেই সে তার ভূমিকার কায়দা-কানুন বুঝিয়া শিক্ষা করে। ঘরে প্রকাণ্ড একখানা আয়না; তাছাড়া টেবিল, চেয়ার, একটা কৌচ এবং তক্তপোষও আছে। কিরণ আসিয়া ঘরের দ্বার ভেজাইয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল, আর লক্ষ্মী তার পানে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পূর্বে ভুলো ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে-বাড়ী আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আর পাড়ার লোকেরা বলিল যে, রঘুনাথবাবু ছোট মেয়েটিকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন সে-সন্ধান কেহই দিতে পারিল না।

শুনিয়া লক্ষ্মীর মাথা ঘুরিয়া গেল। উপায়…? তার চোখের সামনে যে পৃথিবী একটু আগে বেশ শান্ত মূর্তি ধরিয়া অপূর্ব রঙে রাঙাইয়া উঠিতেছিল, সেটা আবার সহসা তার রঙ বদলাইয়া ভীষণ কালো মূর্তি ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে সুরু করিয়া দিল! দুই চোখে আঁধার ভরিয়া সে ডাকিল,—দিদি…

কিরণ বলিল,—ভয় নেই, বোন্, ভেবো না। তাঁকে পাবেই। খবরের কাগজে আমরা ছাপিয়ে দেবো যে, তুমি এখানে আছো। তোমার সিঁথির সিঁদুরের জোর

কি কম! ওরি জোরে তাঁকে আমরা আনবোই। মোদ্দা তুমি অমন মুষড়ে থেকো না—বুক বাঁধো! সতী লক্ষ্মীর এয়োতির জোর সামান্য নয়!

এ কথাগুলো তড়িৎ-প্রবাহের মতো লক্ষ্মীর শিরায়-শিরায় বহিয়া গেল! লক্ষ্মী গুম্ হইয়া রহিল। জোর করিয়া মনকে সে স্থির করিল, মনকে বলিল, ভয় নাই, তাঁকে পাইব! কিন্তু খবরের কাগজ! তাহাতে ছাপা হইবে এত-বড় লজ্জার কথা! না, না! সে বলিল,—খবরের কাগজে আর কিছু লিখো না!···কিরণ বলিল,—তাই হবে।

রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়াই যে কত পথ অতিক্রম করিল, তার ঠিকানা নাই! শেষে হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। মন্টি ক্ষুধায় কাতর হইলে রঘুনাথ দুই চোখে আঁধার দেখিল। মন্টি আর চলিতে পারিতেছিল না। পথের ধারে গাছতলায় সে শুইয়া পড়িল। রঘুনাথ বসিয়া তার পানে চাহিল। সে ভাবিতেছিল, মন্টি যদি মরিয়া যায়? বেশ হয়! তারও শৃঙ্খল কাটে! এ অনিশ্চিতের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ানোরও অবসান হয়! সেও তাহা হইলে মন্টির পিছনে তার অনুসরণ করে!

শীর্ণ-কণ্ঠে মন্টি ডাকিল,—বাবা—

রঘুনাথ সস্নেহে কহিল,—কেন মা?

মন্টি কহিল,—বড্ড খিদে পেয়েছে বাবা!

রঘুনাথ কোনো জবাব দিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ চোখে মন্টির কাতর মুখের পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

সেদিন কি একটা যোগ ছিল। দলে-দলে পল্লী-নারীরা স্নানের বেশে পথে চলিয়াছিল। রঘুনাথ হঠাৎ কি মনে করিয়া রমণীদের সাম্‌নে দাঁড়াইল, ডাকিল—মা···

একজন বর্ষীয়সী রমণী তাহার পানে চাহিলেন। রঘুনাথ অতিকষ্টে নিবেদন করিল যে, দারুণ বিপদে তারা ঘর-ছাড়া; মেয়েটা ক্ষুধায় মরিয়া যাইতে বসিয়াছে, হাতে তার পয়সা নাই। যদি দয়া করিয়া···বর্ষীয়সী গাছতলায় মন্টির পানে চাহিলেন। আঁচলে কয়টা পয়সা ছিল, রঘুনাথের হাতে দিয়া বলিলেন,—এই নাও বাবা···

একজন তরুণী ঘোমটার আড়ালে বর্ষীয়সীকে কি বলিল; শুনিয়া বর্ষীয়সী বলিলেন,—কিছু কিনে ওকে খাওয়াও। তারপর আমরা এই পথেই তো ফিরবো চান করে'! আমাদের সঙ্গে এসো তখন—মেয়ের মুখে ভাতও একমুঠো তাহলে' দেওয়া হবে। হাতে তো পয়সা আর নেই···এতে কি হবে বাবা দু'জনের?

রঘুনাথের চোখে জল আসিল। হায়রে, সে আজ পথের ভিখারী! এ'ও তার অদৃষ্টে ছিল!···পরক্ষণেই সে ভাবিল, দেখা যাক্, এর পর অদৃষ্টে আরো কি আছে! অদৃষ্টের স্রোতেই সে গা ভাসাইয়া দিবে। তারপর লক্ষ্মীর দেখা মেলে কোনোদিন, সেদিন তার কোলে শ্রান্ত শির রাখিয়া বলিতে পারিবে, ওগো

প্রেয়সী, ঐশ্বর্যে তোমায় মুড়িয়া দিতে পারি নাই, প্রাচুর্যের সুখে তোমায় কোনোদিন সুখী করিতে পারি নাই, তবু তোমার প্রেমে ভিখারী সাজিয়াছি··· লক্ষ্মী, প্রাণের প্রেয়সী আমার—

কিন্তু লক্ষ্মীকে যে পাওয়া যাইবেই, তার কি আশা আছে—!

মন্টি ডাকিল,—বাবা—

রঘুনাথের চমক ভাঙিল। সে বলিল,—তুমি একটু শুয়ে থাকো, মা! আমি খাবার কিনে আনি। বলিয়া সে উঠিল এবং খানিকটা আগাইয়া গিয়া একটা খাবারের দোকান দেখিল। খাবার কিনিয়া আনিয়া মন্টির কাছে রাখিয়া সে বলিল,—খাও মা।

মন্টি বলিল,—তুমি খাও, তবে আমি খাবো।

আবার সেই কথা! ওরে, এ কতটুকু—! তবু তাকে খাইতে হইল। মন্টি না খাইলে খাইবে না! খাওয়া শেষ করিয়া রঘুনাথ সেইখানেই বসিয়া রহিল। সেই মমতাময়ী যে-কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁর সে-কথা ঠেলা ঠিক হইবে না। তাঁর মমতার তাহাতে অপমান হইবে!

স্নান সারিয়া তাঁরা আবার এই পথেই আসিলেন। রঘুনাথকে বলিলেন,— এসো বাবা—

রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

একটা কোঠাবাড়ী। বাড়ীর কর্তা বৃদ্ধ—এককালে ভালো চাকরি করিতেন, এখন পেন্সন পাইয়া বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইল। রঘুনাথও তাঁর মমতায় গলিয়া নিজের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন।

রঘুনাথ বলিল,—বড্ড খারাপ দেখাবে। সমস্ত দেশের বুকে এ-কথা একেবারে—

শুনিয়া কর্তা বলিলেন,—একটু অন্য-রকমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্ তবে—

রঘুনাথ বলিল,—না থাক্।

তারপর মনে হইল, যদি লক্ষ্মীকে সত্যই কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এত বড় অপমান, এত-বড় লজ্জার উপর এ ব্যাপারটা তাকে একেবারে কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিবে! তাছাড়া লক্ষ্মী কেমন করিয়া সে-কাগজ দেখিবে! দেখিলেও সে অবলা নারী···ঘরের বাহিরে যে-মস্ত জগৎ, তার কাছে তা একেবারে অচেনা! কেমন করিয়া সে তার জবাব দিবে, কেমন করিয়াই বা আসিয়া তার কাছে উপস্থিত হইবে! তার কোনো সম্ভাবনাই নাই! মাঝ হইতে একটা ঘৃণিত কুৎসার পাঁকে রঘুনাথ তাহাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া ধরিবে!

কাজেই রঘুনাথ এ-কথায় রাজী হইল না।

আহারাদির পর সে আবার বাহির হইবার জন্য উঠিল। কর্তা বলিলেন,— একটু জিরিয়ে নিন্—পথে বেরুতে হবে জানি; তবু···

না। রঘুনাথ ভাবিল, বাহিরে থাকাই চাই এখন। যদি পথে দেখা মেলে! এখানে এই প্রাচীর-ঘেরা বদ্ধ বাড়ীর মাঝে···সে-কথা ভাবিতে গেলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

থাকা হইল না। রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া আবার পথে বাহির হইল। বিধাতা তার সুখের ঘর ভাঙিয়া আজ যদি তাকে পথের পথিকই করিয়াছেন, তবে সে সেই পথকেই সম্বল করিয়া ঘুরিবে ফিরিবে। লক্ষ্মীকে যদি কোনোদিন পাওয়া যায়, তবেই আবার ঘরের কথা ভাবিবে, নইলে এই পথই তার সার।

এমনি পথে-পথে ঘুরিতে-ঘুরিতে একদিন সে নির্জন তরুবীথি ছাড়িয়া একেবারে সুপ্রশস্ত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। এ এক নূতন রাজ্য। এখানে লোক শুধু ছুটিয়াছে, অধীর আগ্রহে কিসের পিছনে কে জানে! এ-পথে কেহ একদণ্ড দাঁড়ায় না,—চলিয়াছে, কেবলি চলিয়াছে! পথের পাশে তৃষিত-চোখে কাতর মুখে কে দাঁড়াইয়া আছে, তার পানে ফিরিয়া দেখিতে কাহারো আগ্রহ জাগে না, ফিরিয়া চাহিবার সময়ও নাই! এ কি ব্যস্ত-চঞ্চল ভাব—চারিদিকে। এই লোকের মেলায়, এই ইট-কাঠ-পাথরে মোড়া সহরের বুকে সে আসিয়াছে, তার লক্ষ্মীর খোঁজে! এ বিষম হট্টগোলে কোথায় পড়িয়া আছে সে বেচারী তার সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সরম আর কুণ্ঠা লইয়া কোন্ নিরালা কোণে···!

এখানে তার লক্ষ্মীর খোঁজ পাওয়া···এ যে আকাশে ফুল ফুটাইবার দুরাশা!

গাড়ীর পর গাড়ী, লোকের পর লোক—কি ভিড়! এ-ভিড় দেখিয়া মন্টি রঘুনাথের হাত চাপিয়া ধরিল; তার বড় ভয় হইতেছিল, যদি তার হাত ছিটকাইয়া সে দূরে সরিয়া পড়ে! রঘুনাথও ভয় পাইল, এ-ভিড়ে তার মন্টিকে ঠিক পাশটিতে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে তো!

তারপরে সুরু হইল পাগলের মত নিরুদ্দেশ ঘোরা-ফেরা! কখনো একটা আশার খেই ধরিয়া সে ছোটে গঙ্গার তীরে···আবার কখনো-বা ঘুরিয়া বেড়ায় এ-পথে ও-পথে—নানা-পথে! এই লোকজনের ভিড়ে এত লোক চলিয়াছে যে, তার আর সংখ্যা হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কি বলিতে পারে না, তার লক্ষ্মীকে কোথাও দেখিয়াছে কি না!

এ জন-তরঙ্গে আশার মাত্রা সহসা বাড়িয়া প্রাণটায় এমনি আবেগ আর উৎসাহ জাগাইয়া তোলে যে, রঘুনাথের হুঁশ থাকে না, মন্টি তার সঙ্গে আছে··· আর, নিজের না হোক, মন্টি তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যায় নাই! কেবলি মনে হয়, এই ভিড়ে তাকে পাইবই···ঐ না, ঘোমটা-মুখে নারীর দল স্নানে নামিয়াছে, উহার মধ্যে ঐ লাল সাড়ী পরিয়া—ও লক্ষ্মী···না?···সে আগাইয়া যায়···কিন্তু হায়রে, কল্পনা শুধু ছলনায় তাহাকে ঘুরাইয়া মারে! সব মিছা হয়!

দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে মুস্কিল বাধিল এই যে, এত ভিড় থাকিলে কি হয়, ভিক্ষা এখানে মেলে না! তার উপর রাত্রিটাও যে কোথাও পথে পড়িয়া

কাটাইবে, তাতেও মুস্কিল! পুলিশ এখানে চোরের পিছনে যত না ছুটুক, নিরাশ্রয় গৃহহীন বেচারাকে পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে বীরদর্পে লাঠি তুলিয়া তার পিছনে ধাওয়া করিয়া তাকে তাড়াইয়া দেয়। ঘর তো নাই-ই, এখানে পথও পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যায়।

এমনিভাবে মাসখানেক কাটিতে চলিল। রঘুনাথ গঙ্গার ঘাটে এক ব্রাহ্মণের কাছে আশ্রয় লইল। সে বেচারা কিছুদিন পূর্বে একটিমাত্র মেয়েকে হারাইয়া তার বিগ্রহের মূর্তিটিকেই আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিল। মন্টিকে দেখিবামাত্র তার প্রাণে এমন মায়া হইল যে, সে আর তাদের ছাড়িতে চায় না। রঘুনাথ তার মমতায় গলিয়া দুঃখের কাহিনী তাহাকে খুলিয়া বলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সান্ত্বনা দিয়া বলিল,— ঠাকুরকে ধরে' পড়ে থাকো, তাঁর অদেয় কি আছে!

রঘুনাথের মন এ-সান্ত্বনা গ্রহণ করিতে পারিল না। এই তো এক মাস ধরিয়া ঠাকুরকে সে প্রাণপণে ডাকিয়া আসিয়াছে, ঠাকুর তো কোনো সাড়া দিলেন না। রঘুনাথ সহসা ভাবিল, এর চেয়ে যদি দেশের সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে হয়তো-বা এতদিনে কোনো হদিশ মিলিত। ব্রাহ্মণকে সে জবাব দিল,—তা কৈ হয় ভাই? এই তো তুমি ঠাকুরকে ধরে' পড়ে' আছো, অথচ তোমার শেষ সম্বলটুকুও ছিনিয়ে নিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল,—সময়-সময় মনে হয় এ কথা!···কিন্তু আবার ভাবি, মেয়েটার ভাবনায় ভারী বিব্রত থাকতুম। কোনো কুলে কেউ নেই, শুধু ঐটুকুই ছিল। যদি ওটার বিয়ে দেবার আগে মরে যাই, তাহলে মেয়েটার কি হবে! কার কাছে যাবে, কে দেখবে—এমনি ভাবনায় পাগল হবো, এমনও মনে হতো! ব্রাহ্মণ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—তাই ঠাকুর ভাবনার বোঝা সরিয়ে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করে' দিলেন।

রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই সরল ব্রাহ্মণ অত-বড় শোকের মধ্যেও কি সান্ত্বনারই সৃষ্টি করিয়াছে! বুকটার মধ্যে শোকের পাথর বলিলেও চলে, কিন্তু বাহিরে তার একটুকু চিহ্ন নাই। চকিতে অমনি এত বড় সহরখানা তার চোখের সাম্‌নে হইতে তার সমস্ত হট্টগোল, বিলাস আর ঐশ্বর্য-সমেত কোথায় সরিয়া গেল, শুধু জাগিয়া রহিল এই গঙ্গার তীরের এই ছোট্ট ভাঙা ঘরখানিতে ঐ ছোট্ট বিগ্রহটুকুকে লইয়া ধৈর্যের এক বিশাল মহিমা।

ব্রাহ্মণ বলিল,—মিছে ভাবা, ভাই। যদি পাবার হয়, তাঁকে পাবেই। আর কি চেষ্টাই-বা করবে, বলো! তার চেয়ে আমার এখানেই থাকো। কাজ-কর্ম করতে চাও, করো,—কিন্তু তোমার মেয়ের ভার আমার। আমার রানু-মা গেছে, আর এখন পেয়েছি আমার এই নূতন মা, মন্টি-মা।

রঘুনাথ বলিল, একটা কথা মনে হচ্ছে। মন্টি তোমার কাছে ভালোই থাকবে। দু'দিনের জন্যে, ভাবছি, একবার বাড়ীর দিকে ঘুরে আসি···

পাছে নিরাশা কোনো দিক দিয়া আঘাত করে, এই ভয়ে রঘুনাথ কারণটা খুলিয়া বলিল না—বলিবার সাহস হইল না।

ব্রাহ্মণ কৃপানাথ প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল। সে-দৃষ্টির সামনে রঘুনাথ কম্পিত-স্বরে বলিয়া ফেলিল—যদি—

কৃপানাথ একটু ভাবিয়া বলিল—বুঝেছি। কিন্তু কি জানো, একটু শক্ত বুকে যেয়ো—আর যদি নিরাশ হও, তো কাবু হয়ো না ভাই। এই মন্টি-মার কথা মনে করে' চট্‌পট্ চলে' এসো। বুঝছো তো, কত-বড় আশা নিয়ে তুমি যাচ্ছো!···

রঘুনাথ বলিল—বুঝি বৈকি।

সেই দিনই অপরাহ্ণে সহসা এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। বৈকালের দিকে গঙ্গার বুকে ছেলেদের সাঁতারের বাজি ছিল। বিস্তর লোক আসিয়া নদীর ধারে আসর জমাইয়া দিয়াছিল। রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া আসিয়াছিল, একটু বৈচিত্র্যে মন্টির মনের স্তব্ধ জমাট ভাবটাকে যদি কাটাইতে পারে, সেই প্রত্যাশায়!

সাঁতারের বাজি প্রায় শেষ—সাঁতরাইয়া প্রতিযোগী ছেলেরা বাগবাজারের ঘাট ছাড়াইয়া গিয়াছে। রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া জেটির উপর হইতে ফিরিয়া পথে পড়িতেই চেনা গলায় কে ডাকিল···মাষ্টার মশায়···

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল। এ কি, এ যে যতীশ! মন্টি যতীশকে একেবারে আঁকড়াইয়া ধরিল। রঘুনাথের মুখখানা তাকে দেখিয়া মুহূর্তে সাদা হইয়া গেল! মনের মধ্যে আবার সেই কবেকার কথাগুলা জাগিয়া উঠিয়া তাকে একেবারে চাপিয়া ঘিরিয়া ধরিল! যতীশ সে-মুখ দেখিয়া বুঝিল, কোনো ফল হয় নাই—মাষ্টার মহাশয়ের শুধু পাগল হইতেই বাকী! সে প্রশ্ন করিল—কোথায় আছেন?

রঘুনাথ বলিল,—ঐ গঙ্গার ঘাটে পূজারী-ব্রাহ্মণের ঘরে। দেখবে এসো।

চলিতে-চলিতেই যতীশ বলিল,—আপনাকে এত খুঁজেছি! মধ্যে একদিন পলাশ-ডাঙায় গেছলুম—ওধারে এমন কিছু খবর পাইনি···

রঘুনাথ চুপ করিয়া রহিল। যতীশ বলিল,—আমাদের ওখানে চলুন—এখানে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

তখন সকলে কৃপানাথের ঘরের সাম্‌নে আসিয়াছে। রঘুনাথ বলিল,—না বাবা, তোমাদের কথা প্রাণ থাকতে ভুলবো না। তবে লোকালয়ে আর থাকবো না, মনে করেছি!

যতীশ বলিল,—মন্টি··· ?

রঘুনাথ বলিল,—তার জন্য যেটুকু ভাবনা ছিল, তাও আজ কাটলো তোমায় দেখে। এই ঘর তো দেখে গেলে—মাঝে-মাঝে এসো। তোমাদের ওখানে বেড়িয়েও আসব'খন।···তারপর যেদিন চলে যাবো, তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাবো ওকে—!

যতীশ স্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টিতে রঘুনাথের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর বহুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর বলিল,—মাকে বলবো, শুনে মা কালই আসবেন'খন।

রঘুনাথ বলিল,—কাল থাক্। কাল আমি থাকবো না। দু'দিন পরে তাঁকে এনো।···আর কিছু দুঃখ করো না, বাবা। 'তোমাদের বাড়ীও যাবো বৈকি মন্টিকে

নিয়ে—তবে থাকতে পারবো না সেখানে। মাকে বুঝিয়ে বলো। তিনি দুঃখ না করে' যেন আমায় ক্ষমা করেন এজন্য! তুমি এখন মন্টিকে নিয়ে একটু গল্পসল্প করো।

যতীশ তখন মন্টিকে লইয়া গঙ্গার ধারে জেটীতে গিয়া বসিল। সাঁতারের আবার বাজি কি? বাজি তো হাউই, তুবড়ি, এই সব। এমনি নানা কথায় যতীশকে সে ঘণ্টাখানেক বিব্রত রাখিল। তারপর সন্ধ্যা হইলে যতীশ উঠিল।

মন্টি বলিল,—আমাদের বামুন-জ্যাঠা কেমন ঠাকুরের আরতি করে,—দেখবে না? এসো, দেখবে এসো! বামুন-জ্যাঠার সঙ্গে ঠাকুর কথা কন্, তা জানো যতীশ-দা? কত লোকের অসুখ হলে' বামুন-জ্যাঠার কাছে আসে—বামুন-জ্যাঠা ঠাকুরদের বলে' ওষুধ দেন, জানো?

এমনি সব কথায় যতীশদার তাক লাগাইয়া সে তাকে ঠাকুরের আরতি দেখাইতে আনিল। আরতির পর ঠাকুরের প্রসাদ দিয়া যতীশদার কাছে সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল যে, যতীশদা আবার আসিবে, রোজ আসিবে তাদের দেখিতে এইখানে, আর মাসীমাকেও সঙ্গে আনিবে আরতি দেখাইতে!

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া রঘুনাথ দেশের দিকে যাত্রা করিল। কৃপানাথ তাকে পয়সা দিয়া সাহায্য করিল—রঘুনাথ ট্রেণেই বাহির হইল।

ষ্টেশন হইতে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। সে-পথে লোকের ভিড়। সে-পথ ছাড়িয়া রঘুনাথ বন-জঙ্গল ঠেলিয়া চলিল। আশায় মাতিয়া কখনো ঝড়ের বেগে চলে, আবার কল্পনা যখন আশার উপর নৈরাশ্যের পর্দা টানিয়া দেয়, তখন রঘুনাথ পথের মাঝে ঝিমাইয়া পড়ে, গতিও মন্থর হয়। মনে হয়, কেন সাধ করিয়া আবার নূতন করিয়া নৈরাশ্য কিনিতে আসিল সে!

বরাবর আসিয়া···ঐ যে হাটতলার পিছনে ঘুরিয়া ঐ বাঁকা সরু পথ চলিয়া গিয়াছে ···বুকটা মুহূর্তের জন্য ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! এই পথের দেখা মিলিলে একদিন কি আনন্দে বুক তার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! কি পুলক-সম্ভাবনায় সমস্ত প্রাণে শিহরণ জাগিত! আর আজ···? এ পথে পা দিতে সে এমন কাঁপিয়া ভাঙিয়া পড়ে কেন?

ঐ ঘর,—পোড়া বাঁশ, পোড়া কাঠ-খুঁটি একটা দারুণ শোক ও নির্মম বিচ্ছেদের পতাকা তুলিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে। আজো তার বিষাদ তেমনি অটুট রহিয়াছে!

. এই উঠান, ঐ দাওয়া, তুলসী-মঞ্চের একটু স্মৃতি···হায়, পাখী উড়িয়া গিয়াছে! অবহেলায় ঠেলিয়া-রাখা তার শূন্য জীর্ণ খাঁচাখানাই শুধু পড়িয়া আছে!

···কারো চিহ্ন নাই! আর কিসের আশা! লক্ষ্মী এ পৃথিবীতে নাই, তা আসিবে কি! পাথরের মত ভারী পা দুইটা টানিতে-টানিতে রঘুনাথ খিড়কির পথে বাহির হইয়া জঙ্গলে ঢুকিল।—খানিক বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় গ্রামের মুদি বিশ্বম্ভরের সঙ্গে দেখা হইল। বিশ্বম্ভর প্রণাম করিয়া বলিল,—দাদাঠাকুর যে!···তা মা-ঠাক্রুণের খোঁজ পেয়েছেন তো?

রঘুনাথ এ-কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল! সে বিশ্বম্ভরের পানে চাহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

বিশ্বম্ভর এ-কথায় ভারী বিস্ময় প্রকাশ করিল। সে বলিল,—বলো কি দাদাঠাকুর! তবে যে, কলকাতা থেকে মোটরে চড়ে একটি লোক এসেছিল, তোমার খোঁজে, মন্টিমার খোঁজে···মা-ঠাকরুণকে পাওয়া গেছে, তিনিই সে লোককে পাঠিয়েছিলেন···তাঁর কে বোন আছেন, সেই তাঁর বাড়ী থেকে···

এ-সব কি কথা! লক্ষ্মী আছে! তার বোনের কাছে?···বোন···! রঘুনাথের পায়ের নীচে মাটি দুলিয়া উঠিল, চোখের সামনে দীপ্ত সূর্যের খর আলোর উপর কালো পর্দা পড়িয়া গেল। টলিতে-টলিতে সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, ওরে বেকুব, ওরে মূর্খ, তুই বড় দর্প করিয়া পথে ঘুরিয়া তার সন্ধান লইতে ছুটিয়াছিলি!···ঘর ছাড়িয়া কেন গেলি রে, তুই কেন গেলি!

বিশ্বম্ভর বলিল,—তা এখানে বসছো কেন! আমার ওখানে চলো—মুখ-হাত ধুয়ে জিরুবে একটু!

রঘুনাথের চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, সেই ভিড়-ভরা সহরের পথ, বাড়ীর ঠাসা-ঠাসি—তার মাঝে কোথায় কোন্ কোণে তার লক্ষ্মী যে পড়িয়া আছে, তার খোঁজ করা—সে কি সহজ কথা!

বিশ্বম্ভর বলিল,—এসো দাদাঠাকুর!

রঘুনাথ বলিল,—না বিশ্বম্ভর, তুমি যাও। আমি এখনি কলকাতায় চললুম,—বলিয়া সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া একেবারে দ্রুত চলিয়া কতকগুলা গাছের অন্তরালে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিরণের আশ্রয়ে লক্ষ্মী একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। পলাশডাঙা হইতে লোক ফিরিয়া আসিবার পর কিরণ তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, বাড়ীতে যখন তিনি নাই, তখন নিশ্চয় এখানে আসিয়াছেন তোমার খোঁজে! এবং তাঁর এই সন্ধান সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য কিরণ প্রায়ই লক্ষ্মীকে লইয়া কলিকাতার বড়-বড় ঘাটে স্নান করিতে যাইত। কখনো যাইত দক্ষিণেশ্বরে, কখনো কালীঘাটে, আবার কখনো-বা নানা মন্দিরে।

কিন্তু ঠাকুরের কাছে মনের আকুল প্রার্থনা জানাইয়া লক্ষ্মীর চোখ তার প্রার্থিতের দর্শন পাইল না। কিরণ বুঝাইত, আজ আশা মিটিল না, কাল মিটিতে পারে!

থিয়েটারে যেদিন ভালো ভালো অভিনয় হইত, লক্ষ্মীকে সে সঙ্গে লইয়া গিয়া মেয়েদের আসনে বসাইয়া দিত। তারপর অভিনয়-শেষে আবার তাহাকে সযত্নে বুকের আড়ালে লইয়া বাড়ী ফিরিত। মনটা ভাঙিয়া গেলেও একদিন আবার তাহাকে গড়িয়া তোলা যাইবে, এমনি আশা লইয়া লক্ষ্মী তার দিন কাটাইতেছিল।

সেদিন মহা-সমারোহে থিয়েটারে নূতন নাটক সীতা-নির্বাসনের অভিনয় হইবে।

সীতা সাজিবে—কিরণ। কিরণের নামের জয়-সঙ্গীতে থিয়েটারের মালিক সহরকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিরণ থিয়েটারে যাইবার পূর্বে নিজের ঘরে সীতার ভূমিকা আর-একবার দুরস্ত করিয়া লইতেছিল! লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া তার সে অভিনয় দেখিতেছিল। কিরণের পাঠ শেষ হইলে লক্ষ্মী বলিল,—এমন বলছো ভাই দিদি, যে, আমার দুই চোখে জল ঠেলে-ঠেলে আসছে।

কিরণ আসিয়া গম্ভীরভাবে লক্ষ্মীর ললাটে চুম্বন করিল, তাকে বুকের মাঝে সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—এসো,—দু'জনে তৈরী হয়ে নি। একলাটি থাকবে কেন! আর যা দেখলে, এতো কিরণকেই দেখলে—থিয়েটারে সিনের গাছ-পালার মধ্যে যাকে দেখবে, সে কিরণ থাকবে না গো, সে সীতা!

গা ধুইয়া কিরণ সাজ-সজ্জা করিল। লক্ষ্মী একখানি মোটা লালপাড় শাড়ী পরিয়া একখানা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া লইল। তারপর একটা ট্যাক্সি আনাইয়া কিরণ লক্ষ্মীকে লইয়া থিয়েটারে যাত্রা করিল।

থিয়েটারের সামনে কি ভিড়—লোকে লোকারণ্য! সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! গাড়ী, মোটর, লোক···! সেই ভিড় ঠেলিয়া কিরণের ট্যাক্সি আসিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইল। ঘোমটায়-ঢাকা কাপড়ের পুঁটুলির মতোই জড়োসড়ো লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কিরণ নামিয়া থিয়েটারে ঢুকিল! অধীর দর্শকের দল কিরণকে অপূর্ব কৌতূহল-ভরা দৃষ্টি লইয়া দেখিল, এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এখনি স্টেজে নামিয়া কি ইন্দ্রজালেরই-না সৃষ্টি করিবে! কোথায় সরিয়া যাইবে সহরের এক কঠিন বুক, সত্যের এই নির্মম পরশ! তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিবে সেই কোন অতীতের অযোধ্যার রাজপুরী, পথঘাট, সেই বাল্মীকির শান্ত তপোবন—সে এক স্বপ্নের রাজ্যে! ঐ কণ্ঠের স্বরে-স্বরে কি কুহকই যে ঝরিয়া পড়িবে···!

এই দর্শকের দলে একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল—তার চোখ কিরণের উপর হইতে সরিয়া তার সঙ্গিনীটিকে তীক্ষ্ণভাবে পরখ করিতেছিল। লক্ষ্মীর কাপড়ের আবরণ ভেদ করিয়া যে মর্মর বাহুলতা, যে চম্পক অঙ্গুলি, পদ-তল প্রকাশ পাইতেছিল,—সে যেন বিদ্যুতের শিখা! এমন একটা আভা ঐ বর-অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যার পরশে তার তৃষিত চোখ একেবারে ক্ষুধিত আকুল হইয়া উঠিল—সে লাবণ্যের পরশ পরিপূর্ণভাবে পাইবার জন্য মন তার অধীর উন্মত্ত হইল। এ লোকটি রজনী।

জীবন তার নিতান্তই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল—পুরানো মুখ, পুরানো সঙ্গ একেবারে নির্জীব! থিয়েটারে সে আসিয়াছিল এখানকার কুহকস্পর্শে প্রাণটায় একটু বৈচিত্র্যের ঝলক লাগাইতে। কিরণকে দেখিবার তার এক-একবার সাধও হইতেছিল—কিন্তু সে জানে, কিরণ এখন দুর্লভ! তাকে পাওয়া যায় না! অথচ একদিন···

একটু হাসিয়া রজনী ভাবিল, যাক সে-কথা···কিন্তু তার ঐ রূপসী সঙ্গিনী—কে ও?

রজনী ভিতরে গেল, গার্ডকে ডাকিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কিরণের সঙ্গে আসিল, ও কে?

গার্ড বলিল, সে শুনিয়াছে, কিরণের কি-রকম বোন্ হয় ও। ভদ্রঘরের মহিলা; কিরণের ওখানেই থাকে, মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে আসে, পর্দায় বসিয়া থিয়েটার দেখে, আবার তার সঙ্গে স্বতন্ত্র গাড়ীতে চলিয়া যায়।

শুনিয়া রজনী ভাবিল, একবার সে কিরণের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে। তবে আজ আর হয় না,—কাল···সন্ধ্যার পরেই—কাল তো কিরণের কোন পার্ট নাই—সে থিয়েটারেও আসিবে না।

রবিবার। সন্ধ্যা হইয়াছে। লক্ষ্মী নিত্যকার মতো জানালায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া ছিল। পথে জন-তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—তাই সে একটি-একটি করিয়া গণিতেছিল। আর ঠাকুরকে মিনতি জানাইতেছিল, এই পথে তাঁকে আনো, ঠাকুর···আর যে সহ্য হয় না! কিরণ তখন গিয়াছিল গা ধুইতে। দু'জনে কালীঘাটে আরতি দেখিয়া আসিবে, কথা ছিল।

রাস্তায় গ্যাস জ্বলিতেছিল। রাত্রের ফেরিওয়ালারা বিচিত্র সুর তুলিয়া তাদের ফেরির পশরা লইয়া পথে বাহির হইয়াছে—কেহ হাঁকিতেছে, 'বেল ফুল', কেহ বা কুলপী বরফের হাঁড়ি মাথায় চাপাইয়াছে! এ সবগুলার উপর দিয়া ভাসিয়া লক্ষ্মীর মন সেই তার পল্লীর ঘরখানির আশে-পাশে বিচরণ করিতেছিল। সেই জনহীন পথ, পুকুর-ঘাট, সেই আঁধারে-ঢাকা তুলসীমঞ্চ···সে কি স্বর্গ ই না ছিল তার···!

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা মত্ততার স্বর জাগিল,—কিরণ-বিবি···

চমকিয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া দেখে···এ কি···এ যে সে-ই! যে তাকে তার স্বর্গ হইতে টানিয়া আনিয়া আজ এই পথে বসাইয়াছে!—এ সে···রজনী।

দু'জনে চোখাচোখি হইল। অমনি আগন্তুক একলাফে একেবারে তার সামনে আসিয়া হাজির হইল। বিভোর দৃষ্টি তার পানে তুলিয়া হাসিয়া সে বলিল,—তুমি! আমার খাঁচার পাখী, তুমি এসে কিরণের খাঁচায় ঢুকেচো! বলিয়াই সে লক্ষ্মীকে ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইল।

লক্ষ্মী ছুটিয়া পলাইতেছিল, রজনী তাকে ধরিয়া ফেলিল; আবেগজড়িত স্বরে বলিল,—তুমি যে একেবারে আমায় মুষড়ে রেখেছো প্রেয়সী। তোমায় কম খুঁজেছি! ···ভাগ্যে কাল থিয়েটারে গেছলুম···

লক্ষ্মী আবার এই দৈত্যের কবলে পড়িয়া প্রমাদ গণিল; ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তার চীৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল কিরণ! কিরণের কেশের রাশি এলায়িত, দুই চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে কি এক দীপ্তি! সে এক অপরূপ মূর্তি!

কিরণ আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া বলিল,—একি! তুমি···?

রজনী হাসিয়া বলিল,—এ যে আমার ধন, কিরণ-বিবি, একে তুমি পেলে কোথায়?

কিরণ বলিল,—তুমিই···?

কথাটা বলিবার সময় রজনীর হাতের বাঁধন একটু শিথিল হইয়াছিল—তারি ফাঁকে লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া কিরণের পিছনে দাঁড়াইল; আসিয়া ভীত-কণ্ঠে কহিল —এই সে, দিদি···!

কিরণ কহিল,—এ-ই ?···তারপর রজনীর পানে চাহিয়া বলিল,—তোমার এ রাক্ষুসে-খিদে কি সবাইকে গ্রাস করবে? আমার সর্বনাশ করেও তোমার তৃপ্তি হয়নি? ভদ্রঘরের সতী-স্ত্রী, স্বামীর প্রেমে স্বর্গ তৈরী করে' বসেছিল, তাকে সে স্বর্গ থেকে হিঁচড়ে টেনে বার করে' পথে দাঁড় করিয়েছো! আশ্চর্য, তোমার মাথায় বাজ পড়ে না? ভগবান কি ঘুমিয়ে আছেন?

হাসিয়া রজনী বলিল,—তোমার সব-সময় এ্যাকটিং!···তা, ঘরে কেন, ষ্টেজে করো, দুশো তারিফ পাবে!

দুই চোখে আগুনের হল্‌কা ফুটাইয়া ভর্ৎসনার স্বরে কিরণ বলিল,—আবার আমার ঘরেই চোরের মত ঢুকেচো!···আর ঢুকে আমারি মুখের উপর ঐ মুখ নিয়ে বিদ্রূপ করচো, ব্যঙ্গ করচো। তুমি ভদ্র বলে' পরিচয় দাও! আমার বাড়ীতে যে চাকর বাসন মাজে, তার জুতো ছোঁবারো যোগ্য নও তুমি!···তোমায় আর কি বলবো? চলে' যাও,···এখনি বেরিয়ে যাও!

রজনী সহসা এ-কথায় চমকিয়া উঠিল। তার মুখের উপর এমন কড়া শাসন চালাইতে সাহস করে, একটা কুলটা নারী, থিয়েটারের সামান্য একজন অভিনেত্রী! বিশেষ, কিরণ—যে একদিন তার হাত ধরিয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছিল!···সে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ বলিল,—এখনো দাঁড়িয়ে রইলে! চলে' যাও, নইলে আমার চাকরকে ডাকবো, সে তোমার হাত ধরে' বাড়ীর বাইরে তোমায় রেখে আসবে···

রজনী বলিল,—কি! এত-বড় কথা! বলিয়া সে কিরণের দিকে আগাইয়া আসিল।

কিরণ হাঁকিল,—ভোলা···

ভোলা ভৃত্য নিকটেই ছিল। ঘরের মধ্যে ঝাঁজালো কথা শুনিয়া সে আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। কিরণের আহ্বানে ঘরের মধ্যে আসিলে কিরণ বলিল, —এই ছোট-লোকটার হাত ধরে' বাড়ীর বার করে' দে···

ভোলা আসিয়া রজনীর হাত ধরিল, বলিল,—কেন বাবু ঝামেলা করো···বাহার যাও···

ঝট্‌কানি দিয়া ভোলার হাত ছাড়াইয়া প্রচণ্ড রোষে রজনী হাতের লাঠি তুলিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা কাঁচের আলমারিতে লাঠি লাগিল এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দে তার দুখানা কাঁচ ভাঙিয়া গেল। অমনি একটা রক্তের তৃষ্ণায় রজনীর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে দিক্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া লাঠির ঘায়ে আলমারিটা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল —তারপর হাতের কাছে পানের ডিবা পাইয়া সেটা ছুঁড়িল কিরণের পানে। কিরণের গায়ে ডিবাটা না লাগিয়া লাগিল গিয়া টেবিলে-রক্ষিত একটা পোর্শি'লেনের বড় প্রতিমূর্তির গায়ে! মূর্তিটা ঝন্-ঝন্ শব্দে পড়িয়া ভাঙিয়া চুরমার হইল।

কিরণ তীব্রস্বরে গর্জিয়া উঠিল—এখানে এসেছো গুণ্ডামি করতে। বদমায়েস, মাতাল, ইতর…বলিয়া লক্ষ্মীকে সে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কোণ হইতে একটা চাবুক তুলিয়া লইল; কহিল,—'বেরোও, বেরোও, বল্‌চি,—না হলে' এখনি এই চাবুকের ঘায়ে তোমায় টিট্ করে' দেবো!

রজনী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল,—রণ-সাজে সেজেছো! কিন্তু এটা থিয়েটার নয়, বিবি…

কথা শেষ হইবার পুর্বেই কিরণের হাতের চাবুক শপাৎ করিয়া পড়িল রজনীর মুখে। তখন প্রহার-ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো রজনী কিরণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভোলা চাকর তখনই রজনীকে টানিয়া ছাড়াইতে গেল—কিন্তু সে তখন প্রচণ্ড বিক্রমে কিরণের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে!

রীতিমত একটা ধস্তাধস্তি চলিল,—মাতাল হইলেও রজনীকে হঠানো সহজ হইল না। এমন সময়ে দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিল। আলমারি ভাঙিতে দেখিয়া সদু দাসী ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছিল—মোড়ের কাছেই ছিল দুজন পাহারাওয়ালা। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পানওয়ালীর সঙ্গে তারা খোসগল্প করিতেছিল। সদু গিয়া তাদের খবর দিতেই তারা ছুটিয়া আসিয়াছে। এ-বাড়ী হইতে বখশিশ প্রায়ই মেলে, তাই তারা খাতিরও করে!…

কনেষ্টবলরা আসিয়া রজনীর দুই হাত ধরিয়া তাকে ছাড়াইল। কিরণের মুখ তখন নীল হইয়া গিয়াছে। রজনী ফুঁসিতেছিল। পুলিশ বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরিয়া তারি গায়ের চাদর টানিয়া রজনীর হাত দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল। কিরণ ততক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

কিরণ বলিল,—এই গুণ্ডা আমার ঘরে ঢুকে আমায় খুন করতে এসেছিল। আমার জিনিস-পত্র ভেঙে চুরমার করে' দিয়েছে। একে ধরে' থানায় নিয়ে যাও!

পাহারাওয়ালারা কিরণকে সেলাম করিয়া আসামী লইয়া প্রস্থান করিল।

যতীশ গিয়া সে-রাত্রে যখন মা'র কাছে বলিল,—রঘুনাথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মা তখন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন মন্টিকে দেখিবার জন্য যে, সেই রাত্রেই গাড়ী আনাইয়া বাগবাজারে আসিয়া হাজির হইলেন!

যতীশের মা বহু সাধ্যসাধনা করিলেন, আমার ওখানে চলো বাবা—কিন্তু রঘুনাথের এক কথা, মাপ করবেন মা! মানুষের পুরীতে আর আমার ফেরবার সাধ নেই! এখানে বেশ আছি।

যতীশ বলিল,—কাল এসে আমাদের ওখানে আপনাদের নিয়ে যাবো মাষ্টার মশাই। আমরাও বেশী দূরে থাকি না—এই দর্জিপাড়ায়—দশ মিনিটের পথ।

তারপর যতীশ এখানে প্রায়ই আসিতে লাগিল। তার সঙ্গে মন্টি বেড়াইয়া আসিত, গঙ্গার ধার দিয়া অমন কতদূর অবধি!

সেদিন যতীশদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ সারিয়া রঘুনাথ, যতীশ আর মন্টি পরেশনাথের

মন্দির দেখিতে গিয়াছিল। মন্দির দেখিয়া সেখানে খানিক বসিয়া গল্প করিয়া তারা যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়!

বরাবর সার্কুলার রোড ধরিয়া আসিয়া তারা গ্রে ষ্ট্রীটে পড়িল; গ্রে ষ্ট্রীট ধরিয়া তারা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আসিল। সেইখানটায় পথ পার হইয়া যেমন ওদিককার ফুটপাথে উঠিবে, হঠাৎ অমনি কোথা হইতে একটা ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল; এবং মন্টি ভ্যাবাচাকা খাইয়া যেমন ছুটিতে যাইবে, অমনি গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া ফুটপাথের কোলে ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল! তার কপাল কাটিয়া ঠোঁট কাটিয়া ঝরঝর ধারে রক্ত ঝরিল।

অমনি মজা পাইয়া যত ভিড় আসিয়া জমিল সেই জায়গায়। সকলেই উঁকি মারিয়া দেখিতে চায়, বেশ গল্প করিবার মতো ব্যাপার কিছু ঘটিল কি না! ড্রাইভারটা পলাইতেছিল—পাঁচ-সাত জন লোক ঘুষি পাকাইয়া তাহাকে রুখিয়া দাঁড়াইল—কেহ দিল তার গালে প্রচণ্ড চড়, কেহ দিল এক ঘুষি। মারের চোটে ড্রাইভারের একটা দাঁত ভাঙিয়া ছিট্‌কাইয়া কোথায় যে গিয়া পড়িল, তারও মুখে রক্ত ছুটিল।

তখন পুলিশ আসিয়া ধমক দিয়া ভিড় সরাইল—রঘুনাথ আর যতীশ পথের কলের জলে চাদর ভিজাইয়া মন্টির মুখে-চোখে দিল। পুলিশ আসিয়াই তাদের লইয়া থানায় যাইতে উদ্যত হইল। যতীশ বলিল,—তার আগে হাসপাতালে চলো। মেয়েটিকে আগে বাঁচানো দরকার।

সেই ট্যাক্সিতে করিয়াই মন্টিকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তার ক্ষত ধুইয়া ডাক্তার পটি বাঁধিলেন এবং প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখিয়া পুলিশের হাতে দিলেন; পুলিশ সেই রিপোর্ট আর জখমী রোগীকে লইয়া বড়তলা থানায় হাজির করিয়া দিল।

থানার সামনে আবার ভিড় আসিয়া ঠেলা দিয়া দাঁড়াইল। সকলের চোখেই কৌতুহল, সকলের মুখেই চীৎকার। পথের চলন্ত ট্রাম হইতে যাত্রীর দল থানার পানে চাহিয়া ভাবিল, ব্যাপার কি! এরা সব থানা লুঠ করিতে আসিয়াছে না কি!

মন্টির কেস লেখা হইতেছে, এমন সময় গ্রেপ্তারী আসামী রজনীকে লইয়া অপর পুলিশের লোক ভিড় ঠেলিয়া থানায় ঢুকিল।

থানার ঘরে ঢুকিয়া সামনেই মন্টিকে দেখিয়া রজনী শিহরিয়া উঠিল।

এ কি এ···এ যে প্রেয়সীর মুখখানি ছোট্ট করিয়া কোন নিপুণ শিল্পী ছকিয়া রাখিয়াছে। আর···তখনি চোখ পড়িল রঘুনাথের দিকে! এ কি মূর্তি! এ যে বেদনা তার দারুণ আর্ত রূপ ধরিয়া রজনীর সামনে দাঁড়াইয়া! মুখে একরাশ দাড়ি গজাইয়াছে, মাথার চুলগুলো এলোমেলো, দীর্ঘ···তার মনের উপর শপাৎ করিয়া কোথা হইতে তীব্র চাবুকের ঘা পড়িল,—কে যেন কানের কাছে চীৎকার করিয়া বলিল, পাষণ্ড, তোর জন্যই আজ এদের এ দশা! সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়িল, সেই বনের কোলে পুকুরের পাশে জীর্ণ ঘর, সেই ঘরের তকতকে উঠানে এই মেয়েটি নিজের মনে খেলা করিত···

তারপর রজনী চাহিয়া দেখে, এটা থানা! চোর, খুনে, ঠক, বাটপাড়, জালিয়াৎদের যেখানে আটক রাখে—নর-সমাজের আবর্জনা ঝাঁটাইয়া পুলিশ যেখানে জড়ো করে! ঐ হাজত ঘর! পথে চলিতে পথ হইতে সে অমন কতদিন দেখিয়াছে, ঐ ঘরের মধ্যে

চিড়িয়াখানায় বদ্ধ জানোয়ারের মতোই কোমরে দড়ি-বাঁধা আসামী···লোহার গরাদের মধ্যে দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। বাহির হইতে তাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া ঐ খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখা হইয়াছে, তার দানবী হিংসা হইতে অপর মানুষগুলোকে রক্ষা করিবার জন্য! এই ঘরেই···ঐসব খুনে-জালিয়াতের সঙ্গেই তাকেও এখন পুরিয়া রাখা হইবে···! আর সহরের লোক দূর হইতে দেখিয়া ভাবিবে, এ-ও একটা খুনে, জালিয়াৎ, ঠক, চোর···

রজনী ভাবিল, সেও কি তাদের চেয়ে কম কোনোখানে! সে-ও যে কত নারীর মন ছেঁচিয়া খুন করিয়াছে, প্রেমের কুহকে মজাইয়া কত নারীর সর্বনাশ করিয়াছে,—নারীর নারীত্ব—তাও কি সে চুরি করে নাই?

ভাবিতে-ভাবিতে মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল—পায়ের তলা হইতে মাটি বুঝি সরিয়া যাইবে, এমন বেগে দুলিয়া উঠিল। রজনী পড়িয়া যাইতেছিল, তার কনেস্টবল এক ঠেলা দিয়া গর্জিয়া উঠিল—এই মাতোয়ালা খাড়া রহো···

ইন্‌স্পেক্টরবাবু মন্টির কেস লিখিয়া তাদের লইয়া তদারকে বাহির হইলেন; বলিয়া গেলেন, এ আসামীকে হাজতে পুরিয়া রাখো, আসিয়া সব কথা শুনিব। অন্য বাবুরা তদারকে বাহির হইয়াছেন, তাঁরও মোটর-কেসের জরুরী তদারক পড়িয়াছে!

রজনীকে তখন হাজত-ঘরে পোরা হইল! বাহিরের ভিড় হইতে দুই-একটা তীব্র মন্তব্য রজনীর কানে আসিয়া পৌঁছিল। তারা বলিতেছিল,—জানিস না? ও ভারী বাবু-লোক, মোটরে চড়ে' বেড়ায় যে! থিয়েটারের বক্সেও প্রায়ই নানা মূর্তি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসে! নাও বাবা, এখন পুলিশের রুলের গুঁতো খাও! একজনের স্বদেশপ্রেম এমন তীব্র জাগিয়া উঠিল যে, আক্ষেপ ও বিদ্রূপের সুরে সে বলিল,—এই সব লোক হলো আমাদের দেশের বড় লোক! এতে আর জাতের উন্নতি হয় কখনো! মাতাল ব্যাটা···

ঘৃণায় লজ্জায় রজনী হাজত-ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

মোটর-কেসের তদারক সারিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবু থানায় ফিরিয়া হাঁকিলেন,—আসামী লে আও।

তখন হাজত-ঘর হইতে রজনীকে বাহিরে আনা হইল। তার কনেস্টবল আসিয়া বলিল, এই আসামী থ্যাটারের কিরণ বিবির ঘরে ঢুকিয়া বিবি-লোককে মারিতেছিল, তার ঘরের জিনিস-পত্রও ভাঙিয়া তচ্‌নচ্ করিয়া দিয়াছে। বিবির দাসী আসিয়া খবর দিয়া তাদের পথ হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়—তারা গিয়াও স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এ সব জিনিস-পত্র ভাঙিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলিলেন,—এখন মজা দেখবেন, চলুন! ছি, ছি, আপনারা ভদ্দর লোক! কাল কোর্টে চোর-ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে ডকে গিয়ে দাঁড়ালে ভারী পৌরুষ বেরুবে'খন! বীরত্ব দেখাবার আর জায়গা পাননি?

রজনী একেবারে কাঁদিয়া ইন্‌স্পেক্টরের পায়ে পড়িল, মিনতির সুরে বলিল,—আমি কান মল্‌চি, এ অপমানের হাত থেকে বাঁচান। এ অপমানের পর আমি আর বাঁচবো না!

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন,—আমাদের হাতে পড়লে অনেক বদমায়েসই একেবারে সত্যপীর হয়ে ধর্ম্মের বক্তৃতা সুরু করে' দেয়!

রজনী বলিল,—না মশায়, আমি তাদের দলে এখনো পৌঁছুইনি। অনেক বদমায়েসী করেচি, অনেক পাপ করেচি…তবে পার পেয়ে গেছি,…এই সামান্য ব্যাপারে আমার জ্ঞান হয়েছে,…যথার্থ বলচি, আজ এ থানার ঘরে ঢুকে আমি বুঝতে পেরেচি, আমি কোথায় নেমে দাঁড়িয়েচি! দয়া করুন, আমায় একটা chance দিন্ মানুষ হবার—a life's chance.

ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলিলেন,—তা আপনি কিরণ বিবিকে বলতে পারেন…তিনি যদি মামলা তুলে নেন তো আমাদের আপত্তি নেই। এটা compoundable case—শুধু trespass বলে' লিখে নিচ্ছি!…আপনি জামিন দিতে পারেন?

জামিন! রজনী অকূল পাথারে পড়িল। এই লজ্জার কথা সে কাহার কাছে গিয়া বলিবে এখন! বন্ধু-সমাজে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? হাজতের আসামী! সে হতাশভাবে বলিল,—আমার জামিন হবার জন্যে উপস্থিত তো কাকেও দেখ্‌চি নে।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,…আচ্ছা, এখন কিরণ বিবির ওখানে তো যাওয়া যাক্, তারপরে সে-কথা হবে'খন।

বলিয়াই ইন্‌স্পেক্টরবাবু একজন পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন, তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য। সে আসিয়া রজনীর কোমরে একটা মোটা দড়ি জড়াইল। ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলিলেন,—এই দড়ি-বাঁধা বেশে পথে যেতে পারবেন তো?

রজনী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—তারপর কাল সূর্য্যের মুখ দেখবার জন্য আমায় আর থাকতে হবে না। এ-অপমানের পর…

ইন্‌স্পেক্টববাবুটি ভদ্র; তিনি পাহারাওয়ালাকে বলিলেন,—একঠো গাড়ী বোলাও।

সে গাড়ী ডাকিলে রজনীকে লইয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবু গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন; কনেষ্টবল গিয়া কোচবক্সে চড়িল। তখন গাড়ী চলিল কিরণের বাড়ীর দিকে!

কিরণ বাড়ী ছিল না। অত-বড় ব্যাপারখানা ঘটিয়া যাইবার পর কিরণের কাছে সমস্ত বাড়ীর হাওয়া এমন বিষাইয়া উঠিয়াছিল যে, সে লক্ষ্মীকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল! সে ভাবিতেছিল, এই রজনী—হায় রে, ইহাকে বিশ্বাস করিয়া, ইহার উপর নির্ভর করিয়া সে কি আশায় পথে বাহির হইয়াছিল! ঘৃণায় মন একেবারে কালো হইয়া উঠিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। রূপালি আলোর ঝর্ণায় স্নান করিয়া সারা সহর যেন হাসিতেছিল। এই আলোর ধারায় কিরণের মন তার সমস্ত দুঃখ মুছিয়া ঝরঝরে হইয়া উঠিল। গাড়ী গিয়া যখন দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিল, তখন একটু রাত্রি হইয়াছে। শান্ত মন্দির, চারিধার শান্ত—এমনি এক মায়ার জাল বিছানো রহিয়াছে যে, একটু আগেই যে বিশ্রী কাণ্ডখানা ঘটিয়াছিল, তার শেষ চিহ্ন অবধি তার মন হইতে ছিট্‌কাইয়া কোথায় ঝরিয়া পড়িল।

দুইজনে গিয়া ঘাটের কোলে বসিল। নদীতে তখন ভাঁটা পড়িয়াছে। মৃদু উল্লাসে

ছোট-ছোট ঢেউগুলা তটের কোলে ছুটিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল—ঠিক যেন এক দুঃখে-জমাট পাষাণ বুকের কাছে সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মতো! দূরে কে গান গাহিতেছিল:

দিবস-রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি,
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।

গানের কথাগুলি লক্ষ্মীর বুকে এমন করুণ রেশ জাগাইয়া তুলিল যে, তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। ওগো, এ যে তার অন্তরের বড় গোপন কথা। কে তুমি, এ-কথা কেমন করিয়া জানিলে গো? আমার মন সত্যই যে অতি-তৃষিত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে—দুই শ্রবণ তার কণ্ঠের স্বরটুকু পাইবার জন্য উন্মুখ অধীর সর্বক্ষণ। কে গো, বলিয়া দাও,—কোথায় সে।

গায়ক গাহিতেছিল:

জাগরণে তারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন-পাশে—

লক্ষ্মীও তো তাই আকুল থাকে, কখন্ রাত্রি হইবে, চারিদিককার সব কোলাহল মূর্ছিত হইবে! তার মনও অমনি তন্দ্রালোকে গিয়া প্রবেশ করিবে,—তখন সে আসিবে, তার প্রিয়তম, দুই বাহুর বাঁধনে লক্ষ্মীকে বাঁধিবার জন্য…

গান তখন দুলিয়া-দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে,—

এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি!

কৈ, কৈ, কৈ গো, তার ব্যাকুল প্রাণের বাসনা কামনা লক্ষ্মীর প্রিয়তমকে ডাকিয়া আনিতে পারিল না তো!—তবে…তবে?

বুকের কাছটায় এমন এক নৈরাশ্য জমাট বাঁধিয়া ভারী পাথরের মত ঠেলিয়া আসিল যে, তার চাপে লক্ষ্মীর নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; চোখের সামনে চাঁদের আলো সহসা নিবিয়া আসিল। সে কিরণের বুকে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত হতাশভাবে ঢলিয়া পড়িল। কিরণ ওপারে আলো-আঁধারের অস্পষ্ট ছবির মতো গ্রাম-রেখার পানে চাহিয়াছিল। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ঐ যে আলোর কণা দেখা যাইতেছে, লোক-কোলাহলের একটা অস্ফুট গুঞ্জনও ঐ যে জলের বুক বহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে …কিরণ ভাবিতেছিল, ঐ আলোর কণা, ও কোন সুখের হাসির হীরার কুচি! ভাই-বোন, মা-বাপের স্নেহ-প্রীতিতে ঘেরা সুখের ঘর—ও-ঘরে না আছে নৈরাশ্য, না আছে অনুতাপের বেদনা! সে যদি ঐ ঘরে আজ একটু ঠাঁইও লইতে পারিত!

এমনি ভাবনার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্মী তার বুকে শ্রান্ত শির এলাইয়া দিতে কিরণের চমক ভাঙিল। সে ডাকিল,—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মী কাতর চোখে তার পানে চাহিয়া ডাকিল,—দিদি…তারপর চক্ষু মুদিল।

গানটা কিরণের কানেও গিয়াছিল। তার প্রাণের বৃন্তটিকে নাড়া দিয়া গানের সুর তাকে একেবারে শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, হায়রে, তার যে আশা করিবার কিছু নাই…সে এই এত-বড় পৃথিবীর বুকে নিতান্ত একা, অসহায়। একটু আশা করিবার শক্তি—তাও দুই পায়ে মাড়াইয়া চুরমার করিয়া দিয়া আসিয়াছে! তার মতো দুর্ভাগিনী আর কেহ আছে কি! কোনো কথা না বলিয়া লক্ষ্মীর পানেই সে চাহিয়া রহিল।

গায়ক তখন অন্য গান ধরিয়াছে :

অলি বার বার ফিরে যায়—
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে তো ফুল বিকাশে।

কিরণের মন গানের সুরে এই ধূলা-মাটির জগৎ ছাড়িয়া কোথায় যে উধাও যাত্রা সুরু করিল…ফুল, ফুল, ফুলে-ছাওয়া, আলোর আলো-করা সে এক কুহকের রাজ্য! হাসির রাশি ফুলের পাপড়ির মতোই এ-রাজ্যের পথে-পথে ছড়ানো!—সেই ফুল আর হাসির রাশির মাঝে কিরণের মন এমন বিভোর হইয়া পড়িল যে, এই মন্দির, এই ঘাট, ঐ নদীর জলে ঢেউয়ের কাণাকাণি, পাশে লক্ষ্মী,—সব একেবারে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল!…

হঠাৎ একটা সুরের হাওয়ায় চমক ভাঙ্গিল।

গায়ক গাহিতেছিল :

আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়-রতন আশে।

এ-কথায় সে একেবারে লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া কহিল,—ঐ শোনো লক্ষ্মী…আশা ছেড়ো না বোন্, কোনোদিন ছেড়ো না। নদীর ঢেউগুলোও, শোনো, ঐ কথা বলছে…আশা ছেড়ে তবু আশা রাখো, আশা রাখো…

কিরণের বুক হইতে মাথা তুলিয়া লক্ষ্মী ঢেউগুলার পানে উদাস নেত্রে চাহিল …তারো মনে হইল, ঢেউগুলা যেন আছাড়ি-পিছাড়ি খাইয়া ঐ কথাই বলিতেছে—সুরের ঐ কথাটাই যেন চারিদিকে ভাসিয়া ফিরিতেছে। আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও…কিন্তু এ কি আশা…এ যে দুরাশা, মস্ত-বড় দুরাশাকে সে আজ সম্বল করিয়া আবার জগতের বুকে উঠিয়া দাঁড়াইতে চায়!

তারপর দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মাথার উপর নক্ষত্রের সভার একরাশ নক্ষত্র শুধু স্তম্ভিত-বুকে এই দুই নারীর অন্তরের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে! হায় নারী, হায় অভাগিনী,—এত দুঃখ সহিয়াও তোরা বাঁচিয়া থাকিস্, কি করিয়া! ছল-ছল চোখে দুইজনের পানে চাহিয়া নক্ষত্রের দল বুঝি এই কথাটাই কাণাকাণি করিতেছিল।

কিরণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—চলো ভাই, ঠাকুর প্রণাম করে' আসি। এখনি দোর বন্ধ হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীকে লইয়া কিরণ আসিয়া মন্দিরে দাঁড়াইল। ঠাকুরকে দুইজনে প্রণাম করিল। লক্ষ্মী প্রাণের আবেগ উজাড় করিয়া ডাকিল,—আর যে পারি না মা, বুক ভেঙে যাচ্ছে! দাও মা, তাঁদের এনে দাও। যদি কায়-মনে স্বামীর পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তাহলে তাঁদের আর দূরে রেখো না, এনে দাও মা! আমি বুক চিরে রক্ত দেবো…এই পাহাড়-প্রমাণ দুঃখে-ভরা বুক চিরে…যত চাও…

কিরণ লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া ডাকিল,—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মী সে আহ্বানে চমকিয়া মুখ তুলিল, বলিল,—ডাকচো দিদি?

কিরণ দীপ্ত-চোখে বলিল,—হ্যাঁ। আমি আকুল হয়ে মাকে ডাকছিলুম যে,—মা, এই সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল মুছে দাও মা…তাতে তার মুখে যেন হাসি ফুটে উঠলো—বিদ্যুতের রেখা! তবে তাতে ঝাঁজ নেই—এই জ্যোৎস্নার মতো ঠাণ্ডা…এমন তো কখনো আমি দেখিনি ভাই!

লক্ষ্মী আবেগে কিরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল,—তোমার কথাই সত্য হোক্ দিদি…

বাড়ীতে ফিরিতে দাসী সংবাদ দিল, রজনীকে লইয়া থানার ইন্‌স্পেক্টরবাবু তদারকে আসিয়াছিলেন, তারা তাঁর কাছে সব খুলিয়া বলিয়াছে। তবে কিরণের কথাও পুলিশ শুনিতে চায়। কাল সকালে পুলিশের বাবু আবার আসিবে। দাসী আরো বলিল, রজনীবাবু আর সে-রজনীবাবু নাই। পুলিশের হাতে পড়িয়া তার বিষ-দাঁত ভাঙিয়াছে। তাহাদের কাছে মিনতি জানাইয়াছে, কিরণ যেন তাকে ক্ষমা করে। সে আরো বলিয়াছে যে, ছোটদিদিমণির স্বামীর সে সন্ধান পাইয়াছে! ছোট-দিদিমণির মেয়েটি নাকি মোটরের ধাক্কা লাগিয়া জখম হইয়াছে…এই কলিকাতাতেই—

এ সব কি কথা! কিরণ ও লক্ষ্মী দুইজনে চমকিয়া উঠিল; এবং তখনি একখানা গাড়ী ডাকাইয়া দুইজনে ভৃত্যকে লইয়া থানায় ছুটিল।

রজনী তখনো থানায় বসিয়া আছে। ভুলো গিয়া খবর দিল, কিরণ বিবি আসিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলিলেন,—বেশ আমি যাচ্ছি।

তিনি উঠিবার পূর্বেই কিরণ আসিয়া থানার ঘরে প্রবেশ করিল।

রজনী তাকে দেখিয়াই বলিল,—আমায় মাপ করো কিরণ। আজকের ঘটনা আমায় নতুন মানুষ করেছে!…এখন আমার জামিন হয়ে কেউ না দাঁড়ালে আমায় ঐ চোর-জালিয়াৎদের সঙ্গে হাজত-ঘরে বাস করতে হবে! আগে তার উপায় করো। তুমি মনে করলেই এ মামলা উঠিয়ে নিতে পারো…যদি ক্ষমা করতে পারো আমায় তো সব দিক দিয়েই আমি সুযোগ পাই মানুষ হবার…তাছাড়া রঘুনাথবাবুর সন্ধানও আমি পেয়েছি…যদি অনুমতি করো তো যে অন্যায় করেছি, তার প্রতিকার করবারও সুযোগ হয়!

কিরণ ইন্‌স্পেক্টরবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, মামলা আমি উঠিয়ে নিতে চাই। একজন বড়-ঘরের ছেলের এ বে-ইজ্জতি…

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। এ সেই রজনী…যার সান্নিধ্য তার সব-চেয়ে কাম্য ছিল, একদিন যার অদর্শন তার অসহ্য ঠেকিত!…যা গিয়াছে, তা একেবারেই গিয়াছে, ফিরিবার নয়, ফিরাইতে সে চায়ও না!

ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলিলেন,—স্বচ্ছন্দে আপনি মামলা উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তার আগে আপনার জবানবন্দী চাই—অর্থাৎ যা-যা ঘটেছিল—! এর পর আজ রাত্রের মতো উনি জামিনে খালাস থাক্‌বেন। কাল ডেপুটি-কমিশনারের কাছে ওঁকে একবার হাজির হতে হবে। আপনি তাঁর কাছে বললে বা উকিল দিয়ে বলালে মামলা মিটবে, উনিও খালাস পাবেন।

কিরণ বলিল,—একজন উকিল তো চাই তাহলে। কিন্তু আমি তো কাকেও চিনি না।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,—বেশ, আমি সে ব্যবস্থা করছি। বলিয়া তিনি ডাকিলেন, —দরোয়াজা…

একজন পাহারাওয়ালা আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্পেক্টরবাবু তাকে একজন উকিল আনাইবার কথা বলিয়া দিলেন। সে চলিয়া গেলে ইন্‌স্পেক্টরবাবু কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছিল, ইনি কি করেছিলেন, সব বলুন দিকি আমায়।

কিরণ সব কথা খুলিয়া বলিল, বলিয়া নিবেদন করিল, যে-নারীর উপর উনি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি একজন ভদ্রমহিলা—তাঁর নামটা জানিতে না চাহিলেই সে কৃতার্থ হইবে। তাছাড়া তাঁকে যেন থানায় দাঁড়াইতে না হয় বা তাঁকে এ-সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা না হয়—এই তার প্রার্থনা।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু রজনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি এ-সব স্বীকার করেন?

রজনী বলিল,—সব সত্য।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,—আপনার সম্বন্ধে এ-সব কথা শুনে সত্যই বড় কষ্ট হচ্ছে! আপনারা বড়লোক—অবসরও আপনার প্রচুর। এই পয়সা আর অবসর কত ভালো কাজে খাটাতে পারেন। তা না করে' এমন ইতর লোকের মতো নোংরা কাজে ছোটেন—ছি!

রজনী বলিল,—যথার্থই আমার অনুতাপ হচ্ছে, ইন্‌স্পেক্টরবাবু! I beg a life's chance of you.

উকিল আসিয়া জামিন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, কিরণ একটা চিঠি লিখিয়া দিল, মামলা সে চালাইতে চায় না।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলিলেন,—এই চিঠি কাল আমি দাখিল করবো। আর রজনীবাবু, আপনি সরকারী-গরীবখানায় কিছু দিয়ে দেবেন—তাহলেই মামলা তুলে নিতে কষ্ট হবে না।

এদিককার ব্যাপার চুকিলে রজনী বলিল,—সেই যে মেয়েটি আজ মোটর চাপা পড়েছিল, তার বাপের নাম রঘুনাথবাবু! তাঁদের ঠিকানা যদি দেন…আমাদের আপনার লোক তিনি…

ইন্‌স্পেক্টর সকৌতূহলে রজনীর পানে চাহিলেন, তারপর কাগজপত্র দেখিয়া তাদের ঠিকানা বলিয়া দিলেন,—বাগবাজার কালীমন্দির, কৃপানাথ ঠাকুরের বাড়ী।

ঠিকানা জানিয়া লইয়া রজনী বাহিরে আসিল; আসিয়া কিরণকে বলিল,—তোমরা বাড়ী যাও—আমি তাঁদের নিয়ে এখনি তোমার ওখানে আসছি!

কিরণ লক্ষ্মীকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়া সে লক্ষ্মীকে বলিল,—মা-কালীব সে হাসি মিথ্যা নয়—আমাদেব দুই বোনের প্রার্থনা তিনি শুনেচেন। রঘুনাথবাবুকে এখনি দেখতে পাবে ··

এ কি সত্য, এ কি স্বপ্ন·· না, এ পরিহাস! তার এত-বড় দুরাশা তবে লক্ষ্মীর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে পড়িয়া যাইতেছিল, কিরণ তাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—এসো, এবার রাণীর সাজে তোমায় সাজিয়ে দি ··

লক্ষ্মীব সমস্ত চেতনা অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে জড় পদার্থের মতোই নিজেকে কিরণের হাতে ছাড়িয়া দিল। কিরণ তাব মুখ-হাত ধোয়াইয়া তাকে সাজাইতে বসিল—মাথাব চুল আঁচড়াইয়া দিয়া সিঁথিতে বেশ করিয়া সিঁদুর পরাইয়া, আলতায় পা দুখানি রাঙাইয়া, ভালো একখানি শাড়ী পরাইয়া লক্ষ্মীকে একটা কোচে বসাইয়া দিয়া কিবণ মুগ্ধ-বিহ্বলদৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

লক্ষ্মীর মনে হইতেছিল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! হোক স্বপ্ন—তবু এ বড় সুখের—তাই সে অমনি স্পন্দহীন স্তব্ধ বসিয়া রহিল—ঠিক যেন এক মাটির পুতুল!

লক্ষ্মীর স্পন্দিত-বুকের উপব দিয়া সশব্দে কখন একখানা গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল এবং কখন যে বজনীর সঙ্গে তার প্রাণের চিরবাঞ্ছিতেরা আসিয়া ঘরে ঢুকিল—এগুলো সব যেন স্বপ্ন! হঠাৎ তার চেতনা হইল, কপালে পটি-বাঁধা মণ্টি যখন মা বলিয়া তার কাছে ছুটিয়া আসিল।

রঘুনাথ তীক্ষ্ণ-স্বরে হাঁকিল,—মণ্টি!

মণ্টি থমকাইয়া দাঁড়াইষা পড়িল! রঘুনাথ তার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গেল! লক্ষ্মী চাহিয়া দেখে, রঘুনাথের চোখে তীব্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! সে দৃষ্টির আগুন তার প্রাণটাকে নিমেষে পুড়াইয়া দিল।

লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পা এমন কাঁপিতে লাগিল যে, আর দাঁড়ানো যায় না। রঘুনাথ তার পানে তেমনি বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—তুমি তো বেশ আছো। এই ঐশ্বর্য দেখাতে আমাদের ডাকিয়ে এনেছো! আমরা পথের ভিখারী, আর তুমি রাজরাণী! তা বেশ, তুমি সুখে থাকো। আমরা চললুম! রঘুনাথ মণ্টিকে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল!

সমস্ত পৃথিবী এমন ভয়ানক বেগে লক্ষ্মীর পায়ের তলায় দুলিয়া উঠিল যে, লক্ষ্মী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। কিরণ তাকে ধরিয়া কোচের উপর শোয়াইয়া দিল। তারপর সে রঘুনাথকে বলিল,—আপনি ভুল বুঝবেন না! আমি যে-ই হই—তবু শপথ করে' বলতে পারি, ভগবানের নাম নিয়ে যে, লক্ষ্মী সত্যই

সতী-লক্ষ্মী। ওর দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনলে পাষাণও ফেটে যায়। আপনার জন্যই ও প্রাণটুকু এখনো রেখেচে—আর আপনি এইসব কথা বলছেন! আপনি না—স্বামী? ওর সঙ্গে ঘর করেছেন? ওর মনের কথা সবই তো আপনার জানা··· সেই লক্ষ্মীকে আপনি বুঝতে ভুল করেন···

রঘুনাথ এ-কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক হইয়া কিরণের পানে চাহিল। কিরণ রজনীকে দেখাইয়া বলিল,—এই তো ওর মস্ত সাক্ষী। উনিই বলুন···লক্ষ্মী কি···

রজনীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মনকে প্রাণপণ বলে খাড়া করিয়া বলিল,—ইনি সতী-লক্ষ্মী—আমার মা। আমি অন্ধ-মোহে ওঁকে ঘর থেকে টেনে এনেছিলুম,—ভেবেছিলুম, নারীকে পাওয়া কোনোকালেই শক্ত নয়! কিন্তু আমি শপথ করে' বলছি, উনি নিষ্পাপ সতী···

তারপর রজনী ধীরে-ধীরে সকল কথা খুলিয়া বলিল। কেমন করিয়া লক্ষ্মীকে প্রথম দেখিয়া তাকে পাইবার জন্য সে পাগল হইয়া উঠে, তারপর কি ফন্দী করিয়া সে তাকে ধরিয়া আনে, কি করিয়াই-বা বন্দী করিয়া রাখে, তার পায়ে রাজার ঐশ্বর্য ঢালিয়া তাকে পাইবার দুরাশা লইয়া মিনতি-ভরা ভিক্ষা চায়, জোর করে—কিন্তু লক্ষ্মী দুই পায়ে সে ঐশ্বর্য মাড়াইয়া ভাঙিয়া, সে বল তুচ্ছ করিয়া পলাইয়া যায়। তারপর আবার একদিন, আজই সন্ধ্যার পূর্বে তাকে পুনরায় পাইবার জন্য কি দুরন্ত আগ্রহে সে ছুটিয়া আসে—এবং তারি ফলে তার মনের উপর হইতে পাপের ভারী পাথরখানা হড়হড় করিয়া সরিয়া গিয়া মনকে মুক্তি দিয়া রজনীকেও আবার মানুষ হইবার মস্ত সুযোগ দিয়াছে! থানায় রঘুনাথকে দেখিয়া সে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল! এ সতী-লক্ষ্মীকে কু-কথা বলিলে পৃথিবী এখনই ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে।

কিরণের চোখ দুইটা ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল! রজনীর কথা শেষ হইতে সে-ও খুলিয়া বলিল, দৈবাৎ সে লক্ষ্মীকে কেমন করিয়া পথে দেখে এক পিশাচের কবলে। ভাগ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই লক্ষ্মী রক্ষা পায়! নহিলে···

তারপর এখানে আসিয়া লক্ষ্মী সব আশা হারাইয়া মরিতে চাহিল! তারি কথায় দেশের বাড়ীতে লোক যায় লক্ষ্মার চিঠি লইয়া এবং সে আসিয়া খবর দেয় সেখানকার বাড়ী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! তারপর লক্ষ্মী তাঁকে পাইবার জন্য পাগলের মতো আজ কালীঘাটে, কাল দক্ষিণেশ্বরে, নিত্য এই গঙ্গার তীরে ঘাটে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সে ঘোরার এখনো বিরাম নাই!

সমস্ত কথাগুলি রঘুনাথের চিত্তকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তার লক্ষ্মী তার জন্য এত সহিয়াছে, আর তাকেই সে নিমেষের জন্যও এখন অবিশ্বাসের চোখে দেখিয়াছে! রঘুনাথের মনে হইল, এ চিন্তাই-বা তাকে পাইয়া বসিল কি করিয়া!

কিরণ রঘুনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মন্টিকে একেবারে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তারপর চুমায়-চুমায় তার ছোট মুখখানি ভরিয়া দিয়া বলিল,—এসো মা এসো, মা'র কাছে এসো—

লক্ষ্মীর সর্বশরীর প্রচণ্ড আবেগে তখনো কাঁপিতেছিল! এ কি, সত্যই তার সামনে

আজ তার চিরবাঞ্ছিত! এত-বড় আশাও তার এমন করিয়া পূর্ণ হইল! এখনো এ কি স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে, না··· ?

মন্টি গিয়া মা'র গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল,—মা—

লক্ষ্মীর দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। জলে-ভরা অস্পষ্ট দৃষ্টিতে মন্টির পানে চাহিয়া সে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—মনে-মনে ডাকিল, মন্টি, মন্টি, মা, মা···

তারপর সকলে চুপ—কাহারো মুখে কথা নাই! বুকের মধ্যে সকলেরই কিসের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল!

রজনী সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে একেবারে আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীর পায়ে প্রণাম করিল, করিয়া রুদ্ধ-স্বরে কহিল,—মা আমায় ক্ষমা করুন। আমার সমস্ত অপমান ভুলে যান—

লক্ষ্মী যেন কেমন হইয়া গেল! সে যে কি করিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—নারী যে কত-বড়, তার মন যে হেলা-ফেলার বস্তু নয়, সে যে সুলভ নয়, তা আমি আগে বুঝিনি। তারপর কিরণের পানে চাহিয়া বলিল, —কিরণ তুমিও আমায় ক্ষমা করো! যা ফেরাবার নয়,—তা ফিরবে না—কিন্তু তোমরা দুজনে আশীর্বাদ করো, জীবনের বাকী দিনগুলো যেন মানুষের মতো কাটাতে পারি!

রঘুনাথ তখনো স্তব্ধ দাঁড়াইয়া। রজনী তার পানে চাহিয়া বলিল,—আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার স্পর্ধা আমার নেই, সে সাহসও নেই! তবে যদি কোনোদিন পারেন, আমায় ক্ষমা করবেন। মন যা চায় তাকে তাই দিয়ে তৃপ্তি পাওয়া—মানুষের পক্ষে এ ভাব ঠিক নয়। সে তৃপ্তি কত ক্ষণিক, আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! সে তৃপ্তি এত ক্ষণিক বলেই একটার পর আর একটার দিকে ক্রমেই অসহ্য ঝোঁক নিয়ে অন্ধ হয়েই আমি ছুটেছিলুম!—আপনি কত মহৎ, এখনো আমায় গুলি করে' মারচেন না, এতেই আমি বুঝেছি—তবে এবার আমায় শোধরাবার সুযোগ দিন···বলিতে বলিতে সে রঘুনাথের দুই পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল,—বলুন, কোনোদিন আমায় ক্ষমা করতে পারবেন··· ? একটু আশা দিন, না হলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হবে না!

রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল; আর এই একটা নিশ্বাসের সঙ্গে এতদিনকার পুঞ্জিত বেদনা আর হাহাকার যেন তার বুক ছাড়িয়া বাহির হইয়া বুকটাকে হাল্কা করিয়া দিল। রঘুনাথ বলিল,—আপনাকে ক্ষমা করা শক্ত নয় তো! যা কেড়ে নিয়েছিলেন, তা' আবার ঐ হাতেই আমায় ফিরিয়ে দিলেন···তেম্‌নি অমলিন, তেমনি শুভ্র!

কিরণ মন্টির মাথায় হাত দিয়া বলিল,—এ যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে উঠেছে মা···

রঘুনাথ বলিল,—ওকে যে পেয়েছি এই ঢের। আর ভাগ্যে ওর এই বিপদ হয়েছিল, নইলে এ যে আয়ত্তের বাইরেই থেকে যেতো!

কিরণ বলিল,—রজনীবাবুর মুখে শুনলুম! আজকের বিপদগুলো সম্পদ বুকে করেও এসেছিল···আশ্চর্য!···তা, আমি মেয়েটাকে নিয়ে যাই···একটু-কিছু মুখে দিক্! আহা, মুখখানি শুকিয়ে উঠেছে একেবারে,···এসো তো মা···বলিয়া কিরণ মন্টিকে লইয়া চলিয়া গেল।

রজনী বলিল,—আজ আপনারা কথাবার্তা কন্, কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো এসে। আমার মা পেয়েছি···জীবনে মাকে কোনোদিন জানিওনি, তাই এত কষ্ট! তাই এমন একটা জ্বালার মতো চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলুম, মানুষ হইনি!—আজ আশা হয়েছে, মা'র পায়ের তলায় পড়ে' এবার বুঝি মানুষ হবো!

রঘুনাথ ও লক্ষ্মীকে আর-একবার প্রণাম করিয়া রজনী বিদায় লইল।

সে চলিয়া গেলে রঘুনাথ ও লক্ষ্মী দুইজনে কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—লক্ষ্মী মাটির দিকে মুখ নত করিয়া, আর রঘুনাথ দুই চোখে ক্ষুধিত তৃষিত দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া!

বহুক্ষণ এমনি থাকিবার পর রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে-ধীরে আসিয়া লক্ষ্মীর হাত দুখানি নিজের হাতে তুলিয়া ধরিল, ডাকিল,—লক্ষ্মী···

লক্ষ্মীর সর্বশরীর আবার কাঁপিয়া উঠিল! তার বুকের মধ্যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছুটিল।

রঘুনাথ বলিল,—এত কষ্ট সয়েছো তুমি লক্ষ্মী···আমি স্বামী, আমি তোমায় রক্ষা করতে পারিনি, তোমার সম্মান রক্ষার জন্য কোনো আয়োজন করিনি···

লক্ষ্মী রঘুনাথের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল,—আমায় ক্ষমা করো। তোমাদের দেখেছি, আর আমার কোনো সাধ নেই। আমি এবার মরতে চাই—দয়া করে' আমায় সে অনুমতি দাও···

রঘুনাথ বলিল,—এ-কথার মানে কি, লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী আবেগের সহিত বলিল,—না, না, আমি এ-কথা অনেকদিন থেকে ভেবে রেখেছি···তোমার ঘরে আমার ঠাঁই নেই! সব শান্তি নষ্ট করবে তুমি আমার জন্যে···? না, তা হবে না! পাড়ার লোক পাঁচ কথা বলবে, তা সহ্য করে'···না···না···

রঘুনাথ বলিল,—সে-সব কথা আমি গ্রাহ্য করিনে। তারা কি আমার মতো তোমায় জানে?

লক্ষ্মী বলিল,—তবু সে সমাজ—

রঘুনাথ বলিল,—এটা সত্যযুগ নয়, ত্রেতাও নয় যে, সমাজের জন্য আমি মানুষ হয়ে আমার নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীকে ত্যাগ করবো। মানুষের মন যে না ঢাগে, সমাজের সে কেউ নয়, কেউ হতেও পারে না কোনোদিন···আগে মানুষ, তারপর সমাজ!

লক্ষ্মী বলিল,—কিন্তু আমার উপর এত বিশ্বাস···

রঘুনাথ তাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল,—তোমায় অবিশ্বাস করলে আমার নিজের উপরও যে সব বিশ্বাস হারাবো, লক্ষ্মী! তোমার মন···? এতদিনেও কি তার কোনোখানটা আমার জানতে বাকী আছে? তুমি কি শুধুই আমার ঘরের ঘরণী? তুমি যে আমার প্রাণের প্রেয়সী···

তারপর রঘুনাথ বলিল,—সেদিন নদীর ধারে এসে যখন দেখলুম, ওপারের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, বুকের মধ্যটা এমন দুলে উঠলো···তবু এ-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি যে, এত-বড় বিপদ আমারি কপালে ঘটেছে!···বলিতে-বলিতে তার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল, চোখের সামনে অমনি ফুটিয়া উঠিল, বায়োস্কোপের পটে চলন্ত ছবির মত সেই

আগুন-রাঙা আকাশ, লোক-জনের চীৎকার তারপর শূন্য ঘর! পাড়ার লোক আসিয়া কতজনে কত কথাই বলিয়া গেল! অসহ্য সে-সব কথার হাত এড়াইতে মন্টিকে লইয়া রঘুনাথ দেশত্যাগ করিল।...পথে-পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে...শেষে এক পূজারী ব্রাহ্মণ মেয়ের শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ই বুক পাতিয়া দুইজনকে ঠাঁই দিয়াছে। আর যতীশ, যতীশের মা...তাঁদের কথা সোনার অক্ষরে বুকে লেখা থাকিবে, চিরদিন!

রঘুনাথ আজই ভাবিয়াছিল, এই মোটরের ধাক্কা-লাগার ফলে যদি মন্টির বেশী অসুখ হয়,...তাহা হইলে এ কুঁড়ে-ঘরে কে দেখিবে! তাছাড়া যতীশ বলিয়া গিয়াছে, কাল সকালেই সে আসিয়া তাঁদের লইয়া যাইবে, কোনো কথা শুনিবে না। মন্টি যে চোট পাইয়াছে,—এখানে কে তাকে দেখিবে।

রঘুনাথ সব কথাই খুলিয়া বলিল। লক্ষ্মী বিভোর মন লইয়া শুনিতেছিল। এ যেন কার রচা দুঃখের কাহিনী সে শুনিতেছে...এ লোকগুলি যে তারই প্রাণের জন, এ-কথাও সে ভুলিয়া যাইতেছিল।

গাঢ় সমবেদনায় লক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া কেবলই জল ঝরিতেছিল।

রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—মন্টির কথা...আজই যতীশের মা বলছিলেন যে, ওকে আমার হাতে দাও, ওটিকে আমি নেবো, আমার যতীশের জন্য!...

লক্ষ্মীর বুক দারুণ উত্তেজনায় দুলিতে লাগিল। সে বিমূঢ়ের মতো দুই চোখে জলের ধারা দুলাইয়া বসিয়া রহিল!

রঘুনাথ লক্ষ্মীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিল!—এই তার প্রাণের প্রেয়সী, কতদূরে গিয়াছিল, কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে! আজ আবার তার চোখের সামনে, তার বাহুর বাঁধনে সে ফিরিয়া আসিয়াছে!...

রঘুনাথ লক্ষ্মীর মুখখানি টানিয়া মুখের কাছে আনিল—যেমনি চুম্বন করিতে যাইবে, অমনি দ্বারের পাশে কিরণের স্বর শুনা গেল। কিরণ আসিয়া বলিল,—কিন্তু একটি কথা...মেয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে, বুঝলেন রঘুনাথবাবু, এই ঘর-দোর আমার এই মেয়েটির অভাবেই এতদিন অপূর্ণ ছিল, আজ সে এসে একে পূর্ণ করেছে। ঘর আমার আলো হয়ে উঠেছে...তার উপর আপনাদের হাসির আলো...ঘর আজ আমার আলোয় আলো! এ আলোর মুখ যে কখনো দেখিনি আমি...

বলিতে-বলিতে কিরণের স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল, সে-স্বরে মিনতি ভরিয়া সে আবার বলিল,—এ আলো নিবিয়ে দিয়ে আমার এ-ঘর আর আঁধার করে' চলে যাবেন না...

রঘুনাথ ও লক্ষ্মী দুজনেই বিস্মিত-চোখে ফিরিয়া দেখিল, সামনেই মন্টি...তার মুখ পুলকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, আর কিরণ, তার দুই চোখের কোলে জল একেবারে ঘনাইয়া আসিয়াছে!

রঘুনাথ তার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—আপনার কথা আমাদের কাছে দেবীর আদেশ! তার যদি অপমান করি, তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাবে।

শেষ